ভালবাসা খাঁটি, তার ভিতর পাগলামি ও প্রবঞ্চনা দুইই থাকে, ঐটুকুই ত ওর রহস্য।"

সীতেশের কাণে এ কথা এতই অদ্ভুত, এতই ... ঠেকল যে, তা শুনে তিনি একেবারে ... হয়ে গেলেন। কি উত্তর করবেন, ভেবে না ... বাক্ হয়ে রইলেন।

... বল্লেন, "বাঃ সোমনাথ বাঃ! এতক্ষণ ...কটা কথার মত কথা বলেছ—এর মধ্যে নূতনত্ব আছে, তেমনি বুদ্ধির খেলা আছে। ...দের মধ্যে তুমিই কেবল, মনোজগতে নিত্য ...ত্যের আবিষ্কার করতে পারো।"

...তেশ আর ধৈর্য্য ধরে' থাকতে না পেরে ...ঠলেন—

...অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি—এ কথা যে কতদূর ...ত্য, তোমাদের এই সব প্রলাপ শুনলে, তা বোঝা ...!"—

...সামনাথ তাঁর কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে ...তন না, অর্থাৎ কেউ তাঁর লেজে পা দিলে, তখনি উল্টে তাকে ছোবল মারতেন, আর ...সঙ্গে বিষ ঢেলে দিতেন। যে কথা তিনি ...য়ে বলতেন, সে কথা প্রায়ই বিষদিগ্ধ-বাণের ...লোকের বুকে গিয়ে বিঁধত।

সোমনাথের মতের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের যে বিশেষ ...ও মিল ছিল না, তার প্রমাণ ত তাঁর ...কাহিনী থেকেই স্পষ্ট পাওয়া যায়। গরল কণ্ঠে থাকলেও, তাঁর হৃদয়ে ছিল না। হাড়ের কঠিন ঝিনুকের মধ্যে যেমন জেলির মত ...ল দেহ থাকে, সোমনাথেরও তেমনি অতি কঠিন মতামতের ভিতর অতি কোমল মনোভাব লুকিয়ে থাকত। তাই তাঁর মতামত শুনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ত না, যা' হ'ত, তা হচ্ছে ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্য, কেননা, তাঁর কথা যতই অপ্রিয় হোক, তার ভিতর থেকে একটি সত্যের চেহারা উঁকি মারত,—যে সত্য আমরা দেখতে চাইনে বলে' দেখতে পাইনে।

এতক্ষণ আমরা গল্প বলতে ও শুনতে এতই নিবিষ্ট ছিলুম যে, বাহিরের দিকে চেয়ে দেখবার অবসর আমাদের কারও হয়নি। সকলে যখন চুপ করলেন, সেই ফাঁকে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, মেঘ কেটে গেছে, আর চাঁদ দেখা দিয়েছে। তার আলোয় চারিদিক ভরে' গেছে, ...ধু সে আলো এতই নির্ম্মল, এতই কোমল যে, ... বুক খুলে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে, তার হৃদয় কত মধুর আর কত করুণ। প্রকৃতির এ রূপ আমরা নিত্য দেখতে পাই নে বলেই আমাদের মনে ভয় ও ভরসা, সংশয় ও বিশ্বাস, দিন-রাত্তি... মত পালায় পালায় নিত্য যায় আর আসে।

অতঃপর আমি আমার কথা সুরু করলুম।

আমার কথা

সোমনাথ বলেছেন, "Love is both a mystery and a joke"। এ কথা যে এক হিসেবে সত্য, তা' আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য; কেননা, এই ভালবাসা নিয়ে মানুষে কবিত্বও করে, রসিকতাও করে। সে কবিত্ব যদি অপার্থিব হয়, আর সে রসিকতা যদি অশ্লীল হয়, তাতেও সমাজ কোন আপত্তি করে না। Dante এবং Boccaccio, উভয়েই এক যুগের লেখক,—শুধু তাই নয়, এর একজন হচ্ছেন গুরু, আর একজন শিষ্য। Don Juan এবং Epipsychidion, দুই কবিবন্ধুতে এক ঘরের পাশাপাশি বসে' লিখেছিলেন। সাহিত্য-সমাজে এই সব পৃথক্‌পন্থী লেখকদের যে সমান আদর আছে, তা'ত তোমরা সকলেই জানো।

এ কথা শুনে সেন বল্লেন, "Byron এবং Shelley ও-দুটি কাব্য যে এক সময়ে একসঙ্গে বসে' লিখেছিলেন, এ কথা আমি আজ এই প্রথম শুনলুম।"

আমি উত্তর করলুম, "যদি না ক'রে থাকেন, তা হ'লে তাঁদের তা' করা উচিত ছিল।"

সে যাই হোক, তোমরা যে সব ঘটনা বললে, তা নিয়ে আমি তিনটি দিব্যি হাসির গল্প রচনা করতে পারতুম, যা পড়ে' মানুষ খুসি হ'ত। সেন কবিতায় যা পড়েছেন, জীবনে তাই পেতে চেয়েছিলেন। সীতেশ জীবনে যা' পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে কবিত্ব করতে চেয়েছিলেন। আর সোমনাথ মানব-জীবন থেকে তার কাব্যাংশটুকু বাদ দিয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিন জনই সমান আহাম্মক বনে' গেছেন। কোনও বৈষ্ণব কবি বলেছেন যে, জীবনের পথ "প্রেমে পিচ্ছিল,"—কিন্তু সেই পথে কাউকে পা পিছলে পড়তে দেখলে মানুষের যেমন আমোদ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু তোমরা, যে-ভালবাসা

আসলে হাস্যরসের জিনিষ, তার ভিতর দু'চার ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে তাকে করুণরসে পরিণত কর্‌তে গিয়ে, ও-বস্তুকে এম্‌নি ঘুলিয়ে দিয়েছ যে, সমাজের চোখে, তা' কলুষিত ঠেক্‌তে পারে। কেননা, সমাজের চোখ, মানুষের মনকে হয় সূর্য্যের আলোয়, নয় চাঁদের আলোয় দেখে। তোমরা আজ নিজের মনের চেহারা যে আলোয় দেখেছ, সে হচ্ছে আজকের রাত্তিরের ঐ দুষ্ট ক্লিষ্ট আলো। সে আলোর মায়া এখন আমাদের চোখের সুমুখ থেকে সরে' গিয়েছে। সুতরাং আমি যে গল্প বল্‌তে যাচ্ছি, তার ভিতর আর যাই থাক্‌, কোনও হাস্যকর কিম্বা লজ্জাকর পদার্থ নেই।

এ গল্পের ভূমিকাস্বরূপে আমার নিজের প্রকৃতির পরিচয় দেবার কোন দরকার নেই, কেননা, তোমাদের যা' বল্‌তে যাচ্ছি, তা' আমার মনের কথা নয়—আর একজনের,—একটি স্ত্রীলোকের; এবং সে রমণী আর যাই হোক্‌—চোরও নয়, পাগলও নয়।

গত জুন মাসে আমি কল্‌কাতায় একা ছিলুম। আমার বাড়ী ত তোমরা সকলেই জানো; ঐ প্রকাণ্ড পুরীতে রাত্তিরে খালি দু'টি লোক শুত,—আমি আর আমার চাকর। বহুকাল থেকে একা থাক্‌বার অভ্যেস নেই, তাই রাত্তিরে ভাল ঘুম হ'ত না। একটু কিছু শব্দ শুনলে মনে হ'ত, যেন ঘরের ভিতর কে আস্‌ছে, অমনি গা ছম্‌ ছম্‌ ক'রে উঠ্‌ত; আর রাত্তিরে জানই ত কতরকম শব্দ হয়,—কখনও ছাদের উপর, কখনও দরজা-জানালায়, কখনও রাস্তায়, কখনও বা গাছপালায়। একদিন এই সব নিশাচর ধ্বনির উপদ্রবে রাত একটা পর্য্যন্ত জেগেছিলুম, তার পর ঘুমিয়ে পড়্‌লুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলুম, যেন কে টেলিফোনে ঘণ্টা দিচ্ছে। অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেই সঙ্গে ঘড়িতে দুটো বাজ্‌ল। তার পর শুনি যে, টেলিফোনের ঘণ্টা একটানা বেজে চলেছে। আমি ধড়্‌ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। মনে হ'ল যে, আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কারও হয় ত হঠাৎ কোন বিশেষ বিপদ ঘটেছে, তাই এত রাত্তিরে আমাকে খবর দিচ্ছে। আমি ভয়ে ভয়ে বারান্দায় এসে দেখি, আমার ভৃত্যটি অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে। তার ঘুম না ভাঙ্গিয়ে টেলিফোনের মুখ-নলটি নিজেই তুলে নিয়ে কাণে ধরে' বল্লুম—Hallo!

উত্তরে পাওয়া গেল শুধু ঘণ্টার সেই ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। তার পর দু'চারবার "হ্যালো" "হ্যালো" কর্‌বার পর একটি অতি মৃদু, অতি মিষ্ট আমার কানে এল! জানো সে কি রকম গির্জ্জার অর্‌গানের সুর যখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, আর মনে হয় যে, সে সুর লক্ষ যোজন দূরে আস্‌ছে,—ঠিক সেইরকম।

ক্রমে সেই স্বর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল। আমি শুনলুম, কে ইংরাজীতে জিজ্ঞেস কর্‌ছে—

"তুমি কি মিষ্টার রায়?"

—হাঁ—আমি একজন মিষ্টার রায়।

—S. D.?

—হাঁ—কাকে চাও?

—তোমাকেই।

গলার স্বর ও কথার উচ্চারণে বুঝ্‌লুম, যিনি কথা কচ্ছেন, তিনি একটি ইংরাজ-রমণী।

আমি প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞেস কর্‌লুম, "তুমি কে?"

—চিন্‌তে পার্‌ছ না?

—না।

—একটু মনোযোগ দিয়ে শোন ত, এ কণ্ঠ তোমার পরিচিত কি না।

—মনে হচ্ছে, এ স্বর পূর্ব্বে শুনেছি, তবে কোথায় আর কবে, তা' কিছুতেই মনে কর্‌তে পার্‌ছি নে।

—আমি যদি আমার নাম বলি, ত হ'লে কি মনে পড়্‌বে?

—খুব সম্ভব পড়্‌বে।

—আমি "আনি"।

—কোন্‌ "আনি"?

—বিলেতে যাকে চিন্‌তে।

—বিলেতে ত আমি অনেক "আনি"কে চিন্‌তুম। সে দেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের ত ঐ এক নাম।

—মনে পড়ে, তুমি Gordon Square-এ এক বাড়ীতে ঘর ভাড়া ক'রে ছিলে?

—তা' আর মনে নেই? আমি যে একাদিক্রমে দুই বৎসর সেই বাড়ীতে থাকি।

—শেষ বৎসরের কথা মনে পড়ে?

—অবশ্য। সে ত সে-দিনকের কথা; বছর দশেক হ'ল সেখান থেকে চলে' এসেছি।

—সেই বৎসর সে-বাড়ীতে "আনি" বলে' একটি দাসী ছিল, মনে আছে?

এই কথা বলবামাত্র আমার মনে পূর্ব্বস্মৃতি সব ফিরে এল। "আনি"র ছবি আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠল।

ভালব... বললুম, "খুব মনে আছে। দাসীর মধ্যে অত সুন্দরী বিলেতে কখনও দেখিনি।"

...সুন্দরী ছিলুম, তা জানি, কিন্তু আমার ...চোখে যে কখনও পড়েছে, তা' জান-

...'রে জানবে? আমার পক্ষে ও কথা ...া অভদ্রতা হ'ত।

...কথা ঠিক। তোমার আমার ভিতর ...অবস্থার অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল।

এ কথার কোনও উত্তর দিলুম না। ...র সে আবার বল্লে—আমি আজ তোমাকে ...টি কথা বলব, যা তুমি জানতে না।

...কি বল ত?

...আমি তোমাকে ভালবাসতুম।

...ত্যি?

...এমন সত্য যে, দশ বৎসরের পরীক্ষাতেও তা' ...য়েছে।

...এ কথা কি ক'রে জানব? তুমি ত আমাকে বলো নি।

...তোমাকে ও-কথা বলা যে আমার পক্ষে অভ-...ত।" তা' ছাড়া ও জিনিষ ত ব্যবহারে, চেহা-...রা পড়ে। ও কথা অন্ততঃ স্ত্রীলোকে মুখ বলে না।

—কই আমি ত কখনও কিছু লক্ষ্য করিনি।

—কি ক'রে করবে, তুমি কি কখনও মুখ তুলে ...র দিকে চেয়ে দেখেছ? আমি প্রতিদিন ...ঘণ্টা ধরে' তোমার বসবার ঘরে টেবিল ...রেছি, তুমি সে সময় হয় খবরের কাগজ দিয়ে ...কে রাখতে, নয় মাথা নীচু ক'রে ছুরি দিয়ে ...তে।

—এ কথা ঠিক,—তার কারণ, তোমার দিকে ...ক'রে নজর দেওয়াটাও আমার পক্ষে অভদ্রতা ...ত। তবে সময়ে সময়ে এটুকু অবশ্য লক্ষ্য করেছি ...য, আমার ঘরে এলে তোমার মুখ লাল হয়ে উঠত, আর তুমি একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তে। আমি ভাবতুম, সে ভয়ে।

—সে ভয়ে নয়, লজ্জায়। কিন্তু তুমি যে কিছু লক্ষ্য করো নি, সেইটেই আমার পক্ষে অতি সুখের হয়েছিল।

—কেন?

—তুমি যদি আমার মনের কথা জানতে পারতে, ...নাহি আর লজ্জায় তোমাকে মুখ দেখাতে ...ম। তা হ'লে আমিও আর তোমাকে নিত্য দেখতে পেতুম না, তোমার জন্যে কিছু করতেও পারতুম না।

—আমার জন্য তুমি কি করেছ?

—সেই শেষ বৎসর তোমার একদিনও কোনও জিনিষের অভাব হয়েছে,—একদিনও কোন অসু-বিধেয় পড়তে হয়েছে?

—না।

—তার কারণ, আমি প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি। জানো, তোমাকে যে ভাল না বাসে, সে কখন তোমার সেবা করতে পারে না?

—কেন বল দেখি?

—এই জন্যে যে, তুমি নিজের জন্য কিছু করতে পারো না, অথচ তোমার জন্য কাউকে কিছু করতেও বলো না!

—তুমি যে আমার জন্যে সব ক'রে দিতে, আমি ত তা' জানতুম না। আমি ভাবতুম Mrs. Smith। তাইতে আসবার সময় তোমাকে কিছু না বলে', Mrs. Smithকে ধন্যবাদ দিয়ে আসি।

—আমি তোমার ধন্যবাদ চাই নি। তুমি যে আমাকে কখনও ধমকাও নি, সেই আমার পক্ষে ছিল যথেষ্ট পুরস্কার।

—সে কি কথা! স্ত্রীলোককে কোনও ভদ্রলোক কি কখনও ধমকায়?

—স্ত্রীলোককে কেউ না ধমকালেও, দাসীকে অনেকেই ধমকায়।

—দাসী কি স্ত্রীলোক নয়?

—দাসীরা জানে, তারা স্ত্রীলোক, কিন্তু ভদ্র-লোকে সে কথা দু'বেলা ভুলে যায়।

কথাটা এতই সত্য যে, আমি তার কোন জবাব দিলুম না। একটু পরে সে বল্লে—

—কিন্তু একদিন তুমি একটি অতি নিষ্ঠুর কথা বলেছিলে।

—তোমাকে?

—আমাকে নয়, তোমার একটি বন্ধুকে, কিন্তু সে আমার সম্বন্ধে।

—তোমার সম্বন্ধে আমার কোনও বন্ধুকে কখন কিছু বলেছি বলে' ত মনে পড়ছে না।

—তোমার কাছে সে এত তুচ্ছ কথা যে, তোমার তা মনে থাকবার কথা নয়,—কিন্তু আমার মনে তা' চিরদিন কাঁটার মত বিঁধে ছিল।

—শুনলে হয় ত মনে পড়বে।

—তুমি একদিন একটি মুক্তোর Tie-Pin নিয়ে এলে, তার পরদিন সেটি আর পাওয়া গেল না।

—হ'তে পারে।

—আমি সেটি সারা রাত্তির খুঁজে বেড়াচ্ছি, এমন সময় তোমার একটি বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; তুমি তাঁকে হেসে বললে যে, "আনি" ওটি চুরি ক'রে ঠকেছে, কেননা, মুক্তোটি হচ্ছে ঝুঁটো, আর পিনটি পিতলের; "আনি" বেচতে গিয়ে দেখতে পাবে যে, ওর দাম এক পেনি। তার পর তোমরা দু'জনেই হাস্তে লাগলে। কিন্তু ঐ কথায় তুমি ঐ পিতলের পিনটি আমার বুকের ভিতর ফুটিয়ে দিয়েছিলে।

—আমরা না ভেবে চিন্তে অমন অন্যায় কথা অনেক সময় বলি।

—তা' আমি জানতুম, তাই তোমার উপর আমার রাগ হয় নি,—যা' হয়েছিল সে শুধু যন্ত্রণা। দারিদ্র্যের কষ্টের চাইতে তার অপমান যে বেশী, সেদিন আমি মর্ম্মে মর্ম্মে তা' অনুভব করেছিলুম। তুমি কি ক'রে জানবে যে, আমি তোমার এক ফোঁটা ল্যাভেণ্ডারও কখনও চুরি করি নি।

—এর উত্তরে আমার আর কিছু বলবার নেই। না জেনে হয় ত ঐরকম কথায় কত লোকের মনে কষ্ট দিয়েছি।

—তোমার মুক্তোর পিন্ কে চুরি করেছিল, পরে আমি তা' আবিষ্কার করি।

—কে বল ত?

—তোমার ল্যাণ্ডলেডি Mrs. Smith.

—বল কি! সে ত আমাকে মায়ের মত ভাল বাসত। আমি চলে' আসবার দিন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

—সে তার ব্যাঙ্ক ফেল হ'ল বলে'!—তোমাকে সে এক টাকার জিনিষ দিয়ে দু'টাকা নিতো।

—আমি কি তা হ'লে অতদিন চোখ বুজে ছিলুম?

—তোমাদের চোখ তোমাদের দলের বাইরে যায় না, তাই বাইরের ভালমন্দ কিছুই দেখতে পায় না। সে যাই হোক্, আমি তোমার একটি জিনিষ না বলে' নিতুম—বই,—আবার তা' পড়ে' ফিরে দিতুম।

—তুমি কি পড়তে জানতে?

—ভুলে যাচ্ছ, আমরা সকলেই Board Schoolএ লেখাপড়া শিখি।

—হাঁ, তা'ত সত্যি।

—জানো কেন চুরি ক'রে বই পড়তুম?

—না।

—ভগবান্ আমাকে রূপ দিয়েছিলেন, আমি তা' যত্ন ক'রে মেজে ঘসে রাখতুম।

—তা আমি জানি। তোমার মত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দাসী আমি বিলেতে দেখিনি।

—তুমি যা জানতে না, তা' হচ্ছে এই,—ভগবান্ আমাকে বুদ্ধিও দিয়েছিলেন, তাও আমি মেজে ঘসে রাখতে চেষ্টা করতুম,—এবং এ দুইই করতুম তোমারই জন্যে।

—আমার জন্যে?

—পরিষ্কার থাকতুম এই জন্যে, যাতে তুমি আমাকে দেখে নাক না শেঁটকাও; আর বই পড়তুম এই জন্যে, যাতে তোমার কথা ভাল ক'রে বুঝতে পারি।

—আমি ত তোমার সঙ্গে কখনও কথা কইতুম না।

—আমার সঙ্গে নয়। খাবার টেবিলে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমি যখন কথা কইতে, তখন আমার তা' শুনতে বড় ভাল লাগ্‌ত। সে ত কথা নয়, সে যেন ভাষার আতসবাজি! আমি অবাক্ হয়ে শুনতুম, কিন্তু সব ভাল বুঝতে পারতুম না। কেননা, তোমরা যে ভাষা বলতে, তা' বইয়ের ইংরাজি। সেই ইংরাজি ভাল ক'রে শেখবার জন্য আমি চুরি ক'রে বই পড়্‌তুম।

—সে সব বই বুঝতে পারতে?

—আমি পড়তুম শুধু গল্পের বই। প্রথমে জায়গায় জায়গায় শক্ত লাগ্‌ত, তার পর একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর কোথাও বাধ্‌ত না।

—কি রকম গল্পের বই তোমার ভাল লাগত? যাতে চোর-ডাকাত খুন-জখমের কথা আছে?

—না, যাতে ভালবাসার কথা আছে। সে যাই হোক্, তোমাকে ভালবেসে তোমার দাসীর এই উপকার হয়েছিল যে, সে শরীরে মনে ভদ্রমহিলা হয়ে উঠেছিল,—তার ফলেই তার ভবিষ্যৎ জীবন এত সুখের হয়েছিল।

—আমি শুনে সুখী হলুম।

—কিন্তু প্রথমে আমাকে ওর জন্য অনেক ভুগতে হয়েছিল।

—কেন?

—তোমার মনে আছে, তুমি চলে' আসবার সময় বলেছিলে যে, এক বৎসরের মধ্যে আবার ফিরে আসবে?

—সে ভদ্রতা ক'রে,—Mrs. Smith দুঃখ করছিল বলে' তাকে স্তোক দেবার জন্যে।

—কিন্তু আমি সে কথায় বিশ্বাস করেছিলুম।

—তুমি কি এত ছেলেমানুষ ছিলে?

—আমার মন আমাকে ছেলেমানুষ করে' ফেলেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আশা ছেড়ে দিলে, জীবনে যে আর কিছু ধরে' থাকবার মত আমার ছিল না।

—তার পর?

—তুমি যে দিন চলে' গেলে, তার পরদিনই আমি Mrs. Smithএর কাছ থেকে বিদায় হই।

—Mrs. Smith তোমাকে বিনা নোটিসে ছাড়িয়ে দিলে?

—না, আমি বিনা নোটিসে তাকে ছেড়ে গেলুম। ও শ্মশানপুরীতে আমি আর এক দিনও থাক্তে পারলুম না।

—তার পর কি কর্‌লে?

—তার পর একবৎসর ধরে' যেখানে যেখানে তোমার দেশের লোকেরা থাকে, সেই সব বাড়ীতে চাক্‌রি করেছি,—এই আশায় যে, তুমি ফিরে এলে সে খবর পাব। কিন্তু কোথাও এক মাসের বেশী থাক্‌তে পারি নি।

—কেন, তারা কি তোমাকে বকৃত, গাল দিত?

—না, কটু কথা নয়, মিষ্ট কথা বলৃত বলে'। তুমি যা' করেছিলে—অর্থাৎ উপেক্ষা,—এরা কেউ আমাকে তা' করে নি। আমার প্রতি এদের বিশেষ মনোযোগটাই আমার কাছে বিশেষ অসহ্য হ'ত।

—মিষ্টি কথা যে মেয়েদের তিতো লাগে, এ ত আমি আগে জানতুম না।

—আমি মনে আর দাসী ছিলুম না—তাই আমি স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে, তাদের ভদ্র কথার পিছনে যে মনোভাব আছে, তা মোটেই ভদ্র নয়। ফলে আমি আমার রূপ, যৌবন, দারিদ্র্য নিয়েও সকল বিপদ এড়িয়ে গেছি! জানো কিসের সাহায্যে?

—না।

—আমি আমার শরীরে এমন একটি রক্ষাকবচ ধারণ কর্‌তুম, যার গুণে কোন পাপ আমাকে স্পর্শ কর্‌তে পারে নি।

—সেটি কি Cross?

—বিশেষ ক'রে আমার পক্ষেই তা' Cross ছিল—অন্ত কারও পক্ষে নয়। তুমি যাবার সময় আমাকে যে গিনিটি বক্‌শিস্ দেও, সেটি আমি একটি কালো ফিতে দিয়ে বুকে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। আমার বুকের ভিতর যে ভালবাসা ছিল, আমার বুকের উপরে ওই স্বর্ণমুদ্রা ছিল তার বাহ্য নিদর্শন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি সেটিকে দেহছাড়া করি নি যদিচ আমার এমন দিন গেছে, যখন আমি খে[তে] পাই নি।

—এমন এক দিনও তোমার গেছে—য[খন] তোমাকে উপবাস কর্‌তে হয়েছে?

—একদিন নয়, বহুদিন। যখন আমার চাক্[রি] থাকৃত না, তখন হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেলে আমাকে উপবাস কর্‌তে হ'ত।

—কেন, তোমার বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, আত্মী[য়] স্বজন কি কেউ ছিল না?

—না, আমি জন্মাবধি একটি Foundlin[g] Hospitalয়ে মানুষ হই।

—কত বৎসর ধরে' তোমাকে এ কষ্ট ভো[গ] কর্‌তে হয়েছে?

—এক বৎসরও নয়। তুমি চলে' যাবার ম[াস] দশেক পরে আমার এমন ব্যারাম হ'ল যে, আমাকে হাঁসপাতালে যেতে হ'ল। সেইখানেই আমি এ স[ব] কষ্ট হতে মুক্তি লাভ কর্‌লুম।

—তোমার কি হয়েছিল?

—যক্ষ্মা।

—রোগেরও ত একটা যন্ত্রণা আছে?

—যক্ষ্মা রোগের প্রথম অবস্থায় শরীরের কোন কষ্ট থাকে না, বরং যদি কিছু থাকে ত [সে] আরাম। তাই যে ক'মাস আমি হাঁসপাতা[লে] ছিলুম, তা' আমার অতি সুখেই কেটে গিয়েছিল।

—মরণাপন্ন অসুখ নিয়ে হাঁসপাতালে এ[কা] পড়ে' থাকা যে সুখের হ'তে পারে, এ আজ নতু[ন] শুনলুম।

—এ ব্যারামের প্রথম অবস্থায় মৃত্যুভয় থাকে না। তখন মনে হয়, এতে প্রাণ হঠাৎ একদি[ন] নিভে যাবে না। সে প্রাণ দিনের পর দি[ন] ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অলক্ষিতে অন্ধকা[রে] মিলিয়ে যাবে। সে মৃত্যু কতকটা ঘুমিয়ে পড়া[র] মত। তা ছাড়া, শরীরের ও-অবস্থায় শরীরে[র] কোন কাজ থাকে না বলে' সমস্ত দিন স্ব[প্ন] দেখা যায়,—আমি তাই শুধু সুখস্বপ্ন দেখতুম।

—কিসের?

—তোমার। আমার মনে হ'ত যে, একদি[ন] হয় ত তুমি এই হাঁসপাতালে আমার সঙ্গে দে[খা] কর্‌তে আসুবে। আমি নিত্য তোমার প্রতীক্ষা কর্‌তুম।

—তার যে কোনই সম্ভাবনা ছিল না, তা কি জান্‌তে না?

—যক্ষ্মা হ'লে লোকের আশা অসম্ভবরকম বেড়ে যায়। সে যাই হোক্, তুমি যদি আস্তে, তা হ'লে আমাকে দেখে খুসি হতে।

—তোমার ঐ রুগ্ন চেহারা দেখে আমি খুসি হতুম, এরূপ অদ্ভুত কথা তোমার মনে কি ক'রে হল' ?

—সেই ইটালিয়ান পেন্টারের নাম কি, যার ছবি তুমি এত ভালবাসতে যে,সমস্ত দেয়ালময় টাঙ্গিয়ে রেখেছিলে ?

—Botticelli.

—হাঁ, তুমি এলে দেখতে পেতে যে, আমার চেহারা ঠিক Botticelliর ছবির মত হয়েছিল। হাত-পাগুলি সরু সরু, আর লম্বা লম্বা। মুখ পাতলা, চোখ দুটো বড় বড়, আর তারা দুটো যেমন তরল, তেমনি উজ্জ্বল। আমার রং হাতীর দাঁতের রংয়ের মত হয়েছিল, আর যখন জ্বর আসত, তখন গাল দুটি একটু লাল হয়ে উঠ্ত। আমি জানি যে, তোমার চোখে সে চেহারা বড় সুন্দর লাগ্ত।

—তুমি কতদিন হাঁসপাতালে ছিলে ?

—বেশী দিন নয়। যে ডাক্তার আমায় চিকিৎসা করূতেন, তিনি মাসখানেক পরে আবিস্কার করূলেন যে, আমার ঠিক যক্ষ্মা হয় নি, শীতে আর অনাহারে শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। তাঁর যত্নে ও সুচিকিৎসায় আমি তিন মাসের মধ্যেই ভাল হয়ে উঠলুম।

—তার পর ?

—তার পর আমার যখন হাঁসপাতাল থেকে বেরবার সময় হ'ল, তখন ডাক্তারটি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করূলেন যে, আমি বেরিয়ে কি করূব ? আমি উত্তর করূলুম—দাসীগিরি। তিনি বল্‌লেন যে—তোমার শরীর যখন একবার ভেঙ্গে পড়েছে, তখন জীবনে ওরকম পরিশ্রম করা তোমার দ্বারা আর চলবে না। আমি বল্লুম—উপায়ান্তর নেই। তিনি প্রস্তাব করূলেন যে, আমি যদি Nurse হ'তে রাজি হইত তার জন্য যা দরকার, সমস্ত খরচা তিনি দেবেন। তাঁর কথা শুনে আমার চোখে জল এল,—কেন না, জীবনে এই আমি সব প্রথম একটি সহৃদয় কথা শুনি। আমি সে প্রস্তাবে রাজি হলুম। এত শীগ্‌গির রাজি হবার আরও একটি কারণ ছিল।

—কি ?

—আমি মনে করূলুম, Nurse হয়ে আমি কল্‌কাতায় যাব। তা হ'লে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমার অসুখ হ'লে তোমার শুশ্রূষা করূব।

—আমার অসুখ হবে, এমন কথা তোমার মনে হ'ল কেন ?

—শুনেছিলুম, তোমাদের দেশ বড়ই অস্বাস্থ্যকর, সেখানে নাকি সব সময়েই সকলের অসুখ করে।

—তার পরে সত্য সত্যই Nurse হলে ?

—হাঁ। তার পরে সেই ডাক্তারটি আমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করূলেন। আমি আমার মন ও প্রাণ, আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর হাতে সমর্পণ করূলুম।

—তোমার বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছে ?

—পৃথিবীতে যতদূর সম্ভব, ততদূর হয়েছে। আমার স্বামীর কাছে আমি যা' পেয়েছি, সে হচ্ছে পদ ও সম্পদ, ধন ও মান, অসীম যত্ন এবং অকৃত্রিম স্নেহ ; একটি দিনের জন্যও তিনি আমাকে তিলমাত্র অনাদর করেন নি, একটি কথাতেও কখন মনে ব্যথা দেন নি।

—আর তুমি ?

—আমার বিশ্বাস, আমিও তাঁকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অসুখী করি নি। তিনি ত আমার কাছে কিছু চান নি, তিনি চেয়েছিলেন শুধু আমাকে ভালবাসতে ও আমার সেবা করূতে। বাপ চিররুগ্ন মেয়ের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে, তিনি আমার সঙ্গে ঠিক সেইরকম ব্যবহার করেছিলেন। আমি সেরে উঠ্‌লেও আর আগের শরীর ফিরে পাইনি, বরাবর সেই Botticelliর ছবিই থেকে গিয়েছিলুম—আর আমার স্বামী আমার বাপের বয়সীই ছিলেন। তাঁকে আমি আমার সকল মন দিয়ে দেবতার মত পূজো করেছি।

—আশা করি, তোমাদের বিবাহিত জীবনের উপর আমার স্মৃতির ছায়া পড়ে নি ?

—তোমার স্মৃতি আমার জীবন-মন কোমল ক'রে রেখেছিল।

—তা হ'লে তুমি আমাকে ভুলে যাওনি ?

—না। সেই কথাটা বল্‌বার জন্যই ত আজ তোমার কাছে এসেছি। তোমার প্রতি আমার মনোভাব বরাবর একই ছিল।

—বল্‌তে চাও, তুমি তোমার স্বামীকে ও আমাকে দুজনকে একসঙ্গে ভালবাস্‌তে ?

—অবশ্য ! মানুষের মনে অনেক রকম ভালবাসা আছে, যা' পরস্পরে বিরোধ না ক'রে

একসঙ্গে থাকতে পারে। এই দেখো না কেন, লোকে বলে যে শত্রুকে ভালবাসা শুধু অসম্ভব নয়, অনুচিত;—কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে, শত্রু-মিত্র নির্ব্বিচারে, যে যন্ত্রণা ভোগ করছে, তার প্রতিই লোকের সমান মমতা, ভালবাসা হ'তে পারে।

—এ সত্য কোথায় আবিষ্কার করেছ?

—ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে।

—তুমি সেখানে কি করতে গিয়েছিলে?

—বলছি। এই যুদ্ধে আমরা দুজনেই ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলুম, তিনি ডাক্তার হিসেবে, আমি Nurse হিসেবে—সেইখান থেকে এই তোমার কাছে আসছি, যে কথা আগে বলবার সুযোগ পাইনি, সেই কথাটি বলবার জন্য।

—তোমার কথা আমি ভাল বুঝতে পারছি নে।

—এর ভিতর হেঁয়ালি কিছু নেই। এই ঘণ্টাখানেক আগে তোমার সেই Botticelliর ছবি একটি জর্ম্মাণ গোলার আঘাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে—অমনি আমি তোমার কাছে চলে' এসেছি।

—তা হ'লে এখন তুমি?

—পরলোকে।

এর পর টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আমি ঘরে চলে' এলুম। মুহূর্ত্তে আমার শরীর-মন একটা তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এল। আমি শোবামাত্র ঘুমে অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। তার পরদিন সকালে চোখ খুলে দেখি, বেলা দশটা বেজে গেছে।

* * * *

কথা শেষ ক'রে বন্ধুদের দিকে চেয়ে দেখি, রূপকথা শোনবার সময় ছোট ছেলেদের মুখের যেমন ভাব হয়, সীতেশের মুখে ঠিক সেই ভাব। সোমনাথের মুখ কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে। বুঝলুম, তিনি নিজের মনের উদ্বেগ জোর ক'রে চেপে রাখ্‌ছেন। আর সেনের চোখ ঢুলে আসছে,—ঘুমে কি ভাবে, বলা কঠিন। কেউ 'হুঁ না'ও করলেন না। মিনিটখানেক পরে বাইরে গির্জ্জের ঘণ্টায় বারোটা বাজলে, আমরা সকলে একসঙ্গে উঠে পড়ে' boy boy বলে' চীৎকার করলুম, কেউ সাড়া দিলে না। ঘরে ঢুকে দেখি, চাকরগুলো সব মেজেতে বসে' দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমচ্ছে। চাকরগুলোকে টেনে তুলে গাড়ী জুততে বলতে নীচে পাঠিয়ে দিলুম।

হঠাৎ সীতেশ বলে' উঠলেন, "দেখ রায়, তুমি একজন লেখক, দেখো, এ সব গল্প যেন কাগজে ছাপিয়ে দিয়ো না, তা হ'লে আমি আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাতে পারব না।" আমি উত্তর করলুম, "সে লোভ আমি সম্বরণ করতে পারব না, তাতে তোমরা আমার উপর খুসিই হও, আর রাগই করো।" সেন বল্লেন, "আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি যা' বল্লুম, তা আগাগোড়া সত্য, কিন্তু সকলে ভাববে যে, তা' আগাগোড়া বানানো।" সোমনাথ বল্লেন, "আমারও কোনও আপত্তি নেই, আমি যা' বল্লুম, তা আগাগোড়া বানানো, কিন্তু লোকে ভাববে যে, তা' আগাগোড়া সত্যি!" আমি বললুম, "আমি যা' বল্লুম, তা' ঘটেছিল, কি আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, তা' আমি নিজেও জানি নে। সেই জন্যই ত এ সব গল্প লিখে ছাপাব। পৃথিবীতে দু'রকম কথা আছে, যা' বলা অন্যায়,—এক হচ্ছে মিথ্যা, আর এক হচ্ছে সত্য। যা' সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, আর না হয় ত একই সঙ্গে দুই,—তা বলায় বিপদ নেই।

সীতেশ বল্লেন, "তোমাদের কথা আলাদা। তোমাদের একজন কবি, একজন ফিলজফার, আর একজন সাহিত্যিক,—সুতরাং তোমাদের কোন্ কথা সত্য আর কোন্ কথা মিথ্যে, তা' কেউ ধরতে পারবে না। কিন্তু আমি হচ্ছি সহজ মানুষ, হাজারে ন'শ নিরনব্বুই জন যেমন হয়ে থাকে, তেমনি। আমার কথা যে খাঁটি সত্য, পাঠকমাত্রেই তা' নিজের মন দিয়েই যাচাই ক'রে নিতে পারবে।"

আমি বল্লুম—"যদি সকলের মনের সঙ্গে তোমার মনের মিল থাকে, তা হ'লে তোমার মনের কথা প্রকাশ করায় ত তোমার লজ্জা পাবার কোনও কারণ নেই।" সীতেশ বল্লেন, "বাঃ, তুমি ত বেশ বল্লে। আর পাঁচজন যে আমার মত, এ কথা সকলে মনে মনে জানলেও, কেউ মুখে তা' স্বীকার করবে না, মাঝ থেকে আমি শুধু বিদ্রূপের ভাগী হব।" এ কথা শুনে সোমনাথ বল্লেন, "দেখ রায়, তা হ'লে এক কাজ করো,—সীতেশের গল্পটা আমার নামে চালিয়ে দেও, আর আমার গল্পটা সীতেশের নামে!" এ প্রস্তাবে সীতেশ অতিশয় ভীত হয়ে বললেন, "না না, আমার গল্প আমারই থাক্। এতে নয় লোকে দুটো ঠাট্টা করবে, কিন্তু সোমনাথের পাপ আমার ঘাড়ে চাপলে আমাকে ঘর ছাড়তে হবে!"—

এর পরে আমরা সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করলুম

জানুয়ারি, ১৯১৬।

আহুতি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু—

আহুতি

ইউরোপীয় সভ্যতা আজ পর্য্যন্ত আমাদের গ্রামের বুকের ভিতর তার শিং ঢুকিয়ে দেয় নি; অর্থাৎ রেলের রাস্তা সে গ্রামকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে চলে' গেছে। কাজেই কলিকাতা থেকে বাড়ী যেতে অদ্যাবধি কতক পথ আমাদের সেকেলে যানবাহনের সাহায্যেই যেতে হয়; বর্ষাকালে নৌকা, আর শীত-গ্রীষ্মে পাল্কিই হচ্ছে আমাদের প্রধান অবলম্বন।

এই স্থলপথ আর জলপথ ঠিক উল্টো উল্টো দিকে। আমি বরাবর নৌকাযোগেই বাড়ী যাতায়াত করতুম, তাই এই স্থলপথের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ আমার কোনই পরিচয় ছিল না। তার পর, যে বৎসর আমি B.A. পাস করি, সে বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমাকে একবার দেশে যেতে হয়; অবশ্য স্থলপথে। এই যাত্রায় যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল, তোমাদের কাছে আজ তারই পরিচয় দেব।

আমি সকাল ছ'টায় ট্রেণ থেকে নেমে দেখি, আমার জন্য ষ্টেসনে পাল্কি-বেহারা হাজির রয়েছে। পাল্কি দেখে তার অন্তরে প্রবেশ করবার যে বিশেষ লোভ হয়েছিল,তা বলতে পারি নে। কেন না, চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে, সেখানি প্রস্থে দেড় হাত আর দৈর্ঘ্যে তিন হাতের চাইতেও কম। তার পর বেহারা-দের চেহারা দেখে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। এমন অস্থিচর্ম্মসার মানুষ, অন্য কোনও দেশে বোধ হয় হাঁস-পাতালের বাইরে দেখা যায় না। প্রায় সকলেরি পাঁজরার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, হাতপায়ের মাংস সব দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এদের শরীরের একটিমাত্র অঙ্গ—উদর—অস্বাভাবিক-রকম স্ফীতি ও চাকচিক্য লাভ করেছে। আমি ডাক্তার না হলেও, অনুমানে বুঝলুম যে, তার অভ্য-ন্তরে পীলে ও যকৃৎ পরস্পর পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। মনে প'ড়ে গেল বৃহদারণ্যক উপনিষদে পড়েছিলুম যে, অশ্বমেধের অশ্বের "যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্ব্বতা"। পীলে ও যকৃৎ নামক মাংসপিণ্ড দুটিকে পর্ব্বতের সঙ্গে তুলনা করা যে অসঙ্গত নয়, এই প্রথম আমি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম। মানুষের দেহ যে কতদূর শ্রীহীন, শক্তিহীন হ'তে পারে, তার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে আমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লুম; এরকম দেহ মনুষ্যত্বকে প্রকাশ্যে অপমান করে। অথচ আমাদের গ্রামের হিন্দুর বীরত্ব এই সব দেহ আশ্রয় করেই টি'কে আছে। এরা জাতিতে অস্পৃশ্য হলেও হিন্দু—শরীরে অশক্ত হলেও বীর। কেন না, শীকার এদের জাতব্যবসা। এরা বর্শা দিয়ে শূয়োর মারে, বনে ঢুকে জঙ্গল ঠেঙ্গিয়ে বাঘ বার করে; অবশ্য উদরান্নের জন্য। এদের তুলনায়, মাথায় লাল পাগড়ি ও গায়ে সাদা চাপকান পরা—আমার দর্শনধারী সঙ্গী ভোজপুরী দরওয়ানটিকে রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছিল।

এ সব কৃষ্ণের জীবদের কাঁধে চড়ে' বিশ মাইল পথ যেতে প্রথমে আমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হয়েছিল মনে হ'ল, এই সব জীর্ণ-শীর্ণ জীবন্মৃত হতভাগ্যদের স্কন্ধে আমার দেহের ভার চাপানোটা নিতান্ত নিষ্ঠুর তার কার্য্য হবে। আমি পাল্কিতে চড়তে ইতস্তত করছি দেখে, বাড়ী থেকে যে মুসলমান সর্দ্দারটি এসে ছিল, সে হেসে বললে—

"হুজুর উঠে পড়ুন, কিছু কষ্ট হবে না। আর দেরি করলে বেলা চারটের মধ্যে বাড়ী পৌঁছতে পারবেন না।

দশ ক্রোশ পথ যেতে দশ ঘণ্টা লা[illegible], এ কথা শুনে আমার পাল্কি চড়বার উৎসাহ যে বেড়ে গেল অবশ্য তা নয়। তবুও আমি 'দুর্গা' বলে' হামাগুড়ি দিয়ে সেই প্যাকবাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়লুম, কেন না তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। বলা বাহুল্য, ইতি মধ্যে নিজের মনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম যে, মানুষের স্কন্ধে আরোহণ ক'রে যাত্রা করায় পাপ নেই আমরা ধনী লোকেরা পৃথিবীর দরিদ্র লোকদের কাঁধে চড়েই ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করছি। আর পৃথিবীতে যে স্বল্পসংখ্যক ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্র ছিল, আছে থাকবে এবং থাকা উচিত, এই ত 'পলিটিক্যাল ইক নমি'র শেষ কথা। Conscienceকে ঘুম পাড়াবার কত-না মন্ত্রই আমরা শিখেছি!

অতঃপর পাল্কি চলতে সুরু করল।

সর্দ্দারজী আশা দিয়াছিলেন যে, হুজুরের কোন

কষ্ট হবে না। কিন্তু সে আশা যে "দিলাশা" মাত্র, তা বুঝতে আমার বেশিক্ষণ লাগে নি। কেন না, হুজুরের সুস্থ শরীর ইতিপূর্ব্বে কখনও এতটা ব্যতি-ব্যস্ত হয় নি। পাল্কির আয়তনের মধ্যে আমার দেহায়তন খাপ খাওয়াবার বৃথা চেষ্টায় আমার শরীরের যে ব্যস্তসমস্ত অবস্থা হয়েছিল, তাকে শোয়াও বলা চলে না, বসাও বলা চলে না। শাল-গ্রামের শোওয়া বসা দুই এক হলেও মানুষের অবশ্য তা নয়। কাজেই এ দুয়ের ভিতর যেটি হোক, একটি আসন গ্রহণ করবার জন্য আমাকে অবি-শ্রাম কসরৎ করতে হচ্ছিল। কুচিমোড়া না ভেঙ্গে বীরাসন ত্যাগ ক'রে পদ্মাসন গ্রহণ করবার জো ছিল না, অথচ আমাকে বাধ্য হয়ে মিনিটে মিনিটে আসন পরিবর্ত্তন করতে হচ্ছিল। আমার বিশ্বাস, এ অবস্থায় হঠযোগীরাও একাসনে বহুক্ষণ স্থায়ী হ'তে পারতেন না, কেন না, পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করবামাত্র পাল্কির ছাদ সজোরে মস্তকে চপেটাঘাত করছিল। ফলে, গুরুজনের সুমুখে কুলবধূর মত, আমাকে কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে অবস্থিতি করতে হয়েছিল। নাভিপদ্মে মনঃসংযোগ করবার এমন সুযোগ আমি পূর্ব্বে কখনও পাই নি; কিন্তু অভ্যাস-দোষে আমার বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত ক'রে নাভি-বিবরে সুনিবিষ্ট করতে পারলুম না।

শরীরের এই বিপর্য্যস্ত অবস্থাতে আমি অবশ্য কাতর হয়ে পড়ি নি। তখন আমার নবযৌবন। দেহ তার স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম্ম তখনও হারিয়ে বসে নি। বরং সত্য কথা বলতে গেলে, নিজ দেহের এই সব অনিচ্ছাকৃত অঙ্গভঙ্গী দেখে আমার শুধু হাসি পাচ্ছিল। এই যাত্রার মুখে, পূর্ব্বদিক থেকে যে আলো ও বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে আসছিল, তার দর্শনে ও স্পর্শনে আমার মন উৎফুল্ল উল্লসিত হয়ে উঠেছিল; সে বাতাস যেমন সুখস্পর্শ, সে আলো তেমনি প্রিয়দর্শন। দিনের এই নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমার নয়ন-মন সব জেগে উঠেছিল। আমি একদৃষ্টে বাইরের দৃশ্য দেখতে লাগলুম। চারিদিকে শুধু মাঠ ধূ ধূ করছে, ঘর নেই, দোর নেই, গাছ নেই, পালা নেই, শুধু মাঠ —অফুরন্ত মাঠ—আগাগোড়া সমতল ও সমরূপ, আকাশের মত বাধাহীন এবং ফাঁকা। কলিকাতার ইটকাঠের পায়রার খোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকৃতির এই অসীম উদারতার মধ্যে আমার অন্তরাত্মা মুক্তির আনন্দ অনুভব করতে লাগল। আমার মন থেকে সব ভাবনা-চিন্তা ঝরে' গিয়ে সে মন ঐ আকাশের মত নির্ব্বিকার ও প্রসন্ন রূপ ধারণ করলে,—তার মধ্যে যা ছিল, সে হচ্ছে আনন্দের ঈষৎ রক্তিম আভা। কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হ'ল না, কেন না, দিনের সঙ্গে রোদ, প্রকৃতির গায়ের জ্বরের মত বেড়ে উঠতে লাগল, আকাশ-বাতাসের উত্তাপ, দেখতে দেখতে একশত' পাঁচ ডিগ্রিতে চড়ে' গেল। যখন বেলা প্রায় ন'টা বাজে, তখন দেখি, বাইরের দিকে আর চাওয়া যায় না; আলোয় চোখ ঝলসে যাচ্ছে। আমার চোখ একটা কিছু সবুজ পদার্থের জন্য লালায়িত হয়ে দিগ্‌দিগন্তে তার অন্বেষণ ক'রে এখানে ওখানে দুটি একটি বাবলা গাছের সাক্ষাৎ লাভ করলে। বলা বাহুল্য, এতে চোখের পিপাসা মিটল না, কেন না, এ গাছের আর যে গুণই থাক, এর গায়ে শ্যামল-শ্রী নেই, পায়ের নীচে নীল ছায়া নেই। এই তরুহীন, পত্রহীন, ছায়াহীন পৃথিবী আর মেঘমুক্ত রৌদ্রপীড়িত আকাশের মধ্যে ক্রমে একটি বিরাট অবসাদের মূর্ত্তি ফুটে উঠল। প্রকৃতির এই একঘেয়ে চেহারা আমার চোখে আর সহ্য হ'ল না। আমি একখানি বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলুম। সঙ্গে Meredith-এর Egoist এনেছিলুম, তার শেষ চ্যাপ্টার পড়তে বাকী ছিল। একটানা দু'চার পাতা পড়ে' দেখি, তার শেষ চ্যাপ্টার তার প্রথম চ্যাপ্টার হয়ে উঠেছে,—অর্থাৎ তার একবর্ণও আমার মাথায় ঢুকল না। বুঝলুম, পাল্কির অবিশ্রাম ঝাকুনিতে আমার মস্তিষ্ক বেবাক ঘুলিয়ে গেছে। আমি বই বন্ধ ক'রে পাল্কি বেহারাদের একটু চাল বাড়াতে অনুরোধ করলুম, এবং সেই সঙ্গে বকশিষের লোভ দেখালুম। এতে ফল হ'ল। অর্দ্ধেক পথে যে গ্রামটিতে আমাদের বিশ্রাম করবার কথা ছিল, সেখানে বেলা সাড়ে দশটায়, অর্থাৎ মেয়াদের আধঘণ্টা আগে গিয়ে পৌঁছলুম।

এই মরুভূমির ভিতর এই গ্রামটি যে ওয়েসিসের একটা খুব নয়নাভিরাম এবং মনোরম উদাহরণ, তা বলতে পারি নে। মধ্যে একটি ডোবা, আর তার তিন পাশে একতলা সমান উঁচু পাড়ের উপর খান দশবারো খড়োঘর, আর এক পাশে একটি অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছের নীচে পাল্কি নামিয়ে, বেহারারা ছুটে গিয়ে সেই ডোবায় ডুব দিয়ে উঠে, ভিজে কাপড়েই চিঁড়ে-দইয়ের ফলার করতে বসল। পাল্কি দেখে গ্রাম-বধূরা সব পাড়ের উপরে এসে কাতার দিয়ে দাঁড়াল। এই পল্লীবধূদের

সম্বন্ধে কবিতা লেখা কঠিন, কেন না, এদের আর যাই থাক,—রূপও নেই, যৌবনও নেই। যদি বা কারও রূপ থাকে ত, তা কৃষ্ণবর্ণে ঢাকা পড়েছে, যদি বা কারও যৌবন থাকে ত, তা মলিন বসনে চাপা পড়েছে। এদের পরণের কাপড় এত ময়লা যে, তাতে চিমটি কাটলে একতাল মাটি উঠে আসে। যা বিশেষ ক'রে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সে হচ্ছে তাদের হাতের পায়ের রূপোর গহনা। এক যোড়া চুড় আমার চোখে পড়ল, যার তুল্য সুশ্রী গড়ন একালের গহনায় দেখতে পাওয়া যায় না। এই থেকে প্রমাণ পেলুম যে, বাঙালার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের দেহে সৌন্দর্য্য না থাক, সেই শ্রেণীর পুরুষের হাতে আর্ট আছে।

ঘণ্টা আধেক বাদে আমরা আবার রওনা হলুম। পাল্কি অতি ধীরে সুস্থে চলতে লাগল, কেন না, ভূরিভোজনের ফলে আমার বাহকদের গতি আপন্নসত্ত্বা স্ত্রীলোকের তুল্য মৃদুমন্থর হয়ে এসেছিল। ইতিমধ্যে আমার শরীর, মন, ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ প্রভৃতি সব এতটা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, আমি চোখ বুঝে ঘুমাবার চেষ্টা করলুম। ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর রোদ্দুর এবং পাল্কির দোলার প্রসাদে আমার তন্দ্রা এল; সে তন্দ্রা কিন্তু নিদ্রা নয়। আমার শরীর যেমন শোওয়া বসা এ দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল, আমার মনও তেমনি সুপ্তি ও জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল। তার পর পাল্কির একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি জেগে উঠলুম, সে ধাক্কার বেগ এতই বেশি যে, তা আমার দেহের ষট্‌চক্র ভেদ ক'রে একেবারে সহস্রারে গিয়ে উপনীত হয়েছিল! জেগে দেখি, ব্যাপার আর কিছুই নয়—বেহারারা একটি প্রকাণ্ড বট-গাছের তলায় সোয়ারি সজোরে নিক্ষেপ ক'রে একদম অদৃশ্য হয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সর্দ্দারজী বললেন, ওরা একটু তামাক খেতে গিয়েছে। যাত্রা ক'রে অবধি, এই প্রথম একটি জায়গা আমার চোখে পড়ল, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। সে বট একাই একশ'; চারিদিকে সারি সারি বোয়া নেমেছে, আর তার উপরে পাতা এত ঘনবিন্যস্ত যে, সূর্য্যরশ্মি তা ভেদ ক'রে আসতে পারছে না। মনে হ'ল, প্রকৃতি তাপক্লিষ্ট পথশ্রান্ত পথিকদের জন্য একটি হাজার থামের পান্থশালা স্বহস্তে রচনা ক'রে রেখেছেন। সেখানে ছায়া এত নিবিড় যে, সন্ধ্যে হয়েছে বলে' আমার ভুল হ'
কিন্তু ঘড়ি খুলে দেখি, বেলা তখন সবে একটা।

আমি এই অবসরে বহুকষ্টে পাল্কি থেকে নিষ্ক্রা
লাভ ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম
দেহটিকে সোজা ক'রে খাড়া করতে প্রায় মিনি
পোনোরো লাগল; কেন না, ইতিমধ্যে আমার সর্ব্বাে
খিল ধরে' এসেছিল, তার উপর আবার কোন অ
অসাড় হয়ে গিয়েছিল; কোনও অঙ্গে ঝিনঝিনি ধরে
ছিল, কোনও অঙ্গে পক্ষাঘাত, কোনও অঙ্গে ধনুষ্টঙ্কা
হয়েছিল। যখন শরীরটি সহজ অবস্থায় ফিরে এ
তখন মনে ভাবলুম, গাছটি একবার প্রদক্ষিণ ক'
আসি। খানিকটে দূর এগিয়ে দেখি, বেহারাগুলে
সব পাঁড়েজীকে ঘিরে বসে' আছে, আর সকলে মি
একটা মহা জটলা পাকিয়ে তুলেছে। প্রথমে আমা
ভয় হ'ল যে, এরা হয় ত আমার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করবা
চক্রান্ত করছে; কেন না, সকলে একসঙ্গে মহা উৎসা
বক্তৃতা করছিল। কিন্তু তার পরেই বুঝলুম যে
এই বকাবকি চেঁচামেচির অন্য কারণ আছে। এর
যে বস্তুর ধূমপান করছিল, তা যে তামাক নয়—
"বড় তামাক," তার পরিচয় ঘ্রাণেই পাওয়া গেল
এদের স্ফূর্ত্তি, এদের আনন্দ, এদের লম্ফঝম্ফ দেখে
গঞ্জিকার ত্বরিতানন্দ নামের সার্থকতার প্রত্যক্ষ
প্রমাণ পেলুম। এক জন কল্কের এক এ
টান দিচ্ছে, আর "ব্যোম্ কালী কল্‌কাত্তা ওয়ালি'
বলে' হুঙ্কার ছাড়ছে! গাঁজার কল্কের গড়ন যে এ
সুডোল, তা আমি পূর্ব্বে জানতুম না,—গড়নে ক
ফুলও এর কাছে হার মানে। মাদকতার আধা
যে সুন্দর হওয়া দরকার, এ জ্ঞান দেখলুম এদেরও
আছে।

প্রথমে এদের এই ধূমপানোৎসব দেখতে আমা
আমোদ বোধ হচ্ছিল, কিন্তু ক্রমে বিরক্তি ধরতে
লাগল। ছিলেমের পর ছিলেম পুড়ে যাচ্ছে, অথ
দেখি, কারও ওঠবার অভিপ্রায় নেই। এদের গাঁজ
খাওয়া কখন্ শেষ হবে জিজ্ঞাসা করাতে, সর্দ্দারজী
উত্তর করলেন—"হুজুর, এদের টেনে না তুললে এর
উঠবে না, সুমুখে ভয় আছে, তাই এরা গাঁজায় দ
দিয়ে মনে সাহস ক'রে নিচ্ছে।" আমি বল্লুম,
"কি ভয়?" সে জবাব দিলে, "হুজুর, সে ভয়ে
নাম করতে নেই। একটু পরে সব চোখেই
দেখতে পাবেন।" এ কথা শুনে ব্যাপার কি দেখ-
বার জন্যে আমার মনে এতটা কৌতূহল জন্মাল যে,
বেহারাগুলোকে টেনে তোলবার জন্যে স্বয়ং তাদের
কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখি, যে-সব চোখ

ইতিপূর্ব্বে যক্কতের প্রভাবে হলুদের মত হলদে ছিল, এখন সে-সব গঞ্জিকার প্রসাদে চূণ-হলুদের মত লাল হয়ে উঠেছে। প্রতি লোকটিকে নিজের হাতে টেনে খাড়া করতে হ'ল, তার ফলে বাধ্য হয়ে কতকটা গাঁজার ধোঁয়া আমাকে উদরস্থ করতে হ'ল; সে ধোঁয়া আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশলাভ ক'রে আমার মাথায় গিয়ে চড়ে' বসল। অমনি আমার গা পাক দিয়ে উঠল, হাত-পা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল, চোখ টেনে আসতে লাগল, আমি তাড়াতাড়ি পাল্কিতে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। পাল্কি আবার চলতে সুরু করল। এবার আমি পাল্কি চড়বার কষ্ট কিছুমাত্র অনুভব করলুম না, কেন না, আমার মনে হ'ল যে, শরীরটে যেন আমার নয়—অপর কারো।

খানিকক্ষণ পর,—কতক্ষণ পর তা বলতে পারিনে,—বেহারা-গুলো সব সমস্বরে ও তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। এদের গায়ের জোরের চাইতে গলার জোর যে বেশি, তার প্রমাণ পূর্ব্বেই পেয়েছিলুম,—কিন্তু সে জোর যে এত অধিক, তার পরিচয় এই প্রথম পেলুম। এই কোলাহলের ভিতর থেকে একটা কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—সে হচ্ছে রামনাম। ক্রমে আমার পাঁড়েজীটিও বেহারাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে "রামনাম সৎ হ্যায়" "রাম নাম সৎ হ্যায়" এই মন্ত্র অবিরাম আউড়ে যেতে লাগলেন। তাই শুনে আমার মনে হ'ল যে, আমার মৃত্যু হয়েছে, আর ভূতেরা পাল্কিতে চড়িয়ে আমাকে প্রেতপুরীতে নিয়ে যাচ্ছে! এ ধারণার মূলে আমার অন্তরস্থ গঞ্জিকাধূমের কোনও প্রভাব ছিল কি না জানিনে। এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, জানবার জন্য আমার মহা কৌতূহল হ'ল। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, গ্রামে আগুন লাগলে যে রকম হয়, আকাশের চেহারা সেই রকম হয়েছে, অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ,—আকাশ-যোড়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুনতে পেলুম না। চারিদিক এমন নির্জ্জন, এমন নিস্তব্ধ যে, মনে হ'ল, মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। তার পর পাল্কি আর একটু অগ্রসর হ'লে দেখলুম যে, সুমুখে যা পড়ে' আছে, তা একটি মরুভূমি—বালির নয়, পোড়ামাটির,—সে মাটি পাতখোলার মত, তার গায়ে একটি তৃণ পর্য্যন্ত নেই। এই পোড়ামাটির উপরে মানুষের এখন বসবাস নেই, কিন্তু পূর্ব্বে যে ছিল, তার অসংখ্য এবং অপর্য্যাপ্ত চিহ্ন চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। এ যেন ইটের রাজ্য। যতদূর চোখ যায়, দেখি, শুধু ইট আর ইট, কোথায়ও বা তা গাদা হয়ে রয়েছে, কোথায়ও বা হাজারে হাজারে মাটির উপর বেছানো রয়েছে; আর সে ইট এত লাল যে, দেখলে মনে হয়, টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে। এই ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ; কিন্তু তার একটিতেও পাতা নেই, সব নেড়া, সব শুকনো, সব মরা। এই গাছের কঙ্কালগুলি কোথাও বা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা দু' একটি একধারে আলগোছ হয়ে রয়েছে। আর এই ইটকাঠ, মাটি, আকাশের সর্ব্বাঙ্গে যেন রক্তবর্ণ আগুন জড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে বেহারাদের প্রকৃতির লোকের ভয় পাওয়াটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কেন না, আমারই গা ছম্-ছম্ করতে করতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে এই নিস্তব্ধতার বুকের ভিতর থেকে একটি অতি ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি আমার কানে এল। সে স্বর এত মৃদু, এত করুণ, এত কাতর যে, মনে হ'ল, সে সুরের মধ্যে যেন মানুষের যুগযুগান্তের বেদনা সঞ্চিত, ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। এ কান্নার সুরে আমার সমগ্র অন্তর অসীম করুণায় ভরে' গেল, আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশ্বমানবের ব্যথার ব্যথী হয়ে উঠলুম। এমন সময়ে হঠাৎ ঝড় উঠল, চারিদিক থেকে এলোমেলোভাবে বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসের তাড়নায় আকাশের আগুন যেন পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। আকাশের রক্তগঙ্গায় যেন তুফান উঠল, চারিদিকে আগুনের ঢেউ বইতে লাগল। তার পর দেখি, সেই অগ্নিপ্লাবনের মধ্যে অসংখ্য নরনারীর ছায়া কিলবিল করছে, ছট্‌ফট্ করছে। এই ব্যাপার দেখে উনপঞ্চাশ বায়ু মহানন্দে করতালি দিতে লাগল, হা হা হো হো শব্দে চীৎকার করতে লাগল। ক্রমে এই শব্দ মিলেমিশে একটা অট্টহাস্যে রূপান্তরিত হ'ল,—সে হাসির নির্ম্মম বিকট ধ্বনি দিগ্‌দিগন্তে ঢেউ খেলিয়ে গেল। সে হাসি ক্রমে ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হয়ে, আবার সেই মৃদু, করুণ ও কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হ'ল। এই বিকট হাসি আর এই করুণ ক্রন্দনের দ্বন্দ্বে আমার মনের ভিতর এই ধ্বংসপুরীর পূর্ব্বস্মৃতি সব জাগিয়ে তুললে,—সে স্মৃতি ইহজন্মের, কি পূর্ব্বজন্মের, তা আমি বলতে পারি নে। আমার ভিতর থেকে কে যেন আমাকে বলে' দিলে যে, সে গ্রামের ইতিহাস এই—

২

এই ইটকাঠের মরুভূমি হচ্ছে রুদ্রপুরের ধ্বংসাবশেষ। রুদ্রপুরের রায় বাবুরা এককালে এ অঞ্চলের

সর্ব্বপ্রধান জমিদার ছিলেন। রায়-বংশের আদি পুরুষ রুদ্রনারায়ণ, নবাব-সরকারে চাকরি ক'রে রায়-রাইয়াঁন খেতাব পান, এবং সেই সঙ্গে তিন পরগণার মালিকি স্বত্ব লাভ করেন। লোকে বলে, এঁদের ঘরে দিল্লীর বাদশার স্বহস্তে স্বাক্ষরিত সনদ ছিল, এবং সেই সনদে তাঁদের কোতল কচ্ছলের ক্ষমতা দেওয়া ছিল। সনদের বলে হোক আর না হোক, এঁরা যে কোতল কচ্ছল করতেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিম্বদন্তী এই যে, এমন দুর্দ্দান্ত জমিদার এ দেশে পূর্ব্বাপর কখনও হয়নি। এঁদের প্রবল প্রতাপে বাঘে ছাগলে একঘাটে জল খেত। কেন না, যার উপর এঁরা নারাজ হতেন, তাকে ধনে-প্রাণে বিনাশ করতেন। এঁরা কত লোকের ভিটামাটি যে উচ্ছন্নে দিয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। রায় বাবুদের দোহাই অমান্য করে, এত বড় বুকের পাটা বিশ ক্রোশের মধ্যে কোনও লোকেরই ছিল না। তাঁদের কড়া শাসনে পরগণার মধ্যে চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গাহাঙ্গামার নামগন্ধও ছিল না, তার একটি কারণ, ও-অঞ্চলের লাঠিয়াল, সড়কিয়াল, তীরন্দাজ প্রভৃতি যত ক্রুরকর্ম্মা লোক, সব তাঁদের সরকারে পাইক-সর্দ্দারের দলে ভর্ত্তি হ'ত। একদিকে যেমন মানুষের প্রতি তাঁদের নিগ্রহের সীমা ছিল না, অপর-দিকে তেমনি অনুগ্রহেরও সীমা ছিল না। দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র, আতুরকে ঔষধপথ্য দান এঁদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। এঁদের অনুগত আশ্রিত লোকের লেখাযোখা ছিল না। এঁদের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরের প্রসাদে দেশের গুরুপুরোহিতের দল সব জোৎদার হয়ে উঠেছিলেন। তার পর পূজা-আর্চ্চা, দোল-দুর্গোৎসবে তাঁরা অকাতরে অর্থ ব্যয় করতেন; রুদ্র-পুরে দোলের সময় আকাশ আবীরে, ও পুজোর সময় পৃথিবী রুধিরে লাল হয়ে উঠত। রুদ্রপুরের অতিথিশালায় নিত্য একশত অতিথি-ভোজনের আয়োজন থাকত। পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়গ্রস্ত কোনও ব্রাহ্মণ, রুদ্রপুরের বাবুদের দ্বারস্থ হয়ে কখনও রিক্ত-হস্তে ফিরে যায় নি। এঁরা বলতেন, ব্রাহ্মণের ধন বাঁধবার জন্য নয়—সৎকার্য্যে ব্যয় করবার জন্য। সুতরাং সৎকার্য্যে ব্যয় করবার টাকার যদি কখনও অভাব হ'ত, তা হ'লে বাবুরা সে টাকা সা-মহাজনদের ঘর লুঠে নিয়ে আসতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এক কথায়, এঁরা ভাল কাজ মন্দ কাজ সব নিজের খেয়াল ও মর্জ্জি অনুসারে করতেন; কেন না, নবাবের আমলে তাঁদের কোনও শাসনকর্ত্তা ছিল না। ফলে, জন-সাধারণে তাঁদের যেমন ভয় করত, তেমনি ভক্তিও করত, তার কারণ, তাঁরা জনসাধারণকে ভক্তিও করতেন না, ভয়ও করতেন না। এই অবাধ যথেচ্ছাচারের ফলে তাঁদের মনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা উত্তরোত্তর অসাধারণ বৃদ্ধিলাভ করে-ছিল। তাঁদের মনে যা ছিল, সে হচ্ছে জাতির অহ-ঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, বলের অহঙ্কার, রূপের অহঙ্কার। রায়-পরিবারের পুরুষেরা সকলেই গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ ছিলেন, এবং তাঁদের ঘরের মেয়েদের রূপের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সব কারণে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা এঁদের পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

এ দেশে ইংরেজ আসবার পূর্ব্বেই এ পরিবারের ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছিল, তার পর কোম্পানির আমলে এঁদের সর্ব্বনাশ হয়। এঁদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ হওয়ার দরুণ যে-সকল সরিক নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, ক্রমে তাদের বংশ লোপ পেতে আরম্ভ হ'ল; কেননা, নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন করাটা এঁদের মতে অতি হেয় কার্য্য বলে' গণ্য ছিল। তার পর সরিকানা বিবাদ। রায়-পরিবার ছিল শাক্ত,—এত ঘোর শাক্ত যে, রুদ্রপুরের ছেলে বুড়োতে মদ্যপান করত। এমন কি, এ বংশের মেয়েরাও তাতে কোন আপত্তি করত না, কেন না, তাদের বিশ্বাস ছিল, মদ্যপান করা একটি পুরুষালি কাজ। সন্ধ্যার সময় কুলদেবতা সিংহবাহিনীর দর্শনের পর বাবুরা যখন বৈঠকখানায় বসে' মদ্যপানে রত হতেন, তখন সেই সকল গৌরবর্ণ প্রকাণ্ড পুরুষদের কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা আর জবাফুলের মত দুই চোখ, এই তিনে মিলে সাক্ষাৎ মহাদেবের রোষকষায়িত ত্রিনেত্রের মত দেখাত। এই সময়ে পৃথিবীতে এমন দুঃসাহসের কার্য্য নেই, যা তাঁদের দ্বারা সিদ্ধ না হ'ত। তাঁরা লাঠিয়ালদের এ-সরিকের ধানের গোলা লুঠে আনতে, ও-সরিকের প্রজার বৌঝিকে বে-ইজ্জৎ করতে হুকুম দিতেন। ফলে রক্তারক্তি কাণ্ড হ'ত। এই জ্ঞাতি-শত্রুতার দরুণ তাঁরা উৎসন্নের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তার পর এঁদের বিষয়সম্পত্তি যা অবশিষ্ট ছিল, তা দশশালা বন্দোবস্তের প্রসাদে হস্তান্তরিত হয়ে গেল। কিস্তির শেষ তারিখে সদর খাজানা কোম্পানির মালখানায় দাখিল না করলে লক্ষ্মী যে চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করবেন, এ জ্ঞান এঁদের মনে কখনও জন্মাল না। পূর্ব্ব আমলে নবাব সরকারে নিয়মিত শালি-য়ানা মাল খাজানা দাখিল করবার অভ্যাস তাঁদের ছিল না। এই অনভ্যাসবশতঃ কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব

এঁরা সময়মত দিয়ে উঠতে পারতেন না। কাজেই এঁদের অধিকাংশ সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে রায়বংশ প্রায় লোপ পেয়ে এসেছিল। যে গ্রামে এঁরা প্রায় একশ' ঘর ছিলেন, সেই গ্রামে আজ একশ' বৎসর পূর্ব্বে ছ'ঘর মাত্র জমিদার ছিল।

এই ছ'ঘরের বিষয়সম্পত্তিও ক্রমে ধনঞ্জয় সরকারের হস্তগত হ'ল। এর কারণ, ধনঞ্জয় সরকার ইংরাজের আইন যেমন জানতেন, তেমনি মানতেন। ইংরাজের আইনের সাহায্যে, এবং সে আইন বাঁচিয়ে, কি করে' অর্থোপার্জ্জন করতে হয়, তার অন্ধি-সন্ধি ফিকির-ফন্দি সব তাঁর নখাগ্রে ছিল। তিনি জিলার কাছারিতে মোক্তারি করে' দুচার বৎসরের মধ্যেই অগাধ টাকা রোজগার করেন। তার পর তেজারতিতে সেই টাকা সুদের সুদ, তস্য সুদে হুহু করে' বেড়ে যায়। জনরব যে, তিনি বছর দশেকের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা উপায় করেন। এত না হোক, তিনি যে দু'চার লক্ষ টাকার মালিক হয়েছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই টাকা করবার পর তাঁর জমিদার হবার সাধ গেল, এবং সেই সাধ মেটাবার জন্য তিনি একে একে রায়বাবুদের সম্পত্তিসকল খরিদ করতে আরম্ভ করলেন; কেননা, এ জমিদারির প্রতি কাঠা জমি তার নখদর্পণে ছিল। রায়বংশের চাকরি করেই তাঁর চৌদ্দপুরুষ মানুষ হয়, এবং তিনিও অল্পবয়সে রুদ্রপুরের বড় সরিক ত্রিলোকনারায়ণের জমাসেরেস্তায় পাঁচ সাত বৎসর মুহুরির কাজ করেছিলেন। সকল সরিকের সমস্ত সম্পত্তি মায় বসতবাটী খরিদ করলেও, বহুকাল যাবৎ তাঁর রুদ্রপুরে যাবার সাহস ছিল না, কেননা,তাঁর মুনিবপুত্র উগ্রনারায়ণ তখনও জীবিত ছিলেন। উগ্রনারায়ণ হাতে পৈতা জড়িয়ে সিংহবাহিনীর পা ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে ধনঞ্জয় যদি রুদ্রপুরের ত্রিসীমানার ভিতর পদার্পণ করে, তা হ'লে সে সশরীরে আর ফিরে যাবে না। তিনি যে তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন, সে বিষয়ে ধনঞ্জয়ের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কেননা, তিনি জানতেন যে উগ্রনারায়ণের মত দুর্দ্ধর্ষ ও অসমসাহসী পুরুষ রায়বংশেও কখন জন্মগ্রহণ করে নি।

উগ্রনারায়ণের মৃত্যুর কিছুদিন পরে ধনঞ্জয় রুদ্রপুরে এসে রায়বাবুদের পৈতৃকভিটা দখল করে' বসলেন। তখন সে গ্রামে রায়বংশের একটি পুরুষও বর্ত্তমান ছিল না, সুতরাং তিনি ইচ্ছা করলে সকল সরিকের বাড়ী নিজ-দখলে আনতে পারতেন, তবুও তিনি উগ্রনারায়ণের একমাত্র বিধবা কন্যা রত্নময়ীকে তাঁর পৈতৃক বাটী থেকে বহিষ্কৃত করে' দেবার কোনও চেষ্টা করেন নি। তার প্রথম কারণ, রুদ্রপুরের সংলগ্ন পাঠানপাড়ার প্রজারা উগ্রনারায়ণের বাটীতে রত্নময়ীর স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। এরা গ্রামশুদ্ধ লোক পুরুষানুক্রমে লাঠিয়ালের ব্যবসা করে' এসেছে; সুতরাং ধনঞ্জয় জানতেন যে, রত্নময়ীকে উচ্ছেদ করতে চেষ্টা করলে, খুন-জখম হওয়া অনিবার্য্য। তাতে অবশ্য তিনি নিতান্ত নারাজ ছিলেন, কেন না, তাঁর মত নিরীহ ব্যক্তি বাঙলা দেশে তখন আর দ্বিতীয় ছিল না। তার দ্বিতীয় কারণ, যার অন্নে চৌদ্দপুরুষ প্রতিপালিত হয়েছে, ধনঞ্জয়ের মনে তার প্রতি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ কিঞ্চিৎ ভয় এবং ভক্তিও ছিল। এই সব কারণে, ধনঞ্জয় উগ্রনারায়ণের অংশটি বাদ দিয়ে, রায়বংশের আদ্‌বাড়ীর বাদবাকী অংশ অধিকার করে' বসলেন, সেও নাম মাত্র। কেন না, ধনঞ্জয়ের পরিবারের মধ্যে ছিল তাঁর একমাত্র কন্যা রঙ্গিণী দাসী, আর তাঁর গৃহজামাতা এবং রঙ্গিণীর স্বামী রতিলাল দে। এই বাড়ীতে এসে ধনঞ্জয়ের মনের একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটল। অর্থ উপার্জ্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয়ের অর্থলোভ এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে, তাঁর অন্তরে সেই লোভ ব্যতীত অপর কোনও ভাবের স্থান ছিল না। সেই লোভের ঝোঁকেই তিনি এতদিন অন্ধভাবে যেন-তেন-উপায়েন টাকা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিসের জন্য, কার জন্য টাকা জমাচ্ছি, এ প্রশ্ন ধনঞ্জয়ের মনে কখনও উদয় হয় নি।

কিন্তু রুদ্রপুরে এসে জমিদার হয়ে বসবার পর ধনঞ্জয়ের জ্ঞান হ'ল যে, তিনি শুধু টাকা করবার জন্যই টাকা করেছেন, আর কোন কারণে নয়, আর কারও জন্য নয়। কেন না, তাঁর স্মরণ হ'ল যে, যখন তাঁর একটির পর একটি সাতটি ছেলে মারা যায়, তখনও তিনি একদিনের জন্যও বিচলিত হন নি, একদিনের জন্যও অর্থোপার্জ্জনে অবহেলা করেন নি। তাঁর চিরজীবনের অর্থের আত্যন্তিক লোভ, এই বৃদ্ধবয়সে অর্থের আত্যন্তিক মায়ায় পরিণত হ'ল। তাঁর সংগৃহীত ধন কি করে' চিরদিনের জন্য রক্ষা করা যেতে পারে, এই ভাবনায় তাঁর রাত্তিরে ঘুম হ'ত না। অতুল ঐশ্বর্য্যও যে কালক্রমে নষ্ট হয়ে যায়, এই রুদ্রপুরই ত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ক্রমে তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল যে, মানুষে নিজ চেষ্টায় ধনলাভ করতে পারে, কিন্তু দেবতার সাহায্য ব্যতীত সে

ধন রক্ষা করা যায় না। ইংরাজের আইন কণ্ঠস্থ থাকলেও, ধনঞ্জয় একজন নিতান্ত অশিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিগত বর্ব্বরতা কোনরূপ শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা পরাভূত কিম্বা নিয়মিত হয় নি। তাঁর সমস্ত মন সেকালের শূদ্র-বুদ্ধি-জাত সকলপ্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ছেলে-বেলায় শুনেছিলেন যে, একটি ব্রাহ্মণ-শিশুকে যদি টাকার সঙ্গে একটি ঘরে বন্ধ করে' দেওয়া যায়, তা হ'লে সেই শিশুটি সেই ঘরে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে' যক্ষ হয়ে সেই টাকা চিরকাল রক্ষা করে। ধনঞ্জয়ের মনে এই উপায়ে তাঁর সঞ্চিত ধন রক্ষা করবার প্রবৃত্তি এত অদম্য হয়ে উঠল যে, তিনি যখ্ দেওয়াটা যে তাঁর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হলেন। যেখানে ধনঞ্জয়ের কোন মায়া মমতা ছিল না এবং তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে' নিজের কার্য্য উদ্ধার করবার কৌশলে অভ্যস্ত ছিলেন; কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক বিষম বাধা উপস্থিত হ'ল। ধনঞ্জয় একটি ব্রাহ্মণ-শিশুকে যখ্ দিতে মনস্থ করেছেন শুনে, রঙ্গিণী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলে। ফলে, ধনঞ্জয়ের পক্ষে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ল। ধনঞ্জয় এ পৃথিবীতে টাকা ছাড়া আর কিছু যদি ভাল-বাসতেন ত, সে হচ্ছে তাঁর কন্যা। চূণসুরকির গাঁথনির ভিতর এক একটি গাছ যেমন শিকড় গাড়ে, ধনঞ্জয়ের কঠিন হৃদয়ের কোন একটি ফাটলের ভিতর এই কন্যাবাৎসল্য তেমনি ভাবে শিকড় গেড়েছিল। ধনঞ্জয় এ বিষয়ে উদ্যোগী না হলেও, ঘটনাচক্রে তাঁর জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ হ'ল।

রত্নময়ীর একটি তিন বৎসরের ছেলে ছিল। তার নাম কিরীটচন্দ্র। তিনি সেই ছেলেটি নিয়ে দিবারাত্র ঐ বাড়ীতে একা বাস করতেন, জনমানবের সঙ্গে দেখা করতেন না এবং তাঁর অন্তঃপুরে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। রুদ্রপুরে লোকে তাঁর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে যেত, যদি না তিনি প্রতিদিন স্নানান্তে ঠিক দুপুরবেলায় সিংহবাহিনীর মন্দিরে ঠাকুর দর্শন করতে যেতেন। সে সময়ে তাঁর আগে পিছে পাঠানপাড়ার দুজন লাঠিয়াল তাঁর রক্ষক হিসেবে থাকত। রত্নময়ীর বয়েস তখন বিশ কিম্বা একুশ। তাঁর মত অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীলোক আমাদের দেশে লাখে একটি দেখা যায়। তাঁর মূর্ত্তি সিংহ-বাহিনীর প্রতিমার মত ছিল এবং সেই প্রতিমার মতই উপরের দিকে কোণ্-তোলা তাঁর চোখ দুটি, দেবতার চোখের মতই স্থির ও নিশ্চল ছিল। লোকে বলত সে চোখে কখনও পলক পড়ে নি। সে চোখের ভিতরে যা জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছিল, সে হচ্ছে চারপাশের নরনারীর উপর তাঁর অগাধ অবজ্ঞা। রত্নময়ী তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের তিনশত বৎসরের সঞ্চিত অহঙ্কার উত্তরাধিকারিত্বস্বত্বে লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য, রত্নময়ীর অন্তরে তাঁর রূপেরও অসাধারণ অহঙ্কার ছিল। কেন না, তাঁর কাছে সে রূপ ছিল তার আভিজাত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। রত্নময়ীর মতে রূপের উদ্দেশ্য মানুষকে আকর্ষণ করা নয়—তিরস্কার করা। তিনি যখন মন্দিরে যেতেন, তখন পথের লোকজন সব দূরে সরে' দাঁড়াত, কেন না, তাঁর সকল অঙ্গ, তার বর্ণ ও রেখার নীরব ভাষায় সকলকে বলত, "দূর হ! ছায়া মাড়ালে নাইতে হবে।" বলা বাহুল্য, তিনি কোনও দিকে দৃকপাত করতেন না, মাটির দিকে চেয়ে সকল পথ রূপে আলো করে' সোজা মন্দিরে যেতেন, আবার ঠিক সেই ভাবে বাড়ী ফিরে আসতেন। রঙ্গিণী জানালার ফাঁক দিয়ে রত্নময়ীকে নিত্য দেখত, এবং তার সকল মন, সকল দেহ হিংসার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে উঠত, যেহেতু, রঙ্গিণীর আর যাই থাক, রূপ ছিল না। আর তার রূপের অভাব তার মনকে অতিশয় ব্যথা দিত, কেন না, তার স্বামী রতিলাল ছিল অতি সুপুরুষ।

ধনঞ্জয় যেমন টাকা ভালবাসতেন, রঙ্গিণী তেমনি তার স্বামীকে ভালবাসত অর্থাৎ এ ভালবাসা একটি প্রচণ্ড ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং সে ক্ষুধা শারীরিক ক্ষুধার মতই অন্ধ ও নির্ম্মম। এ ভালবাসার সঙ্গে মনের কতটা সম্পর্ক ছিল, বলা কঠিন, কেন না, ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীর মত জীবদের মন, দেহের অতিরিক্ত নয়, অন্তর্ভূত বস্তু। তার পর ধনঞ্জয় যে ভাবে টাকা ভালবাসতেন, রঙ্গিণী ঠিক সেইভাবে তার স্বামীকে ভালবাসত—অর্থাৎ নিজের সম্পত্তি হিসেবে। সে সম্পত্তির উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে, এ কথা মনে হ'লে সে একেবারে মায়ামমতাশূন্য হয়ে পড়ত এবং সে সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর কাজ নেই, যা রঙ্গিণী না করতে পারত। রঙ্গিণীর মনে সম্পূর্ণ অকারণে এই সন্দেহ জন্মেছিল যে, রতিলাল রত্নময়ীর রূপে মুগ্ধ হয়েছে, ক্রমে সেই সন্দেহ তার কাছে নিশ্চয়তায় পরিণত হ'ল। রঙ্গিণী হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে, রতিলাল লুকিয়ে লুকিয়ে উগ্র-নারায়ণের বাড়ী যায় এবং যতক্ষণ পারে, ততক্ষণ সেইখানেই কাটায়। এর যথার্থ কারণ এই যে, রতিলাল রত্নময়ীর বাড়ীতে আশ্রিত যে ব্রাহ্মণটি ছিল, তার কাছে সে ভাঙ খেতে যেত। তার পর রত্নময়ীর ছেলেটির উপর নিঃসন্তান রতিলালের এতদূর মায়া

পড়ে' গিয়েছিল যে, কিরীটচন্দ্রকে না দেখে একদিনও থাকতে পারত না। বলা বাহুল্য, রত্নময়ীর সঙ্গে রতিলালের কখনও চার চক্ষুর মিলন হয় নি, কেন না, পাঠানপাড়ার প্রজারা তার অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষা করত। কিন্তু রঙ্গিণীর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, রত্নময়ী তার স্বামীকে সুপুরুষ দেখে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য, তার মজ্জাগত হিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য, রঙ্গিণী রত্নময়ীর ছেলেটিকে যখ্ দেবার জন্য কৃতসংকল্প হ'ল। রঙ্গিণী একদিন ধনঞ্জয়কে জানিয়ে দিলে যে, যখ্ দেওয়া সম্বন্ধে তার আর কোনও আপত্তি নেই, শুধু তাই নয়, ছেলের সন্ধান সে নিজেই করবে।

এ কাজ অবশ্য অতি গোপনে উদ্ধার করতে হয়। তাই বাপে-মেয়েতে পরামর্শ ক'রে স্থির হ'ল যে, রঙ্গিণীর শোবার পাশের ঘরটিতে যখ্ দেওয়া হবে। দু-চার দিনের ভিতর সে ঘরটির সব দুয়ার-জানালা ইট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে' দেওয়া হ'ল। তার পর অতি গোপনে ধনঞ্জয়ের সঞ্চিত যত সোনা-রূপোর টাকা ছিল, সব বড় বড় তামার ঘড়াতে পূরে সেই ঘরে সারি সারি সাজিয়ে রাখা হ'ল। যখন ধনঞ্জয়ের সকল ধন সেই কুঠরিজাত হ'ল, তখন রঙ্গিণী একদিন রতিলালকে বল্লে যে, রত্নময়ীর ছেলেটি এত সুন্দর যে, তার সেই ছেলেটিকে একবার কোলে করতে নিতান্ত ইচ্ছে যায়; সুতরাং যে উপায়েই হোক, তাকে একদিন রঙ্গিণীর কাছে আনতেই হবে। রতিলাল উত্তর করলে, সে অসম্ভব, রত্নময়ীর লাঠিয়ালরা টের পেলে তার মাথা নেবে। কিন্তু রঙ্গিণী এত নাছোড় হয়ে তাকে ধরে' বসল যে, রতিলাল অগত্যা একদিন সন্ধ্যাবেলা কিরীটচন্দ্রকে ভুলিয়ে সঙ্গে করে' রঙ্গিণীর কাছে নিয়ে এল। কিরীটচন্দ্র আসবামাত্র রঙ্গিণী ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে, চুমো খেলে, কত আদর করলে, কত মিষ্টি কথা বল্লে। তার পর সে কিরীটচন্দ্রের গায়ে লাল চেলির যোড়, তার গলায় ফুলের মালা, তার কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, আর তার হাতে দু'গাছি সোনার বালা পরিয়ে দিলে। কিরীটচন্দ্রের এই সাজ দেখে রতিলালের চোখমুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তার পর রঙ্গিণী হঠাৎ তার হাত ধরে' টেনে নিয়ে, সেই ব্রাহ্মণ-শিশুকে সেই অন্ধকূপের ভিতর পূরে দিয়ে, বাইরে থেকে দরজার গা-চাবি বন্ধ করে' চলে' গেল। রতিলাল এ ঘোর ও ঘোর ঠেলে দেখে বুঝলে যে, রঙ্গিণী তাকেও তার শোবার ঘরে বন্দী করে' চ'লে গিয়েছে। রতিলাল ঠেলে, ঘুঁসো মেরে, লাথি মেরে সেই অন্ধকূপের কপাট ভাঙ্গবার চেষ্টা করে' দেখলে, সে চেষ্টা বৃথা। সে কপাট এত ভারি আর এত শক্ত যে, কুড়োল দিয়েও তা কাটা কঠিন। কিরীটচন্দ্র সেই অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে প্রথমে ককিয়ে কাঁদতে লাগলে, তার পর রতিলালকে দাদা দাদা ব'লে ডাকতে লাগলে। দু'তিন ঘণ্টার পর তার কান্নার আওয়াজ আর শুনতে পাওয়া গেল না। রতিলাল বুঝলে, কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার পর তিন দিন তিন রাত নিজের ঘরে বন্দী হয়ে রতিলাল কখনও শোনে যে, কিরীটচন্দ্র দুয়োরে মাথা ঠুকছে, কখনও শোনে, সে কাঁদছে, আবার কখনও বা চুপচাপ। রতিলাল এই তিন দিন, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দিনের ভিতর হাজারবার পাগলের মত ছুটে গিয়ে সেই কপাট ভাঙতে চেষ্টা করেছে অথচ সে দরজা একচুলও নাড়াতে পারে নি। যখন কান্নার আওয়াজ তার কানে আসত, তখন রতিলাল দুয়োরের কাছে ছুটে গিয়ে বলত, "দাদা দাদা, অমন করে' কেঁদ না, কোনও ভয় নেই, আমি এখানে আছি।" রতিলালের গলা শুনে সে ছেলে আরও জোরে কেঁদে উঠত, ঘন ঘন কপাটে মাথা ঠুকত। রতিলাল তখন দুই কানে হাত দিয়ে ঘরের অন্য কোণে পালিয়ে যেত ও চীৎকার করে' কখনও রঙ্গিণীকে কখনও ধনঞ্জয়কে ডাকত এবং যা মুখে আসে, তাই বলে' গালি দিত। এই পৈশাচিক ব্যাপারে সে এতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল যে, কিরীটচন্দ্রের উদ্ধারের যে অপর কোনও উপায় হ'তে পারে, এ কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তার মনে উদয় হয় নি, তার সকল মন ঐ কান্নার টানে সেই অন্ধকূপের মধ্যেই বন্দী হয়ে ছিল। তিন দিনের পর সেই শিশুর ক্রন্দনধ্বনি ক্রমে অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ হয়ে এসে, পঞ্চম দিনে একেবারে থেমে গেল। রতিলাল বুঝলে, কিরীটচন্দ্রের ক্ষুদ্র প্রাণের শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন সে তার ঘরের জানালার লোহার গরাদে দু হাতে ফাঁক্ করে' নীচে লাফিয়ে পড়ে' একদৌড়ে রত্নময়ীর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেদিন দেখলে, অন্তঃপুরের দরজায় প্রহরী নেই, পাঠানপাড়ার প্রজারা সব ছেলে খোঁজবার জন্য নানাদিকে বেরিয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে রতিলাল রত্নময়ীর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তার কাছে এক নিশ্বাসে জানালে। আজ তিন বৎসরের মধ্যে রত্নময়ীর মুখে কেউ হাসি দেখে নি। তার ছেলের এই নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনে তার মুখ চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠল, দেখতে মনে হ'ল, সে যেন হেসে উঠলে। এ দৃশ্য

রতিলালের কাছে এতই অদ্ভুত বোধ হ'ল যে, সে রত্নময়ীর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

তার পর, সেই দিন দুপুর রাত্তিরে—যখন সকলে শুতে গিয়েছে—রত্নময়ী নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। সকল সরিকের বাড়ী সব গায়ে গায়ে। তাই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সে আগুন দেবতার রোষাগ্নির মত ব্যাপ্ত হয়ে ধনঞ্জয়ের বাড়ী আক্রমণ করলে। ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণী ঘর থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল, সদর ফটকে এসে দেখে, রত্নময়ীকে ঘিরে পাঠানপাড়ার প্রায় একশ প্রজা ঢাল, সড়কি ও তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রত্নময়ীর আদেশে তারা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীকে সড়কির পর সড়কির ঘায়ে অপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত করে' সেই জ্বলন্ত আগুনের ভিতর ফেলে দিলে। রত্নময়ী অমনি অট্টহাস্য করে' উঠল। তার সঙ্গীরা বুঝলে যে, সে পাগল হয়ে গিয়েছে। তার পর সেই পাঠানপাড়ার প্রজাদের মাথায় খুন চড়ে' গেল, তারা ধনঞ্জয়ের চাকর-দাসী, অমলা-ফয়লা, দ্বারবান, বরকন্দাজ যাকে সুমুখে পেলে, তার উপরেই সড়কি ও তলোয়ার চালালে, রায়-বংশের পৈতৃক ভিটার উপরে আগুনের ও নীচে রক্তের নদী বইতে লাগল। তার পর ঝড় উঠল, ভূমিকম্প হ'তে লাগল। যখন সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, তখন রত্নময়ী সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে।

রুদ্রপুরের সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। শুধু কিরীটচন্দ্রের কান্না ও রত্নময়ীর উন্মত্ত হাসি আজও তার আকাশ-বাতাস পূর্ণ করে' রেখেছে।

আষাঢ়, ১৩২৩ সন।

বড়বাবুর বড়দিন

বড়দিনের ছুটিতে বড়বাবু যে কেন থিয়েটার দেখতে যান, যে কাজ তিনি ইতিপূর্ব্বে এবং অতঃপর কখনও করেন নি, সেই একদিনের জন্য সে কাজ তিনি যে কেন করেন, তার ভিতর অবশ্য একটু রহস্য আছে। তিনি যে আমোদপ্রিয় নন, এ সত্য এতই স্পষ্ট যে, তাঁর শত্রুরাও তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করত। তিনি বাঁধাবাঁধি নিয়মের অতিশয় ভক্ত ছিলেন এবং নিজের জীবনকে বাঁধা নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন করে' নিয়ে এসেছিলেন। পোনেরো বৎসরের মধ্যে তিনি একদিনও আপিস কামাই করেন নি, একদিনও ছুটি নেন নি এবং প্রতিদিন দশটা পাঁচটা ঘাড় গুঁজে একমনে খাতা লিখে এসেছেন। আপিসের বড়-সাহেব Mr. Schleiermacher বলতেন, "'ফবানী' মানুষ নয়—কলের মানুষ; ও দেহে বাঙালী হলেও, মনে খাঁটি জর্ম্মাণ।" বলা বাহুল্য যে, "ফবানী" হচ্ছে ভবানীরই জর্ম্মাণ সংস্করণ। এই গুণেই, এই যন্ত্রের মত নিয়মে চলার দরুণই, তিনি অল্পবয়সে আপিসের বড়বাবু হয়ে ওঠেন। সে সময়ে তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশি ছিল না, যদিচ দেখতে মনে হ'ত যে, তিনি পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। চোখের এরকম ভুল হবার কারণ এই যে, অপর্য্যাপ্ত এবং অতিপ্রবৃদ্ধ দাড়িগোঁফে, তাঁর মুখে বয়সের অঙ্ক সব চাপা পড়ে' গিয়েছিল। বড়বাবু যে সকলপ্রকার সখসাধ আমোদআহ্লাদের প্রতি শুধু বীতরাগ নয়, বীতশ্রদ্ধও ছিলেন, তার কারণ, আমোদ জিনিসটে কোনরূপ নিয়মের ভিতর পড়ে না; বরং ও-বস্তুর ধর্ম্মই হচ্ছে সকলপ্রকারের নিয়ম ভঙ্গ করা। "রুটীন" করে' আমোদ করা যে কাজ করারই সামিল, এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য। উৎসব-ব্যাপারটি অবশ্য নিত্যকর্ম্মের মধ্যে নয় এবং যে কর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম নয় এবং হ'তে পারে না, তাকে বড়বাবু ভালবাসতেন না, —ভয় করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সুচারুরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে—জীবনটাকে দৈনন্দিন ক'রে তোলা; অর্থাৎ সেই জীবন আদর্শ জীবন, যার দিনগুলো কলে-তৈরি জিনিসের মত, একটি ঠিক আর একটির মত।

বৈচিত্র্য না থাকলেও, বড়বাবুর জীবন যে নিরানন্দ ছিল, তা নয়। তাঁর গৃহের কোটায় এমন একটি অমূল্য রত্ন ছিল, যার উপর তাঁর হৃদয়-মন দিবারাত্র পড়ে' থাকত। তাঁর স্ত্রী ছিল পরমা সুন্দরী। বাপ-মা তার নাম রেখেছিলেন পটেশ্বরী। এ নামের সার্থকতা সম্বন্ধে তার পিতৃকুলের, তার মাতৃকুলের কেউ কখন সন্দেহ প্রকাশ করেন নি; তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলতেন, এ হেন রূপ পটের ছবিতেই দেখা যায়, রক্তমাংসের শরীরে দেখা যায় না। এমন কি, চাকর-দাসীরাও পটেশ্বরীকে আরমানির বিবির সঙ্গে তুলনা করত। বড়বাবুর তাদৃশ সৌন্দর্য্যবোধ না থাকলেও, তাঁর স্ত্রী যে সুন্দরী—শুধু সুন্দরী নয়, অসাধারণ সুন্দরী, এ বোধ তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি অবশ্য তাঁর স্ত্রীর রূপবর্ণনা করতে পারতেন না, কেন না, বড়বাবু আর যাই হন, —কবিও নন, চিত্রকরও নন। তা ছাড়া বড়বাবু তাঁর স্ত্রীকে কখনও ভাল করে' খুঁটিয়ে দেখেন নি। একটি

প্রাকৃত কবি বলেছেন যে, তাঁর প্রিয়ার সমগ্র রূপ কেউ কখন দেখতে পায় নি; কেন না, যার চোখ তার যে অঙ্গে প্রথম পড়েছে, সেখান থেকে আর উঠতে পারে নি। সম্ভবত ঐ কারণে বড়বাবুর মুগ্ধনেত্র পটেশ্বরীর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত কখন আয়ত্ত করতে পারে নি। বড়বাবু জানতেন যে, তাঁর স্ত্রীর গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মত, আর তার চোখদুটি সাত রাজার ধন কালো মাণিকের মত। এই রূপের অলৌকিক আলোতেই তাঁর সমস্ত নয়ন-মন পূর্ণ করে' রেখেছিল। বড়বাবুর বিশ্বাস ছিল যে, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলেই তিনি এ হেন স্ত্রীরত্ন লাভ করেছেন। এই শাপভ্রষ্টা দেবকন্যা যে পথ ভুলে' তার হাতে এসে পড়েছে এবং তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি হয়েছে, এ মনে করে' তাঁর আনন্দের আর অবধি ছিল না।

কিন্তু মানুষের যা অত্যন্ত সুখের কারণ, প্রায়ই তাই তার নিতান্ত অসুখের কারণ হয়ে ওঠে। এ স্ত্রী নিয়ে বড়বাবুর মনে সুখ থাকলেও, সোয়াস্তি ছিল না। দরিদ্রের ঘরে কোহিনুর থাকলে তার রাত্তিরে ঘুম হওয়া অসম্ভব। বড়বাবুর অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছিল। এ রত্ন হারাবার ভয় মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর মনকে ছেড়ে যেত না, তাই তিনি সকালসন্ধ্যা কিসে তা রক্ষা করা যায়, সেই ভাবনা—সেই চিন্তা-তেই মগ্ন থাকতেন। আপিসের কাজে তন্ময় থাকাতে, কেবলমাত্র দশটা-পাঁচটা তিনি এই দুর্ভাবনা থেকে অব্যাহতি লাভ করতেন। বড়বাবুর যদি আপিস না থাকত, তা হ'লে বোধ হয়, তিনি ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যেতেন।

বড়বাবুর মনে তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে নানারূপ সন্দে-হের উদয় হ'ত। অথচ সে সন্দেহের কোনও স্পষ্ট কারণ ছিল না। কিন্তু তার থেকে তিনি কোনরূপ সান্ত্বনা পেতেন না,—কেন না, অস্পষ্ট ভাবনাই আমা-দের মনকে সব চাইতে বেশি পেয়ে বসে এবং বেশি চেপে ধরে। তাঁর স্ত্রীকে সন্দেহ করবার কোনরূপ বৈধ কারণ না থাকলেও; বড়বাবুর মনে তার স্বপক্ষে অনেকগুলি ছোটখাট কারণ ছিল। প্রথমতঃ, সাধা-রণত স্ত্রী-জাতির প্রতি তাঁর অবিশ্বাস ছিল। "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ", এ বাক্যের প্রথম অংশ তিনি বেদবাক্যস্বরূপে মানতেন। তার পর তাঁর ধারণা ছিল যে, রূপ আর চরিত্র প্রায় একাধারে পাওয়া যায় না। তার পর তাঁর শ্বশুর-পরিবারের অন্তত পুরুষদের চরিত্রবিষয়ে তেমন সুনাম ছিল না। পাটের কারবারে হঠাৎ অগাধ পয়সা করায়, সে পরিবারের মাথা অনেকটা বিগড়ে গিয়ে-ছিল; ফলে তাঁর শ্বশুরবাড়ীর হালচাল অসম্ভব-রকম বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর শ্যালক তিনটি যে আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই দিন কাটাতেন, এ কথা ত সহরশুদ্ধ লোক জানত এবং এদের ভাইবোনের ভিতর যে পরস্পরের অত্যন্ত মিল ছিল, সে সত্য বড়বাবুর নিকট অবিদিত ছিল না। ভাইদের সঙ্গে দেখা হ'লে পটেশ্বরীর মুখ হাসিতে ভরে' উঠত, তাদের সঙ্গে তার কথা আর ফুরত না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে অনর্গল বকে যেত, আর হেসে কুটি-কুটি হ'ত। এ সব সময়ে বড়বাবু অবশ্য উপস্থিত থাকতেন না, তাই এদের কি যে কথা হ'ত, তা তিনি জানতেন না। কিন্তু তিনি ধরে' রেখেছিলেন যে, তখন যা বলা-কওয়া হ'ত, সে সব নেহাৎ বাজে কথা। ভাইদের সঙ্গে এই হাসি, তামাসা, তিনি পটেশ্বরীর চরিত্রের আমোদ-প্রিয়তার লক্ষণ ব'লেই মনে করতেন। এ অবশ্য তাঁর মোটেই ভাল লাগত না। বড়বাবুর স্বভাবটি যেমন চাপা, পটেশ্বরীর স্বভাব ছিল তেমনি খোলা। তার চালচলন কথাবার্ত্তার ভিতর প্রাণের যে সহজ সরল স্ফূর্ত্তি ছিল, বড়বাবু তাকে চঞ্চলতা বলতেন এবং এই চঞ্চলতাকে তিনি বিশেষ ভয় করতেন। তার পর পটেশ্বরীর কোনও সন্তানাদি হয় নি, সুতরাং তার যৌবনের কোনও ক্ষয় হয় নি। যদিচ তখন তার বয়স চব্বিশ বৎসর, তবুও দেখতে তাকে ষোলোর বেশী দেখাত না এবং তার স্বভাব ও মনোভাবও ঐ ষোলো বৎসরের অনুরূপই ছিল। বড়বাবুর পক্ষে বিশেষ কষ্টের বিষয় এই ছিল যে, এই সব ভয় ভাবনা তাঁকে নিজের মনেই চেপে রাখতে হ'ত। পটেশ্বরীর কোন কাজে বাধা দেওয়া কিম্বা তাকে কোনও কথা বলা, বড়বাবুর সাহসে কখনও কুলোয় নি। এমন কি, বাঙালী ঘরের মেয়ের পক্ষে, বিশেষতঃ ভদ্রমহিলার পক্ষে শিশ দেওয়াটা যে দেখতেও ভাল দেখায় না, শুনতেও ভাল শোনায় না, এই সহজ কথাটাও বড়বাবু তাঁর স্ত্রীকে কখনও মুখ ফুটে বলতে পারেন নি! তার প্রথম কারণ, পটেশ্বরী বড়মানুষের মেয়ে। শুধু তাই নয়, একমাত্র কন্যা। বাপ মা ভাইদের আদর পেয়ে পেয়ে, সে অত্যন্ত অভিমানিনী হয়ে উঠেছিল, একটি রূঢ় কথাও তার গায়ে সইত না, অনাদরের ঈষৎ স্পর্শে তার চোখ জলে ভরে' আসত। আর পটেশ্বরীর চোখের জল দেখবার শক্তি আর যারই থাক—বড়বাবুর দেহে ছিল না। তা ছাড়া দেবতার গায়ে হস্তক্ষেপ করতে মানুষ-মাত্রেরই সঙ্কোচ হয়, ভয় হয় এবং তাঁর শ্যালকদের

বিশ্বাস অক্ষরূপ হলেও, তিনি মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত ছিলেন না। সে যাই হোক, বড়বাবুর মনে শান্তি ছিল না বলে' যে সুখ ছিল না, এ কথা সত্য নয়। বিপদের ভয় না থাকলে মানুষে সম্পদের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই সব ভয়-ভাবনাই বড়বাবুর স্বভাবত-ঝিমন্ত মনকে সজাগ, সচেতন ও সতর্ক করে' রেখেছিল। তা ছাড়া পটেশ্বরী সম্বন্ধে তাঁর ভয় যে অলীক এবং তাঁর সন্দেহ যে অকারণ, এ জ্ঞান অন্তত দিনে একবার করেও তাঁর মনে উদয় হ'ত এবং তখন তাঁর মন কোজাগর-পূর্ণিমার রাতের মত প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হয়ে উঠত।

বড়বাবুর মনে শুধু দুটি ভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল; —স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, আর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রাগ। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অবশ্য তাঁর কোনরূপ বিদ্বেষ ছিল না, কেন না, তিনি ধর্ম্ম নিয়ে কখনও মিছে মাথা বকান নি। দেবতা এক কি বহু, ঈশ্বর আছেন কি নেই, যদি থাকেন, তা হ'লে তিনি সাকার কি নিরাকার, ব্রহ্ম সগুণ কি নিগুর্ণ, দেহাতিরিক্ত আত্মা নামক কোনও পদার্থ আছে কি না, থাকলেও তার স্বরূপ কি,—এ সকল সমস্যা তাঁর মনকে কখনও ব্যতিব্যস্ত করে নি, তাঁর নিদ্রার এক রাত্তিরের জন্তও ব্যাঘাত ঘটায় নি। তিনি জানতেন যে, বিশ্বের হিসাবের খতিয়ান করবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। তবে এর থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। আমাদের অধিকাংশ লোকের ভূতপ্রেত সম্বন্ধে যে মনোভাব, ঠাকুর-দেবতা সম্বন্ধে বড়বাবুর ঠিক সেইরূপ মনোভাব ছিল;—অর্থাৎ তিনি তাদের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও পুরো ভয় করতেন। আফিসের হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে হ'লে তিনি কালীঘাটে আগে পুজো দিয়ে পরে আদালতে আসতেন,—এই উদ্দেশ্যে যে, মা কালী তাঁকে জেরার হাত থেকে রক্ষা করবেন।

ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মমত নয়, সামাজিক মতামতের বিরুদ্ধেই তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠত। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, যৌবন-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ —এ সকল কথা শুনে তিনি কানে হাত দিতেন। এ সব মত যারা প্রচার করে, তারা যে সমাজের শত্রু, সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাঁর নিজের পক্ষে কি ভালমন্দ, তারই হিসেব থেকেই তিনি সমাজের পক্ষে কি ভালমন্দ, তাই স্থির করতেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা?—তাঁর স্ত্রীকে স্বাধীনতা দিলে কি প্রলয়কাণ্ড হবে, সে কথা মনে করতেও তাঁর আতঙ্ক উপস্থিত হ'ত। যিনি নিজের স্ত্রীরত্নকে সামলে রাখবার জন্য ছাদের উপরে ছ-হাত উঁচু দরমার বেড়ার ঘের দিয়েছিলেন, যাতে করে' তাঁর বাড়ীর ভিতর পাড়াপড়শির নজর না পড়ে, তাঁর কাছে অবশ্য স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেওয়া আর ঘরভাঙা— দুই-ই এক কথা। তার পর স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধেও ঘোরতর আপত্তি ছিল। স্ত্রীজাতির শরীরের অপেক্ষা মনকে স্বাধীনতা দেওয়া যে কম বিপজ্জনক, এ ভুল ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি এই সার বুঝেছিলেন যে, স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শেখানোর অর্থ হচ্ছে, বাইরের লোকের এবং বাজে লোকের মনের সঙ্গে তার মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। পটেশ্বরী যে সামান্য লেখাপড়া জানত, তার কুফল ত তিনি নিত্যই চোখে দেখতে পেতেন। তিনি তাকে যত ভাল ভাল বই কিনে দিতেন, যাতে নানারূপ সদুপদেশ আছে, পটেশ্বরী তার দুই এক পাতা পড়ে, ফেলে দিত; আর সে বাপের বাড়ী থেকে যে সব বাজে গল্পের বই নিয়ে আসত, দিনমান বসে' বসে' তাই গিলত। সে সব কেতাবে কি লেখা আছে, তা না জানলেও বড়বাবু এটা নিশ্চিত জানতেন যে, তাতে যা আছে, তা কোনও বইয়ে থাকা উচিত নয়। স্ত্রীলোকের অল্প লেখাপড়ার ভোগ যদি মানুষকে এইরকম ভুগতে হয়, তা হ'লে তাদের বেশি লেখাপড়ার ফলে যে সর্ব্বনাশ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? তার পর যৌবন-বিবাহ। যৌবন-বিবাহের প্রচলনের সঙ্গে যে স্বেচ্ছা-বিবাহের প্রবর্ত্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী, এ জ্ঞান বড়বাবুর ছিল। আমাদের সমাজে যদি স্বেচ্ছাবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকত, তা হ'লে বড়বাবুর দশা কি হ'ত! পটেশ্বরী যে স্বয়ংবরা-সভায় তাঁর গলায় মালা দিতেন না, এ বিষয়ে বড়বাবু নিঃসন্দেহ ছিলেন। বড়বাবুর যে রূপ নেই, সে জ্ঞান তাঁর ছিল,—কেন না, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ সেই অভাবের কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করত, এবং পটেশ্বরী যে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা বোঝে না, এ সত্যের পরিচয় তিনি বিবাহাবধি পেয়ে এসেছেন। পটেশ্বরী যে মানুষের চাইতে কুকুর, বিড়াল, লাল মাছ, সাদা ইঁদুর, ছাই-রঙের কাকাতুয়া, নীলরঙের পায়রা বেশি ভালবাসত, তার প্রমাণ ত তাঁর গৃহাভ্যন্তরেই ছিল। বাপের পয়সায় তাঁর স্ত্রী তাঁর অন্দরমহলটি একটি ছোটখাটো চিড়িয়াখানায় পরিণত করেছিল। তার পর বিধবা-বিবাহের কথা মনে করতে বড়বাবুর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠত। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, তিনি স্বর্গারোহণ করলে পটেশ্বরী যদি পত্যন্তর গ্রহণ করে, আর সে সংবাদ যদি স্বর্গে পৌঁছয়, তা হ'লে সেই মুহূর্ত্তে স্বর্গ নরক হয়ে উঠবে।

২

বড়বাবুর মনে এই দুটি প্রধান প্রবৃত্তি, এই অনুরাগ আর এই বিরাগ একজোট হয়ে তাঁকে বড়দিনে থিয়েটারে নিয়ে যায়; নচেৎ সখ করে' তিনি অর্থ এবং সময়ের ওরূপ অপব্যয় কখনও করতেন না।

বড়দিনের ছুটিতে পটেশ্বরী তার বাপের বাড়ী গিয়েছিল। আপিসের কাজ নেই, ঘরে স্ত্রী নেই,—অর্থাৎ বড়বাবুর জীবনের যে দুটি প্রধান অবলম্বন, দুই এক সঙ্গে হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে তাঁর কাছে পৃথিবী খালি হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী ঘরে থাকলেও ছুটির দিনে বড়বাবু অবশ্য বাড়ীর ভিতর বসে' থাকতেন না। তবে এক ঘরে ফুল থাকলে তার পাশের ঘরটিকে তার সৌরভে যেমন পূর্ণ করে' রাখে, তেমনি পটেশ্বরী অন্তঃপুরে থাকলেও অদৃশ্য ফুলের গন্ধের মত অদৃশ্য দেহের রূপে বড়বাবুর গৃহের ভিতর-বার পূর্ণ করে' রাখত। প্রতিমা অন্তর্হিত হ'লে মন্দিরের যে অবস্থা হয়, পটেশ্বরীর অভাবে তাঁর গৃহের অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল।

বড়বাবু এই শূন্য মন্দিরে কি করে' দিন কাটাবেন, তা আর ভেবে পেতেন না। প্রথমত, তাঁর কোনও বন্ধুবান্ধব ছিল না, তিনি কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসতেন না। গল্প করা কিম্বা তাস-পাশা খেলা, এ সব তাঁর ধাতে ছিল না। তার পর তাঁর বাড়ীতে কোনও ভদ্রলোক আসা তিনি নিতান্ত অপছন্দ করতেন। তাঁর স্ত্রীর স্বভাবে কৌতূহল জিনিসটে কিঞ্চিৎ বেশিমাত্রায় ছিল; তার স্বামীর কাছে কোনও লোক এলে, পটেশ্বরী খড়খড়ের ভিতর দিয়ে উঁকিঝুঁকি না মেরে থাকতে পারত না।

তার পর সময় কাটাবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়—বই পড়া—তাঁর কোন কালেই অভ্যাস ছিল না। তাঁর বাড়ীতেও এমন কেউ ছিল না, যার সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ করতে পারতেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে ছিল, তাঁর স্ত্রী আর তিনি। তিনি গাঁ-সম্পর্কের যে মাসিটিকে পটেশ্বরীর প্রহরিস্বরূপে বাড়ীতে এনে রেখেছিলেন, তার সঙ্গে কথা কইতে বড়বাবু ভয় পেতেন। কেন না, ঐ ধারকরা মাসিমাটি, তাঁর সাক্ষাৎ পেলেই দুঃখের কান্না কাঁদতে বসতেন এবং সর্ব্বশেষে টাকা চাইতেন। বড়বাবু টাকা কাউকেও দিতে ভালবাসতেন না, আর উক্ত মাসীমাতাটিকে ত নয়ই, কারণ, তিনি জানতেন যে, সে টাকা মাসির গুণধর ছেলেটির মদের খরচে লাগবে। এই সব কারণে বড়বাবু নিরুপায় হয়ে দুটি গোটা দিন খবরের কাগজ পড়ে' কাটিয়েছিলেন। ওরি মধ্যে এক-খানিতে একটি বিজ্ঞাপন তাঁর চোখে পড়ল। তাতে তিনি দেখলেন যে, সাবিত্রী থিয়েটারে খৃষ্টমাস রজনীতে "সংস্কারের কেলেঙ্কার" নামক প্রহসনের অভিনয় হবে। বলা বাহুল্য, উক্ত প্রহসনের নাম শুনেই সেটির প্রতি তাঁর মন অনুকূল হয়ে উঠল। তার পর তিনি সেই বিজ্ঞাপন হ'তে এই জ্ঞান সঞ্চয় করলেন যে, উক্ত প্রহসনে সংস্কারকদের উপর বেশ এক হাত নেওয়া হবে। এই বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে তাঁর মন "সংস্কারের কেলেঙ্কারের" অভিনয় দেখবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু থিয়েটারে যাওয়া সম্বন্ধে তিনি সহসা মনস্থির করে' উঠতে পারলেন না।

তার প্রধান কারণ, তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও থিয়েটারে যান নি, শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রীর সম্মুখে তিনি বহুবার থিয়েটারের বহু নিন্দা করেছেন। থিয়েটারের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশের কারণ এই ছিল যে, সেখানে ভদ্র-ঘরের মেয়েরাও যাতায়াত করে। তাঁর মতে অন্তঃপুরবাসিনীদের থিয়েটারে যেতে দেওয়াও যা, আর পত্র আবডাল দিয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতা দেওয়াও তাই। ওর চাইতে মেয়েদের গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতে দেওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ। আর তিনি যে, সময়ে অসময়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে এ-বিষয়ে তাঁর কড়াকড়া মতামত সব প্রকাশ করতেন, তার কারণ, তিনি শুনেছিলেন যে, থিয়েটার দেখা তাঁর শ্যালাজগণের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে হয়ে উঠেছিল। পাছে তাঁর স্ত্রী, তার বৌদিদিদের কুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, এই ভয়ে তিনি পটেশ্বরীকে শুনিয়ে শুনিয়ে থিয়েটারের বিরুদ্ধে যত কটুকথা প্রয়োগ করতেন। তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ছিল, শ্বশুরকুলের বৌকে মেরে ঝিকে শেখানো। এর ফলে পটেশ্বরীর মনে, থিয়েটার সম্বন্ধে এমনি একটি বিশ্রী ধারণা জন্মেছিল যে, তার বৌদিদিদের হাজার পীড়াপীড়ি সত্বেও, সে কখনও কোন থিয়েটারের চৌকাঠ ডিঙ্গয় নি। অন্তত সে তো তার স্বামীকে তাই বুঝিয়েছিল। বড়বাবু তাঁর স্ত্রীর এ কথা বিশ্বাস করতেন, কেন না, তা না করলে তিনি জানতেন যে, তাঁর মুখের ভাত গলা দিয়ে নামবে না, রাত্তিরে চোখের পাতা পড়বে না, আফিসের খাতায় ঠিক নামাতে ভুল হবে,—এক কথায় তাঁর বেঁচে আর কোনও সুখ থাকবে না। এর পর তিনি

নিজে যদি সেই পাপ থিয়েটার দেখতে যান, তা হ'লে তাঁর স্ত্রী কি আর তাঁকে ভক্তি করবে? বলা বাহুল্য, তাঁর স্ত্রীর স্বামিভক্তির উপরে তিনি তাঁর জীবনের সকল আশা, সকল ভরসা প্রতিষ্ঠিত করে' রেখেছিলেন।

একদিকে স্বচক্ষে সংস্কারকদের লাঞ্ছনা দেখবার অদম্য কৌতূহল, অপরদিকে স্ত্রীর ভক্তি হারাবার ভয়—এই দুটি মনোভাবের মধ্যে তিনি এতদূর দোলাচলচিত্তবৃত্তি হয়ে পড়েছিলেন যে, সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁর আর মনস্থির করা হ'ল না। এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি উভয়েরই বল সমান ছিল বলে' এর একটি অপরটিকে পরাস্ত করতে পারছিল না।

অতঃপর সূর্য্য যখন অস্ত গেল, তখন "সংস্কারের কেলেঙ্কারের" অভিনয় দেখাটা যে তাঁর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য, এই ধারণাটি হঠাৎ তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল। একা বাড়ীতে দিনটা বড়বাবু কোনো প্রকারে কাটালেও, ও অবস্থায় সন্ধ্যেটা কাটানো তাঁর পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সেই গোধূলিলগ্নে পটেশ্বরী সম্বন্ধে যত রকম দুশ্চিন্তা, সংশয়, ভয় ইত্যাদি চামচিকে-বাদুড়ের মত এসে তাঁর সমস্ত মনটাকে অধিকার করে' বসত। তিনি দুদিন এ উপদ্রব সহ্য করেছিলেন, তৃতীয় দিন সহ্য করবার মত ধৈর্য্য ও বীর্য্য বড়বাবুর দেহে থাকলেও, মনে ছিল না। তিনি স্থির করলেন, থিয়েটারে যাবেন এবং সে কথা পটেশ্বরীর কাছে চেপে যাবেন। তিনি না বললে, পটেশ্বরী কি করে' জানবে যে, তিনি থিয়েটারে গিয়েছিলেন, সে তো আর ও সব জায়গায় যায় না? এক ধরা পড়বার ভয় ছিল তাঁর শ্যালাজদের কাছে। যদি তারাও সে রাত্তিরে ঐ একই থিয়েটারে যায় এবং সেখানে বড়বাবুকে দেখতে পায়, তা হ'লে সে খবর নিশ্চয়ই পটেশ্বরীর কানে পৌঁছিবে। যদি তা হয়, তা হ'লে তিনি অম্লানবদনে সে কথা অস্বীকার করবেন, এইরূপ মনস্থ করলেন; চিকের আড়াল থেকে দেখলে যে লোক চিনতে ভুল হওয়া সম্ভব—এ সত্য, তাঁর স্ত্রীও অস্বীকার করতে পারবেন না।

৩

সে রাত্তিরে বড়বাবু সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে,—অর্থাৎ একরকম না খেয়েই গায়ে আল্‌ষ্টার চড়িয়ে, গলায় কম্‌ফার্টার জড়িয়ে, মাথা-মুখে শাল ঢাকা দিয়ে, সাবিত্রী থিয়েটারের অভিমুখে পদব্রজে রওনা হলেন। পাছে পাড়ার লোক তাঁকে দেখতে পায়, পাছে তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সুনাম একদিনে নষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি নীল-নিচোলাবৃত অভিসারিকার মত ভীত-চকিত-চিত্তে, অতি সাবধানে, অতি সন্তর্পণে পথ চলতে লাগলেন। এখানে বলে' রাখা আবশ্যক যে, তাঁর আল্‌ষ্টারের বর্ণ ছিল ঘোর নীল, আর নিচোল-পদার্থটি শাড়ি নয়—ওভারকোট। অনাবশ্যক রকম শীতবস্ত্রের ভার বহন করাটা অবশ্য তাঁর পক্ষে মোটেই আরামজনক হয় নি; বিশেষতঃ কম্‌ফার্টার নামক গলকম্বলটি, তাঁর গলদেশের ভার যে পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল, তার শোভা সে পরিমাণে বৃদ্ধি করে নি। পাঁচ হাত লম্বা উক্ত পশমের গলাবন্ধটি কণ্ঠে ধারণ করা তাঁর পক্ষে একান্ত কষ্টকর হলেও, প্রাণ ধরে' তিনি সেটি ত্যাগ করতে পারতেন না; তার কারণ, পটেশ্বরী সেটি নিজ হাতে বুনে দিয়েছিল। বড়বাবুর বিশ্বাস ছিল, পাঁচরঙা উলে-বোনা ঐ বস্তুটির তুল্য সুন্দর বস্তু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। কারুকার্য্যের ওই হচ্ছে চরম ফল। সৌন্দর্য্যে, আকাশের ইন্দ্রধনুর সঙ্গে শুধু তার তুলনা হ'তে পারত। স্ত্রীহস্তরচিত এই গলবস্ত্রটি ধারণ করে' তাঁর দেহের যতই অসোয়াস্তি হোক, তাঁর মনের সুখের আর সীমা ছিল না। তিনি মর্ম্মে চর্ম্মে অনুভব করছিলেন যে, পটেশ্বরীর অন্তরের ভালবাসা যেন সাকার হয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে।

অবশেষে বড়বাবু থিয়েটারে উপস্থিত হয়ে দেখেন, সে জায়গা প্রায় ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে। এই লোকারণ্যে প্রবেশ করবামাত্র তিনি একটা ভেবড়ে গেলেন যে, নিজের "সীটে" যাবার পথে এক ব্যক্তির গায়ে ধাক্কা মারলেন, আর এক ব্যক্তির পা মাড়িয়ে দিলেন। তার জন্য তাঁকে সম্বোধন করে' যে সব কথা বলা হয়েছিল, তাকে ঠিক স্বাগত সম্ভাষণ বলা যায় না।

তখনও Dropscene ওঠে নি, সবে কন্‌সার্ট সুরু হয়েছিল; বেয়ালাগুলো সব সমস্বরে চিঁ চিঁ করছিল, Cello গ্যাঙরাচ্ছিল, Bass viola থেকে থেকে হুঙ্কার ছাড়ছিল, এবং Double bass দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁকাহোঁকা করছিল। তবে ঐ ঐক্যতান সঙ্গীতের প্রতি বড় কেউ যে কান দিচ্ছিলেন না, তার প্রমাণ, দর্শকবৃন্দের আলাপের গুঞ্জনে ও হাসির হুল্লারে রঙ্গভূমি একেবারে কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

তার পর Dropscene যখন পাক খেয়ে খেয়ে

শূন্যে উঠে গেল, তখন ডজন ছয়েক অভিনেত্রী, লালপরী, নীলপরী, সবজাপরী, জরদাপরী প্রভৃতি-রূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে, খামকা অকারণ নৃত্য-গীত সুরু ক'রে দিলে। বড়বাবুর মনে হ'ল, তাঁর চোখের সুমুখে স্তবকে স্তবকে সব পারিজাত ফুটে উঠল, আর এই সব স্বর্গের ফুল যেন নন্দনবনের মন্দ পবনের স্পর্শে কখন জড়িয়ে, কখন ছড়িয়ে, ঈষৎ হেলতে, ঈষৎ দুলতে লাগল। ক্রমে এই সকল নর্ত্তকীদের কম্পিত ও আন্দোলিত দেহ ও কণ্ঠ হ'তে উচ্ছ্বসিত নৃত্য ও গীতের হিল্লোল, সমগ্র রঙ্গালয়ের আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত হ'ল, সে হিল্লোলের স্পর্শে দর্শকমণ্ডলী শিহরিত পুলকিত হয়ে উঠল। মিনিট পাঁচেকের জন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিতি করে' এই পরীর দল যখন সবেগে চক্রাকারে ভ্রমণ করতে লাগল, তখন চারিদিক থেকে সকলে মহা উল্লাসে "Encore, Encore" বলে' চীৎকার করতে লাগল। এত আলো, এত রঙ, এত সুরের সংস্পর্শে বড়বাবুর ইন্দ্রিয় প্রথম থেকেই ঈষৎ সচকিত উত্তেজিত হয়েছিল, তার পর সমবেত দর্শকমণ্ডলীর এই তরঙ্গিত আনন্দ তাঁর দেহমনকে একটি সংক্রামক ব্যাধির মত আক্রমণ করলে। পান করা অভ্যাস না থাকলে একপাত্র মদও যেমন মানুষের মাথায় চড়ে' যায়, আর তাকে বিহ্বল করে' ফেলে, এই নাচগান বাজনাও তেমনি বড়বাবুর মাথায় চ'ড়ে গেল এবং তাঁকে বিহ্বল ক'রে ফেল্‌লে। আমোদের নেশায় তাঁর ইন্দ্রিয় একসঙ্গে বিকল হয়ে পড়ল, ও চঞ্চল হয়ে উঠল। অতঃপর নেচে নেচে শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্তকলেবর হয়ে নর্ত্তকীর দল যখন নৃত্যে ক্ষান্ত দিলে, তখন একটি স্থূলাঙ্গী বয়স্কা গায়িকা, অতি-মিহি অতি-নাকী এবং অতি-টানা সুরে একটি গান গাইতে আরম্ভ করলেন। সে ত গান নয়, ইনিয়ে বিনিয়ে নাকে-কান্না। বড়বাবু যে কতদূর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন, তার প্রমাণ, সেই গান যেমনি থামা, অমনি তিনি বড়গলায় "encore encore" বলে' দু-তিনবার চীৎকার করলেন। তাই শুনে তাঁর এপাশে ওপাশে যে সব ভদ্রলোক বসেছিলেন, তাঁরা বড়বাবুর দিকে কট্‌মট্ করে' চাইতে লাগলেন।

এ গানের যে সুরতালের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না, সে জ্ঞান অবশ্য বড়বাবুর ছিল না; তাই উক্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে একটি রসিক ব্যক্তি যখন তাঁকে এই প্রশ্ন করলেন যে, "ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি লাগে, এ কথা কি মহাশয় কখনও শোনেন নি? আর এটাও কি মালুম হ'ল না যে, উনি যে পুরিয়া উদ্গার করলেন, সেটি সরপুরিয়া নয়—ক্যালমেলের পুরিয়া?" তখন তিনি লজ্জায় অধোবদন ও নিরুত্তর হয়ে রইলেন। নৃত্যগীত সমাধা হবার পর পর আবার Drop-scene পড়ল, আবার কনসার্ট বেজে উঠল। তাঁতের ছোট বড় মাঝারি বিলাতি যন্ত্রগুলো. বাদকের ছড়ির তাড়নায় গ্যাঁ গোঁ কোঁ প্রভৃতি নানারূপ কাতর ধ্বনি করতে লাগল; ক্লারিওনেট ও করনেট পরস্পরে জ্ঞাতিশক্রতার ঝগড়া সুরু করে' দিলে এবং অতি কর্কশ আর অতি তীব্র কণ্ঠে, যা মুখে আসে, তাই বললে; তার পর ঢোলকের মুখ দিয়ে ঝড় বয়ে গেল; শেষটা করতাল যখন কড় কড় কড়াৎ করে' উঠলে, তখন কনসার্টের দম ফুরিয়া গেল। বড়বাবু ইতিমধ্যে এ সব গোলমালে কতকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছিলেন, সুতরাং ঐ ঐক্যতান সঙ্গীতের বিলিতি মদ তাঁর অন্তরাত্মাকে এ দফা ততটা ব্যতিব্যস্ত করতে পারলে না।

এর পর নলদময়ন্তী অভিনয় সুরু হ'ল। বড়বাবু হাঁ করে' দেখতে লাগলেন। এ যে অভিনয়, এ জ্ঞান দু'মিনিটেই তাঁর লোপ পেয়ে এল, তাঁর মনে হ'ল, নলদময়ন্তী প্রভৃতি সত্যসত্যই রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে' সাবিত্রী থিয়েটারে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার পর রঙ্গমঞ্চের উপরে যখন স্বয়ংবরা-সভার আবির্ভাব হ'ল, তখন থিয়েটারের অভ্যন্তরে অকস্মাৎ একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হ'ল। পুরুষদের মাথার উপরে চিকের অপর পারে, রঙ্গালয়ের যে প্রদেশ মেয়েরা অধিকার করে' বসেছিলেন, সেই অঞ্চল থেকে একটা ঝড় উঠল। কোনও অজ্ঞাত কারণে সমবেত স্ত্রী-মণ্ডলী ঐক্যতানে কলরব করতে সুরু করলেন। ফলে আকাশে স্ত্রী-কণ্ঠের কনসার্ট বেজে উঠল, তার ভিতর ক্লারিওনেট, করনেট প্রভৃতি সবরকমেরই যন্ত্র ছিল, এবং তাদের পরস্পরের ভিতর কারও সঙ্গে কারও সুরের মিল ছিল না। তার পর সেই কনসার্ট যখন দুন্ থেকে পরদুনে গিয়ে পৌঁছল, তখন অভিনয় অগত্যা বন্ধ হ'ল। এই কলহ শুনে দময়ন্তীর বড় মজা লাগল, তিনি ফিক্ করে' হেসে দর্শকমণ্ডলীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর সখীরা সব অঞ্চল দিয়ে মুখ ঢাকলেন, আর ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি অভ্যাগত দেবতাগণ তটস্থ হয়ে রইলেন। অমনি silence! silence! শব্দে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হ'তে লাগল, তাতে গোলযোগের মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

অতঃপর দর্শকদের মধ্যে অনেকে দাঁড়িয়ে উঠে, আকাশের দিকে মুখ করে', গলবস্ত্রে যোড়করে, উক্ত স্ত্রী-সমাজকে সম্বোধন করে'—"মা-লক্ষ্মীরা চুপ করুন" এই প্রার্থনা করতে লাগলেন; তাতে মা-লক্ষ্মীদের চুপ করা দূরে থাকুক, তাঁদের কোলের ছেলেরা জেগে উঠে কোকিয়ে কাঁদতে সুরু করলে। তখন দর্শকদের মধ্যে দু'চার জন ইয়ারগোছের লোক, অতি সাদা বাঙলায় ছেলেদের মুখ বন্ধ করবার এমন একটা সহজ উপায় বাৎলে দিলে—যা শুনে দময়ন্তী ও তাঁর সখীরা অন্তরুদ্ধ হাসির বেগে ধুঁকতে লাগলেন। বড়বাবু যদিচ জীবনে কখন কারও প্রতি কোনরূপ অভদ্র কথা ব্যবহার করেন নি, তথাচ তিনি ভদ্র-মহিলাদের এই অপমানে খুসি হলেন। কেননা, তাঁর মতে যারা থিয়েটারে আসতে পারে, সে সব স্ত্রীলোকের মানই বা কি, আর অপমানই বা কি? মিনিট দশেক পরে, এই গোলযোগ বৈশাখী ঝড়ের মত যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল।

অভিনয় যেখানে থেমে গিয়েছিল, সেইখান থেকে আবার চলতে সুরু করল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বড়বাবু সেই অভিনয়ে তন্ময় হয়ে গেলেন। এই অভিনয় দর্শনে তিনি এতটা মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তাঁর মনে সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হ'ল, তাঁর কাছে রঙ্গালয় তীর্থস্থান হয়ে উঠল। তার পর নলদময়ন্তীর বিপদ যখন ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর মন নায়ক-নায়িকার দুঃখে একবারে অভিভূত দ্রবীভূত হয়ে পড়ল। নলের দুঃখই অবশ্য তিনি বেশি করে' অনুভব করছিলেন, কেননা, পুরুষমানুষের মন পুরুষমানুষেই বেশি বুঝতে পারে। নলের প্রতি তাঁর এতটা সহানুভূতির আর একটি কারণ ছিল। তিনি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে ঐ রঙ্গমঞ্চের নলের যথেষ্ট আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; কিন্তু পটেশ্বরীর সঙ্গে দময়ন্তীর কোন সাদৃশ্যই ছিল না। নলরাজ বেশ পরিত্যাগ করবার সময় সে সাদৃশ্য এতটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে, মধ্যে মধ্যে বড়বাবুর মনে ভুল হচ্ছিল যে, উক্ত নল তিনি ছাড়া আর কেউ নয়; সুতরাং নল যখন নিদ্রিতা দময়ন্তীর অঞ্চলপাশ মোচন করে' "হা হতোস্মি হা দগ্ধোস্মি" বলে' রঙ্গমঞ্চ হ'তে সবেগে নিষ্ক্রমণ করলেন, তখন বড়বাবু আর অশ্রুসম্বরণ করতে পারলেন না; তাঁর চোখ দিয়ে, তাঁর নাক দিয়ে দরবিগলিতধারে জল তাঁর দাড়ী চুঁইয়ে তাঁর কমফর্টারের অন্তরে প্রবেশ করলে। ফলে সেই গলকম্বলটি ভিজে ন্যাতা হয়ে তাঁর গলায় নেপটে ধরলে। বড়বাবুর ভ্রম হ'ল যে, কলি তাঁর গলায় গামছা দিয়ে,—শুধু গামছা নয়,—ভিজে গামছা দিয়ে—টেনে নিয়ে যাচ্ছে!

৪

ঠিক এই সময়ে, একটি জেনানা-বক্স থেকে, একটি হাসির আওয়াজ তাঁর কানে এল। সে ত হাসি নয়, হাসির গিটকারি, জলতরঙ্গের তানের মত, সে হাসি থিয়েটারের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত সাত সুরের বিদ্যুৎ খেলিয়ে গেল। অভিনয়ের দোষে নলের সজোরে পলায়নটি যে ঈষৎ হাস্যকর ব্যাপার হয়ে উঠেছিল, তা যাঁর চোখ আছে, তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু সেই হাসিতে বড়-বাবুর মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। তাঁর কাণে সে হাসি চিরপরিচিত বলে' ঠেকল—এ যে পটেশ্বরীর হাসি! যে অঞ্চল থেকে এই হাসির তরঙ্গ ছুটে এসেছিল, সেই অঞ্চলে মুখ ফিরিয়ে, ঘাড় উঁচু করে' নিরীক্ষণ করে' তিনি দেখলেন যে, চিকের গায়ে মুখ দিয়ে যে বসে' আছে, তার দেহের গড়ন ও বসবার ভঙ্গী ঠিক পটেশ্বরীর মত। অবশ্য চিকের আড়াল থেকে যা দেখা যাচ্ছিল, সে হচ্ছে একটি রমণীদেহের অস্পষ্ট ছায়া মাত্র, কারণ, সে বক্সের ভিতরে কোনও আলো ছিল না। তাই নিজের মনের সন্দেহ ঘোচাবার জন্য, তাকে একবার ভাল করে' দেখে নেবার জন্য, বড়বাবু দাঁড়িয়ে উঠে সেই বক্সের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' চেয়ে রইলেন। এবারও তিনি সে স্ত্রীলোকটির মুখ দেখতে পান নি, তাঁর চোখে পড়ে-ছিল শুধু কালো কস্তাপেড়ে একখানি সাদা সুতোর শাড়ী। বড়বাবু জানতেন যে, ওরকম শাড়ী তাঁর স্ত্রীরও আছে। এর থেকে তাঁর ধারণা হ'ল যে, ও শাড়ী যার গায়ে আছে, সে নির্ঘাত পটেশ্বরী। তার পর তাঁর মনে পড়ে' গেল যে, ও শাড়ীর "আঁচরে উজোর সোণা" লুকানো আছে। সেই তপ্তকাঞ্চনের আভায় তাঁর চোখ ঝলসে গেল, তার আঁচে তাঁর চোখের তারা দুটি যেন পুড়ে গেল, তিনি চোখ চেয়ে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

ও ভাবে দণ্ডায়মান বড়বাবুকে সম্বোধন করে' চারদিক থেকে লোকে Sit down, Sit down বলে' চীৎকার করতে লাগল। তাঁর পাশের ভদ্রলোকটি বললেন—"মশায় থিয়েটার দেখতে এসেছেন, থিয়েটার দেখুন, মেয়েদের দিকে অমন করে' চেয়ে রয়েছেন কেন? আপনি দেখছি অতিশয় অভদ্র লোক!"—এই ধমক খেয়ে তিনি

বসে' পড়লেন। বলা বাহুল্য, তাঁর পক্ষে অভিনয়ে মনোনিবেশ করা আর সম্ভব হ'ল না। তাঁর চোখের উপরে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে যাচ্ছিল, আর বুকের ভিতর কত কি তোলপাড় করছিল, ছট্‌ফট্ করছিল। এক কথায় তাঁর হৃদয়মন্দিরে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় সুরু হয়েছিল।

তার পর অভিনয়ের টুকরো-টাকরা যা তাঁর চোখে পড়ছিল, তাতে তিনি আরও কাতর হয়ে পড়লেন, এই মনে করে'—কোথায় দময়ন্তী, আর কোথায় পটেশ্বরী। তার পর তাঁর মনে হ'ল যে, পটেশ্বরী যদি তাঁর কাছে মিথ্যে কথা বলতে পারে, বিশ্বাসঘাতিনী হ'তে পারে, তা হ'লে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কোন্ স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যে বিশ্বাস করা যেতে পারে? তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, নলদময়ন্তীর কথা মিথ্যা, মহাভারত মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, নীতি মিথ্যা, সব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা!—মানুষের কষ্টই হচ্ছে এ পৃথিবীতে একমাত্র সত্য বস্তু। তখন তাঁর কাছে ঐ অভিনয় একটা বীভৎস কাণ্ড হয়ে দাঁড়াল। এদিকে তাঁর হাত-পা সব হিম হয়ে এসেছিল, তাঁর মাথা ঘুরছিল, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনবরত ঘাম পড়ছিল—অর্থাৎ তাঁর দেহে মূর্চ্ছার পূর্ব্বলক্ষণ সব দেখা দিয়েছিল। তিনি আর ভিতরে থাকতে পারলেন না—থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালেন। বড়বাবু উপরে চেয়ে দেখলেন যে, অনন্ত আকাশ জুড়ে অগণ্য নক্ষত্র তাঁর দিকে তাকিয়ে সব চোখটিপে হাসছে। এ বিশ্ব যে কতদূর নির্ম্মম, কতদূর নিষ্ঠুর, এই প্রথম তিনি তার সাক্ষাৎ পরিচয় পেলেন। তার পর এই আকাশদেশের অসীমতা তাঁর কাছে হঠাৎ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল, এই নীরব নিস্তব্ধ মহাশূন্যের ভিতর দাঁড়িয়ে তাঁর বড় একা একা ঠেকতে লাগল;—তাঁর মনে হ'ল, এই বিরাট বিশ্বের কি ভিতরে কি বাইরে কোথাও প্রাণ নেই, মন নেই, হৃদয় নেই, দেবতা নেই;—যা আছে, তা হচ্ছে আগাগোড়া ফাঁকা, আগাগোড়া ফাঁকি। সেই সঙ্গে তিনি যেন দিব্যচক্ষে দেখতে পেলেন যে, ওই সব গ্রহ, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি আকাশ-প্রদীপগুলো ঐ থিয়েটারের বাতির মত দুদণ্ড জ্বলে' যখন নিবে যাবে, তখন সংসার-নাটকের অভিনয় চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে, আর থাকিবে শুধু অসীম অনন্ত অখণ্ড অন্ধকার! অমনি ভয়ে তাঁর বুক চেপে ধরলে, তিনি এই অনন্ত বিভীষিকার মূর্ত্তি চোখের আড়াল করবার জন্য থিয়েটারে পুনঃপ্রবেশ করবার সংকল্প করলেন। অমনি তাঁর মনশ্চক্ষু হ'তে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সরে' গেল, আর তার জায়গায় পটেশ্বরী এসে দাঁড়ালে। অসংখ্য অপরিচিত অসভ্য ও আমোদপ্রিয় লোকের মধ্যে তাঁর স্ত্রী একা বসে' রয়েছে—এই মনে করে' তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। তিনি যেন স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে, চিকের আবরণ ভেদ করে' শত শত লোলুপনেত্রের আরক্ত-দৃষ্টি পটেশ্বরীর দেহকে স্পর্শ করছে, অঙ্কিত করছে, কলঙ্কিত করছে। এর পর বড়বাবুর পক্ষে আর এক মুহূর্ত্তও বাইরে থাকা সম্ভব হ'ল না, তিনি পাগলের মত ছুটে গিয়ে আবার থিয়েটারের ভিতরে প্রবেশ করলেন। এবার তাঁর আর অভিনয় দেখা হ'ল না; তাঁর চোখের সুমুখে কোত্থেকে যেন একটি ঘন কুয়াশা উঠে এসে, চারদিক ঝাপসা করে' দিলে। দেখতে না দেখতেই অভিনয় ছায়াবাজি হয়ে দাঁড়াল। অভিনেত্রীদের কতক কথা তাঁর কাণে ঢুকলেও, তার একটি কথাও তাঁর মনে ঢুকল না। কেননা, সে মনের ভিতর শুধু একটি কথা জাগছিল, উঠছিল, পড়ছিল। যে স্ত্রীলোক খিল্‌খিল্ করে' হেসে উঠেছিল, সে পটেশ্বরী—কি পটেশ্বরী নয়? এই ভাবনা, এই চিন্তাই তাঁর সমস্ত মনকে অধিকার করে' বসেছিল। তিনি বারবার সেই জেনানা-বক্সের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন, এবং প্রতিবার তাঁর মনে হ'ল যে, এ পটেশ্বরী না হয়ে আর যায় না। শুধু তাই নয়, তিনি রঙ্গালয়ের অন্দরমহলের যেদিকে দৃষ্টিপাত করলেন—সেই দিকেই দেখলেন, পটেশ্বরী বসে' আছে। ক্রমে এই দৃশ্য তাঁর কাছে এত অসহ্য হয়ে উঠল যে, তিনি চোখ বুজলেন। তাতেও কোন ফল হ'ল না। তাঁর বোজা চোখের সুমুখেও পটেশ্বরী এসে উপস্থিত হ'ল, পরণে সেই কালা কস্তাপেড়ে শাড়ী, আর মুখ সেই চিকে ঢাকা। তখন তাঁর জ্ঞান হ'ল যে, তাঁর মনে যে সন্দেহের উদয় হয়েছে, তা দূর করতে না পারলে, তিনি সত্য সত্যই পাগল হয়ে যাবেন। তাই তিনি শেষটা মনস্থির করলেন যে, থিয়েটার ভাঙ্গবার মুখে, যে দরজা দিয়ে মেয়েরা বেরোয়, সেই দরজার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কেননা, একবার সামনাসামনি স্বচক্ষে না দেখলে, তাঁর মনের এ সন্দেহ আর কিছুতেই দূর হবে না।

তার পর যা ঘটেছিল, তা দু'কথায় বলা যায়। থিয়েটার ভাঙ্গবার মিনিট দশেক পরে থিয়েটারের খিড়কিদরজায় একখানি জুড়িগাড়ী এসে দাঁড়াল। বড়বাবুর মনে হ'ল, এ তাঁর শ্বশুরবাড়ীর গাড়ী; যদিচ কেন যে তা মনে হ'ল, তা তিনি ঠিক

বলতে পারতেন না। তার পর তিনটি ভদ্রমহিলা আর একটি দাসী অতি দ্রুতপদে এসে সেই গাড়ীতে চড়লে, অমনি সহিস তার কপাট বন্ধ করে' দিলে। বড়বাবু এঁদের কারও মুখ দেখতে পান নি, কেননা, সকলেরি মুখ ঘোমটায় ঢাকা ছিল। এই তিনজনের মধ্যে একজন মাথায় পটেশ্বরীর সমান উঁচু; তাই দেখে বড়বাবু বিদ্যুৎ-বেগে ছুটে গিয়ে, পা-দানের উপর লাফিয়ে উঠে, দু'হাত দিয়ে জোর করে' গাড়ীর দরজা ফাঁক করলেন। মেয়েরা সব ভয়ে হাঁউ-মাউ করে' চেঁচিয়ে উঠলো, আর রাস্তার লোকে সব "চোর চোর" বলে' চীৎকার করতে লাগল! বড়বাবু অমনি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে' উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করলেন, আর পিছনে অন্তত পঞ্চাশজন লোক "পাহারাওয়ালা পাহারাওয়ালা" বলে' হাঁক দিতে দিতে ছুটতে লাগল। এই ঘোর বিপদে পড়ে' বড়বাবুর বুদ্ধি খুলে গেল। তিনি যেন বিদ্যুতের আলোতে দেখতে পেলেন যে, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাত-লামির ভাণ করা। তাতে নয় দু'দশ টাকা জরিমানা হবে, কিন্তু গাড়ী চড়াও করে' ভদ্রমহিলাকে বে-ইজ্জত করবার চার্জে, জেল নিশ্চিত। মদ না খেয়ে মাত-লামির অভিনয় করা, যখন দেহের কলকব্জাগুলো সব ঠিক ভাবে গাঁথা থাকে, তখন সে দেহকে বাঁকানো চোরানো দোমড়ানো কোঁকড়ান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে এক মুহূর্ত্তে জড় করা, আর তার পরমুহূর্ত্তে ছড়িয়ে দেওয়া, অতিশয় কঠিন এবং কষ্ট-কর ব্যাপার। কিন্তু হাজার কষ্টকর হ'লেও আত্ম-রক্ষার্থে, যতক্ষণ-না তিনি পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক ধৃত হন, ততক্ষণ বড়বাবুকে এই কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করতে হয়েছিল। তার পর অজস্র চড়-চাপড় রুলের গুঁতো খেতে খেতে তিনি যখন গারদে গিয়ে হাজির হলেন, তখন রাত প্রায় চারটে বাজে। সেখানে থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি শ্বশুরালয়ে সংবাদ পাঠাতে বাধ্য হলেন। ভোর হ'তে না হতেই, তাঁর বড়-শ্যালক তথায় উপস্থিত হয়ে, বেশ দু'পয়সা খরচ করে' তাঁকে উদ্ধার করে' নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। রাস্তায় তিনি বড়বাবুকে নানারূপ গঞ্জনা দিলেন। তিনি বললেন, "এতদিন শুনে আসছিলুম, আমরাই খারাপ লোক, আর তুমি অতি ভাল লোক। ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না, কিন্তু তুমি ভুলে' গিয়েছিলে যে, ডুবে ডুবে মদ খেলে পুলিশে টের পায়!" তার পর, তিনি শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হ'লে, তাঁর সঙ্গে তাঁর শ্বশুর কোন কথা কইলেন না। শুধু তাঁর ছোট শ্যালক বললেন, "Beauty and the Beast-এর কথা লোকে বইয়ে পড়ে; পটে-শ্বরীর কপালদোষে আমরা তা বরাবর চোখেই দেখে আসছি। তবে তুমি চরিত্রেও যে beast, এ কথা এতদিন জানতুম না; আমরা ভাবতুম, 'পটের' ঘাড়ে বাবা একটা জড় পদার্থ চাপিয়ে দিয়েছেন।" তার পর তিনি বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখেন, পটেশ্বরী মেজেয় শুয়ে আছে। তার গায়ে একখানিও গহনা নেই, সব মাটীতে ছড়ানো রয়েছে। তার পরণে শুধু একখানা কালো কস্তাপেড়ে সাদা সুতোর শাড়ী। কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটি যেমন লাল হয়েছে, তেমনি ফুলে উঠেছে। সে স্বামীকে দেখে নড়লও না চড়লও না, কথাও কইলে না; মড়ার মত পড়ে' রইল। তাঁর সোণার প্রতিমা ভুঁয়ে লোটাচ্ছে দেখে, সে থিয়েটারে গিয়েছিল, কি যায় নি,—এ কথা জিজ্ঞাসা করতে বড়বাবুর আর সাহস হ'ল না। তার পর তিনি যে কোন দোষে দোষী নন, এবং নির্ম্মল চরিত্রে যে কোনরূপ কলঙ্ক ধরে নি, এই সত্য কথাটাও তিনি মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। তিনি বুঝলেন যে, আসল ঘটনাটি যে কি, ইহজীবনে তিনিও তা জানতে পারবেন না, তাঁর স্ত্রীও তা জানতে পারবে না —মধ্যে থেকে তিনি শুধু চিরজীবনের জন্য মিছা অপরাধী হয়ে থাকলেন। ফলে, তিনি মহা অপ-রাধীর মত মাথা নীচু করে' চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলেন।

এ গল্পের moral এই যে পৃথিবীতে ভাল লোকেরই যত মন্দ হয়;—এই হচ্ছে ভগবানের বিচার।

ভাদ্র, ১৩২৩

একটি সাদা গল্প

আমরা পাঁচজনে গল্পলেখার আর্ট নিয়ে মহাতর্ক করছিলুম, এমন সময়ে সদানন্দ এসে উপস্থিত হলেন। তাতে অবশ্য তর্ক বন্ধ হ'ল না, বরং আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে তা চালাতে লাগলুম—এই আশায় যে, তিনি এ আলোচনায় যোগ দেবেন; কেন না, আমরা সকলেই জানতুম যে, এই বন্ধুটি হচ্ছেন এক-জন ঘোর তার্কিক। M. A. পাস করবার পর

থেকে অত্যাবধি এক তর্ক ছাড়া তিনি আর কিছু করেছেন বলে' আমরা জানিনে। কিন্তু তিনি, কেন জানিনে, সেদিন একেবারে চুপ করে' রইলেন। শেষটা আমরা সকলে একবাক্যে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, "আমি একটি গল্প বল্‌ছি, শোনো, তার পর সারা রাত ধরে' তর্ক করো। তখন সে তর্ক ফাঁকা তর্ক হবে না।"

সদানন্দের কথা

আমি যে গল্প বল্‌তে যাচ্ছি, তা অতি সাদা-সিধে। তার ভিতর কোনও নীতিকথা কিম্বা ধর্ম্ম-কথা নেই, কোনও সামাজিক সমস্যা নেই, অতএব তার মীমাংসাও নেই, এমন কি, সত্য কথা বলতে গেলে কোনও ঘটনাও নেই। ঘটনা নেই বল্‌ছি এইজন্যে যে, যে ঘটনা আছে, তা বাঙলা দেশে নিত্য ঘটে' থাকে,—অর্থাৎ ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে। আর হাজারে নশ' নিরনব্বইটি মেয়ের যে-ভাবে বিয়ে হয়ে থাকে, এ বিয়েও ঠিক সেই ভাবে হয়েছিল,—অর্থাৎ এ ব্যাপারের মধ্যে পূর্ব্বরাগ অনুরাগ প্রভৃতি গল্পের খোরাক কিছুই ছিল না। তোমরা জিজ্ঞেস করতে পার যে, যে-ঘটনার ভিতর কিছুমাত্র বৈচিত্র্য কিম্বা নূতনত্ব নেই, তার বিষয় বলবার কি আছে?—এ কথার আমি ঠিক উত্তর দিতে পারি নে। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, যে ঘটনা নিত্য ঘটে এবং বহুকাল থেকেই ঘটে' আসছে, হঠাৎ এক একদিন তা যেন অপূর্ব্ব অদ্ভুত বলে' মনে হয়; কিন্তু কেন যে হয়, তাও আমরা বুঝতে পারি নে। যে বিয়েটির কথা তোমাদের আমি বলতে যাচ্ছি, তা মামুলি হ'লেও আমার কাছে একেবারে নূতন ঠেকেছিল। তাই চাই কি তোমাদের কাছেও তা অদ্ভুত মনে হ'তে পারে, সেই ভরসায় এ গল্প বলা।

এ গল্প হচ্ছে শ্যামবাবুর মেয়ের বিয়ের গল্প। শ্যামবাবুর পুরো নাম শ্যামলাল চাটুয্যে, এবং তিনি আমার গ্রামের লোক।

শ্যামলাল যে-বৎসর হিষ্টরির M. A.-তে ফার্ষ্ট হন, তার পরের বৎসর যখন তিনি ফার্ষ্ট ডিভিসনে B. L. পাস করে' কলেজ থেকে বেরলেন, তখন তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে হাইকোর্টের উকীল হবার জন্য বহু পীড়াপীড়ি করেন। শ্যামলাল যে দশ পোনেরো বৎসরের মধ্যেই হাইকোর্টের একজন হয় বড় উকীল, নয় অন্ততঃ জজ হবেন, সে বিষয়ে তাঁর আপনার লোকের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কেন না, যা যা থাকলে মানুষ জীবনে কৃতী হয়, শ্যামলালের তা সবই ছিল,—সুস্থ শরীর, ভদ্র চেহারা, নিরীহ প্রকৃতি, স্থির বুদ্ধি, কাজে গা ও কাজে মন। কিন্তু শ্যামলাল তাঁর আত্মীয়স্বজনের কথা রাখলেন না। উকীল হ'তে তাঁর এমন অপ্রবৃত্তি হ'ল যে, কেউ তাঁকে তাতে রাজি করাতে পারলেন না; এ অনিচ্ছার কারণও কেউ বুঝতে পারলেন না। তাঁর আত্মীয়েরা শুধু দেখতে পেলেন যে, উকীল হবার কথা শুনলেই একটা অস্পষ্ট ভয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়তেন। তাই তাঁরা ধরে' নিলেন যে, এ হচ্ছে সেই জাতের ভয়, যা থাকার দরুণ কোন কোন মেয়ে হুড়কো হয়; ও একটা ব্যারামের মধ্যে, সুতরাং কি বকে-ঝকে, কি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কোনমতে ও রোগ সারানো যাবে না। অতঃপর তাঁরা হার মেনে শ্যামলালকে ছেড়ে দিলেন; তিনিও অমনি মুন্সেফী চাকরি নিলেন।

তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা যাই ভাবুন, শ্যামলাল কিন্তু নিজের পথ ঠিক চিনে নিয়েছিলেন। যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায়, সেই অবাধ্য প্রবৃত্তি কিম্বা অপ্রবৃত্তিগুলোই মানুষের প্রধান সুহৃৎ। শ্যামলাল হাইকোর্টে ঢুকলে উপরে ওঠা দূরে থাক, একেবারে নীচে তলিয়ে যেতেন। তাঁর ঘাড়ে কেউ কোন কাজ চাপিয়ে দিলে এবং তা করবার বাঁধাবাঁধি পদ্ধতি দেখিয়ে দিলে, শ্যামলাল সে কাজ পুরোপুরি এবং আগাগোড়া নিখুঁৎ ভাবে করতে পারতেন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় জীবনে নিজের পথ কেটে বেরিয়ে যাবার সাহস কি শক্তি তাঁর শরীরে লেশমাত্র ছিল না। পৃথিবীতে কেউ জন্মায় চরে' খাবার জন্য, কেউ জন্মায় বাঁধা খাবার জন্য। শ্যামলাল শেষোক্ত শ্রেণীর জীব ছিলেন।

পৃথিবীতে যতরকম চাকরি আছে, তার মধ্যে এই মুন্সেফীই ছিল তাঁর পক্ষে সব চাইতে উপযুক্ত কাজ। এ কাজে ঢোকার অর্থ কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করা নয়, ছাত্রজীবনেরই মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া। অন্তত শ্যামলালের বিশ্বাস তাই ছিল, এবং সেই সাহসেই তিনি ঐ কাজে ভর্ত্তি হন। এতে চাই শুধু আইন পড়া আর রায় লেখা। পড়ার ত তাঁর আশৈশব অভ্যাস ছিল, আর রায় লেখাকে তিনি এগজামিনে প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখা হিসেবে দেখতেন। ইউনিভারসিটির এগজামিনের চাইতে এ এগজামিন দেওয়া তাঁর পক্ষে ঢের সহজ ছিল, কারণ এতে বই দেখে উত্তর লেখা যায়।

২

চাকরির প্রথম পাঁচ বৎসর তিনি চৌকিতে চৌকিতে ঘুরে বেড়ান। সে সব এমন জায়গা, যেখানে কোন ভদ্রলোকের বসতি নেই, কাজেই কোন ভদ্রলোক তাদের নাম জানে না। শ্যামলালের মনে কিন্তু সুখ-সন্তোষ দুই ছিল। জীবনে যে দুটি কাজ তিনি করতে পারতেন—পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষা দেওয়া—এ ক্ষেত্রে সে দুটির চর্চ্চা করবার তিনি সম্পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে Tenancy Act, Limitation Act এবং Civil Procedure Code-এর তিনি এতটা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন যে, সে পরিমাণ মুখস্থ বিদ্যা যদি হাইকোর্টের সকল জজের থাকত, তা হ'লে কোন রায়ের বিরুদ্ধে আর বিলেত-আপীল হ'ত না।

শ্যামলালের স্ত্রী বরাবর তাঁর সঙ্গেই ছিলেন; কিন্তু তাঁর মনে সুখও ছিল না, সন্তোষও ছিল না; কেন না, যে সব জিনিসের অভাব শ্যামলাল একদিনের জন্যও বোধ করেন নি, তাঁর স্ত্রী সে সকলের—অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনের অভাব, মেলামেশার লোকের অভাব, এমন কি, কথা কইবার লোকের পর্য্যন্ত অভাব—প্রতিদিন বোধ করতেন।

চাকরির প্রথম বৎসর না যেতেই শ্যামলালের একটি ছেলে হয়। সেই ছেলে হবার পর থেকেই তাঁর স্ত্রী শুকিয়ে যেতে লাগলেন, ফুল যেমন করে' শুকিয়ে যায়, তেমনি করে', অর্থাৎ অলক্ষিতে এবং নীরবে। শ্যামলাল কিন্তু তা লক্ষ্য করলেন না। শ্যামলাল ছিলেন এক-বুদ্ধির লোক। তিনি যে কাজ হাতে নিতেন, তাতেই মগ্ন হয়ে যেতেন; তার বাইরের কোনও জিনিসে তাঁর মনও যেত না, তাঁর চোখও পড়ত না। তা ছাড়া তাঁর স্ত্রীর অবস্থা কি হচ্ছে, তা লক্ষ্য করবার তাঁর অবসরও ছিল না। ঘুম থেকে উঠে তিনি রায় লিখতে বসতেন; সে লেখা শেষ করে' তিনি আপিসে যেতেন; আপিস থেকে ফিরে এসে আইনের বই পড়তেন; তার পর রাত্তিরে আহারান্তে নিদ্রা দিতেন। তাঁর স্ত্রী এই বনবাস থেকে উদ্ধার পাবার জন্য স্বামীকে কোন লোকালয়ে বদলি হবার চেষ্টা করতে বরাবর অনুরোধ করতেন, কিন্তু শ্যামলাল বরাবর একই উত্তর দিতেন। তিনি বলতেন, "তোমরা স্ত্রীলোক, ও সব বোঝো না; চেষ্টা-চরিত্তির করে' এ সব জিনিস হয় না। কাকে কোথায় রাখবে, সে সব উপরওয়ালারা সব দিক্ ভেবে চিন্তে ঠিক করে। তার বদল হবার জো নেই।" আসল কথা এই যে, তিনি বদলি হবার কোনও আবশ্যকতা বোধ করতেন না, কেন না, তাঁর কাছে লোকসমাজ বলে' কোনও পদার্থের অস্তিত্বই ছিল না। আর তা ছাড়া সাহেব-সুবোর কাছে উপস্থিত হয়ে দরবার করা, তাঁর সাহসে কুলতো না। তাঁর স্ত্রী অবশ্য এতে অত্যন্ত দুঃখিত হতেন, কেন না, তিনি এ কথা বুঝতেন না যে, নিজ চেষ্টায় কিছু করা তাঁর স্বামীর পক্ষে অসম্ভব।

ফলে, আলো ও বাতাসের অভাবে ফুল যেমন শুকিয়ে যায়, শ্যামলালের স্ত্রী তেমনি শুকিয়ে যেতে লাগলেন। আমি ঘুরেফিরে ঐ ফুলের তুলনাই দিচ্ছি, তার কারণ, শুনতে পাই, সেই ব্রাহ্মণকন্যা শরীরে ও মনে ফুলের মতই সুন্দর, ফুলের মতই সুকুমার ছিলেন এবং তাঁর বাঁচবার জন্যে আলো ও বাতাসের দর্শন ও স্পর্শনের প্রয়োজন ছিল। ছেলে হবার চার বৎসর পরে তিনি একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করে' আঁতুড়েই মারা গেলেন।

তার পর স্ত্রীর মৃত্যুতে শ্যামলাল অতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে কত ভালবাসতেন, তা তিনি স্ত্রী-বর্ত্তমানে বোঝেন নি, তার অভাবেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলেন। জীবনে তিনি এই প্রথম শোক পেলেন; কেন না, তাঁর মা ও বাবা তাঁর শৈশবেই মারা যান এবং তাঁর কোন ভাইবোন কখন জন্মায় নি, সুতরাং মরেও নি। সেই সঙ্গে তিনি এই নতুন সত্যের আবিষ্কার করলেন যে, মানুষের ভিতর হৃদয় বলে' একটা জিনিস আছে—যা মানুষকে শাসন করে এবং মানুষে যাকে শাসন করতে পারে না।

স্ত্রীর মৃত্যুতে শ্যামলাল এতটা অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, তিনি নিশ্চয়ই কা[illegible]কর্ম্মের বার হয়ে যেতেন, যদি না তাঁর একটি চার বৎসরের ছেলে আর একটি চার দিনের মেয়ে থাকত। তাঁর মন ইতিমধ্যে তাঁর অজ্ঞাতসারে জীবনের মধ্যে অনেকটা শিকড় নামিয়েছিল। তিনি দেখলেন যে, এই দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী নিতান্ত অসহায় এবং তিনি ছাড়া পৃথিবীতে এদের অপর কোন সহায় নেই। তাঁর নব-আবিষ্কৃত হৃদয় তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যে, চাকরির দাবী ছাড়া পৃথিবীতে আরও পাঁচরকমের দাবী আছে, এবং কলেজ ও আদালতের পরীক্ষা ছাড়া মানুষকে আরও পাঁচরকমের পরীক্ষা দিতে হয়। তাঁর মনে এই ধারণা জন্মাল যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে অবহেলা করেছেন; এ জ্ঞান হওয়ামাত্র তিনি মনঃস্থির করলেন যে, তাঁর ছেলে-মেয়ের জীবনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজের এবং একমাত্র নিজের

ঘাড়েই নেবেন। স্বামী হিসেবে তাঁর কর্ত্তব্য না-পালন করারূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি সন্তান-পালনের দ্বারা করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন।

এই জীবনের পরীক্ষা তিনি কি ভাবে দিয়েছিলেন এবং তার ফলাফল কি হয়েছিল, সেই কথাটাই হচ্ছে এ গল্পের মোদ্দা কথা।

৩

শ্যামলাল আর বিবাহ করেন নি। তার কারণ, প্রথমত তাঁর এ বিষয়ে প্রবৃত্তি ছিল না, দ্বিতীয়ত তিনি তা অকর্ত্তব্য মনে করতেন। তার পর তাঁর মেয়েটির মুখের দিকে তাকালে, আবার নতুন এক স্ত্রীর কথা মনে হ'লে তিনি আঁৎকে উঠতেন। তাঁর মনে হ'ত, ঐ মেয়েটিতে তাঁর স্ত্রী তার শরীর-মনের একটি জীবন্ত স্মরণচিহ্ন রেখে গিয়েছে।

কোনও কাজ হাতে নিয়ে তা আধা-খেঁচড়া-ভাবে করা শ্যামলালের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সুতরাং এই সন্তান-লালনপালনের কাজ তিনি তাঁর সকল মন, সকল প্রাণ দিয়ে করেছিলেন। শ্যামলাল যেমন তাঁর সকল মন একটি জিনিসের উপর বসাতে পারতেন, তেমনি তিনি তাঁর সকল হৃদয় দুটি একটি লোকের উপরও বসাতে পারতেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সকল হৃদয় তাঁর ছেলে-মেয়ে অধিকার করে' বসেছিল, সুতরাং তাঁর হৃদয়বৃত্তির একটি পয়সাও বাজে খরচে নষ্ট হয় নি। ফলে, তাঁর ছেলে ও মেয়ে শরীরে ও মনে অসাধারণ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কেননা, এ কাজে শ্যামলালের ভালবাসা তাঁর কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রবল সহায় হয়েছিল।

তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি চৌকির হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে, বছর দশেক মহকুমায় মহকুমায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু সে সব দুর্গম স্থানে—পটুয়াখালি, দক্ষিণ শাহাবাজপুর, কক্সবাজার, জেহানাবাদ প্রভৃতিই ছিল তাঁর কর্ম্মস্থল। আজ এখানে, কাল ওখানে।—এই কারণে তিনি তাঁর ছেলেকে স্কুলে দিতে পারেন নি, ঘরে রেখে নিজেই পড়িয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর সঙ্গে ও সব জাগয়ার কোন স্কুল-মাষ্টারের তুলনাই হ'তে পারে না। ফলে বীরেন্দ্রলাল যখন ১৫ বৎসর বয়সে প্রাইভেট ষ্টুডেণ্ট হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশান দিলে, তখন সে অক্লেশে ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করলে।

শ্যামলাল তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বই পড়তে সুরু করলেন,—কিন্তু আইনের নয়। তার কারণ, ইতিমধ্যে আগাগোড়া দেওয়ানি-আইন ম্যায় নজির তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং নূতন Law-reports ছাড়া তাঁর আর কিছু পড়বার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বই পড়া ছাড়া সন্ধ্যেটা কাটাবার আর কোন উপায়ও ছিল না। সুতরাং শ্যামলাল হিষ্টরি পড়তে সুরু করলেন, কেন না, সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র হিষ্টরিই ছিল তাঁর প্রিয় বস্তু। ঐ হিষ্টরিই ছিল তাঁর কাব্য, তাঁর দর্শন, তাঁর নভেল, তাঁর নাটক। তিনি ছুটির সময় একবার কল্‌কাতায় গিয়ে সেকেণ্ড্‌হ্যাণ্ড বইয়ের দোকান থেকে সস্তায় হিষ্টরির যে বই পেতেন, তাই কিনে আনতেন, তা সে যে-দেশেরই হোক, যে-যুগেরই হোক, আর যে লেখকেরই হোক। ফলে, তাঁর কাছে সেই সব ইতিহাসের কেতাব জমে' গিয়েছিল—যা এ দেশে আর কেউ বড় একটা পড়ে না। যথা, Gibbon's Decline and Fall, Mill's History of India, Grote's Greece, Plutarch's Lives, Macaulay's History of England, Lamartine's History of the Girondists, Michelet's French Revolution, Cunningham's History of the Sikhs, Tod's Rajasthan ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রলাল বারো তেরো বছর বয়েস থেকেই, ভাল করে' বুঝুক, আর না বুঝুক, এই সব বই পড়তে সুরু করেছিল; এবং পড়তে পড়তে শুধু ইতিহাসে নয়, ইংরেজিতেও সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বীরেন্দ্রলাল নিজের শিক্ষার ভার নিজের হাতে নিয়েছিল; কিন্তু শ্যামলাল তা লক্ষ্য করেন নি।

ম্যাট্রিকুলেশান পাস করবার পর শ্যামলাল ছেলেকে কলেজে পড়বার জন্য কল্‌কাতায় পাঠাতে বাধ্য হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বেহারে বদলি হয়ে গেলেন। তার পর চার বৎসরের মধ্যে বীরেন্দ্রলাল অবলীলাক্রমে ফার্ষ্ট ডিভিসেনে I. A. এবং B. A. পাস করলে। তাঁর ছেলের পরীক্ষা পাস করবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে, শ্যামলাল মনঃস্থির করলেন যে, তাকে M. A. পাসের পর Civil Service-এর জন্য বিলেতে পাঠাবেন। বীরেন্দ্রলাল যে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, সে বিষয়ে তার বাপের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

বিলেতে ছেলে পড়াবার টাকারও তাঁর সংস্থান ছিল। শ্যামলাল জানতেন যে, খাওয়ার উদ্দেশ্য জীবন ধারণ করা এবং পরার উদ্দেশ্য লজ্জা নিবারণ করা; সুতরাং তাঁর সংসারের কোনরূপ ... হবে

না। তোমার মেয়ের বর ঠিক হয়ে গেছে। উপরে ত ভগবান্ আছেন, তিনি কি আমাদের পরিবারে একটা কলঙ্ক হ'তে দেবেন?" শ্যামলাল একেবারে আনন্দে অধীর হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

—কে?

—ক্ষেত্রপতি মুখুয্যে।

—কোন্ ক্ষেত্রপতি মুখুয্যে?

—আমাদের গ্রামের ক্ষেত্রপতি হে, দক্ষিণ পাড়ায় যার বড় বাড়ী।

—আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?

—মেয়ের বিয়েকে, বাবাজি, আমি নই, তুমিই রসিকতা মনে কর।

—বলেন কি, তার স্ত্রী ত আজ সবে তিন দিন হ'ল মারা গেছে?

—সেই জন্মেই ত সে এই বিয়ের প্রস্তাব করে' পাঠিয়েছে। তার স্ত্রী বেঁচে থাকলে ত আর তুমি তোমার মেয়েকে সতীনের ঘর করতে পাঠাতে না?

—কিন্তু ক্ষেত্রপতি যে আমার একবয়সী?

—দোজবরে বলেই ত সে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। বিশ একুশ বছরের মেয়েকে ত আর কোনও বিশ একুশ বছরের ছেলে বিয়ে করবে না। এতদিন ত চেষ্টা করে' দেখেছ?

—কিন্তু আমার মেয়ের বয়স ত আর বিশ একুশ নয়।

—বাবাজি, আমার কাছে আর মিছে কথা বলে' কি হবে? আমিই ত বলে' বেড়াচ্ছি যে, ওর বয়েস বারো কি তেরো। আসল বয়েস আর কেউ জানুক আর না জানুক—আমি ত জানি। তোমাকে ত সেদিন জন্মাতে দেখলুম, তুমি কি আমাকে ভোগা দিতে পার?

—কিন্তু ক্ষেত্রপতি যে আকাট মূর্খ, সে ত এনট্রান্সও পাস করে নি।

—সেই জন্মেই ত তোমার মেয়ে বিয়ে করতে সে রাজি হয়েছে। তোমার টাকা দেবার সামর্থ্য নেই আর বিনে পয়সায় পাসকরা ছেলে মেলে না, এর প্রমাণ ত হাজারবার পেয়েছ।

শ্যামলাল বুঝলেন যে, তাঁর খুড়োর সঙ্গে আর তর্ক করা অসম্ভব, কেন না, খুড়োমহাশয়ের কথাগুলো যে সবই সত্য, তা তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না; অথচ এ বিবাহের প্রস্তাবে তাঁর হৃদয়মন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল যে, ক্ষেত্রপতির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া আর শ্রীমতীকে জ্যান্ত গোর দেওয়া—একই কথা। তাই তিনি চুপ করে' রইলেন। তাঁর খুড়ো ধরে' নিলেন যে, সে মৌনতা সম্মতির লক্ষণ। তিনি অমনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ক্ষেত্রপতিকে পাকা কথা দিয়ে এলেন। স্থির হ'ল ক্ষেত্রপতি তাঁর বিগত স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ করেই আগত স্ত্রীকে ঘরে আনবেন।

ক্ষেত্রপতির এ বিবাহ করবার আগ্রহের একমাত্র কারণ, শ্রীমতী সুন্দরী এবং কিশোরী। সুন্দরী স্ত্রীলোককে হস্তগত করবার লোভ ক্ষেত্রপতি জীবনে কখনো সম্বরণ করতে পারেন নি এবং এ ক্ষেত্রে বিবাহ ছাড়া শ্রীমতীকে আত্মসাৎ করবার উপায়ান্তর নেই জেনে, তিনি তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হলেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন দ্বিধা হ'ল না, কেন না, তিনি লোকনিন্দাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন। তিনি গ্রামের কাউকেও ভয় করতেন না, সকলে তাঁকে ভয় করত; তার কারণ, তিনি পুলিশে চাকরি করতেন, তার উপর তাঁর দেহে বল, মনে সাহস ও ঘরে টাকা ছিল। এ তিন বিষয়ে গ্রামের কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না।

শ্যামলালের খুড়ো তাঁকে এসে যখন জানালেন যে, তিনি ক্ষেত্রপতিকে পাকা কথা দিয়ে এবং বিয়ের দিনস্থির করে' এসেছেন, তখন শ্যামলাল বললেন, "আপনি যাই বলুন আর না বলুন, আমি এ বিবাহ কিছুতেই হ'তে দেব না, প্রাণ গেলেও নয়।"

এ কথা শুনে খুড়োমহাশয়—" ভদ্রলোককে কথা দিয়ে সে কথার আর কিছুতেই অন্যথা করা যেতে পারে না", এই বলে' চীৎকার করতে লাগলেন। বাড়ীতে হুলস্থূল পড়ে' গেল। কিন্তু শ্যামলাল যে সেই "না" বলে' চুপ করলেন, তার পর আর কোন কথা কইলেন না। তার কারণ, হাজার চীৎকার করলেও তাঁর খুড়োর কোন কথা শ্যামলালের কাণে ঢুকছিল না; তাঁর শরীর-মন, ইন্দ্রিয় সব একেবারে অবশ অসাড় হয়ে গিয়েছিল, মাথায় বজ্রাঘাত হ'লে মানুষের যেমন হয়।

এ মহাসমস্যার মীমাংসাও শ্রীমতী করে' দিলে। সকলের সকল কথা শুনে, সকল অবস্থা জেনে, শ্রীমতী বল্লে, এ বিবাহ সে করবেই। সে বুঝেছিল যে, তার বিবাহ না হওয়া তক তার বাপের বিড়ম্বনার আর শেষ হবে না। তা ছাড়া সে কোন দুঃখকষ্টকেই আর ভয় করত না, বরং তার

মনে হ'ত যে, তার পক্ষে জীবনে নিজে সুখী হবার ইচ্ছাটাও একটা মহাপাপ, সে ইচ্ছাটা যেন তার নির্ম্মম স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়।

শ্যামলাল অবশ্য মেয়ের মতে মত দিলেন, কিন্তু ব্যাপারখানা যে কি হ'ল, তা তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। এইটুকু শুধু বুঝলেন যে, পুরাতনের সংঘর্ষে তাঁর জোড়া-সুখস্বপ্নের আর একটিও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

এর পর এক মাস না যেতেই শ্যামলালের মেয়ের বিয়ে হ'ল। সে বিবাহ-সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। সেই আমি প্রথম ও শেষ শ্রীমতীকে দেখি। তার রূপের খ্যাতি পূর্ব্বে থেকেই শুনেছিলুম, কিন্তু যা দেখলুম, তা সুন্দরী স্ত্রীলোক নয়,—শ্বেতপাথরে খোদা দেবীমূর্ত্তি; তার সকল অঙ্গ দেবতার মতই সুঠাম, দেবতার মতই নিশ্চল, আর তার মুখ দেবতার মতই প্রশান্ত আর নির্ব্বিকার। বর-কনে মানিয়েছিল ভাল, কেন না, ক্ষেত্রপতিও যেমন বলিষ্ঠ, তেমনি সুপুরুষ; তার বয়েস পঁয়তাল্লিশের উপর হ'লেও ত্রিশের বেশি দেখাত না, আর তার মুখও ছিল পাষাণের মতই নিটোল ও কঠিন। আমার মনে হ'ল, আমি যেন দুটি Statue-র বিয়ের অভিনয় দেখছি। বর-কনে'তে যে মন্ত্র পড়ছিল, তা প্রথমে আমার কাণে ঢোকে নি, তার পর হঠাৎ কাণে এল, ক্ষেত্রপতি বলছেন, "যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব"। এ কথা শোনামাত্র আমি উঠে চলে' এলুম। বুঝলুম, এ অভিনয় সত্যিকার জীবনের, তবে তা Comedy কি Tragedy, তা বুঝতে পারলুম না।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩

ফরমায়েসি গল্প

মকদমপুরের জমিদার রায় মহাশয় সন্ধ্যা-আহ্নিক করে', সিকি ভরি অহিফেন সেবন করে', যখন বৈঠকখানায় এসে বসলেন, তখন রাত এক প্রহর। তিনি মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে' গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে ঝিমুতে লাগলেন। সভাস্থ ইয়ার-বক্সির দল সব চুপ করে' রইল; পাছে হুজুরের ঝিমুনির ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে কেউ টুঁ-শব্দও করলে না। খানিকক্ষণ বাদে রায় মহাশয় হঠাৎ জেগে উঠে গা-ঝাড়া দিয়ে বসে' প্রথম কথা বললেন—"ঘোষাল! গল্প বল।"

রায় মহাশয়ের মুখ থেকে এ কথা পড়তে না পড়তে তাঁর ডানধার থেকে একটি গৌরবর্ণ ছিপছিপে টেড়িকাটা যুবক, হাসি-মুখে চাঁচা গলায় উত্তর করলে—

—যে আজ্ঞে হুজুর, বলছি।

—আজ কিসের গল্প বলবি বল্ ত?

—বর্ষার গল্প হুজুর।

—একে শ্রাবণ মাস, তায় আবার তেমনি মেঘ করেছে, তাই আজ ঘোষাল বর্ষার গল্প বলবে। ওর রসবোধটা খুব আছে। কি বলেন, পণ্ডিত মহাশয়?

একটি অস্থি-চর্ম্মসার দীর্ঘাকৃতি পুরুষ একটিপ নস্য নিয়ে সানুনাসিক স্বরে উত্তর করলেন—

—তার আর সন্দেহ কি? তা না হ'লে কি মহাশয়ের মত গুণগ্রাহী লোক আর ওকে মাইনে করে' চাকর রাখেন? তবে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এই যে, ঘোষাল আজ কি রসের অবতারণা করবে?

ঘোষাল তিলমাত্র দ্বিধা না করে' বললে—

—মধুর রসের। বর্ষার রাত্তিরে আর কি রস ফোটানো যায়?

রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, ভূতের গল্প চলবে না? কি বলেন স্মৃতিরত্ন?"

—আজ্ঞে, চলবে না কেন, তবে তেমন জমবে না। ভয়ানক রসের অবতারণা শীতের রাত্রেই প্রশস্ত।

ঘোষাল পণ্ডিত মহাশয়ের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে' উঠল—

—এ লাখ কথার এক কথা। কেন না, মানুষের বাইরেটা যখন শীতে কাঁপছে, তখনি তার ভিতরটা ভয়ে কাঁপানো সঙ্গত। এই দুই কাঁপুনিতে মিলে গেলে, গল্পের আর রসভঙ্গ হয় না।

পণ্ডিত মহাশয় এ কথা শুনে মহা খুসি হয়ে বল্লেন—

—তা ত বটেই, তা ত বটেই। আর তা ছাড়া মধুর রসের মধ্যেই ত ভয়ানক প্রভৃতি সকল রসই বর্ত্তমান, তাতেই না অলঙ্কার শাস্ত্রে ওর নাম— আদিরস।

রায় মহাশয়ের মুখ দিয়ে এতক্ষণ শুধু অম্বুরি তামাকের ধোঁয়ার একটি ক্ষীণ ধারা বেরচ্ছিল, এইবার আবার কথা বেরল; কিন্তু তার ধারা ক্ষীণ নয়—

—আপনার অলঙ্কার শাস্ত্রে যা বলে বলুক, তাতে কিছু আসে যায় না। আমার কথা হচ্ছে এই, আমি এখন বুড়ো হ'তে চল্লুম—বয়েস প্রায়

পঞ্চাশ হ'ল। এ বয়েসে প্রেমের কথা কি আর ভাল লাগবে? ও সব গল্প যাও ছেলে-ছোকরাদের শোনাও গিয়ে।

উপস্থিত সকলেই জানতেন যে, রায় মহাশয় তাঁর বয়েস থেকে তার তৃতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণীর বয়েস—অর্থাৎ ঝাড়া পোনেরো বৎসর চুরি করেছেন, অতএব তাঁর কথার আর কেউ প্রতিবাদ করলেন না। শুধু ঘোষাল বল্লে—

—হুজুর, ছেলে-ছোকরারা নিজেরা প্রেম করতে এত ব্যস্ত যে, প্রেমের গল্প শোনার তাদের ফুরসৎ নেই। তা ছাড়া আদিরসের কথা শোনায় ছেলেদের নীতি খারাপ হয়ে যেতে পারে, হুজুরের ত আর সে ভয় নেই।

—দেখেছেন পণ্ডিত মশায়, ঘোষাল কেমন হিসেবি লোক! যাই বলুন, কার কাছে কোন কথা বলতে হয়, তা ও জানে।

—সে কথা আর বলতে? শাস্ত্রে বলে, যৌবনে যার মনে বৈরাগ্য আসে, সেই যথার্থই বিরক্ত, আর বৃদ্ধবয়সেও যার মনে রস থাকে, সেই যথার্থ রসিক। ঘোষাল কি আর না বুঝে-সুঝে কথা কয়? ও জানে, আপনার প্রাণে এ বয়সেও যে রস আছে, এ কালের যুবাদের মধ্যে হাজারে এক জনেরও তা নেই।

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়। আমি সেদিন যখন সেই ভৈরবীর টপ্পাটা গাইলুম, হুজুর শুনে কত বাহবা দিলেন; আর সেই গানটাই একটা পয়লা-নম্বরের M. A.-এর কাছে গাওয়াতে সে ভদ্রলোক কাণে হাত দিলে। বললে অশ্লীল।

—কোন্ গানটা ঘোষাল?

—"গোরী তুনে নয়না লাগাওয়ে যাদুভারা—"

—কি বলছিস ঘোষাল, ঐ গান শুনে ইষ্টুপিট্ কাণে হাত দিলে? অমন কাণ মলে' দিতে পারলি নে? হতভাগাদের যেমন ধর্ম্মজ্ঞান, তেমনি রসজ্ঞান। ইংরেজি প'ড়ে জাতটে একেবারে অধঃপাতে গেল!

এই কথা শুনে সে সভার সব চাইতে হৃষ্টপুষ্ট ও খর্ব্বাকৃতি ব্যক্তিটি অতি মিহি অথচ অতি তীব্র গলায় এই মত প্রকাশ করলেন যে—

—অধঃপাতে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এখন আবার উঠছে।

—তুমি আবার কি তত্ত্ব বার করলে হে উজ্জ্বল নীলমণি?—

রায় মহাশয় যাঁকে সম্বোধন করে' এ প্রশ্ন করলেন, তাঁর নাম শ্রীনীলমণি গোস্বামী। ঘোষাল তার পিছন থেকে গোস্বামীটি কেটে দিয়ে সুমুখে "উজ্জ্বল" শব্দটি জুড়ে দিয়েছিল। তার এক কারণ, গোস্বামী মহাশয়ের বর্ণ ছিল, উজ্জ্বল নয়—ঘোর শ্যাম;—আর এক কারণ, তিনি কথায় কথায় উজ্জ্বল নীলমণির দোহাই দিতেন। এই নামকরণের পর সে রোগ তাঁর সেরে গিয়েছিল।

জমিদার মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে গোঁসাইজি বললেন—আজ্ঞে, ইংরাজিনবীশদের যে মতিগতি ফিরছে, তা আমি জেনে শুনেই বলছি। আমারই জনকত পাসকরা শিষ্য আছে, যাদের কাছে ঘোষাল যদি ও গানটা না গেয়ে গান ধরত

গেলি কামিনী গজবরগামিনী
বিহসি পালটী নেহারি

তা হ'লে আমি হলপ করে' বলতে পারি, তারা ভাবে বিভোর হয়ে যেত।

—ও দুয়ের তফাৎটা কোথায়?

—তফাৎটা কোথায়?—বললেম ভাল পণ্ডিত মশায়! একটা টপ্পা আর একটা কীর্ত্তন!

—অর্থাৎ তফাৎ যা তা নামে!

—অবাক্ করলেন! তা হ'লে শোরীমিয়ার সঙ্গে বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রভেদও শুধু নামে। নামের ভেদেই ত বস্তুর ভেদ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আসল প্রভেদ রসে। যাক, আপনার সঙ্গে রসের বিচার করা বৃথা। রসজ্ঞান ত আর টোলে জন্মায় না।

—বটে! অমরু শতক থেকে সুরু করে' নৈষধের অষ্টাদশ সর্গ পর্য্যন্ত আলোচনা করে' যদি রসজ্ঞান না জন্মায়, তা হ'লে মনু থেকে সুরু করে' রঘুনন্দনের অষ্টাদশ তত্ত্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করেও ধর্ম্মজ্ঞান জন্মায় না।

—রাগ করবেন না পণ্ডিত মশায়, কিন্তু কথাটা এই যে, সংস্কৃতকাব্যের রস আর পদাবলীর রস এক বস্তু নয়—ও দুয়ের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

—আপনি ত দেখছি এক কথারই বার বার পুনরুক্তি করছেন। মানলুম, টপ্পা ও কীর্ত্তন এক বস্তু নয়, কাব্যরস ও পদাবলীর রস এক বস্তু নয়। কিন্তু পার্থক্য যে কোথায়, তা ত আপনি দেখিয়ে দিতে পারছেন না।

—তফাৎ আছে বৈ কি। যেমন তালের রস ও তাড়ি এক বস্তু নয়—একটায় নেশা হয়, আর একটায় হয় না। সংস্কৃত কবিতা পড়ে' কেউ কখন ধুলোয় গড়াগড়ি দেয়?

ঘোষালের এ মন্তব্য শুনে মায় স্মৃতিরত্ন সভাশুদ্ধ

লোক হেসে উঠল। উজ্জ্বলনীলমণি মহাক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—

পণ্ডিত মহাশয়, আপনিও এই সব ইয়ারকির প্রশ্রয় দেন? আশ্চর্য্য! যেমন ঘোষালের বিদ্যে, তেমনি তার বুদ্ধি।

রায় মহাশয় ঘোষালকে চব্বিশঘন্টা ধমকের উপরেই রাখতেন; কিন্তু তার বিরুদ্ধে অপর কাউকেও একটি কথা বলতে দিতেন না। "আমার পাঁঠা আমি ল্যেজের দিকে কাটব, কিন্তু অপর কাউকে মুড়ির দিকেও কাটতে দেব না,"—এই ছিল তাঁর motto. তিনি তাই একটু গরম হয়ে বললেন—

—কেন, ওর বুদ্ধির কমতিটে দেখলে কোথায় হে উজ্জ্বলনীলমণি! তোমাদের মত ওর পেটে বিদ্যে না থাকতে পারে, কিন্তু মগজে ঢের বেশি বুদ্ধি আছে। তাগমাফিক অমনি একটি বুতসই উপমা লাগাও ত দেখি!

—আজ্ঞে, ওর বুদ্ধি থাকতে পারে, কিন্তু রসজ্ঞান নেই।

—রসজ্ঞান ওর নেই, আর তোমার আছে? করো ত অমনি একটা রসিকতা।

—আজ্ঞে, ঐ রসিকতাই প্রমাণ, ওর মনে ভক্তির নামগন্ধও নেই। যার ধর্ম্মজ্ঞান নেই, তার আবার রসজ্ঞান!

স্মৃতিরত্ন এ কথা শুনে আর চুপ থাকতে পারলেন না। বল্লেন—

—এ আবার কি অদ্ভুত কথা? ঘোষালের ধর্ম্মজ্ঞান না থাকতে পারে, তাই বলে', কি ওর রসজ্ঞান থাকতে নেই?

—অবশ্য না! ও দুই ত আর পৃথক জ্ঞান নয়।

—আমাদের কাছে যা সামান্য, আপনার কাছে যখন তা বিশেষ; আমাদের কাছে যা বিশেষ, আপনার কাছে তা ত[illegible] সামান্য; এ এক নব্যন্যায় বটে!

—শুনুন পণ্ডিত ম'শা[illegible] যার নাম রসজ্ঞান, তারি নাম ধর্ম্মজ্ঞান; [illegible]যার নাম ধর্ম্মজ্ঞান তারি নাম রসজ্ঞান। ন[illegible]ভেদে ত আর বস্তুর প্রভেদ হয় না।

—বলেন কি গোঁস[illegible]তা হ'লে আপনাদের মতে, যার নাম কাম, [illegible] ধর্ম্ম, আর যার নাম অর্থ, তারি নাম মোক্ষ?

—আসলে ও সব[illegible]রূপান্তরে শুধু নামান্তর হয়েছে।

—বুঝছেন না পণ্ডিত মহাশয়, কথা খুব সোজা। গোঁসাইজি বলছেন কি যে, যার নাম ভাজা চাল, তারি নাম মুড়ি—নামান্তরে শুধু রূপান্তর হয়েছে।

মদের পিঠ পিঠ এই চাটের উপমা আসায়, রায় মহাশয়ের পাত্র-মিত্রগণ মহা খুসি হয়ে অট্টহাস্যে ঘোষালের এ টিপ্পনির অনুমোদন করলেন। উজ্জ্বল-নীলমণি-এর প্রতিবাদ করবার উদ্যত হবামাত্র, তাঁর মাথার উপর থেকে একটা টিকটিকি বলে' উঠল, "ঠিক ঠিক ঠিক"। সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রস্ফুরিত ও বিস্ফারিত নাসিকারন্ধ্র হ'তে একটা প্রচণ্ড সহাস্য "হেঁচ্চ"ধ্বনি নির্গত হয়ে, উজ্জ্বল নীলমণির বক্ষোদেশ যুগপৎ হাস্য ও নস্যরসে সিক্ত করে' দিলে। তিনি অমনি "রাধামাধব" বলে' সরে' বসলেন। রায় মহাশয় এই সব ব্যাপার দেখে শুনে ভারি চটে' বললেন—

—তোমরা ক'টায় মিলে ভারি গণ্ডগোল বাধালে ত হে! আমি শুনতে চাইলুম গল্প আর এঁরা সুরু করে' দিলেন তর্ক, আর সে তর্কের যদি কোনও মাথামুণ্ডু থাকে। ঘোষাল! গল্প বল।

—হুজুর, এই বল্লুম বলে'।

—শীগ্‌গির, নইলে এরা আবার তর্ক জুড়ে দেবে। এ কি আমার শ্রাদ্ধের সভা যে, নাগাড় পণ্ডিতের বিচার চলবে?

উজ্জ্বলনীলমণি বললেন—

—আজ্ঞে, সে ভয় নেই। যে সভায় ঘোষাল বক্তা, সে সভায় যদি আমি আর মুখ খুলি ত আমার নামই নয়—

—"ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈ-
র্জলদাগমে।"

পণ্ডিত মশায়ের বচনটি খাপে খাপে মিলে গিয়েছে। কাল যে বর্ষা, তা ত সকলেই জানেন। তার উপর গোঁসাইজির কোকিলের সঙ্গে যে এক বিষয়ে সাদৃশ্যও আছে, সে ত প্রত্যক্ষ।

উজ্জ্বলনীলমণির গায়ে এই কথার নখ বসিয়ে দিয়ে ঘোষাল আরম্ভ করলে—

—তবে বলি, শ্রবণ করুন।

—দেখ্‌, মধুর রসের বলে' গল্প যেন একদম চিনির পানা করে' তুলিস নে। একটু নুণঝাল যেন থাকে।

—হুজুর যে অরুচিতে ভুগছেন, তা কি আর জানিনে!

—আর দেখ্‌, একটু অলঙ্কার দিয়ে বলিস, একেবারে যেন ন্যাড়া না হয়।

—অলঙ্কারের সখই যে আজকাল হুজুরের প্রধান সখ, তা ত আর কারও জানতে বাকী নেই।

—কিন্তু সে অলঙ্কার যেন ধারকরা কিম্বা চুরিকরা না হয়।

—হুজুর, ভয় নেই। পরের সোনা এখানে কাণে দেব না, তা হ'লে গোঁসাইজি তা হেঁচকাটানে কেড়ে নেবেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিজের জিনিস ব্যবহার করলে সবাই সোনাকে বলবে পিতল, আর বড় অনুগ্রহ করে ত—গিল্টি।

—অন্যে যে যা বলে, তা বলুক; কিন্তু আসল ও নকলের প্রভেদ আমার চোখে ঠিক ধরা পড়বে।

—হুজুর জহুরি, সেই ত ভরসা। তবে শুনুন—

শ্রাবণ মাস, অমাবস্যার রাত্তির, তার উপর আবার তেমনি দুর্য্যোগ। চারিদিক একেবারে অন্ধকারে ঠাসা। আকাশে যেন দেবতারা আবলুশ কাঠের কপাট ভেজিয়ে দিয়েছে; আর তার ভিতর দিয়ে যা গলে' পড়ছে, তা জল নয়,—একদম আলকাতরা। আর তার এক একটা ফোঁটা কি মোটা, যেন তামাকের গুল—

—কাঠের কপাটের ভিতর দিয়ে জল কি করে' গলে' পড়বে, বল ত মূর্খ? যখন বর্ণনা সুরু করে' দিস, তখন আর তোর সম্ভব অসম্ভবের জ্ঞান থাকে না। বল, জল চুঁইয়ে পড়ছে!

—হুজুর বলতে চান, আমি বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারি নে। আজ্ঞে তা নয়, আমি ঠিকই বলেছি। জল গলেই পড়ছে, চুঁইয়ে নয়। কপাট বটে, কিন্তু—ফারফোরের কাজ, ভাষায় যাকে বলে জালির কাজ। সেই জালির ফুটো দিয়ে—

—দেখলেন স্মৃতিরত্ন, ঘোষালের ঠিকে ভুল হয় না। এই শুনে দেওয়ানজি বল্লেন—

—দেখলে ঘোষাল! ঠিকে ভুল কর্ত্তার চোখ এড়িয়ে যায় না।—

—সে আর বলতে। হুজুর হিসেব নিকেশে যদি অত পাকা না হতেন, তা হ'লে তাঁর বাড়ীতে আর পাকা চণ্ডীমণ্ডপ হয়, আগে যার চালে খড় ছিল না।

—তুমি কার কথা বলছ হে, আমার?

—যে নল চালায়, সে কি জানে, কার ঘরে গিয়ে সে নল ঢুকবে? যাক্ ও সব কথা, এখন গল্প শুনুন। এই দুর্য্যোগের সময় একটি ব্রাহ্মণের ছেলে, বয়েস আন্দাজ পঁচিশ ছাব্বিশ, এক তেপান্তর মাঠের ভিতর এক বটগাছের তলায় একা দাঁড়িয়ে ঠায় ভিজছিল।

—কি বল্লি! ব্রাহ্মণের ছেলে রাত দুপুরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজছে আর তুই ঘরের ভিতর বসে' মনের সুখে গল্প বলে' যাচ্ছিস? ও হবে না ঘোষাল, ওকে ওখান থেকে উদ্ধার করতে হবে!

—হুজুর, অধৈর্য্য হবেন না; উদ্ধার ত করবই। নইলে মধুর রসের গল্প হবে কি করে'? কেউ ত আর নিজের সঙ্গে নিজে প্রেম করতে পারে না।

—তা ত জানি, কিন্তু তুই হয় ত ঐখানেই আর একটাকে এনে জোটাবি! গল্প সুরু করে' দিলে তোর ত আর কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঘোষাল যদি তা করে, তাতেও অলঙ্কারশাস্ত্রের হিসেবে কোনও দোষ হয় না। সংস্কৃত কবিরাও ত অভিসারিকাদের এমনি দুর্য্যোগের মধ্যেই বার করতেন।

—দেখুন পণ্ডিত মহাশয়, সেকালে তাদের হাড় মজবুত ছিল, একালের ছেলেমেয়েদের আধঘণ্টা জলে ভিজলে নির্ঘাৎ pneumonia হবে। এ যে বাঙলাদেশ, তায় আবার কলিকাল।

এ কথা শুনে উজ্জ্বলনীলমণি আর স্থির থাকতে পারলেন না, সাবেগে বলে' উঠলেন—

—তাতে কিছু যায় আসে না মশায়। পদাবলী পড়ে' দেখবেন,—কি ঝড়জলের মধ্যে অভিসারিকারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন এবং তাতে করে' তাঁদের কারও যে কখনও অপমৃত্যু ঘটেছে, এ কথা কোনও পদাবলীতে বলে না। আসল কথাটা কি জানেন, মনের ভিতর যার আগুন জ্বলেছে, বাইরের জলে তার কি করবে?

—হুজুর ত ঠিকই ভয় পেয়েছেন। অভিসারিকাদের চামড়া মোমজামা হ'তে পারে, কিন্তু তাই বলে' ব্রাহ্মণ-সন্তানকে বৃষ্টির জলে ভেজালে যে ব্রহ্মহত্যা হবে না, কে বল [illegible] থছি? অভিসারক বলে' ত আর কোনও জন্ম! [illegible] মানছি, দেখুন হুজুর, ব্রাহ্মণের ছেলে ভিজছিল আর পদাবলীটার গায়ে জল লাগছিল না। তার [illegible]মের প্র[illegible]থায়, [illegible], গায়ে বর্ষাতি, আর পায়ে বুটজুতে [illegible]ন—

শুধু ঝড় [illegible]ইজি! [illegible]বৈ কি। উপর বজ্র ধমকাচ্ছিল আর চোখে [illegible]রি নাম[illegible]—এক ঝাঁকাচ্ছিল। সে এক তুমুল ব্যাপ[illegible] সংস্কৃত তুবড়ি ছুটছে, ঝাঁকে ঝাঁকে হা[illegible] এক। [illegible] দেয়? ফাঁকে ফাঁকে বোমা ফুটছে—সে[illegible]ব্য শুনে [illegible]য়ালি।

—কি বললি ঘোষাল, শ্রাবণ মাসে দেওয়ালি ?
—তুই দেখছি পাঁজি মানিস নে !

—আজ্ঞে, আমি মানি, কিন্তু দেবতারা মানেন না। স্বর্গে ত সমস্তক্ষণই শুভক্ষণ। কি বলেন পণ্ডিত মশায় ?

—তা ত ঠিকই ! আমাদের পক্ষে যা নৈমিত্তিক, দেবতাদের পক্ষে তা কাম্য। সুতরাং তাঁরা যখন যা খুসি, তখনই সেই উৎসব করতে পারেন।

—শুধু করতে পারেন না, ক'রেও থাকেন। স্বর্গে ত আর উপবাস নেই, আছে শুধু উৎসব। স্বর্গে যদি একাদশী থাকত, তা হ'লে কে আর সেখানে যেতে চাইত ? আমি ত নয়ই—

—উনি ত নন্ই ! যেন উনি যেতে চাইলেও স্বর্গে যেতে পেতেন !

—হুজুর, আমি কোথাও যেতে চাইনে, যেখানে আছি, সেইখানেই থাকতে চাই।

—যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকতে চান ! যেন উনি থাকতে চাইলেই থাকতে পেতেন। তুই বেটা ঠিক নরকে যাবি !

—হুজুর যেখানে যাবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব !

—দেখেছেন পণ্ডিত মশায়, ঘোষালের আর যাই দোষ থাক, লোকটা অনুগত বটে। যাক ও সব বাজে কথা, যার কপালে যা আছে, তাই হবে। তুই এখন বস্, তার পর কি হ'ল ?

তার পর দেবতারা একটা বিদ্যুতের ছুঁচোবাজি ছেড়ে দিলেন। সেটা ঐ কপাটের ফাঁক দিয়ে গলে' এসে অন্ধকারের বুক চিরে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের সুমুখ দিয়ে লাউডগা সাপের মত এঁকে-বেঁকে গিয়ে সামনে পড়ল। তার আলোতে দেখা গেল যে, দশ হাত দূরে একটা পর্ব্বত-প্রমাণ মন্দির খাড়া রয়েছে। ব্রাহ্মণের ছেলে অমনি "ব্যোম ভোলানাথ" বলে' হুঙ্কার দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই মন্দিরের দুয়োরে ধাক্কা মারতে লাগল। একটু পরে ভিতর থেকে কে একজন হুড়কো খুলে দিলে। তার পর ব্রাহ্মণ-সন্তান ঢোকবার আগেই ঝড়-জল হো হো করে' মন্দিরের ভিতর গিয়ে পড়ল আর অমনি বাতি গেল নিবে। এই অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মণের ছেলেটি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

—মন্দিরে ঢুকে ভ্যাবা-গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে রইল ? আর পায়ের জুতো খুললে না, আচ্ছা ব্রাহ্মণের ছেলে ত !

—হুজুর, সে জুতোয় কিছু দোষ নেই, রবারের !

—এই যে বললি বুট ?

—বুট বটে, কিন্তু রবারের বুট। হুজুর, আমার গল্পের নায়ক কি এতই বোকা যে, মন্দির অশুদ্ধ করে' দেবে ?

তার পর অনেক ডাকাডাকিতে কেউ জবাব না করায় সে ভদ্রলোক অগত্যা হাতড়ে হাতড়ে কপাটের হুড়কো বন্ধ করে' দিলে। তার পর পকেট থেকে দিয়াশিলাই বার করে' জ্বালিয়ে দেখলে যে, বাঁ-দিকে একটা হারিকেন লণ্ঠন কাৎ হয়ে পড়ে' রয়েছে। অনেক কষ্টে সেই লণ্ঠনটি জ্বেলে সে দেখতে পেলে, ডান দিকে দেয়ালের গায়ে—খাড়া রয়েছে চিত্রপুত্তলিকার মত একটি মূর্ত্তি। আর সে কি মূর্ত্তি ! একেবারে মারবেল পাথরে খোদা। ব্রাহ্মণ-সন্তান একদৃষ্টে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইল। সে দেখবার মত জিনিসও বটে। নাকটি তিলফুলের মত, চোখ দুটি পদ্মফুলের মত, গাল দুটি গোলাপফুলের মত, ঠোঁট দুটি ডালিমফুলের মত, কাণ দুটি—

—রাখ তোর রূপবর্ণনা। লোকটা দেখছি অতি হতভাগা। দেবতার দিকে হাঁ করে' চেয়ে রইল, প্রণাম করলে না !

—আজ্ঞে, তার দোষ নেই। মূর্ত্তিটি যে কোন্ দেবতার, তা সে ঠাওর করতে পারছিল না। কালী, শীতলা, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি কোনো জানাশুনো দেবতা ত নয়।

—তা নাই হোক্, দেবতা ত বটে। দেবতা ত তেত্রিশ কোটি—মানুষে কি তাদের সবাইকে চেনে ? আর চেনে না বলে' প্রণাম করবে না ?

—আজ্ঞে লোকটা সন্ন্যাসী। ওদের ত কোন ঠাকুর-দেবতাকে প্রণাম করতে নেই, ওরা যে সব স্বয়ংব্রহ্ম।

—দেখ ঘোষাল, মিথ্যে কথা তোর মুখে আর বাধে না দেখছি। এই মাত্র বলেছিস ব্রাহ্মণের ছেলে।

—আজ্ঞে, মিথ্যে কথা নয়, তার গলা-ওণ্টানো কোটের ভিতর দিয়ে পৈতা দেখা যাচ্ছিল।

—আবার বলছিস্ সন্ন্যাসী ! দেখ্, যে কখনো সাধুসন্ন্যাসী দেখে নি, তার কাছে গিয়ে এই সব ফক্কুড়ি কর্। পরমহংস বলো, অবধূত বলো, নাগা বলো, আকালি বলো, গিরি বলো, পুরি বলো, ভারতী বলো, বাবাজি বলো, আর কত নাম করব—রামায়েৎ লিঙ্গায়েৎ কাণফাটা ঊর্দ্ধবাহু, দাদুপন্থী অঘোরপন্থী, —দেশে এমন সাধুসন্ন্যাসী নেই যে, আমার পয়সা খায় নি, আর যার ওষুধ আমি খাই নি। কিন্তু কারুও ত কখন পৈতা দেখি নি—এক দণ্ডী ছাড়া।

তাদেরও ত বাবা পৈতা গলায় ঝোলানো থাকে না, দণ্ডে জড়ানো থাকে।

—হুজুর, এ ছোকরা ও সব দলের নয়। এ হচ্ছে একজন স্বদেশী সন্ন্যাসী।

—সন্ন্যাসী ত বিদেশীই হয়ে থাকে। তুই আবার স্বদেশী সন্ন্যাসী কোত্থেকে বার করলি? জানিসনে, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না।

—হুজুর, আমি বার করি নি, এরা নিজেই বেরিয়েছে। এরা ভিখ চায়ও না, নেয়ও না। এদের পয়সার অভাব নেই। এরা আপনার ছাইমাখা কোপনি-আঁটা টো টো কোম্পানীর দল নয়। এরা দীক্ষিত নয়, শিক্ষিত সন্ন্যাসী। এরা গেরুয়াও পরে, জুতো-মোজাও পরে, স্বামীও হয়, পৈতাও রাখে। এরা একসঙ্গে ভবঘুরে ও সহুরে, এক রকম গেরস্ত সন্ন্যাসী।

—এরা কিছু মানে টানে?

—আজ্ঞে, এরা কিছুই মানে না, অথচ সবই মানে।

—কথাটা ভাল বুঝলুম না।

—বোঝা বড় শক্ত হুজুর। এরা হচ্ছে সব বৈদান্তিক শাক্ত।

—বৈদান্তিক শাক্ত আবার কি রে! এ বেখাপ্পা ধর্ম্মমত পয়দা করলে কে?

—হুজুর, জার্ম্মাণরা। যার সঙ্গে যা একদম মেলে না, তার সঙ্গে তা বেমালুম মিলিয়ে দিতে ওদের মত ওস্তাদ দুনিয়ায় আর কে আছে? ওরা যেমন পাটে আর পশমে মিলিয়ে কাশ্মীরী শাল বুনে এ দেশে চালান দেয়, তেমনি ওরা শঙ্করের সঙ্গে শঙ্করী মিলিয়ে এ দেশে চালান দিয়েছে।

—চোর বেটারা যেন ভেল চালায়, কিন্তু দেশের লোক তা নেয় কেন?

—আজ্ঞে, সস্তা বলে'।

—অনেকক্ষণ চুপ করে' থাকা উজ্জ্বলনীলমণির ধাতে ছিল না। তিনি বললেন—

—ঘোষাল যাদের কথা বলছে, তারা সব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। আমার পাসকরা শিষ্যেরাই হচ্ছে খাঁটি বৈদান্তিক বৈষ্ণব।

—অর্থাৎ এঁদের কাছে সাকার ও নিরাকারের ভেদ শুধু উপসর্গে; এবং ভেদজ্ঞানও এঁদের নেই, এঁরা খুসিমত সা'র জায়গায় নি এবং নি'র জায়গায় সা বসিয়ে দেন!

রায় মহাশয়ের আর ধৈর্য্য থাকল না। তিনি বেজায় রেগে উঠে চীৎকার করে' বললেন—

—তোমার টীকা-টিপ্পনি রাখো হে ঘোষাল! আমার কাছে ও-সব বুজরুকি চলবে না। ইষ্টু-পিটরা দু'পাতা ইংরেজি পড়ে' সব সোঽহং হয়ে উঠেছে। আমি জানি এরা সব কি—হয় বর্ণচোরা নাস্তিক, নয় বর্ণচোরা খৃষ্টান। ঐ অকালকুষ্মাণ্ডটা বৈদান্তিক শাক্তই হোক আর বৈদান্তিক বৈষ্ণবই হোক, গেরস্তই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক, স্বদেশীই হোক আর বিদেশীই হোক, তোমার ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের ঘাড় ধরে' ঐ দেবতার পায়ে মাথা ঠেকাও।

—হুজুর, ওকে দিয়ে যদি এখন প্রণাম করাই, তা হ'লে আমার গল্প মারা যায়।

—আর যদি প্রণাম না করে ত কাণ ধরে' মন্দির থেকে বার করে' দে।

—হুজুর, তা হ'লেও আমার গল্প মারা যায়।

—যাক্ মারা। আমি ঐ সব গোঁয়ারগোবিন্দ লোকের যথেচ্ছাচারের কথা শুনতে চাইনে।

—হুজুর যদি জোর করেন ত আমি নাচার। গল্প তা হ'লে এইখানেই বন্ধ করলুম।

—বেশ! এ মাসের মাইনেও তা হ'লে এইখানেই বন্ধ হ'ল।

এই কথা শুনে ঘোষাল শশব্যস্তে বলে উঠল—

—হুজুর, আপনি মিছে রাগ করছেন। মূর্ত্তিটে যদি দেবী না হয়ে মানবী হয়?

—এ আবার কি আজগুবি কথা বার করলি? এই ছিল দেবতা, আর এই হয়ে গেল মানুষ!

—দেবতা যে মানুষ আর মানুষ যে দেবতা হয়, এ ত আর আজগুবি কথা নয়। এ কথা ত সকল দেশের সকল শাস্ত্রেই আছে। তবে আমি ত আর পুরাণকার নই। এ রকম ওলট-পালট আমি করলে কেউ তা মানবে না, আপনিও বলবেন, ওর ভিতর বস্তুতন্ত্রতা নেই। ব্যাপারখানা আসলে কি, তা বলছি। হুজুর মনোযোগ করবেন। ব্রাহ্মণের ছেলে যখন মন্দিরের দরজা ঠেলছিল, তখন ভিতরে যদি জন-প্রাণী না থাকত, তা হ'লে হুড়কো খুলে দিলে কে? আর যখন দেখা গেল যে, মন্দিরের মধ্যে অপর কোনও কিছু নেই, তখন আগে যাঁকে প্রতিমা বলে' ভুল হয়েছিল, তিনিই যে ও দ্বার মুক্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। সেটি যখন দেখতে দেবীর মত অথচ দেবী নয়, তখন অপ্সরা না হয়ে আর যায় না।

—খুব কথা উল্টে নিতে শিখেছিস বটে।

ব্রাহ্মণের ছেলে যখন দেখলে যে, সেই মূর্ত্তিটির চোখে পলক পড়ছে, নাকে নিঃশ্বাস পড়ছে, তখন আর তার বুঝতে বাকী থাকল না যে, স্বর্গের কোনও অপ্সরা অভিসারে বেরিয়েছিল, অন্ধকারে পথ ভুলে পৃথিবীতে এসে পড়েছে, আর এই ঝড়বৃষ্টির ঠেলায় এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বেচারা মহা ফাঁপরে পড়ে' গেল। দেবী হ'লে পূজা করতে পারত, মানবী হ'লে প্রণয় করতে পারত, কিন্তু অপ্সরাকে নিয়ে সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার মনের ভিতর একদিক থেকে ভক্তি আর একদিক থেকে প্রীতি ঠেলে উঠে পরস্পর লড়াই করতে লাগল।

—কি বললি ভক্তি ও প্রীতি পরস্পর লড়াই করতে লাগল? ও দুই ত একসঙ্গেই থাকে।

—ও দুই শুধু একসঙ্গে থাকে না, একই জিনিস। আমাদের মতে ভক্তি পরাপ্রীতি আর প্রীতি অপরা-ভক্তি।

—মাপ করবেন গোঁসাইজি। ভক্তির জন্ম ভয়ে, আর প্রীতির জন্ম ভরসায়। ও দুই একসঙ্গে ঘর করে বটে, কিন্তু সে বোন্-সতীনের মত।

—ব্রাহ্মণের ছেলেকে ওরকম অকষ্টবদ্ধে ফেলে রাখা ঠিক নয়! অপ্সরাদের প্রতি ভক্তি! রামো, সে ত হবারই জো নেই, তবে প্রণয়ে দোষ কি?

—হুজুর, দোষ কিছু নেই, সম্পর্কে বাধে না। তবে লোকে বলে, অপ্সরার সঙ্গে প্রেম করলে মানুষে পাগল হয়।

—আরে তাতে কি গেল এল? যার সঙ্গেই হোক না, প্রেম করলেই ত মানুষে পাগল হয়।

—কথা ঠিক, কিন্তু সে হচ্ছে একরকম সৌখীন পাগলামি। স্ত্রীলোকের সঙ্গে ভালবাসায় পড়লে লোকে মাথায় মধ্যমনারায়ণ মাখে না, মাখে কুন্তলবৃষ্য। আর অপ্সরার টানে মানুষ হয় উন্মাদ পাগল। তখন স্বর্গে না গেলে আর মানুষের নিস্তার নেই, অথচ সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কি বলেন পণ্ডিত মশায়?

—প্রমাণ ত হাতেই রয়েছে,—বিক্রমোর্ব্বশী।

—শুনলেন হুজুর, পণ্ডিত মশায় কি বললেন? এ অবস্থায়ও ব্রাহ্মণ-সন্তানটিকে কি করে' ভালবাসায় ফেলি?

—তা হ'লে কি গল্প এইখানেই বন্ধ হ'ল?

—আজ্ঞে, তাও কি হয়? যা হ'ল তা শুনুন—

ব্রাহ্মণের ছেলেকে অমন উসখুস করতে দেখে, সেই মূর্ত্তিটিও একটু ভীত ত্রস্ত হয়ে উঠল, অমনি তার কাঁধ থেকে অঞ্চল পড়ল খ'সে। ব্রাহ্মণের ছেলে দেখতে পেলে, তার কাঁধে ডানা নেই, ব্যাপারটা যে কি, তখন আর তার বুঝতে বাকী থাকল না। এখন বুঝুন হুজুর, ওকে দিয়ে প্রণাম করালে কি অনর্থটাই ঘটত? একে তরুণ বয়েস, তাতে আবার হাতের গোড়ায়, পড়ে-পাওয়া ডানাকাটা পরী! তার উপর আবার এই দুর্য্যোগের সুযোগ। এ অবস্থায় পঞ্চতপা ঋষিদেরই মাথার ঠিক থাকে না—ব্রাহ্মণের ছেলে ত মাত্র বালা-যোগী। পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইতে লাগল। ব্রাহ্মণ যুবক সিধে ভাবে, আর যুবতীটি আড়ভাবে। চার চক্ষুর মিলন হবামাত্র সেই সুন্দরীর নয়ন-কোণ থেকে একটি উল্কাকণা খ'সে এসে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখের ভিতর দিয়ে তার মরমে গিয়ে প্রবেশ করলে। ব্রাহ্মণের ছেলের বুক বিলেতি বেদান্ত পড়ে' পড়ে' শুকিয়ে একেবারে সোলার মত চিমসে ও খড়খড়ে হয়ে গিয়েছিল, কাজেই সেই সুন্দরীর চোখের চকমকি-ঠোকা আগুনের ফুলকিটি সেখানে পড়বামাত্র সে বুকে আগুন জ্বলে' উঠল। আর তার ফলে, তার বুকের ভিতর যে ধাতু ছিল, সে সব গলে' একাকার হয়ে উথলে উঠতে লাগল আর অমনি তার অন্তরে ভূমিকম্প হ'তে সুরু হ'ল। তার মনে হ'ল, যেন তার পাঁজরা সব ধসে' যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে' কাঁপতে লাগল, মুখের ভিতর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল, মাথা দিয়ে ঘাম পড়তে লাগল। এক কথায় ম্যালেরিয়া জ্বর আসবার সময় মানুষের যে অবস্থা হয়, তার ঠিক সেই অবস্থা হ'ল। ব্রাহ্মণের ছেলে বুঝলে, তার বুকের ভিতর ভালবাসা জন্মাচ্ছে।

এই বর্ণনা শুনে উজ্জ্বলনীলমণি অত্যন্ত ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বরে বলে উঠলেন—

—আহা! পূর্ব্বরাগের কি চমৎকার বর্ণনাই হ'ল! রসশাস্ত্রে যাকে বলে সাত্ত্বিক ভাব, তার উপমা হ'ল কি না ম্যালেরিয়া-জ্বর। ঘোষাল যখন মধুর রসের কথা পেড়েছিল, তখনই জানি, ও শেষটা বীভৎস রস এনে ফেলবে। আর লোকে বলবে, ঘোষাল কি রসিক!

ঘোষাল এ সব কথার কোন উত্তর না করে' স্মৃতিরত্নের দিকে চাইলে। সে চাউনির অর্থ—মশায় জবাব দিন। স্মৃতিরত্ন বললেন—

—ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাতেই ত চিত্ত প্রকৃতিস্থ থাকে। আর তুমি যাকে সাত্ত্বিকভাব বলছ, সেও ত একটা চিত্তবিকার ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং

ও মনোভাবকে মনের জ্বর বলায় ঘোষাল কি অন্যায় কথা বলেছে?

—পণ্ডিত মশায়, শুধু তাই নয়। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ও জিনিসের আরও অনেক মিল আছে। দুয়ের চিকিৎসাও এক, মধুর রসেরও ওষুধ তিক্ত রস। তত্ত্বকথার কুইনিন্ খাওয়ালে ভালবাসা মানুষের মন থেকে পালাতে পথ পায় না।—

দেওয়ানজি এ কথার প্রতিবাদ করে' বল্‌লেন—কুইনিনে বুঝি জ্বর ছাড়ে? শুধু আটকে দেয়। শিশি শিশি কুইনিন গিলেছি, কিন্তু আমার পিলে—

রায় মহাশয় এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিলেন। উজ্জ্বলনীলমণি ও স্মৃতিরত্নের কথায় তিনি কাণ দেন নি, কিন্তু দেওয়ানজির কথাটি তাঁর কাণে পৌঁছেছিল। তিনি মহা গরম হয়ে বল্‌লেন—

—চুপ করো হে দেওয়ানজি, তোমার পিলে কত বড় হয়ে উঠেছে, সে কথা শুনে শুনে আমার কাণ পচে গেল। ঘোষালের যে যকৃৎ শুকিয়ে যাচ্ছে, কৈ, ও ত তা নিয়ে রাত নেই দিন নেই যার তার কাছে নাকে কাঁদতে বসে না। পিলে-যকৃতের চাইতে যা দশগুণ বেশি সাংঘাতিক, তাই হয়েছে ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের,—হৃদ্‌রোগ। ও-যে কি ভয়ানক রোগ, তা আমি ভুগে ভুগে টের পেয়েছি। সে যা হোক, ঘোষাল যে একটা ব্রাহ্মণের ছেলেকে রাত-দুপুরে একটা তেপান্তর মাঠের ভিতর একটা মন্দিরের মধ্যে একটা মেয়ের হাতে স'পে দিলে, অথচ তার কে বাপ, কে মা, কি জাত, কি গোত্র জানা নেই; সে বিষয়ে দেখছি তোমাদের কারও খেয়াল নেই। হ্যাঁ দেখ্ ঘোষাল, তুই ব্রাহ্মণের ছেলের জাত মারবার আচ্ছা ফন্দি বার করেছিস! উজ্জ্বলনীলমণি যে বলেছিল তোর ধর্ম্মজ্ঞান নেই, এখন দেখছি, সে কথা ঠিক।

—আজ্ঞে, সে কথা আমি অন্য সূত্রে বলেছিলুম। যা ঘটনা হয়েছে, তাতে ঘোষালের দোষ নেই। পূর্ব্বরাগ ত আর জাত বিচার করে' হয় না। এ বিষয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন, "পানি পিয়ে পিছু জাতি বিচারি"—

—বটে! তবে যাও মুসলমানের ঘরে খাও পানি—বদনায় করে'। তার পরে এখানে একবার জাত বিচার করতে এসে দেখো কি হয়।

—হুজুর, গোঁসাইজি কথা ঠিকই বলেছেন, শুধু একটা কথায় একটু ভুল করেছেন। "পানি" না বলে' ব্রাণ্ডিপানি বললে আর কোনও গোলই হ'ত না। জল অবশ্য যার তার হাতে খাওয়া যায় না, কিন্তু মদ সকলের হাতেই খাওয়া যায়। আর ভালবাসা জিনিষটে ত দুনিয়ার সেরা মদ।

—তোর দেখছি হতভাগা শুঁড়িখানা ছাড়া আর কোথায়ও উপমা জোটে না। তোরা দুটোয় মিলেছিস ভাল। একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ। একে ঘোষাল মূলগায়েন, তার উপর আবার উজ্জ্বলনীলমণি দোহার। এ বিষয়ে আমি পণ্ডিত মহাশয়ের মত শুন্‌তে চাই, তোদের কথা শুনতে চাই নে।

—অজ্ঞাত-কুলশীলার প্রতি ভালবাসার ঐরূপ আচম্বিতে জন্মলাভটা স্মৃতির হিসেবে নিন্দনীয়, কিন্তু কাব্যের হিসেবে প্রশস্ত। শকুন্তলা, দময়ন্তী, মালবিকা, বাসবদত্তা, রত্নাবলী, মালতী প্রভৃতি সব নায়িকারই ত—

—তা হ'লে কি আপনি বলতে চান, স্মৃতির ধর্ম্ম এক আর কাব্যের ধর্ম্ম আলাদা?

—আজ্ঞে, তা ত হবেই। স্মৃতির কারবার মানুষের জীবন নিয়ে আর কাব্যের কারবার তার মন নিয়ে।

—কাব্যের শিক্ষা আর স্মৃতির শিক্ষা যদি উল্‌টো হয়, তা হ'লে মানুষে কোন্‌টা মেনে চলবে?

—দুটোই। কাজকর্ম্মে স্মৃতি আর লেখাপড়ায় কাব্য।

—দেখুন রায় মহাশয়, ঐখানেই ত স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল। আমরা বলি রস এক—তা সে জীবনেরই হোক আর কাব্যেরই হোক।

—তা হ'লে আপনারা কি চান যে, গল্পটা হোক জীবনের মত আর জীবনটা হোক গল্পের মত?

—আজ্ঞে, তা নয় হুজুর। ভট্টাচার্য্য-মতে, জীবনে ফেন ফেলে দিয়ে ভাত খেতে হয় আর কাব্যে ভাত ফেলে দিয়ে ফেন খেতে হয়, কিন্তু গোস্বামি-মতে কি জীবনে কি কাব্যে একমাত্র গলা ভাতেরই ব্যবস্থা আছে।

—তুমি থামো ঘোষাল, এ সব বিষয়ে বিচার করবার অধিকার তোমার নেই। পরিণামবাদ কাকে বলে যদি বুঝতে……

—ঘোষাল তা না বুঝতে পারে, কিন্তু অপরিণামবাদ কাকে বলে, তা বুঝলে আপনি ও-সব বাক্য মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতেন না। অলঙ্কার-শাস্ত্র যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সিংহাসন অধিকার করে, তা হ'লে তার পরিণাম সমাজের পক্ষে কি ভীষণ হয়, ভেবে দেখুন ত!

—ঠিক বলেছেন পণ্ডিত মশায়, উনি কাব্যে ও সমাজে ভেস্তে দিতে চান যে, দুয়ের প্রভেদ আকাশ-পাতাল। সমাজে হয় আগে বিয়ে, পরে সন্তান, তার পরে মৃত্যু; আর কাব্যে হয় আগে ভালবাসা, তার পর হয় বিয়ে, নয় মৃত্যু। এক কথায় মানুষের জীবনে যা হয়, তার নাম প্রাণান্ত! কাব্য কিন্তু হয় মিলনান্ত, নয় বিয়োগান্ত; হয় ঘটক, নয় ঘাতক হওয়া ছাড়া কবিদের আর উপায় নেই।

—তা হ'লে তুই দেখছি ঐ ব্রাহ্মণের ছেলের হয় জাত মারবি, নয় প্রাণ মারবি।

—আজ্ঞে, প্রাণে মারতে পারি, কিন্তু জাত কিছুতেই মারব না। হুজুরের কাছে গল্প বল্‌ছি, আর আমার নিজের প্রাণের ভয় নেই?

—দেখ্, তোকে আগেই বলেছি, ব্রহ্মহত্যা কিছু-তেই হ'তে দেব না।

—আজ্ঞে, যদি আথেরে মাথায় বাজ পড়ে' লোকটা মারা যায়, সেও কি আমার দোষ?—এ দুর্য্যোগ কি আমি বানিয়েছি?

—কি বললি? ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু, মন্দিরের ভিতরে আর আমার সুমুখে, বেটা আজ গাঁজা টেনে এসেছিস বুঝি! যেমন করে' পারিস, মিলনান্ত করতেই হবে—বিয়োগান্ত কিছুতেই হ'তে দেব না।

—আজ্ঞে, আমিও ত সেই চেষ্টায় আছি। তবে ঘটনাচক্রে কি হয়, তা বল্‌তে পারি নে। একটা কথা আপনার পা ছুঁয়ে বলছি, যেমন করেই হোক, আমি ওর জাত আর প্রাণ—দু-ই টিঁকিয়ে রাখব, তার পর যা হয়। হুজুর আমার বেয়াদবি মাপ কর-বেন, যদি একটু ধৈর্য্য ধরে' না থাকেন, তা হ'লে গল্প এগুবে কি করে', আর যদি না এগোয় ত তার অন্তই বা হবে কি করে'।

—আচ্ছা বলে' যা।

—তবে শুনুন।

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রথমটা যতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে-ছিল, শেষে আর ততটা থাকল না। সব বিপদের মত ভালবাসার প্রথম ধাক্কাটা সামলানো মুস্কিল, তার পর তা সয়ে আসে। ক্রমে যখন তার জ্ঞানচৈতন্য ফিরে এল, তখন সে সে মেয়েটিকে ভাল করে' খুঁটিয়ে দেখতে লাগলে। প্রথমেই তার চোখে পড়ল যে, মেয়েটির মাথার চুল কপালের উপর চূড়ো করে' বাঁধা, আমাদের মেয়েরা নেয়ে উঠে চুল যেমন করে' বাঁধে, তেমনি করে', বোধ হয় চুল ভিজে গিয়েছিল বলে'। তার পর চোখে এসে ঠেকল তার গড়ন। সে অঙ্গ-সৌষ্ঠবের কথা আর কি বলব। তার দেহটি ছিল তার চোখের মত লম্বা, তার নাকের মত সোজা আর তার ঠোঁটের মত পাতলা। কিন্তু বেচারি ভিজে একেবারে সপসপে হয়ে গিয়েছিল। তার শাড়ী চুঁইয়ে দরবিগলিত ধারে জল পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন তার সর্ব্বাঙ্গ রোদন করছে। এই দেখে ব্রাহ্মণের ছেলের ভারি মায়া হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরও আত্মাপ্রাণী কাঁদতে সুরু করে' দিল।

"—চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—কি? কি? উজ্জ্বলনীলমণি আবার কি বলে?

—হুজুর, গোঁসাইজির ভাব লেগেছে, তাই ইনি পদাবলী আওড়াচ্ছেন। উনি বলছেন—

"—চলে নীলশাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

—ঘোষাল! মেয়েটার পরণে কি রঙের শাড়ী ছিল রে?

—হুজুর, লাল।

—আঃ! ঐ এক কথায় সব মাটি করলে হে!

"চলে লাল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।"

বললে ও কবিতার আর থাকে কি? আর যার তুল্য কবিতা ভূ-ভারতে কখনো হয়ও নি, হবেও না, তারই কি না জান্ মেরে দিলে?

—গোঁসাইজি গোসা করছেন কেন? আমি যে রঙ চড়িয়েছি। তাতেই তো উপমা মেলে। মানুষের পরাণ যদি কেউ নিঙড়ায়, তা হ'লে তা থেকে যা বেরোবে, তার রঙ ত লাল। তবে বল্‌তে পারিনে, হ'তে পারে যে, কারও কারও রক্তের রঙ ও চামড়ার রঙ এক—ঘোর নীল।

—নাই পেয়ে পেয়ে এখন দেখছি তুমি ভদ্র-লোকের মাথায় চড়ছ।

—রাগ করেন কেন মশায়। কোনও সাহেবকে যদি বলা যায় যে, তোমার গায়ের রক্ত নীল, তা হ'লে ত সে না চাইতে চাকরি দেয়।

আবার একটা বকাবকির সূত্রপাত দেখে রায় মহাশয় হুঙ্কার ছেড়ে বললেন,—

—যদি কথায় কথায় তর্ক তুলিস, তা হ'লে রাত দুপুরেও গল্প শেষ হবে না—আর তুই ভেবেছিস, এইখানেই আজ রাত কাটাব?

—হুজুর, তর্ক আমি করি? আমি একজন গুণী লোক—নভেলিষ্ট। কথায় বলে, যাদের আর গুণ নেই, তাদের ছার গুণ আছে। যারা গল্প করতে পারে না তারাই ত তর্ক করে।

—ভারি গুণী! কি চমৎকার গল্পই বলছেন!

—বটে! আমি এইখান থেকেই ছেড়ে দিচ্ছি, আপনি গোঁসাইজি, তার পর চালান দেখি ত কতক্ষণ চালাতে পারেন, হুজুরের এক প্রশ্নের ধাক্কাতেই উল্টে চিৎপাত হয়ে পড়বেন—

—ওরে ঘোষাল, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছিস। আমার আর একটা প্রশ্ন আছে, মেয়েটার বয়স কত?

—উনিশ কি বিশ।

—সধবা কি বিধবা?

—কুমারী। কাব্যে হুজুর কুমারী ছাড়া আর কিছু ত চলে না।

—আমাকে বোকা পেয়েছিস না খোকা পেয়েছিস্? ছ-ছেলের মা'র বয়েসী, আর তিনি হলেন কুমারী? বাঙালীর ঘরে কোথায় এত বড় আইবুড়ো মেয়ে দেখেছিস বল ত?

—হুজুর, মেয়েটি ত বাঙালী নয়—হিন্দুস্থানী।

—যেই একটা মিথ্যা কথা ধরা পড়েছে, অমনি আর একটা মিথ্যে কথা বানাচ্ছিস। কোথাও কিছু নেই, বলে' দিলি হিন্দুস্থানী!

—হুজুর, তার গায়ে ঝুলছিল সলমাচুমকির কাজ-করা ওড়না, আর তার শাড়ীর সুমুখে ঝুলছিল কোঁচা।

—হোক না হিন্দুস্থানী। হিন্দুস্থানীও ত হিন্দু; আর তোদের চাইতে ঢের পাকা হিন্দু। তাদের মেয়েদের পেটে থাকতেই পাত্র ঠিক ও পত্র হয়ে যায়। জানিস, দুধের দাঁত পড়বার আগে মেয়ের বিয়ে না হ'লে তাদের জাত যায়? কোন্ হিন্দুস্থানী হিঁদুর বাড়ীতে অত বড় মেয়ে আইবুড় দেখেছিস বল্ ত গাধা!

—হুজুর, মেয়েটা হিঁদু নয়, মুসলমান।

—কি বল্লি? মুসলমান? হিন্দুর মন্দিরে যেখানে শূদ্রের প্রবেশ নিষেধ, সেইখানে রাসকেল মুসলমান ঢুকিয়েছিস! মন্দির অপবিত্র হবে, ব্রাহ্মণের ছেলের জাত যাবে, কি সর্ব্বনাশের কথা! লক্ষ্মীছাড়িকে এখনি মন্দির থেকে বার করে' দে!

—হুজুর, এই দুর্য্যোগের মধ্যে—.

—দুর্য্যোগ ফুর্য্যোগ জানি নে, এই মুহূর্ত্তে ঐ মুসলমানীকে দে অর্দ্ধচন্দ্র।

—হুজুর, বাইরে ত দেবতা অপ্রসন্ন আর ভিতরেও যদি দেবতা আশ্রয় না দেন ত বেচারা যায় কোথায়? হোক না মুসলমান, মানুষ ত বটে, আমাদের মত ওরও রক্ত-মাংসের শরীর।

—খোপ্‌সুরতি দেখে বেটার ধর্ম্মজ্ঞান লোপ পেয়েছে! আমার হুকুম মানবি কি না বল্? হয় ওকে মন্দির থেকে বার কর্, নয় তোকে ঘর থেকে বার করে' দিচ্ছি,—এই জমাদার! ইস-কো গরদান পাকড়কে নিকাল দেও!

—হুজুর, একটু সবুর্ করুন। হুজুরের হুকুম তামিল না করতে হ'লে আমাকে কি আর এতটা বেগ পেতে হ'ত? ওকে কি আমাকে কাউকে গরদানি দিতে হবে না। মেয়েটি হিন্দুস্থানীও নয়, মুসলমানীও নয়, বাঙালী কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে।

—আবার মিথ্যে কথা? কুলীনের মেয়ে গায়ে ওড়না ওড়ে আর কোঁচা দিয়ে শাড়ী পরে?

—হুজুর, ও আমার দেখবার ভুল। শাড়ীটে ভিজে সুমুখের দিকে জড় হয়ে গিয়েছিল, তাই দেখাচ্ছিল যেন কোঁচা, আর গায়ে ছিল চেলির চাদর, তাই ওড়না বলে' ভুল করেছিলুম।

—এই যে বললি সলমা-চুমকির কাজ করা?

—হুজুর, ঐ চাদরের উপর গোটাকতক জোনাকি বসেছিল, তাই চুমকির মত দেখাচ্ছিল।

—তাই বল্। আঃ বাঁচা গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল!

—হুজুর, আপনার না হোক, আমার ত তাই। জমাদারের নাম শুনে ভয়ে ত আমার পাঁচ-প্রাণ দশদিকে উড়ে গেছল। ভুল করে' একটা কথা······

—অমন ভুল করিস কেন?

—হুজুর, অমন ভুল অনেক বড় বড় কবিরাও করেন, আমি ত কোন্ ছার, তবে তাঁদের বেলায় সে সব ছাপার ভুল বলে' পার পেয়ে যায়।

—সে যাই হোক। ঘোষাল এতক্ষণে গল্পটা বেশ গুছিয়ে এনেছে। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে এতদিন বিয়ে হয় নি, শেষটা ভগবানের অনুগ্রহে কেমন বর জুটে গেল। একেই ত বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। ঘোষাল, তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তুই যে খালি ব্রাহ্মণের ছেলের জাত বাঁচিয়েছিস, তাই নয়—ব্রাহ্মণের মেয়ের বাপেরও জাত বাঁচিয়েছিস্। এখন নিশ্চিন্ত মনে গল্প বলে' যা। কি খেয়ে গল্প বলিস্, বল্ ত? এবার তোকে বিলেতি খাওয়াব।

—হুজুরের প্রসাদ চরণামৃত জ্ঞানে পান করব,

তার পরে মুখ দিয়ে বেরবে অনর্গল বিলেতি গল্প। এখন যা হ'ল, শুনুন।—

ভালবাসা জিনিসটে অন্তত কাব্যে একটা সংক্রামক ব্যাধি। কবিরা একজনের মনের সিগারেট থেকে আর একজনের মনের সিগারেট ধরিয়ে নেন। কাব্যের এ হচ্ছে মামুলি দস্তুর। তাই আমাকে বলতেই হবে যে, ব্রাহ্মণের ছেলের ভালবাসার ছোঁয়াচ লেগে সেই কুলীন-কুমারীর মনে শ্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে ভালবাসার রং ধরতে সুরু করলে।

—কি বল্‌লি? শ্যাম্পেনের নেশার মত আস্তে আস্তে? গাছে না উঠতেই এক কাঁদি! বিলেতির নাম শুনেই অজ্ঞান হয়েছিস্ আর বেফাঁস বকছিস। বেটা খাঁটির খদ্দের, শ্যাম্পেনের গুণাগুণ তুই কি জানিস্? পোর্ট বল্, ক্লারেট বল্, জিন্ বল্, রম্ বল্, হুইস্কি বল্, ব্রাণ্ডি বল্,—আমার ত আর কিছু জানতে বাকি নেই। শ্যাম্পেনের নেশা হয় ধরে না, নয় চট্ করে' মাথায় চড়ে' যায়। ভালবাসার নেশা যদি আস্তে আস্তে চড়াতে চাস্ ত সেরীর সঙ্গে তুলনা দে,—গেলাসের পর গেলাসে যা রেস্তার গাঁথুনি গেঁথে যায়!

—হুজুর ঠিক বলেছেন, মেয়েমানুষের মনে ভালবাসা আস্তে আস্তে বাড়ে বটে, কিন্তু তার বনেদ খুব পাকা হয়। ওদের মনে ও-বস্তু একবার শিকড় গাড়লে তা আর উপড়ে ফেলা যায় না, কেননা, সে শিকড় শুধু ভিতরের দিকেই ডুব মারে। কিন্তু হুজুর এইখানে একটু মুস্কিলে পড়েছি। স্ত্রীলোকের ভালবাসা বর্ণনা করা যায় না, কেন না, তার কোন বাইরের লক্ষণ দেখা যায় না; আর যদি দেখা যায়, তা হলেই বুঝতে হবে, সে সব হাবভাব, ভিতরে সব ফাঁকা।

—তবে কি ওদের মনের কথা জানবার যো নেই?

—আমি ত তা বলি নি, আমি বলছি জানা দুঃসাধ্য, কিন্তু অসাধ্য নয়। ওদের মুখ ওদের বুকের আয়না নয়। যেমন পুরুষের পাণ্ডুরোগ, তেমনি স্ত্রীলোকের হৃদয়রোগ ধরা পড়ে চোখে, এখানেও মেয়েটা ঐ চোখেই ধরা দিলে। কি হ'ল শুনুন।

তার চোখের ভিতর একটা অতি ঢিমে অতি ঠাণ্ডা আলো ফুটে উঠল। কিন্তু সে আলো বিদ্যুতের। সে বিদ্যুৎ, স্ত্রী-বিদ্যুৎ বলে' অত ঠাণ্ডা। সেই স্ত্রী-বিদ্যুতের টানে ব্রাহ্মণের ছেলের চোখ থেকে পুং-বিদ্যুৎ ছুটে বেরিয়ে এল, তার পর সেই দুই বিদ্যুৎ মিলে লুকোচুরি খেলতে লাগল।

"নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ।"

—উজ্জ্বলনীলমণি আবার কি বলে হে?

—আজ্ঞে, ওঁর ভাবোল্লাস হয়েছে তাই উনি আখর দিচ্ছেন।

—আখরই দিন আর যাই দিন, আমি বলে' রাখছি যে, আখেরে ঐ "নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাসের" বেশি আর আমি যেতে দেবো না।

—আজ্ঞে, এর একটা তো আর একটার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

—রাখো হে তোমার পরিণামবাদ, অমন ঢের ঢের দর্শন দেখেছি।

—হুজুর, গোঁসাইজির কথা শুধু দর্শন নয়, বিজ্ঞানসম্মতও বটে। কোন বস্তুর ভিতর বিদ্যুৎ সেঁধুলে তা আপনি হয়ে উঠে চুম্বক।

—বটে! হতভাগারা মরবার আর জায়গা পেলে না। দেবমন্দিরকে করে' তুললে একটা কুঞ্জবন। যেমন আক্কেল ঘোষালের, তেমনি উজ্জ্বলনীলমণির, এখন দেখছি, এ দুটো মাসতুতো ভাই।

—হুজুর, বড় বড় কবিরাও এ কাজ পূর্ব্বে করে' গিয়েছেন।

—সত্যি নাকি পণ্ডিত মশায়?

—আজ্ঞে আমি ত কোন সংস্কৃত কাব্যে দেখি নি যে, দেবালয় হয়েছে প্রেমের রঙ্গালয়।

—আমাদের পদাবলীতেও ও সব ব্যাপার-মন্দিরের বাইরেই ঘটে। বিদ্যাপতি ঠাকুর বলেছেন, "যব গোধূলি সময় ভেলি ধনী মন্দির বাহির ভেলি।"

—ঘোষাল নিজে করবি কুকীর্ত্তি, আর বড় বড় কবিদের ঘাড়ে চাপাবি দোষ।

—হুজুর, আমি মিথ্যে কথা বলি নি, বাঙলার বড় বড় লেখকেরা এ কাজ না করলে আমার কি সাহস যে, আমি আগে ভাগেই তা করে' বসব, আমি ত একজন ছোট গল্পকার। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" হিসেবেই আমি চলি।

—বাঙলা আবার ভাষা, তার আবার লেখক, তার আবার নজির। মন্দিরের ভিতর আমি মধুর রসের চর্চ্চা আর বেশি করতে দেব না, কে জানে তোদের হাতে পড়ে' সে রস কতদূর গড়াবে।

—তা হ'লে বলি হুজুর, ওটা আসলে মন্দির নয়, ভোগের দালান।

—আবার মিথ্যে কথা, এই হাজার বার বল্‌ছিস্ মন্দির, আর এখন বল্‌ছিস্ ভোগের দালান।

—হুজুর, মন্দির হ'লে আর তার ভিতর ঠাকুর থাকত না? আগেই ত বলেছি যে, সেখানে একটি ছাড়া দুটি মূর্ত্তি ছিল না।

—তাও ত বটে। খুব ডিগ্‌বাজি খেতে শিখেছিস্। তুই আর জন্মে ছিলি গেরবাজ।

—হুজুরের কৃপায় এখন লোটন না হলেই বাঁচি।

—আচ্ছা যাক, এখন তুই গল্প বলে' যা, এতক্ষণে জমেছে।

—হুজুর, তার পর—

ব্রাহ্মণ সন্তানটি এমনি স্নেহভরে ব্রাহ্মণ-কন্যাটির দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল যে, তার গায়ে সাত্ত্বিকভাবের লক্ষণগুলি সব ফুটে উঠল। তার কপাল বেয়ে ঘামের সঙ্গে সীঁথের সিঁদুর গলে' তার ঠোঁটের উপর পড়ল আর তার অধর পান-খাওয়া ঠোঁটের মত লালটুকটুকে হয়ে উঠল।

—রোস্ রোস্, সিঁদুরের কথা কি বললি?

—কই হুজুর, সিঁদুরের নামও ত ঠোঁটে আনি নি!

—উঃ, তুই কি ঘোর মিথ্যাবাদী! সিঁদুর শুধু নিজের ঠোঁটে আনিস নি, ওর ঠোঁটেও মাখিয়েছিস।

—তা হ'লে হুজুর, ও মুখফস্কে হয়ে গেছে।

—ও সব জুয়োচ্চুরি কথা আর শুনছি নে। একটা সধবাকে রাসকেল আমাকে ঠকিয়ে কুমারী বলে' চালিয়ে দিচ্ছিল।

—আজ্ঞে, সধবাই যদি হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি?

—কি বললে উজ্জ্বলনীলমণি, ক্ষতি কি?

—আজ্ঞে, আমি বলছিলুম কি, নায়িকা ত পরকীয়াও হয়—

এ কথা শুনে সভাশুদ্ধ লোক একবাক্যে ছি ছি করে' উঠল। উজ্জ্বলনীলমণি তাতে ক্ষান্ত না হয়ে বললেন—

—হয় কি না হয়, তা বিবর্ত্তবিলাস, মীরাবাইয়ের কড়চা প্রভৃতি পড়ে' দেখুন, এমন কি, কবিরাজ গোস্বামী পর্য্যন্ত......

এই কথায় একটা মহা হৈ-চৈ পড়ে' গেল, সকলে একসঙ্গে কথা বল্‌তে সুরু কর্‌লে—কেউ কারও কথায় কাণ দিতে রাজি হল' না। উজ্জ্বলনীলমণি তাঁর মিহি মেয়েলি গলা তারায় চড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন। "পিকোলার" আওয়াজ যেমন ব্যাণ্ডের গোলমালকে ছাড়িয়ে ওঠে, তাঁর আওয়াজও এই হৈ-চৈ-এর উপরে উঠে গেল। সকলে শুনতে পেলে, তিনি বলছেন—

—আগে আমার কথাটা শেষ করতে দিন, তার পর যত খুসি চেঁচামেচি করবেন। স্বকীয়া ত পদকর্ত্তাদের মতে "কর্ম্মী নারী"—সে না হ'লে সংসার চলে না; কিন্তু রসসাহিত্যে তার স্থান কোথায়? দেখান ত পদাবলীতে.......

—রক্ষা করুন গোঁসাইজি, থামুন, আপনার ও সব মত এখানে চলবে না, আপনার পাস-করা শিষ্যেরা হ'লে ওর যা হয় তা একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বার করতে পারত, কিন্তু দেখছেন না, পণ্ডিত মশায় রাগ করে' উঠে যাচ্ছেন। আপনার পাপের বোঝা আমার ঘাড়ে নিতে আমি মোটেই রাজি নই। দাঁড়ান পণ্ডিত মশায়। ব্যাপারটা কি, তা না বুঝেই আপনারা সব চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। আসলে ঘটনা এই যে, মেয়েটি সধবা বটে, কিন্তু পরকীয়া নয়।

—তুই দেখছি বেটা একেবারে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিস, যা মুখে আসছে, তাই বলছিস। স্ত্রীলোকটা হ'ল সধবা অথচ কারও স্ত্রী নয়। এমন অসম্ভব কাণ্ড মগের মুলুকেও হয় না।

—হুজুর, আমি মিছে কথা বলি নি। মেয়েটির বিয়ে হয়েছিল বটে, কিন্তু দশ বৎসর স্বামী নিরুদ্দেশ। আর সে যখন স্বামীর পথ চেয়ে বসে' বসে' শেষটা হতাশ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছে—তখন তাকে বে-ওয়ারিশ হিসেবেই ধরতে হবে।

—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে"—এ বচন শাস্ত্রে থাকলেও কাব্যে নাই। একালে ও সব কথা মুখে আনতে নেই, কেননা, তা শুনে অর্ব্বাচীনদের মতিভ্রম হ'তে পারে। আজ যদি তোমরা ও সব কাব্যে চালাও, দুদিন পরে তা সমাজে চলবে, তার পর সব অধঃপাতে যাবে। দেখো ঘোষাল, তুমি আমার অতিশয় প্রিয়পাত্র, পুত্রতুল্য, কেননা, তোমার নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি আছে; কিন্তু রঙ্গরসের ভূত যখন তোমার ঘাড়ে চাপে, তখন তুমি এত প্রলাপ বকো যে, প্রবীণ লোকের পক্ষে সে ক্ষেত্রে তিষ্ঠোনো ভার। আজ যে রকম উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিচ্ছ, তাতে আমি তোমাকে ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি।

এই বলে' পণ্ডিত মশায় ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বিকচ্ছ হওয়ায় তাঁর গতিরোধ

হ'ল। এই সুযোগে ঘোষাল তাঁর কাছে জোড়হস্তে নিবেদন করলে—

—আপনি আমার ধর্ম্ম-বাপ। আপনার পায়ে ধরি' আমাকে বিনা অপরাধে ত্যজ্যপুত্র করে' চলে' যাবেন না। এতটা উতলা হবার কোনই কারণ নেই। সীঁথেয় সিঁদুর থাকলেই যে সধবা হতেই হবে, এমন ত কোন কথা নেই। ও মেয়েটি ছিল ভৈরবী, তাই না তার মাথায় ছিল রুলি।

এ কথা শুনে সভা আবার শান্ত হ'ল, স্মৃতিরত্ন তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। রায় মহাশয় কিন্তু খাড়া হয়ে বসে' বজ্র-গম্ভীর স্বরে বললেন—

—ঘোষাল, তোর গল্প বন্ধ কর্, নইলে কত যে মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবি, তার আর আদি অন্ত নেই। আজ তোর ঘাড়ে রসিকতার নয়, মিথ্যে কথার ভূত চেপেছে, ঝাঁটা দিয়ে না ঝাড়লে তা নামবে না।

—হুজুর, আমার একটি কথাও মিছে নয়। ভৈরবী না হ'লে কি গেরস্তর ঝি-বউ লাল শাড়ী পরে, লাল দোপাট্টা ওড়ে, কাছা কোঁচা দেয়, মাথার চুল চুড়ো করে' বাঁধে, এক কপাল সিঁদূর লেপে—

—হোক না ভৈরবী, তাতেই তুই বাঁচিস কি করে'? ভৈরবীর আবার প্রেম কি রে—

—হুজুর, এতক্ষণই যদি ধৈর্য্য ধরে' থাকলেন, তবে আর একটু থাকুন। গল্পের শেষটা শুনলে আপনি নিশ্চয় খুসি হবেন। শুনুন—

ঐ ভৈরবীটি আর কেউ নয়, ঐ ব্রাহ্মণের ছেলেরই স্ত্রী। ভদ্রলোক দশ বৎসর নিরুদ্দেশ হয়েছিল। দেশের লোক বললে, তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু পতিপ্রাণা রমণী সে কথায় বিশ্বেস করলে না। "আমার সীঁথের সিঁদূরের যদি জোর থাকে, তবে আমার হাতের লোহা নিশ্চয়ই ক্ষয় যাবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, আমার স্বামী হয়েছেন স্বামীজি।" এই বলে' সে স্বামীর সন্ধানে ভৈরবী সেজে বেরিয়ে পড়ল। ভগবানের ইচ্ছায় এই পুণ্যস্থানে দুজনের আবার মিলন হ'ল। স্ত্রী স্বামীকে দেখামাত্রই চিনতে পেরেছিল; কারণ, এই দশ বৎসর শয়নে স্বপনে সে ঐ মূর্ত্তিই ধ্যান করেছিল। কিন্তু স্বামী তাকে চিনতে পারে নি দেখে সে স্বামীকে একটু খেলিয়ে সন্ন্যাসের ঘোলাজল থেকে গার্হস্থ্যের শুকনো ডাঙ্গায় তোলবার মতলবে এতক্ষণ জড়সড় হয়ে ও মুড়িসুড়ি দিয়ে ছিল। তার পরে যখন সে চাদরখানি মাথা থেকে ফেলে দিয়ে সটান এসে স্বামীর সুমুখে দাঁড়াল, তখন ব্রাহ্মণসন্তান বুঝতে পারল "এই সেই"; অমনি সেই বৈদান্তিক-শাক্ত "তত্ত্বমসি" বলে' ছুটে তাকে আলিঙ্গন করতে গিয়ে হাতের মধ্যে কিছু পেলে না, শুধু দেয়ালে তার মাথা ঠুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা দমকা হাওয়ায় মন্দিরের দুয়োর খুলে গেল আর তার ভিতরে ভোরের আলোয় দেখা গেল, মন্দির একেবারে শূন্য।

—এ আবার কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটালি!

—হুজুর ভূতের গল্প শুনতে চেয়েছিলেন, তাই শুনালুম।

বলা বাহুল্য, ঘোষালের হাতে গল্পের এইরূপ অপমৃত্যু ঘটায়, সব চেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন উজ্জ্বল-নীলমণি। তিনি দাঁত-খিচিয়ে বললেন—

—ভূতের গল্প না তোমার মাথা! পেত্নীর গল্প!

এই সময় বাড়ীর ভিতর থেকে খবর এলো যে, মা-ঠাকুরাণীর মাথা ধরেছে। রায় মহাশয় অমনি হুড়মুড় করে' উঠে ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর পঁয়ষট্টি বৎসরের ভোগায়তন দেহের বোঝা কায়-ক্লেশে অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সভাও সেদিনকার মত ভঙ্গ হ'ল।

চৈত্র, ১৩২৪।

ছোট গল্প

আমরা পাঁচজনে মিলে, এই যুদ্ধ নিয়ে বাগ্‌-যুদ্ধ করছিলুম। সুপ্রসন্ন হঠাৎ তর্কে ক্ষান্ত দিয়ে, একখানি বাঙলা বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন। আমরা তাঁর পড়ায় বাধা দিলুম না। আমরা জানতুম যে, তাঁর সঙ্গে কারও মতের মিল হচ্ছে না বলে' তিনি বিরক্ত হয়েছেন। এ অবস্থায় তাঁকে ফের আলোচনার ভিতর টেনে আনতে গেলে, তিনি মহা চটে' যেতেন। আমি বরাবর লক্ষ্য করে' আসছি যে, এই যুদ্ধ নিয়ে কথা কইতে গেলেই নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তির অন্তরেও বীররসের সঞ্চার হয়, শেষটা তর্ক একটা মারামারি ব্যাপারে পরিণত হয়। সুতরাং আমি কথাটা উল্টে নেবার মনে মনে একটা সদুপায় খুঁজ ছি, এমন সময় সুপ্রসন্ন হঠাৎ আবার বইখানা টেবিলের উপর সজোরে নিক্ষেপ করে' বলে' উঠলেন—Nonsense!

কথাটা এত চেঁচিয়ে বললেন, যে তাতে আমরা সকলেই একটু চমকে উঠলুম।

আমি বল্লুম, "কি nonsense হে?" সুপ্রসন্ন বললেন—

—"তোমাদের এই বাঙলা বইয়ে যা লেখা হয়, তাই। সাধে ভদ্রলোকে বাঙলা পড়ে না। এই বইখানা খুলেই দেখি, লেখক বলছেন, ছোট গল্প প্রথমত ছোট হওয়া চাই, তার পর তা গল্প হওয়া চাই। কি চমৎকার definition' এর পরেও লোকে বলে বাঙালীর শরীরে লজিক নাই!"

অনুকূল এই শুনে একটু হেসে উত্তর করলেন,—

—"ওহে, অত চটো কেন? দেখছ না, লেখক নিজের নাম রেখেছেন, 'বীরবল'। ঐ থেকেই তোমার বোঝা উচিত ছিল যে, ও হচ্ছে রসিকতা।"

—"তোমরা যাকে বলো রসিকতা, আমি তাকেই বলি nonsense. একটা জোড়া কথাকে ভেঙ্গে বলায় মানুষে যে কি বুদ্ধির পরিচয় দেয়, তা আমার বুদ্ধির অগম্য।"

এ শুনে প্রশান্ত আর চুপ করে' থাকতে পারলেন না। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন,—

—"তোমার বুদ্ধির অগম্য হলেই যে তা' আর সকলের বুদ্ধির অগম্য হ'তে হবে, এমন কোনও কথা নেই। বীরবলের ও কথা nonsense-ও নয়, রসিকতাও নয়—ষোল আনা সাচ্চা কথা।"

যে যা বলত, প্রশান্ত তার প্রতিবাদ করত, এই ছিল তার চিরকেলে স্বভাব। সুতরাং সে সুপ্রসন্ন ও অনুকূল দুজনের দ্বিমতকে এক বাণে বিদ্ধ করায়, আমরা মোটেই আশ্চর্য্য হলুম না। বরং নিজের মতকে সে কি করে' প্রতিষ্ঠা করে, তাই শোনবার আগ্রহ আমার মনে জেগে উঠল। তর্কের মুখে প্রশান্ত অনেক নতুন কথা বল্‌ত। তাই আমি বল্লুম—

—"দেখো প্রশান্ত, রসিকতাকে যে সত্য কথা মনে করে, রসজ্ঞান তারও নেই।"

পিঠ পিঠ জবাব এলো—

—"সত্য কথাকে যে রসিকতা মনে করে, সত্য-জ্ঞান তারও নেই।"

—"মানলুম। তার পর ওর সত্যিটি কোনখানে, বুঝিয়ে দাও ত হে?"

—"বীরবলের কথাটা একবার উল্টে নেওয়া যাক্। তা হ'লে দাঁড়ায় এই যে—'ছোট গল্প হচ্ছে সেই পদার্থ, যা প্রথমত ছোট নয়, দ্বিতীয়ত গল্প নয়। তা যদি হয় ত, Kant-এর 'শুদ্ধবুদ্ধির সুবিচার'ও ছোট গল্প'।"

এ কথা শুনে আমরা অবশ্য হেসে উঠলুম, কিন্তু সুপ্রসন্ন আরও অপ্রসন্ন হয়ে বললেন—"তোমার যে রকম বুদ্ধি, তাতে তোমার বাঙলা লেখক হওয়া উচিত। Nonsense-কে উল্টে নিলেই যে তা Sence হয়, এ তত্ত্ব কোন্ লজিকে পেয়েছ, গ্রীক না জার্ম্মাণ? 'ছোট' শব্দের নিজের কোনও অর্থ নেই, ও হচ্ছে একটা আপেক্ষিক শব্দ, অন্য কিছুর সঙ্গে মেপে না নিলে ওর মানে পাওয়া যায় না।"

—"তা হ'লে War and Peace-এর চেহারা চোখের সুমুখে রাখলে Anna Karenina-কে ছোট গল্প বলতে হবে। আর রাজসিংহের পাশে বসিয়ে দিলেই বিষবৃক্ষ ছোট গল্প হয়ে যাবে। একই কথার যে আলাদা আলাদা ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা মানে হয়, এইটে ভুলে গেলেই মানুষের মাথা ঘুলিয়ে যায়। গণিতে 'ছোট' শব্দ relative ও লজিকে Correlative; কিন্তু সাহিত্যে তা positive."

—"তা হ'লে তোমার মতে ছোট গল্পের ঠিক মাপটা কি?"

—"এক ফর্ম্মা। যার দেহ এক ফর্ম্মায় আঁটে না, তা বড় গল্প না হ'তে পারে, কিন্তু তা ছোট গল্প নয়।"

—"তোমার কথা গ্রাহ্য করবার পক্ষে বাধা হচ্ছে এই যে, ফর্ম্মাও সব এক মাপের নয়। ওর ভিতরও আট-পেজি, বারো-পেজি, যোল-পেজি আছে।"

—ছন্দও আট মাত্রার, বারো মাত্রার, ষোল মাত্রার হয়ে থাকে, অতএব যদি বলা যায় যে, পদ্য ছন্দের সীমানা টপকে গেলে, তা গদ্য না হ'তে পারে, কিন্তু তা পদ্য হয় না, তা হ'লে সে কথাও তোমাদের কাছে গ্রাহ্য নয়।"

সুপ্রসন্ন তর্কের এ পেঁচের কাটান হাতের গোড়ায় খুঁজে না পেয়ে বল্লেন—

—"আচ্ছা, তা যেন হ'ল। গল্প গল্প হওয়া উচিত, এ কথা বলে' বীরবল কি তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন? আমরা জানতে চাই, গল্প কাকে বলে?"

প্রশান্ত অতি প্রশান্তভাবে উত্তর করলেন—

—"গল্প হচ্ছে সেই জিনিস—যা আমরা করতে জানি নে।"

—"শুনতে ত জানি?"

—"সে বিষয়েও আমার বিশেষ সন্দেহ আছে। তোমরা ভালবাসো শুধু বর্ণনা আর বক্তৃতা, যার

ভিতর গল্প ফোটা দূরে যাক, শুধু চাপা পড়ে' যায়। বড় গল্পের তোড়া বাঁধতে হ'লে হয় ত তার ভিতর দেদার পাতা পুরে দিতে হয়। কিন্তু ছোট গল্প হওয়া উচিত ঠিক একটি ফুলের মত, বর্ণনা ও বক্তৃতার লতাপাতার তার ভিতর স্থান নেই।"

—"দেখো প্রশান্ত, উপমা যুক্তি নয়, যারা উপমা দিয়ে কথা বলে, তাদের কাছ থেকে আমরা বস্তুর কোনও জ্ঞানলাভ করি নে, লাভ করি শুধু উপমারই জ্ঞান। তোমার ঐ ফুল পাতা রাখো, এখন বল দেখি, ছোট গল্পের প্রাণ কি ?"

—"ট্রাজেডি।"

—"কেন কমেডি নয় কেন ?"

—"এই কারণে যে, ট্রাজেডি অল্পক্ষণের মধ্যেই হয়ে যায়—যথা, খুন জখম মৃত্যু ইত্যাদি, আর কমেডির অভিনয় ত সারা জীবন ধরেই হচ্ছে।"

অনুকূল এতক্ষণ চুপ করে' ছিলেন। এইবার বল্লেন—

—"আমার মত ঠিক উল্টো। জীবনের অধিকাংশ মুহূর্ত্তই হচ্ছে কমিক। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তগুলোকেই একসঙ্গে ঠিক দিলে তবে বোঝা যায় যে, ব্যাপারটা আগাগোড়া ট্রাজিক। পৃথিবীতে যা ছোট তাই কমিক, আর যা বড় তাই ট্রাজিক।"

"জীবনটা ট্রাজিক কি কমিক, এ তর্ক উঠলে যে প্রথমে তা কমিক হবে আর শেষটা ট্রাজিক হ'তেও পারে, এ কথা আমি জানতুম। তার পর ঐ ত হচ্ছে সকল দর্শনের আসল সমস্যা, আর কোনও দর্শনই অদ্যাবধি যখন তার মীমাংসা করতে পারে নি, তখন আমরা যে হাত হাত তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করব, সে ভরসাও ছিল না। আলোচনা-যুদ্ধ থেকে গল্পে এসে পড়ায় একটু হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলুম, তাই দর্শনের একটা ঘোরতর তর্ক হ'তে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমি এই বলে' উভয় পক্ষের আপোষ মীমাংসা করে' দিলুম যে—ট্রাজি-কমেডিই হচ্ছে ছোট গল্পের প্রাণ। প্রফেসার এতক্ষণ আমাদের তর্কে যোগ দেন নি; নীরবে আমাদের কথা শুনে যাচ্ছিলেন। অতঃপর তিনি ঈষৎ হাস্য করে' বললেন—

—"প্রশান্তর কথা যদি ঠিক হয়, তা হ'লে ছোট গল্প আমারই লেখা উচিত, কেননা, আমার মুখে গল্প ছোট হ'তে বাধ্য। কেননা,আমার বর্ণনা করবার শক্তি নেই, আর বক্তৃতা করবার প্রবৃত্তি নেই। এই ত গেল প্রথম কথা। তার পর জীবনটাকে আমি ট্রাজেডিও মনে করি নে, কমেডিও মনে করি নে; কারণ, আমার মতে সংসারটা হচ্ছে একসঙ্গে ও দুই-ই। ও-দুই হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ। এখন আমার নিজের জীবনের একটি ঘটনা বল্‌তে যাচ্ছি। তোমরা দেখো, প্রথমে তা ছোট হয় কি না, আর দ্বিতীয়তঃ তা গল্প হয় কি না। এইটুকু ভরসা আমি দিতে পারি যে, তা ছাপলে আট পেজের কম হবে না, ষোলো পেজেরও বেশি হবে না—বারো পেজের কাছ ঘেঁসেই থাকবে। তবে তা এক 'সবুজ পত্র' ছাড়া আর কোন কাগজ ছাপতে রাজি হবে কি না বল্‌তে পারি নে। কেননা, তার গায়ে ভাষার কোনও পোষাক থাকবে না। ভাষা জিনিসটে যদি আমার ঠোঁটের গোড়ায় থাকত, তা হ'লে আমি আঁকও কষতুম না, গল্পও লিখতুম না, ওকালতি করতুম। আর তা হ'লে আমার টাকারও টানাটানি হ'ত না। সে যা হোক, এখন গল্প শোনো।"

প্রফেসারের কথা

আমি যে বছর B. Sc. পাশ করি, সেই বছর পূজোর ছুটিতে বাড়ী গিয়ে জ্বরে পড়ি। সে জ্বর আর দু'তিন মাসের মধ্যে গা থেকে বেমালুম ঝেড়ে ফেলতে পারলুম না। দেখলুম, চণ্ডীদাসের অন্তরের পীরিতি-বেয়াধির মত, আমার গায়ের জ্বর শুধু "থাকিয়া থাকিয়া জাগিয়া ওঠে, জালার নাহিক ওর।" শেষটা স্থির করলুম চেঞ্জে যাব। কোথায়, জানো ?—উত্তরবঙ্গে! ম্যালেরিয়ার পীঠস্থানে। এর কারণ, তখন বাবা সেখানে ছিলেন এবং ভাল হাওয়ার চাইতে ভাল খাওয়ার উপর আমার বেশি ভরসা ছিল। এ বিশ্বাস আমার পৈতৃক। বাবার জীবনের প্রধান সখ ছিল আহার। তিনি ওষুধে বিশ্বাস করতেন, কিন্তু পথ্যে বিশ্বাস করতেন না, সুতরাং বাবার আশ্রয় নেওয়াই সঙ্গত মনে করলুম। জানতুম, তাঁর আশ্রয়ে জ্বর বিষম হ'লেও সাবু খেতে হবে না।

একদিন রাত দুপুরে রাণাঘাট থেকে একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেণে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলুম। মেল ছেড়ে প্যাসেঞ্জার ধরবার একটু কারণ ছিল। একে ডিসেম্বর মাস, তার উপর আমার শরীর ছিল অসুস্থ, তাই এক পাল অপরিচিত লোকের সঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করে' অতটা পথ যাবার প্রবৃত্তি হ'ল না। জানতুম যে, প্যাসেঞ্জারে গেলে সম্ভবতঃ একটা পুরো সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট আমার একার ভোগেই আসবে। আর তাও যদি না হয় ত গাড়ীতে যে লম্বা হয়ে শুতে পাব, আর কোনও গার্ড ড্রাইভার

গোছের ইংরেজের সঙ্গে একত্র যে যেতে হবে না, এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলুম। এর একটা আশা ফলেছিল, আর একটা ফলে নি। আমি লম্বা হয়ে' শুতে পেরেছিলুম, কিন্তু ঘুমোতে পাই নি। গাড়ীতে একটা বুড়ো সাহেব ছিল, সে রাত চারটে পর্য্যন্ত অর্থাৎ যতক্ষণ হোঁস ছিল, ততক্ষণ শুধু মদ চালালে। তার দেহের গড়নটা নিতান্ত অদ্ভুত, কোমর থেকে গলা পর্য্যন্ত ঠিক বোতলের মত। মদ খেয়েই তার শরীরটা বোতলের মত হয়েছে, কিম্বা শরীরটা বোতলের মত বলে' সে মদ খায়, এ সমস্যার মীমাংসা আমি করতে পারলুম না। যারা দেহের গঠন ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ নির্ণয় করে, এ Problemটা তাদের জন্য, অর্থাৎ ফিজিওলজিষ্টদের জন্য রেখে দিলুম। যাক্ এ সব কথা। আমার সঙ্গে বৃদ্ধটি কোনরূপ অভদ্রতা করে নি, দেখবামাত্রই আমার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হয়ে, সে ভদ্রলোক এতটা মাখামাখি করবার চেষ্টা করেছিল যে, আমি জেগে থেকেও ঘুমিয়ে পড়বার ভাণ করলুম। মাতাল আমি পূর্ব্বে কখনও এত হাতের গোড়ায়, আর এতক্ষণ ধরে' দেখি নি, সুতরাং এই তার খাঁটি নমুনা কি না, বলতে পারি নে। সে ভদ্রলোক পালায় পালায় হাসছিল ও কাঁদছিল। হাসছিল —বিড় বিড় করে' কি বকে', আর কাঁদছিল—পরলোকগতা সহধর্ম্মিণীর গুণকীর্ত্তন করে'। সে যাত্রা গাড়ীতে প্রথমেই মানব-জীবনের এই ট্রাজি-কমেডির পরিচয় লাভ করলুম। আমার পক্ষে এই মাতলামোর অভিনয়টা কিন্তু ঠিক কমেডি বলে' বোধ হয় নি। দুর্ব্বল শরীরে শীতের রাত্তিরে রাত্রি-জাগরণটা ঠাট্টার কথা নয়, বিশেষতঃ সে জাগরণের অংশীদার যখন এমন লোক—যার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে মদের গন্ধ অবিরাম ছুটছে। মানুষ যখন ব্যারাম থেকে সবে সেরে ওঠে, তখন তার সকল ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ হয়, বিশেষত ঘ্রাণেন্দ্রিয়। আমারও তাই হয়েছিল। ফলে জ্বর আসবার মুখে যে রকম গা পাক দেয়, মাথা ঘোরে, আমার ঠিক সেই রকম হচ্ছিল। ঘ্রাণে যে অর্দ্ধ-ভোজনের ফল হয়, এ সত্যের সে রাত্তিরে আমি নাকে মুখে প্রমাণ পাই।

পরদিন ভোরের বেলায় শীতে হি হি করতে করতে ষ্টীমারে পদ্মা পার হলুম। সারায় গিয়ে এবার গাড়ীতে চড়লুম, তাতে জনপ্রাণী ছিল না। আগের রাত্তিরের পাপ সেইখানেই বিদেয় হ'ল। মনে মনে বললুম, বাঁচলুম। যদিচ বিনা নেশায় মানুষটা কি রকম, তা দেখবার ঈষৎ কৌতূহল ছিল! সাদা চোখে হয় ত সে আমার দিকে কটমটিয়ে চাইত। শুনেছি, নেশার অনুরাগ খোঁয়ারিতে রাগে দাঁড়ায়। সে যাই হোক, গাড়ী চলতে লাগল, কিন্তু সে এমনি ভাবে যে, গম্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য যেন তার কোনও তাড়া নেই। ট্রেণ প্রতি ষ্টেশনে থেমে, জিরিয়ে, একপেট জল খেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ধীরে সুস্থে ঘটর ঘটর করে' অগ্রসর হ'তে লাগল। আমি সাহিত্যিক হ'লে, এই ফাঁকে উত্তর-বঙ্গের মাঠ-ঘাট, জলবায়ু, গাছপালার একটা লম্বা বর্ণনা লিখতে পারতুম। কিন্তু সত্যিকথা বলতে গেলে, আমার চোখে এ সব কিছুই পড়ে নি; আর যদি পড়ে' থাকে ত মনে কিছুই ঢোকে নি, কেননা, কি যে দেখেছিলুম, তার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই মনে নেই। মনে এইমাত্র আছে যে, আমি গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। একটা গোলমাল শুনে জেগে উঠে দেখি, গাড়ী হিলি ষ্টেশনে পৌঁচেছে—আর বেলা তখন একটা।

চোখ তাকিয়ে দেখি, একদল মুটে হুড়মুড় করে' এসে গাড়ীর ভিতর ঢুকে এক রাশ বাক্স ও তোরঙ্গে ঘর ছেয়ে ফেললে। সেই সব বাক্স ও তোরঙ্গের উপর বড় বড় কালির অক্ষরে লেখা ছিল "Mr. A, Day." দেখে আমার প্রাণে ভয় ঢুকে গেল এই মনে করে' যে, রাতটে ত একটা সাহেবে জ্বালিয়েছে, দিনটা হয় ত আর একটা সাহেবে জ্বালাবে, সম্ভবত বেশিই জ্বালাবে, কেননা, আগন্তুক যে সরকারি সাহেব, তার সাক্ষী তাঁর চাপরাশ-ধারী পেয়াদা সুমুখেই হাজির ছিল। আমি ভয়ে ভয়ে বেঞ্চির এক কোণে জড়সড় হয়ে বসলুম। স্বীকার করছি, আমি বীরপুরুষ নই।

অতঃপর যিনি কামরায় প্রবেশ করলেন, তাঁকে দেখে আমি ভীত না হই, চকিত হয়ে গেলুম। তাঁর নাম মিষ্টার Day না হয়ে মিষ্টার "Night" হলেই ঠিক হ'ত। আমরা বাঙালীরা শুনতে পাই মোঙ্গল-দ্রাবিড়-জাত। কথাটা সম্ভবত ঠিক, কেন না, আমাদের অধিকাংশ লোকের চেহারায় মঙ্গোলিয়ানের রঙ্গের বেশ একটু আমেজ আছে। কিন্তু পাকা মাদ্রাজি রঙ শুধু দু'চার জনের মধ্যেই পাওয়া যায়। Mr. Day সেই দু'চার জনের একজন। আমি কিন্তু তাঁর রঙ দেখে অবাক্ হই নি, চেহারা দেখে চমকে গিয়েছিলুম। এ দেশে ঢের শ্যামবর্ণ লোক আছে, যারা অতি সুপুরুষ, কিন্তু এই হ্যাটকোটধারী যে কোন্ জাতীয় জীব, তা বলা কঠিন। মানুষের সঙ্গে ভাঁটার যে কতটা সাদৃশ্য থাকতে পারে, ইতিপূর্ব্বে তার চাক্ষুষ পরিচয় কখনই পাই নি। সেই দৈর্ঘ্য-প্রস্থে প্রায় সমান লোকটির গা হাত পা মাথা চোখ

গাল সবই ছিল গোলাকার। তার পর তাঁর সর্ব্বাঙ্গ তাঁর কোট-পেণ্টালুনের ভিতর দিয়ে ফেটে বেরুচ্ছিল। কোট-পেণ্টালুন ত কাপড়ের,—তাঁর দেহ যে তাঁর চামড়া ফেটে বেরয় নি, এই আশ্চর্য্য। তাঁকে দেখে আমার শুধু কোলাবেঙের কথা মনে পড়তে লাগল, আর আমি হাঁ করে' তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম। যা অসামান্য, তাই মানুষের চোখকে টানে, তা সে সুরূপই হোক আর কু-রূপই হোক। একটু পরেই আমার হুঁস হ'ল যে,ব্যবহারটা আমার পক্ষে অভদ্রতা হচ্ছে। অমনি আমি তাঁর সুগোল নিটোল বপু থেকে চোখ তুলে নিয়ে অন্য দিকে চাইলুম। অন্ধকারের পর আলো দেখলে লোকের মন যেমন এক নিমিষে উৎফুল্ল হয়ে উঠে, আমারও তাই হ'ল। এবার যা চোখে পড়ল, তা সত্য সত্যই আলো—সে রূপ, আলোর মতই উজ্জ্বল, আলোর মতই প্রসন্ন। Mr. Day-র সঙ্গে দুটি কিশোরীও যে গাড়িতে উঠেছিলেন, প্রথমে তা লক্ষ্য করি নি। এখন দেখলুম, তার একটি Mr. Day-র ঈষৎ সংক্ষিপ্ত শাড়ি-বাঁধাই সংস্করণ। এর বেশি আর কিছু বলতে চাইনে, Weismann যাই বলুন, বাপের রূপ সন্তানে বর্ত্তায়, তা সে-রূপ স্বোপার্জ্জিতই হোক আর অন্বয়াগতই হোক। অপরটির রূপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য; কেননা, আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমার চোখে ও মনে সেই মুহূর্ত্তে যা চিরদিনের মত ছেপে গেল, সে হচ্ছে একটা আলোর অনুভূতি। এর বেশি আমি আর কিছু বল্‌তে পারি নে। আমি যদি চিরজীবন আঁক না কষে' কবিতা লিখতুম, তা হ'লে হয় ত তার চেহারা, কথায় এঁকে তোমাদের চোখের সুমুখে ধরে' দিতে পারতুম। আমার মনে হল', সে অপাদ-মস্তক বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তার চোখের কোণ থেকে, তার আঙুলের ডগা দিয়ে, অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ ঠিকরে বেরুচ্ছিল। Leyden Jar-এর সঙ্গে স্ত্রীলোকের তুলনা দেওয়াটা যদি সাহিত্যে চলত, তা হ'লে ঐ এক কথাতেই আমি সব বুঝিয়ে দিতুম। সাদা কথায় বল্‌তে গেলে, প্রাণের চেহারা তার চোখ-মুখ, তার অঙ্গভঙ্গী, তার বেশভূষা সকলের ভিতর দিয়ে অবাধে ফুটে বেরুচ্ছিল। সেই একদিনের জন্য আমি বিশ্বাস করেছিলুম যে, অধ্যাপক জে, সি, বোসের কথা সত্য,—প্রাণ আর বিদ্যুৎ একই পদার্থ।

এই উচ্ছ্বাস থেকে তোমরা অনুমান করুছ যে, আমি প্রথম দর্শনেই তার ভালবাসায় পড়ে' গেলুম। ভালবাসা কাকে বলে, তা জানি নে, তবে এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে, সেই মুহূর্ত্তে আমার বুকের ভিতর একটি নূতন জানালা খুলে গেল, আর সেই দ্বার দিয়ে আমি একটা নূতন জগৎ আবিষ্কার করুলুম, যে জগতের আলোয় মোহ আছে, বাতাসে মদ আছে। এই থেকেই আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারবে। আমার বিশ্বাস, আমি যদি কবি হতুম, তা হ'লে তোমরা যাকে ভালবাসা বলো, তা আমার মনে অত শীগ্‌গির জন্মাতো না। যারা ছেলেবেলা থেকে কাব্যচর্চ্চা করে, তারা ও-জিনিসের টীকে নেয়। আমাদের মত চিরজীবন আঁক-কষা লোকদেরই ও-রোগ চট্ করে' পেয়ে বসে। মাপ করো, একটু বক্তৃতা করে' ফেললুম, তোমাদের কাছে সাফাই হবার জন্য। এখন শোনো তার পর কি হ'ল।

Mr. Day আমার সঙ্গে কথোপকথন সুরু করে' দিলেন এবং সেই ছলে আমার আদ্যোপান্ত পরিচয় নিলেন। মেয়ে দুটি আমাদের কথা-বার্ত্তা অবশ্য শুনছিল, স্থূলাঙ্গীটি মনোযোগ সহকারে, আর অপরটি আপাতদৃষ্টিতে—অন্যমনস্কভাবে। আমি আপাতদৃষ্টিতে বলছি, এই কারণে যে, আমার এক একটা কথায় তার চোখের হাসি সাড়া দিচ্ছিল। আমার নাম কিশোরীরঞ্জন,এ কথা শুনে বিদ্যুৎ তার চোখের কোণে চিক্‌মিক্ করতে লাগল, তার ঠোঁটের উপর লুকোচুরি খেলতে লাগল। স্থূলাঙ্গীটি কিন্তু আসল কাজের কথাগুলো হাঁ করে' গিলছিল। আমার বাবা যে পাটের কারবার করেন, আমি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কামারা ছেলে, তার পর অবিবাহিত,তার পর জাতিতে কায়স্থ, এ খবরগুলো বুঝলুম, সে তার বুকের নোট-বুকে টুকে নিচ্ছে। আমাদের সাংসারিক অবস্থা যে কি রকম, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার বোধ হয় Mr. Day-র প্রয়োজন হয় নি। তিনি আমার বাবাকে হয় ত নামে জানতেন, নয় ত তিনি আমার বেশভূষার পারিপাট্য, আসবাব-পত্রের আভিজাত্য থেকে অনুমান করুতে পেরেছিলেন যে, আমাদের সংসারে আর যে বস্তুরই অভাব থাক্—অন্নবস্ত্রের অভাব নেই। সুতরাং আমি বাবার এক ছেলে ও ফার্ষ্ট ডিভিসনে B. Sc. পাশ করেছি, এ সংবাদ পেয়ে তিনি আমার প্রতি হঠাৎ অতিশয় অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। আগের রাত্তিরে বুড়ো সাহেবটি যে পরিমাণ হয়েছিলেন, তার চাইতে এক চুল কম নয়। মদ যে দুনিয়ায় কত রকমের আছে, এ যাত্রায় তার জ্ঞান আমার ক্রমে বেড়ে যেতে লাগল।

এর পর তাঁর পরিচয় তিনি নিজে হ'তেই

দিলেন। সে পরিচয় তিনি খুব লম্বা করে' দিয়েছিলেন, আমি তা দুকথায় বলছি। তিনিও কায়স্থ, তিনিও B. A. পাশ। এখন তিনি গভর্ণমেণ্টের একজন বড় চাকুরে—Settlement Officer। কিন্তু যে কথা তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার করে' বলেছিলেন, সে হচ্ছে এই যে, তিনি বিলেতফেরৎ নন, ব্রাহ্মও নন, পাকা হিন্দু; তবে তিনি শিক্ষিত লোক বলে' স্ত্রী-শিক্ষায় বিশ্বাস করেন এবং বাল্য-বিবাহে বিশ্বাস করেন না। সংক্ষেপে তিনি rêformer নন—reformed Hindu। মেয়েকে লেখাপড়া, জুতো-মোজা পরতে শিখিয়েছেন এবং এই সব শিক্ষা দেবার জন্য বড় করে' রেখেছেন, এতদিনও বিবাহ দেন নি। তবে পয়লা নম্বরের পাশকরা ছেলে পেলে এখন মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি আছেন। এ কথা শুনে আমি তার দিকে চাইলুম, কার দিকে অবশ্য বলবার দরকার নেই। অমনি তার মুখে আলো ফুটে উঠল, কিন্তু তার ভিতর কি যেন একটা মানে ছিল, যা আমি ঠিক ধরতে পারলুম না। আমার মনে হ'ল, সে আলোর অন্তরে ছিল অপার রহস্য আর অগাধ মায়া। এক কথায়, আরতির আলোতে প্রতিমার চেহারা যে রকম দেখায় —সেই হাসির আলোতে তার চেহারা ঠিক তেমনি দেখাচ্ছিল। শরীর যার রুগ্ন, সে পরের মায়া চায় এবং একটুতেই মনে করে অনেকখানি পায়। এই সূত্রে আমি একটা মস্তবড় সত্য আবিষ্কার করে' ফেললুম, সে হচ্ছে এই যে, স্ত্রীলোকে বলকে ভক্তি করে, কিন্তু ভালবাসে দুর্ব্বলকে।

সে যাই হোক, আমি মনে মনে তার গলায় মালা দিলুম, আর তার আকার ইঙ্গিতে বুঝলুম, সেও তার প্রতিদান করলে। এই মানসিক গান্ধর্ব্ব বিবাহকে সামাজিক ব্রাহ্ম বিবাহে পরিণত করতে যে বৃথায় কালক্ষেপ করব না, সে বিষয়েও কৃত-সঙ্কল্প হলুম। দুটির মধ্যে সুন্দরীটিই যে বয়োজ্যেষ্ঠা, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। যদি জিজ্ঞাসা করো যে, দুই বোনের ভিতর চেহারার প্রভেদ এত বেশি কেন? তার উত্তর—একটি হয়েছে মায়ের মত আর একটি বাপের মত। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে অবশ্য আমাকে differential calculusএর আঁক কষতে হয় নি।

আমি ও মিষ্টার দে দুজনেই হলদিবাড়ী নামলুম। দে সাহেবের ঐ ছিল কর্ম্মস্থল এবং বাবাও তাঁর ব্যবসার কি তদ্বিরের জন্য সে সময়ে ঐখানেই উপস্থিত ছিলেন। ষ্টেসনে যখন আমি দে সাহেবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে' যাচ্ছি—তখন সেই সুন্দরীর দিকে চেয়ে দেখি, সে মুখে হাসির রেখা পর্য্যন্ত নেই। যে চোখ এতক্ষণ বিদ্যুতের মত চঞ্চল ছিল, সে চোখ এখন তারার মত স্থির রয়েছে, আর তার ভিতরে কি একটা বিষাদ, একটা নৈরাশ্যের কালো ছায়া পড়েছে। সে দৃষ্টি যখন আমার চোখের উপর পড়ল, তখন আমার মনে হ'ল, তা যেন স্পষ্টাক্ষরে বললে, "আমি এ জীবনে তোমাকে আর ভুলতে পারব না; আশা করি, তুমিও আমাকে মনে রাখবে।" মানুষের চোখ যে কথা কয়, এ কথা আমি আগে জানতুম না। অতঃপর আমি চোখ নীচু করে' সেখান থেকে চলে' এলুম।

তার পর যা হ'ল শোনো। আমি এ বিয়েতে বাবার মত করালুম। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, তার উপর আবার ভালো ছেলে; সুতরাং বাবা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করতে দ্বিধা করলেন না। প্রস্তাবটা অবশ্য বরের পক্ষ থেকেই উত্থাপন করা হল'। উভয় পক্ষের ভিতর মামুলি কথাবার্ত্তা চলল। তার পর আমরা একদিন সেজেগুজে মেয়ে দেখতে গেলুম। মেয়ে আমি আগে দেখলেও বাবা ত দেখেন নি। তা ছাড়া রীত-রক্ষে ব'লেও ত একটা জিনিস আছে।

দে সাহেবের বাড়ীতে আমরা উপস্থিত হবার পর, খানিকক্ষণ বাদেই একটি মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে আমাদের সুমুখে এনে হাজির করা হ'ল। সে এসে দাঁড়াবামাত্র আমার চোখে বিদ্যুতের আলো নয়, বুকে বিদ্যুতের ধাক্কা লাগ্‌ল। এ সে নয়—অন্যটি। সাজগোজের ভিতর তার কদর্য্যতা জোর করে' ঠেলে বেরিয়েছিল। আমি যদি তার সে দিনকার মূর্ত্তির বর্ণনা করি, তা হ'লে নিষ্ঠুর কথা বলব। তার কথা তাই থাক। আমি এ ধাক্কায় এতটা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম যে, কাঠের পুতুলের মত অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। পর্দ্দার আড়াল থেকে পাশের ঘরে একটি মেয়ে বোধ হয় আমার ঐ অবস্থা দেখে, খিল খিল করে' হেসে উঠ্‌ল। আমার বুঝতে বাকী রইল না—সে হাসি কার। আমি যদি কবি হতুম, তা হ'লে সেই মুহূর্ত্তে বলতুম, "ধরণী দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি।"

ব্যাপার কি হয়েছিল জানো, যে মেয়েটিকে আমাকে দেখানো হয়েছিল, সে হচ্ছে দে-সাহেবের অবিবাহিতা কন্যা আর যাকে পর্দ্দার আড়ালে রাখা হয়েছিল, সে হচ্ছে দে বাহাদুরের বিবাহিতা স্ত্রী,

অবশ্য দ্বিতীয় পক্ষের। বলা বাহুল্য, আমি এ বিবাহ করতে কিছুতেই রাজি হলুম না, যদিচ বাবা বিরক্ত হলেন, দে-সাহেব রাগ করলেন, আর দেশশুদ্ধ লোক আমার নিন্দা করতে লাগল।

এ ঘটনার হপ্তাখানেক বাদে ডাকে একখানি চিঠি পেলুম। লেখা স্ত্রী-হস্তের। সে চিঠি এই—

"যদি আমার প্রতি কোনরূপ মায়া থাকে, তা হ'লে তুমি ঐ বিবাহ করো, নচেৎ এ পরিবারে আমার তেষ্টানো ভার হবে।

—কিশোরী—"

এ চিঠি পেয়ে আমার সঙ্কল্প ক্ষণিকের জন্য টলেছিল; কিন্তু ভেবে দেখ্‌লুম, ও কাজ করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। কেননা, দুজনেই এক ঘরের লোক এবং দুজনের সঙ্গেই আমার সম্বন্ধ রাখতে হবে এবং সে দুই মিথ্যাভাবে। নিজের মন যাচিয়ে বুঝলুম, চিরজীবন এ অভিনয় করা আমার পক্ষে অসাধ্য। এই হচ্ছে আমার গল্প—এখন তোমরা স্থির কর যে, এ ট্রাজেডি, কি কমেডি, কিম্বা একসঙ্গে ও দুই।

প্রফেসর এই বলে' থামলে অনুকূল হেসে বল্‌লে—

—"অবশ্য কমেডি। ইংরাজিতে যাকে বলে Comedy of Errors."

প্রশান্ত গম্ভীরভাবে বল্‌লেন—

—"মোটেই নয়, এ শুধু ট্রাজেডি নয়, একেবারে চতুরঙ্গ ট্রাজেডি।"

ঐ চতুরঙ্গ বিশেষণের সার্থকতা কি, প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তর করলেন,—

—"স্ত্রী-কিশোরী আর প্রোফেসার কিশোরী এই দুই কিশোরীর পক্ষে ব্যাপারটা যে কি ট্রাজিক, তা ত সকলেই বুঝতে পারছ। আর এটা বোঝাও শক্ত নয় যে, দে-সাহেবের মনের শান্তিও চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে গেল, আর তাঁর মেয়ের হয় বিয়ে হ'ল না, নয় কোনও বাঁদরের সঙ্গে হ'ল।"

প্রফেসর এর জবাবে বল্‌লেন, "শ্রীমতীর জন্য দুঃখ করবার কিছু নেই, তার আমার চাইতে ঢের ভাল বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। তার স্বামী এখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, আর সে আমার দ্বিগুণ মাইনে পায়। কথাটা হয় ত তোমরা বিশ্বাস করছ না, কিন্তু ঘটনা তাই। দে বাহাদুর দশ হাজার টাকা পণ দিয়ে একটি M. A.-এর সঙ্গে তার বিবাহ দেন, তার পরে সাহেব-সুবোকে ধরে' তাকে ডেপুটি করে' দেন। আমার সঙ্গে বিয়ে হ'লে তাকে খালি পায়ে বেড়াতে হ'ত, এখন সে দু'বেলা জুতো-মোজা পরছে। তার পর বলা বাহুল্য যে, দে বাহাদুরের যে রকম আকৃতি-প্রকৃতি, তাতে করে' তিনি ট্রাজেডি দূরে থাক, কোনও কমেডিরও নায়ক হ'তে পারেন না, তাঁর যথার্থ স্থান হচ্ছে প্রহসনের মধ্যে।"

—"আচ্ছা, তা হ'লে তোমাদের দুজনের পক্ষে ত ঘটনাটা ট্রাজিক ?"

—"কি করে' জানলে ? অপর কিশোরীর বিষয় ত তুমি কিছুই জানো না, আর আমার মনের খবরই বা তুমি কি রাখো ?"

—"আচ্ছা ধরে' নিচ্ছি যে, অপরটির পক্ষে ব্যাপারটা হয়েছে Comedy, খুব সম্ভবত তাই—কেননা, তা নইলে তোমার দুর্দ্দশা দেখে সে খিল খিল করে' হেসে উঠ্‌বে কেন ? কিন্তু তোমার পক্ষে যে এটা ট্রাজেডি, তার প্রমাণ, তুমি অদ্যাবধি বিবাহ করো নি।"

—"বিবাহ করা আর না করা, এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা বড় ট্রাজেডি, তা যখন জানিনে, তখন ধরে' নেওয়া যাক্—করাটাই হচ্ছে Comedy. যদিচ বিবাহটা কমেডির শেষ অঙ্ক বলেই নাটকে প্রসিদ্ধ। সে যাই হোক্, আমি যে বিয়ে করি নি, তার কারণ—টাকার অভাব।"

—"বটে! তুমি যে মাইনে পাও, তাতে আর দশজন ছেলেপিলে নিয়ে ত দিব্যি ঘর-সংসার করছে।"

—"তা ঠিক। আমার পক্ষে তা করা কেন সম্ভব নয়, তা বল্‌ছি। বছর কয়েক আগে বোধ হয় জানো যে, পাটের কারবারে একটা বড় গোছের মার খেয়ে বাবার ধন ও প্রাণ দুই একসঙ্গে যায়। ফলে আমরা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ি। তার পর এই চাকরিতে ঢুকে মা'র অনুরোধে বিয়ে করতে রাজি হলুম। ব্যাপারটা অনেক দূর এগিয়ে এসেছিল, আমি অবশ্য মেয়ে দেখি নি, কিন্তু পাকা দেখাও হয়ে গিয়েছিল। এমন সময়ে আবার একখানি চিঠি পেলুম, লেখা সেই স্ত্রী-হস্তের। সে চিঠির মোদ্দা কথা এই যে, লেখিকা বিধবা হয়েছেন এবং সেই সঙ্গে কপর্দ্দক শূন্য। দে সাহেব তাঁর উইলে তাঁর স্ত্রীকে এক কড়াও দিয়ে যান নি। তাঁর চিরজীবনের সঞ্চিত ঘুষের টাকা তিনি তাঁর কন্যারত্নকে দিয়ে গিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে খোরপোষের মামলা করা কর্ত্তব্য কি না, সে বিষয়ে তিনি আমার পরামর্শ চেয়েছিলেন। আমি প্রত্যুত্তরে মামলা করা থেকে তাঁকে নিবৃত্ত করে' তাঁর সংসারের ভার নিজের ঘাড়ে নিয়েছি। ভেবে দেখো

দেখি, যে গল্পটা তোমাদের বল্‌লুম, সেটা আদালতে কি বিশ্রী আকারে দেখা দিত। বলা বাহুল্য, এর পর আমার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে দিলুম, মা বিরক্ত হলেন, কন্যাপক্ষ রাগ করলেন, দেশশুদ্ধ লোক নিন্দে করতে লাগল, কিন্তু আমি তাতে টল্‌লুম না। কেননা, দু'সংসার চালাবার মত রোজগার আমার নেই।"

—"দেখো, তুমি অদ্ভুত কথা বলছ, একটি হিন্দু বিধবার আর কি লাগে, মাসে দশ টাকা হলেই ত চলে' যায়, তা আর তুমি দিতে পার না?"

—"যদি দশ টাকায় হতো, তা হ'লে আমি পাকা দেখার পর বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে সমাজে দুর্নামের ভাগী হতুম না। সে একা নয়, তার বাপ-মা আছে, তারা যে হতদরিদ্র, তা বোধ হয়, তাদের দে-সাহেবকে কন্যাদান থেকেই বুঝতে পারো। তার পর আমি যে ঘটনার উল্লেখ করেছি, তার সাত মাস পরে তার যে কন্যাসন্তান হয়, সে এখন বড় হয়ে উঠ্‌ছে। এই সবকটির অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমাকে করতে হয়, আর তা অবশ্য দশ টাকায় হয় না।"

অনুকূল জিজ্ঞাসা করলেন,—

—"তার রূপ আজও কি আলোর মত জ্বলছে?"

—"বল্‌তে পারি নে, কেননা, তার সঙ্গে সেই ট্রেণে ছাড়া আমার আর সাক্ষাৎ হয় নি।"

—"কি বলছ, তুমি তার গোনাগুষ্ঠী খাইয়ে পরিয়ে রাখ্‌ছ আর সে তোমার সঙ্গে একবারও সাক্ষাৎ করে নি?"

—"একবার কেন, বহুবার সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিল, কিন্তু আমি করি নি।"

অনুকূল হেসে বল্‌লে, "পাছে 'নেশার অনুরাগ খোঁয়ারির রাগে পরিণত হয়', এই ভয়ে বুঝি?"

—"না, তার কন্যাটি পাছে তার দিদির মত দেখ্‌তে হয়, এই ভয়ে!"

শেষে আমি বল্‌লুম, "প্রফেসার, তোমার গল্প উৎরেছে। তুমি করতে চাইলে বিয়ে, তা হ'ল না, কিন্তু বিয়ের দায়টা পড়্‌ল তোমার ঘাড়ে। এ ব্যাপার যদি ট্রাজি-কমেডি না হয়, ত ট্রাজি-কমেডি কাকে বলে, তা আমি জানি নে"।

সুপ্রসন্ন বল্‌লে—

—"তা হ'তে পারে, কিন্তু এ গল্প ছোট হয় নি, কেন না, এতক্ষণে ষোলপেজ পেরিয়ে গেল।"

প্রশান্ত অমনি বলে' উঠল যে—

"তা যদি হয়ে থাকে ত সে প্রফেসারের গল্প বলার দোষে নয়—তোমাদের জেরা আর সওয়াল-জবাবের গুণে।"

প্রফেসার হেসে বল্‌লেন—"প্রশান্ত যা বলছে, তা ঠিক, শুধু 'তোমাদের' বদলে "আমাদের" ব্যবহার করলে তার বক্তব্যটা ব্যাকরণ-শুদ্ধ হ'ত।"

শ্রাবণ, ১৩২৫।

রাম ও শ্যাম

শ্রীমান্ চিরকিশোর,

কল্যাণীয়েষু—

আর পাঁচজনের দেখাদেখি আমিও অতঃপর গল্প লিখতে সুরু করেছি, কেননা, গল্প না লিখলে আজ-কাল সাহিত্য-সমাজে কোনরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় না। ইতিপূর্ব্বে যে লিখি নি, তার কারণ, লেখবার এমন কোনও বিষয় দেখতে পাই নি, যা পূর্ব্ব-লেখকরা দখল করে' না নিয়েছেন। শেষটা আবিষ্কার করলুম, বাঙলার গল্প-সাহিত্যে আদর্শ পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করা বড়ই দুর্ল্লভ, যা দুর্ল্লভ, তাই সুলভ করবার উদ্দেশ্যেই আমার এ গল্প লেখা। আমার হাতের প্রথম গল্পটি তোমাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, যদি তোমার মতে সেটি উৎরে থাকে, তা হ'লে পরে ঐ বিষয়ে একটি বড় গল্প লিখ্‌ব, ক্রমে সাহস বেড়ে গেলে অবশেষে এই একই বিষয়ে চাই কি একটি মহাকাব্যও লিখতে পারি। একটা কথা বলে' রাখি, মানুষে যাকে সুন্দর বলে, এ গল্পের ভিতর তার নাম-গন্ধও নেই—যদি কিছু থাকে ত, আছে শিব। আর সত্য?—গল্পের ভিতর ও বস্তু সেই খোঁজে, যে ইতি-হাস ও উপন্যাসের ভেদ জানে না। তোমার দৃষ্টির জন্য এইসঙ্গে গল্পটির জাবেদা নকল পাঠাচ্ছি।

গল্প

প্রথম অঙ্ক

স্বভাব।

বাঙলা দেশের একটি পাড়াগেঁয়ে-সহরে দু'কড়ি দত্তের সহধর্ম্মিণী যখন যমজ পুত্র প্রসব করলেন, তখন দত্তজা মহাশয় ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। এ দুই ছেলে বড় হ'লে যে কত বড় লোক হবে, সে কথা জানলে তাঁর আনন্দের অবশ্য আর সীমা থাকত না। কিন্তু কি করে' তিনি তা জানবেন? এই কলিকালে কারও

জন্মদিনে ত কোনও দৈববাণী হয় না, অতএব বলা বাহুল্য, তাদের জন্মদিনেও হয় নি।

তবে ছেলে দুটির বিষয়বুদ্ধি যে নৈসর্গিক এবং অসাধারণ, তার পরিচয় সেইদিনই পাওয়া গেল। তারা ভূমিষ্ঠ হ'তে না হ'তেই, তাদের জননীকে আধা-আধি ভাগ-বাটোয়ারা করে' নিলে। একটি দখল করে' নিলে তাঁর দক্ষিণ অঙ্গ আর একটি দখল করে' নিলে তাঁর বাম অঙ্গ এবং এই সুবন্দোবস্তের ফলে, মাতৃদুগ্ধ তারা সমান অংশে পান করতে লাগল। মাতৃদুগ্ধ পান করবার প্রবৃত্তি ও শক্তির নামই যদি হয় মাতৃভক্তি, তা হ'লে স্বীকার করতেই হবে যে,—এই ভ্রাতৃযুগলের তুল্য মাতৃভক্ত শিশু ভারতবর্ষে আর কখনো জন্মায় নি। ফলে, তারা দুধ না ছাড়তেই তাদের মাতা দেহ ছাড়লেন—ক্ষয়রোগে।

এখানে একটি কথার উল্লেখ করে' রাখা আবশ্যক। এরা দু'ভাই এমনি পিঠ পিঠ জন্মেছিল যে, এদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট, তা কেউ স্থির করতে পারলেন না। এইটেই রয়ে গেল এদের জীবনের আসল রহস্য, অতএব এ গল্পেরও আসল রহস্য। সে যাই হোক, কার্য্যতঃ দুই ভাই শুধু একবর্ণ একাকার নয়, এক-ক্ষণজন্মা বলে' প্রসিদ্ধ হলো।

শুভদিনে শুভক্ষণে তাদের অন্নপ্রাশন হলো এবং দত্তজা তাদের নাম রাখলেন—রাম ও শ্যাম। পৃথিবীতে যমজের উপযুক্ত এত খাসা খাসা জোড়া নাম থাকতে,—যেমন নকুল-সহদেব, হরি-হর, কানাই-বলাই প্রভৃতি, রাম-শ্যামই যে দত্ত মহাশয়ের কেন বেশি পছন্দ হ'ল, তা বলা কঠিন। লোকে বলে, দত্তজা পুত্রদ্বয়ের আকৃতির নয়, বর্ণের উপরেই দৃষ্টি রেখে এই নামকরণ করেছিলেন। এই যমজের দেহের যে বর্ণ ছিল, তার ভদ্র নাম অবশ্য শ্যাম। সে যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, তাঁর পুত্রদ্বয় যে একদিন তাদের নাম সার্থক করবে, এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। এতে তাঁর দোষ দেওয়া যায় না। কারণ, রামশ্যামের নামকরণের সময় আকাশ থেকে ত আর পুষ্পবৃষ্টি হয় নি।

অনেকদিন যাবৎ রাম-শ্যামের কি শরীরে, কি অন্তরে, মহাপুরুষসুলভ কোনরূপ লক্ষণই দেখা যায় নি। তারা শৈশবে কারও ননী চুরি করে নি, বাল্যে কারও মন চুরি করে নি। তাদের বাল্য-জীবন ছিল ঠিক সেই ধরণের জীবন, যেমন আর পাঁচ জনের ছেলের হয়ে থাকে। ছেলেও ছিল তারা নেহাৎ মাঝারি গোছের, কিন্তু তা সত্ত্বেও কৈশোরে পদার্পণ করতে না করতে তারা স্কুলের ছেলেদের একদম দলপতি হয়ে উঠল। তাদের আত্মশক্তি যে কোন্ ক্ষেত্রে জয়যুক্ত হবে, তার পূর্ব্বাভাস এইখান থেকেই সকলের পাওয়া উচিত ছিল।

সকল বিষয়ে মাঝারি হয়েও তারা সকলের মাথা হ'ল কি করে'? এর অবশ্য নানা কারণ আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, তারা ছিল চৌকোশ। যে সব ছেলেরা পড়ায় ফার্ষ্ট হ'ত—তারা খেলায় লাষ্ট হ'ত, আর যে সব ছেলেরা খেলায় ফার্ষ্ট হ'ত—তারা পড়ায় লাষ্ট হ'ত। পাছে কোন বিষয়ে লাষ্ট হ'তে হয়, এই ভয়ে তারা কোন বিষয়েই ফার্ষ্ট হয় নি। চৌকোশ হ'তে হ'লে যে মাঝারি হ'তে হয়, এ জ্ঞান তাদের ছিল; কেননা, বয়েসের তুলনায় তারা ছিল যেমন সেয়ানা, তদধিক হুঁসিয়ার।

কিন্তু সত্য কথা এই যে, তাদের শরীরে এমন একটি গুণ ছিল, যা এ দেশে ছোটদের কথা ছেড়ে দেও—বড়দের দেহেও মেলা দুষ্কর। তারা ছিল বেজায় কৃতকর্ম্মা ছেলে, ইংরেজি ভাষায় যাকে বলে energetic. স্কুলের যত ব্যাপারে তারা হ'ত যুগপৎ অগ্রগামী ও অগ্রণী। চাঁদা, সে ফুটবলেরই হোক আর সরস্বতীপূজোরই হোক, তাদের তুল্য আর কেউ আদায় করতে পারত না। উকীল-মোক্তারদের কথা ত ছেড়েই দাও, জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটদের বাড়ী পর্য্যন্ত তারা চড়াও করত এবং কখনো শুধু হাতে ফিরত না। তারা ছিল যেমনি ছটপটে, তেমনি চটপটে। একে ত তাদের মুখে খই ফুটত, তার উপর চোখ কোথায় রাঙাতে হবে ও কোথায় নামাতে হবে, তা তারা দিব্যি জানত। স্কুলের ছেলেদের যত রকম ক্লাব ছিল, এক ভাই হ'ত তার সেক্রেটারি আর এক ভাই হ'ত তার ট্রেজেরার। তার পর স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে যত প্রকার আবেদন-নিবেদন করা হ'ত, রাম-শ্যাম ছিল সে সবের যুগপৎ কর্ত্তা ও বক্তা। উপরন্তু মাষ্টারদের অভিনন্দন দিতেও তারা ছিল যেমন ওস্তাদ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেও তারা ছিল তেমনি ওস্তাদ। এক কথায় সাবালক হবার বহুপূর্ব্বে তারা দুজনে হয়ে উঠেছিল স্কুল-পলিটিক্সের দুটি অ-তৃতীয় নেতা। এই নেতৃত্বের বলে তারা স্কুলটিকে একেবারে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে চাগিয়ে তুলেছিল। যতদিন তারা দু'ভাই সেখানে ছিল, ততদিন স্কুলটির জীবন ছিল, অর্থাৎ আজ নালিশ, কাল সালিশ, পরশু ধর্ম্মঘট এই সব নিয়েই স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়েছিল। ফলে কত ছেলে বেত খেলে, কত ছেলের নাম কাটা

গেল, কিন্তু রাম-শ্যামের গায়ে যে কখনও আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগল না, সে তাদের ডিপ্লোমাসির গুণে। ডিপ্লোমাসি যে পলিটিক্সের দেহ, সে সত্য তারা নিজেই আবিষ্কার করেছিল।

তার পর পলিটিক্সের যা প্রাণ, অর্থাৎ পেট্রিয়টিজম, সে বিষয়েও আর কেউ ছিল না যে, রাম-শ্যামের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারে। স্ব-স্কুল সম্বন্ধে তাদের মমত্ববোধ এত অসাধারণ ছিল যে, আমি যদি জর্ম্মান দার্শনিক হতুম, তা হ'লে বলতুম যে, সমগ্র স্কুলের "সমবেত আত্মা" তাদের দেহে বিগ্রহবান্ হয়েছিল। প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, তাদের স্কুলের সঙ্গে অপর কোন স্কুলের ছেলেদের ফুটবল ম্যাচ হ'লে রাম-শ্যাম তাতে যোগ দিত না বটে—কিন্তু সকলের আগে গিয়ে দাঁড়াত এবং প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমান বাক্যবর্ষণ করত,—কখনো স্বপক্ষকে উৎসাহিত করবার জন্য, কখনো বিপক্ষকে লাঞ্ছিত করবার জন্য। স্বপক্ষ জিৎলে তারা ইংরাজিতে "ব্রাভো" "হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" বলে' তারস্বরে চীৎকার করত। আর বিপক্ষদল জিৎলে তারা প্রথমেই রেফারিকে জুয়োচোর বলে' বসত, তাতে কেউ প্রতিবাদ করলে, রাম-শ্যাম অমনি, my 'School right or wrong বলে' এমনি হুঙ্কার ছাড়ত যে, স্বদলবলের ভিতর সে হুঙ্কারে যাদের স্কুল পেট্রিয়টিজম প্রকুপিত হয়ে উঠত, তারা বেপরোয়া হয়ে, বিপক্ষদলের সঙ্গে মারামারি করতে লেগে যেত। মারামারি বাধবামাত্র রাম-শ্যামের দেহ অবশ্য এক নিমেষে সেখান থেকে অন্তর্দ্ধান হ'ত, কিন্তু সেই যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের আত্মা বিরাজ করত। জানো ত আত্মার ধর্ম্মই এই যে, তা যেখানে আছে, সেখানে সর্ব্বত্রই আছে, কিন্তু কোথায়ও তাকে ধরে-ছুঁয়ে পাবার যো নেই।

রাম-শ্যামের এই বাল্যলীলা থেকে বোধ হয় তুমি অনুমান করতে পেরেছ যে, এরা দু'ভাই কলিযুগের যুগ-ধর্ম্মের অর্থাৎ পলিটিক্সের—যুগল অবতারস্বরূপে এই ভূ-ভারতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

শিক্ষা

রাম-শ্যাম ষোল বৎসরও অতিক্রম করলেন, সেই সঙ্গে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষাও উত্তীর্ণ হলেন, অবশ্য সেকেণ্ড ডিভিসনে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। যেমন তেমন করে' হোক্, হাতের পাঁচ রাখতে তাঁরা ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

এর পর তাঁরা কলকাতায় পড়তে এলেন। এই-খান থেকেই তাঁদের আসল পলিটিক্সের শিক্ষা-নবিসি সুরু হ'ল। কলেজে ভর্ত্তি হবামাত্র নিজের প্রতি তাঁদের ভক্তি যথোচিত বেড়ে গেল, এবং সেই সঙ্গে তাঁদের উচ্চ আশা সিমলাস্পর্দ্ধী হয়ে উঠল। সহসা তাঁদের হুঁস হ'ল যে, স্কুল-কলেজের মোড়লী করা-রূপ তুচ্ছ ব্যবসায়ের মজুরি তাঁদের মত শক্তিশালী লোকের পোষায় না। তাই তাঁরা মনস্থির করলেন, তাঁরা হবেন দেশ-নায়ক এবং পলিটিক্সের মহানাটকের অভিনয়ে যাতে সর্ব্বাগ্রগণ্য হ'তে পারেন, তার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হ'তে লাগলেন।

মহানগরীর অবহাওয়া থেকে এ তথ্য তাঁরা দু'দিনেই উদ্ধার করলেন যে, এ যুগে ধর্ম্মবলও বল নয়, কর্ম্মবলও বল নয়, একমাত্র বল হচ্ছে বুদ্ধিবল, ওরফে বাক্যবল। এ বল যে তাঁদের শরীরে আছে, তার পরিচয় তাঁরা স্কুলেই পেয়েছিলেন। স্বাক্ষরিত অভিনন্দনপত্র এবং বেনামী দরখাস্ত লিখে, জিভের জোরে একদিকে বড়দের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করে' আর এক দিকে ছোটদের কাছ থেকে ভয়ভক্তি আদায় করে' তাঁরা বাক্যবলের কতকটা চর্চ্চা ইতিপূর্ব্বেই করেছিলেন, এবার তার সম্যক্ অনুশীলনে প্রবৃত্ত হলেন।

রাম-শ্যাম যেমন এ ধরাধামে প্রবেশ করা মাত্র, তাঁদের জননীকে আপোষে আধাআধি ভাগ করে' নিয়ে নিশ্চিন্তমনে ভোগ-দখল করে-ছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করামাত্র, তাঁরা তদ্রূপ আপোষে মা-সরস্বতীকে আধাআধি ভাগ করে' নিয়ে, ভোগ-দখল করতে ব্রতী হলেন। বাণীর একালে দুটি অঙ্গ আছে:—এক রসনা, আর এক লেখনী। রাম ধরলেন বক্তৃতার দিক্, আর শ্যাম ধরলেন লেখার দিক্। এর কারণ, স্কুলে থাকতেই তাঁরা প্রমাণ পেয়েছিলেন যে, অভিনন্দন জবর হ'ত রামের মুখে আর অভিযোগ জবর হ'ত শ্যামের কলমে।

বলা বাহুল্য, নৈসর্গিক প্রতিভার বলে, অচিরে রাম হয়ে উঠলেন একজন মহাবক্তা আর শ্যাম হয়ে উঠলেন একজন মহালেখক। যা এক কথায় বলা যায়, রাম তা অনায়াসে একশ' কথায় বলতেন, আর যা এক ছত্রে লেখা যায়, শ্যাম তা অনায়াসে এক-শ'

ছত্রে লিখতেন। রাম-শ্যামের বক্তব্য অবশ্য বেশি কিছু ছিল না। তার কারণ, যারা অহর্নিশি পরের ভাবনা ভাবে, তারা নিজে কোন কিছু ভাববার কোন অবসরই পায় না। ফলে, অনেক কথা বলে' কিছু না বলার আর্টে তাঁরা Gladstone-এর সমকক্ষ হয়ে উঠলেন।

রামের মুখ ও শ্যামের কলম থেকে অজস্র কথা যে অনর্গল বেরত, তার আরও একটি কারণ ছিল। জ্ঞানের বালাই ত তাঁদের অন্তরে ছিলই না, তার উপরে যে ধর্ম্ম শরীরে থাকলে, মানুষের মুখে কথা বাধে, কলমের মুখে কথা আটকায়, সে ধর্ম্ম, অর্থাৎ সত্যমিথ্যার ভেদজ্ঞান, দুকড়ি দত্তের বংশধর-যুগলের দেহে আদপেই ছিল না! এ জ্ঞানের অভাবটা যে পলিটিক্সে ও গল্প-সাহিত্যে কত বড় জিনিস, সে কথা কি আর খুলে বলা দরকার?

যদি জিজ্ঞাসা করো যে, তাঁরা এই অতুল বাক্‌শক্তির চর্চ্চা কোথায় এবং কি সুযোগে করলেন, এক কথায়, কোথায় তাঁরা রিহার্সেল দিলেন?—তার উত্তর, কলেজের ছাত্রদের কলিকাতা সহরে, যতরকম সভা-সমিতি আছে, রাম তাতে অনবরত বক্তৃতা করতেন এবং শ্যাম সে সবের লেখালেখির কাজ দু'বেলা করতেন, তার উপর নানা কাগজে নানা ছদ্মনামে নানা সত্যমিথ্যা পত্রও লিখতেন। সে সকল অবশ্য ছাপাও হ'ত। বিনা পয়সায় লেখা পেলে কোন্ কাগজ ছাড়ে!

পূর্ব্বেই বলেছি, রাম-শ্যামের বক্তব্য বেশি কিছু ছিল না, কিন্তু যেটুকু ছিল, তার মূল্য অসাধারণ। মাণিকের খানিকও ভাল, এ কথা কে না জানে? একে ত তাঁদের ভাষা ছিল গালভরা ইংরেজি, তার উপর ভাব আবার বুকভরা পেট্রিয়টিক, এই মণিকাঞ্চনের যোগ দেখলে, প্রবীণদেরই মাথার ঠিক থাকে না,—নবীনদের কথা ত ছেড়েই দেও। তাঁদের সকল কথা—সকল লেখার মূলসূত্র ছিল এক। তাঁরা একালের ইউরোপের সঙ্গে সেকালের ভারতের তুলনা করে' দেখিয়ে দিতেন যে, একালের আর্থিক সভ্যতা সেকালের আধ্যাত্মিক সভ্যতার তুলনায় কত তুচ্ছ, কত হেয়। তাঁরা এই মহাসত্য প্রচার করতেন যে, অতীত ভারতই পতিত ভারতকে উদ্ধার করবে, অপর কোনও উপায় নেই। রামের মুখে এ কথা শুনে, শ্যামের লেখায় এ কথা পড়ে', আমাদের সকলের চোখেই জল আস্‌ত, আর দু'চারজন উৎসাহী লোক ঘর ছেড়ে বনেও চলে' গেল—অতীতের সন্ধানে। এর পর, রাম-শ্যামের পেট্রিয়টিজমের খ্যাতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাচীর টপকে যে সমগ্র সহরে ছড়িয়ে পড়ল, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?—সে ত হবারই কথা।

রাম-শ্যাম দেশের অতীত সম্বন্ধে যতই বলা-কওয়া করুন না কেন, নিজেদের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে কিন্তু সম্পূর্ণ সতর্ক ছিলেন। দেশের ভবিষ্যতের উপায় যাই হোক্, নিজের ভবিষ্যৎ যে বর্ত্তমানের সাহায্যেই গড়ে' তুলতে হয়, এ জ্ঞান তাঁরা ভুলেও হারান নি। পাশ না করলে যে পয়সা রোজগার করা যায় না, আর বাক্যের পিছনে অর্থ না থাকলে তার যে কোনও বলই থাকে না,—এ পাকা কথাটা তাঁরা ভাল রকমই জানতেন। তাই তাঁরা যথাসময়ে বি-এ এবং বি-এল পাস করলেন, দুই-ই অবশ্য সেকেণ্ড ডিভিসনে। ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করলে লোকে বল্‌ত খুব মুখস্থ করেছে, আর থার্ড ডিভিসনে পাস করলে বল্‌ত ভাল মুখস্থ কর্‌তে পারে নি। এই দুই অপবাদ এড়াবার জন্যই তাঁরা সেকেণ্ড ডিভিসনে স্থান নিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিলেন। মুখস্থ অবশ্য তাঁরা ঢের করেছিলেন, সে কিন্তু সেই সব বড় বড় ইংরেজি কথা, যা বক্তৃতার আর লেখার কাজে লাগে।

সংসারের বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রের তাঁরা যে কোন্ ক্ষেত্র দখল কর্‌বেন, সে বিষয়ে তাঁরা একদম মনস্থির করে' ফেল্‌লেন। রাম ঠিক কর্‌লেন, তিনি হবেন একজন বড় উকিল, আর শ্যাম ঠিক করলেন, তিনি হবেন একজন বড় এডিটার। এর থেকে তুমি যে [illegible] মনে ক'রো না যে, তাঁরা পলিটিক্সের দি[illegible]েন, ফেরাবার বন্দোবস্ত কর্‌লেন। রাম-শ্যা[illegible]ক দশ বৎসর অত বে-হিসেবী ছেলে ছিলেন না। [illegible]বার সদর্পে জানতেন যে, পেট্রিয়টিজমের সাহায্যে তা[illegible]ত, যুগল-উন্নতি লাভ করবে, আর একবার ব্যবসায় উন্ন[illegible] চেহারা করতে পারলে, দেশের লোক ধরে' নিয়ে [illegible] তাদের পলিটিক্সের নেতা করে' দেবে।

এইখানে একটি কথা বলে' রাখি। আকৃতি-প্রকৃতিতে রামের সঙ্গে শ্যামের পোনেরো আনা তিন পাই মিল থাকলেও এক পাই গরমিল ছিল, যে গরমিল একবৃন্তে দুটি ফুলের মধ্যে চিরদিনই থেকে যায়।

প্রথমতঃ রামের ছিল মোটার ধাত, আর শ্যামের রোগার ধাত। দ্বিতীয়তঃ রামের কণ্ঠস্বর ছিল ভেরীর মত, আর শ্যামের তূরীর মত, জোর অবশ্য দু'য়েরি সমান ছিল, কিন্তু একটা খাদের দিকে, আর একটা জিলের দিকে।

কালিদাস বলে' গেছেন যে, বড়লোকের প্রজ্ঞা তাদের আকারের সদৃশ হয়। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল

যে, কবির কথা মিথ্যে নয়। দু'জনের মধ্যে রাম ছিলেন অপেক্ষাকৃত সুস্থ, আর শ্যাম অপেক্ষাকৃত ব্যস্ত। রাম ছিল, বেশি দরবারী, আর শ্যাম ছিল, বেশী তকরারী। রামের কৃতিত্ব ছিল হিকমতে, শ্যামের হুজ্জুতে। রাম সিদ্ধহস্ত ছিল দল পাকাতে, আর শ্যাম দল ভাঙাতে। এক কথায় দলাদলী ছিল রামের পেশা, আর শ্যামের নেশা। রামের motto ছিল আগে ভেদ, তার পরে বিগ্রহ; কেন না, রাম চাইতেন, লোকে তাঁকে ভক্তি করুক, আর শ্যাম চাইতেন, লোকে ভয় করুক। তাঁদের চরিত্রের প্রভেদটা একটি ব্যাপার থেকেই স্পষ্ট দেখান যায়। আগেই বলেছি যে, স্কুল-কলেজে যত প্রকার সভা-সমিতি ছিল, এই ভ্রাতৃযুগল সে সবের সেক্রেটারি ও ট্রেজারের পদ অধিকার ক'রে বস্‌তেন। কিন্তু রাম বরাবর ট্রেজারারই হতেন আর শ্যাম সেক্রেটারি।

এ হেন চরিত্র এ হেন বুদ্ধি নিয়ে রাম ও শ্যাম যখন সংসারের রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, তখন সকলেই বুঝল যে, তাঁরা জীবনে একটা বড় খেলা খেলবেন।

তৃতীয় অঙ্ক

পেট্রিয়টিজম।

যিনি মহাপুরুষ-চরিতের চর্চ্চা করেছেন, তিনিই জানেন যে, তাঁদের জীবনের একটা ভাগ তাঁরা অজ্ঞাতবাসে কাটান; সে সময় তাঁরা কোথায় স্কুল ... কি করেছেন, সে খবর কেউ জানে না।

বেপরোয়া ... য ছাড়বার পর রাম-শ্যাম দশ বৎসরের জন্য লেগে যেত ... অন্তরালে চলে' গিয়েছিলেন। এ কয় দেহ অবশ্য ...া যে কোথায় ছিলেন এবং কি করেছেন, হ'ত, কিন্তু ...র কেউ জানে না।

করত। তার পর স্বদেশী যুগে তাঁদের পুনরাবির্ভাব হলো। সে "বন্দে মাতরম্"-এর ডাক শুনে তাঁদের সুপ্ত মাতৃ-ভক্তি আবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, তাঁরা আর স্থির থাকতে পারলেন না, অমনি অজ্ঞাতবাস ছেড়ে প্রকাশ্য মাতৃসেবায় লেগে গেলেন। যে অগাধ মাতৃ-ভক্তি শৈশবে তাঁদের গর্ভধারিণীর হৃদয়ের উপর ন্যস্ত ছিল, পূর্ণযৌবনে তা তাঁদের জন্মভূমির পৃষ্ঠে গিয়ে ভর করলে। লোকে ধন্য ধন্য করতে লাগল।

বাতাসের স্পর্শে জল যেমন নেচে ওঠে, আগুনের স্পর্শে খড় যেমন জলে' ওঠে, রামের রসনা আর শ্যামের লেখনীর স্পর্শে, আমাদের হৃদয় তেমনি উদ্বেলিত আন্দোলিত হয়ে উঠল। আমাদের উৎসাহ তেমনি সংধুক্ষিত প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

এবার তাঁরা ধরলেন এক নতুন সুর। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অতীতকে টেঁকে গুঁজে, ভারতবর্ষের আর্থিক ভবিষ্যতের তাঁরা ব্যাখান সুরু করলেন। তাঁদের বাক্যবলে সে ভবিষ্যৎ অন্নবস্ত্রে ধনরত্নে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এ ছবি দেখে সকলেরি মুখে জল এল। যারা পূর্ব্বে বনে চলে' গিয়েছিল, তারা আবার ঘরে ফিরে এল।

রাম যখন স্পষ্ট করে' বললেন যে, "আমি দেশের চিনি খাব," আর শ্যাম যখন স্পষ্ট করে' লিখলেন যে, "আমি বিদেশের নুণ খাব না"—তখন আর কারও বুঝতে বাকী থাকল না যে, অতঃপর রামের মুখ দিয়ে শুধু মধুক্ষরণ হবে, আর শ্যামের কলম শুধু দেশের গুণ গাইবে, অর্থাৎ তাঁরা দু'জনে একমনে একালের যুগধর্ম্ম প্রচার করবেন, অমনি আমাদের মনে তাঁদের প্রতি ভক্তি উথলে উঠল।

যুগধর্ম্মের প্রচারে যাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, তার জন্য দেশের লোক চাঁদা করে' টাকা তুলে শ্যামের জন্য একখানি ইংরেজি কাগজ বার করে' দিলেন, সে কাগজের নাম হ'ল—Nationalist. শ্যামের হাতে পড়ে' সেখানি হয়ে উঠল—একখানি চাবুক। শ্যাম সজোরে তা আকাশের উপর চালাতে লাগলেন, তার পটপটানির আওয়াজে, আকাশ-বাতাস ভরে' গেল। সেই রণবাদ্য শুনে আমাদের বুকের পাটা দশগুণ বেড়ে গেল।

কথায় বলে, দিন যেতে জানে, ক্ষণ যেতে জানে না। শ্যামের ভাগ্যে ঘটলও তাই। এই চাবুক দৈবাৎ একদিন একটি বড় সাহেবের গায়ে লেগে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ শ্যামের বিরুদ্ধে মানহানির নালিশ করলেন। দেশময় রৈ রৈ হৈ হৈ পড়ে' গেল।

যথাসময়ে ফৌজদারী আদালতে শ্যামের বিচার হ'ল এবং এই সূত্রে রাম তাঁর অসাধারণ আইনের জ্ঞান ও অসামান্য ওকালতি-বুদ্ধি দেখাবার একটি অপূর্ব্ব সুযোগ পেলেন। রামের জেরার জোরে বাহাজের বলে, আইনের হিক্‌মতে মামলা মাজপথেই ফেঁসে গেল। রাম নিম্ন আদালতে আইনের যে সব কূটতর্ক তুলেছিলেন, সে তর্ক এখানে তুললে তুমি ভেবড়ে যাবে, কেননা, তার মর্ম্ম তুমি বুঝতে পারবে না; বেচারা ম্যাজিস্ট্রেটও তার নাগাল পায় নি। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি কি রকম বুদ্ধি খেলিয়েছিলেন, তার একটা পরিচয় দিই। রাম এই আপত্তি তুললেন যে, ইংরেজের ইংরেজির যা মানে, শ্যামের ইংরেজির সে মানে করলে, আসামীর উপর সম্পূর্ণ অবিচার

করা হবে। কেন না, শ্যাম যে ভাষা লেখেন, সে তাঁর নিজস্ব-ভাষা, এক কথায় সে হচ্ছে শ্যামের স্বকৃত-ভঙ্গ ইংরেজি! বাঙলা খুব ভাল না জানলে সে ইংরেজির যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ফরিয়াদির সাহেব-কৌঁচুলি এ আপত্তির আর কোনও উত্তর দিতে পারলেন না, কেননা, তিনি এ কথা অস্বীকার করতে পারলেন না যে, শ্যামের ইংরেজি ইংলণ্ডের ইংরেজি নয়। শ্যাম খালাস হলেন; লোকে রাম-শ্যামের জয় জয়কার করতে লাগল।

শ্যাম যে দিন খালাস পেলেন, বাঙলার সেদিন হ'ল—ইংরেজরা যাকে বলে, একটি 'লাল হরফের দিন'। লোকের অমন আনন্দ, অমন উল্লাস, সেদিনের পূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নি।

এমন কি, এই ফচ্‌কে কলকাতা সহরের লোক-রাও সেদিন যা কাণ্ড করেছিল, তা এতই বিরাট যে, বীরবলী ভাষায় তার বর্ণনা করা অসাধ্য, তার জন্য চাই "মেঘনাদ-বধ"-এর কলম। রাম-শ্যামকে একটি ফিটানে চড়িয়ে হাজার হাজার লোকে বড় রাস্তা দিয়ে সেই ফিটান যখন টেনে নিয়ে যেতে লাগল, তখন পথ-ঘাট সব লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল, এত লোক বোধ হয় জগন্নাথের রথযাত্রাতেও একত্র হয় না। লোকে বললে, রাম-শ্যাম কৃষ্ণার্জ্জুন। তার পর এই যুগলমূর্ত্তি দেখবার জন্য জনতার মধ্যে এমনি ঠেলাঠেলি মারামারি লেগে গেল যে, কত লোকের যে হাত-পা ভাঙলে,তার আর ঠিকানা নেই।

আমি ভিড় দেখলে ভড়কাই—ওর ভিতর পড়লে বেঁহোস হয়ে যাবার ভয়ে এবং সেই ভয়ে চড়কের সং দেখা ছাড়া অপর কোনও শোভা-যাত্রা দেখতে কখনও ঘর থেকে বার হইনে। কিন্তু সেদিন উৎসাহের চোটে আমিও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলুম। চোরবাগানের মোড়ে গিয়ে যখন দেখলুম যে, চিৎপুরের দুধার থেকে রাম-শ্যামের মাথায় পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, তখন আমার চোখে জল এসেছিল। আর কোনও গুণের না হোক, পেট্রিয়টিজমের সম্মান যে বাঙালী করতে জানে, সেদিন তার চূড়ান্ত প্রমাণ হয়ে গেল।

এইখান থেকেই দেশ আবার মোড় ফিরলে; অর্থাৎ এই ঘটনার অব্যহতি পরেই স্বদেশী আন্দোলন উপরের চাপে বসে' গেল। কত ছা-পোষা লোকের চাকরি গেল। কত ছেলের স্কুল থেকে নামকাটা গেল, কত যুবক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হ'ল, বাদবাকী আমরা সব একদম দমে' গেলুম। রাম-শ্যামের গায়ে কিন্তু আঁচড়টি পর্য্যন্ত লাগল না। অনেক কথা বলে' কিছু-না-বলার আর্টের যে কি গুণ, এবার তার পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁরা অবশ্য দমেও গেলেন না। এ দুই ভাই এই হাঙ্গামার ভিতর থেকে শুধু যে অক্ষত-শরীরে বেরিয়ে এলেন, তাই নয়—তাঁদের মনেরও কোন জায়গায় আঘাত লাগল না; কেননা, স্বদেশীর সকল কথাই দিবারাত্র তাঁদের মুখের উপরই ছিল, তার একটি কথাও তাঁদের বুকের ভিতর প্রবেশ করবার ফুরসৎ পায় নি!

রামের ওকালতির সনন্দ আর শ্যামের খবরের কাগজ দুই-ই অবশ্য তাঁদের হাতেই রয়ে গেল। তার পর দেশ যখন জুড়ল, তখন রামের ওকালতির পসার ও শ্যামের কাগজের প্রসার, শুক্ল-পক্ষের চন্দ্রের মত দিনের পর দিন আপনা হ'তেই বেড়ে যেতে লাগল। সেক্সপিয়র বলেছেন যে, মানুষমাত্রেরই জীবনে এমন একটা জোয়ার আসে, যার ঝুঁটী চেপে ধরতে পারলে তার কাঁধে চড়ে' যেখানে প্রাণ চায়, সেখানেই যাওয়া যায়। যে স্বদেশীর জোয়ারে আমরা সকলেই হাবুডুবু খেলুম এবং অনেকে একেবারে ডুবে গেল, রাম-শ্যাম তার কাঁধে চড়ে' একজন বড় উকিল আর একজন বড় এডিটার হ'তে চললেন।

চতুর্থ অঙ্ক

ইভলিউসান।

অবতারের কথা হচ্ছে—"সম্ভবামি যুগে যুগে"। মহাপুরুষদের লীলাও নিত্য-লীলা নয়। তাঁরা অনাবশ্যক দেখা দেন না, যখন দরকার বোঝেন, তখনই আবার আবির্ভূত হন।

স্বদেশী আন্দোলন চাপা পড়বার ঠিক দশ বৎসর পরে রাম-শ্যাম রাজনীতির আসরে আবার সদর্পে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু সে এক নব মূর্ত্তিতে, যুগল-রূপে নয়—স্ব স্ব রূপে। তাঁদের উভয়ের-ই চেহারা আর সাজগোজ ইতিমধ্যে এতটা বদলে গিয়েছিল যে, তাঁদের দুজনকে যমজ ভ্রাতা ত অনেক দূরের কথা, পরস্পরের ভ্রাতা ব'লেই চেনা গেল না।

রামের দেহটি হয়েছিল ঠিক ঢাকের মত, আর শ্যামের হয়েছিল তার কাঠির মত, এর কারণ, রামের হয়েছিল বহুমূত্র আর শ্যামের শ্বাসরোগ।

তাদের বেশভূষাও একদম বদ্‌লে গিয়েছিল। এবার দেখা গেল, রামের দাড়ি-গোঁফ দুই-ই কামানো, মাথার চুল কয়েদিদের ফ্যাসানে ছাঁটা এবং পরণে ইংরেজি-পোষাক। হঠাৎ দেখ্‌তে পাকা বিলেত-ফেরত বলে' ভুল হয়। অপরপক্ষে শ্যামের দেখা গেল, দাড়ি গোঁফ চুল সবই অতি প্রবৃদ্ধ,

পরণে থানধুতি, গায়ে আঙরাখা, পায়ে তালতলার চটি, হঠাৎ দেখতে ঘোর থিয়জফিষ্ট বলে' ভুল হয়।

এ হেন রূপান্তরের কারণ, ইতিমধ্যে রাম হয়ে উঠেছিলেন একজন বড় উকিল আর শ্যাম হয়ে উঠেছিলেন, একজন বড় এডিটার! এই বড় হবার চেষ্টার ফলেই তাঁদের এতাদৃশ বদল হয়েছিল। রামের পসার যেমন বাড়তে লাগল, তিনি চাল-চলনে তেমনি সাহেবি-আনার দিকে ঝুঁকতে লাগলেন, আর যত তিনি সেই দিকে ঝুঁকতে লাগলেন, তত তাঁর পসার বাড়তে লাগল। অপর পক্ষে শ্যামের কাগজের প্রসার যেমন বাড়তে লাগল, তেমনি তিনি হিঁদুয়ানীর দিকে ঝুঁকতে লাগলেন; আর যত তিনি হিঁদুয়ানীর দিকে ঝুঁকতে লাগলেন,—তত তাঁর কাগজের প্রসার বাড়তে লাগল।

তাঁরা যে দুটি রোগ সংগ্রহ করেছিলেন, সেও ঐ বড় হবার পথে। এ দেশে মস্তিষ্কের বেশি চর্চ্চা করলে হাঁপানি হয়, এ কথা কে না জানে।

বাইরের চেহারার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মনের চেহারাও ফিরে গিয়েছিল।

এই দশ বৎসরের মধ্যে রাম হয়ে উঠেছিলেন একজন রিফরমার, আর শ্যাম একজন নব্য-হিন্দু। সমাজ-সংস্কার ছাড়া রামের মুখে অপর কোনও কথা ছিল না, আর বেদান্ত ছাড়া শ্যামের মুখে অপর কোনও কথা ছিল না। রাম বলতেন বাল্য-বিবাহ বন্ধ না হ'লে দেশের কোনও উন্নতি হবে না, আর শ্যাম বলতেন, "অথাতো ব্রহ্ম" জিজ্ঞাসা না করলে দেশের কোনও উন্নতি হবে না। রাম বলতেন যে দেশের লোক যদি শক্তিশালী হ'তে চায় ত তাদের Eugenics মেনে চলতে হবে, আর শ্যাম বলতেন, ওর জন্য "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" মেনে চলতে হবে। রাম বলতেন, জাতিভেদ তুলে দিতে হবে, শ্যাম বলতেন, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ফিরে আনতে হবে। এক কথায় রাম দোহাই দিতেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আর শ্যাম প্রাচ্য-দর্শনের। বলা বাহুল্য, রামের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জ্ঞান, আর শ্যামের প্রাচ্য-দর্শনের জ্ঞান দুই ছিল তুল্যমূল্য।

এর থেকে অবশ্য মনে করো না যে, আচারে বিচারে রাম-শ্যামের ভিতর কোনরূপ প্রভেদ ছিল। যে কৌশলে কথা মুখে রাখলেও তা পেটে যায় না—সে কৌশলে তাঁরা চিরাভ্যস্ত ছিলেন। রাম তাঁর মেয়েদের যথাসময়ে অর্থাৎ দশ বৎসর বয়েসেই পাত্রস্থ করতেন,—প্রধানত পাত্রের জাত ও কুল দেখে, আর নিত্য মুরগি না খেলে শ্যামের অম্বল হ'ত, আর চায়ের বদলে Bovril না খেলে তিনি জোর কলমে লেখবার মত বুকের জোর পেতেন না। সুরা অবশ্য দুজনেই পান করতেন, উভয়ে কিন্তু এ ক্ষেত্রে এক রসের রসিক ছিলেন না। রাম খেতেন হুইস্কি আর শ্যাম ব্রাণ্ডি।

রাম-শ্যামের কথার সঙ্গে কাজের এই গরমিলটা ইউরোপে অবশ্য দোষ বলে' গণ্য হ'ত—তার কারণ, ইউরোপের মোটা বুদ্ধি, সত্যের সঙ্গে ব্যবহারিক সত্যের প্রভেদটা ধরতে পারেনি। রাম এ সত্য জানতেন যে, সত্য কাজে লাগে অপর লোকের, আর শ্যাম জানতেন যে, ও-বস্তু কাজে লাগে পরলোকের। নিজের ইহলোকের জীবন সুখে যাপন করতে হ'লে যে ব্যবহারিক সত্য মেনে চলতে হয়, এ জ্ঞান রাম-শ্যাম দুজনেরই সমান ছিল।

পঞ্চম অঙ্ক

পলিটিক্স।

এবার অবশ্য দুজনে দু-দলের নায়ক হয়েই রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। রাম হলেন দক্ষিণ মার্গের মহাজন ও শ্যাম বাম মার্গের। এর কারণ, শৈশবে রাম লালিত-পালিত হয়েছিলেন মা'র ডান কোলে আর শ্যাম তাঁর বাঁ কোলে।

দু'দলে যুদ্ধের সূত্রপাত হ'ল সেই দিন, যেদিন তারে খবর এল যে, জর্ম্মানরা চাই কি ভারতবর্ষের উপরেও চড়াও হ'তে পারে।

এই সংবাদ যেই পাওয়া, অমনি রাম প্রকাশ্য সভায় বজ্রগম্ভীরস্বরে ঘোষণা করলেন,—"আমি যুদ্ধ করব।" দেশের বাতাস অমনি কেঁপে উঠল। শ্যাম তার ঠিক পরের দিনই নিজের কাগজে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখলেন, "আমি যুদ্ধ করব না।" দেশের আকাশ অমনি চমকে উঠল।

রাম-শ্যামের এই দৃঢ় সংকল্পের সংবাদ শুনে, যুদ্ধের কর্ত্তৃপক্ষেরা ভীত কিম্বা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, অদ্যাবধি তার কোনও পাকা খবর পাওয়া যায় নি; সম্ভবত আগামী Peace Conference-এ সে কথা প্রকাশ পাবে।

কিন্তু এর প্রত্যক্ষ ফল হ'ল এই যে, স্বদেশ-রক্ষা আগে না স্ব-রাজ্যলাভ আগে, এই নিয়ে দেশময় একটা মহাতর্ক বেধে গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোক দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। যারা রক্ষণশীল, তারা হ'ল রাম-পন্থী আর যারা অরক্ষণশীল, তারা হ'ল শ্যাম-পন্থী। রামের দল হ'ল ওজনে ভারি আর শ্যামের দল হ'ল সংখ্যায় বেশি। তার কারণ, যারা মোটা, তারা হ'ল রামের

চেলা, আর যারা রোগা, তারা হ'ল শ্যামের চেলা। বাঙলাদেশে মোটাদের চাইতে রোগারা যে দলে ঢের বেশি পুরু—সে কথা বলাই বেশি। এর পর দু'দলে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ যে বেধে যাবে, সে কথা সকলেই টের পেলে। দেশের জন্য যারা কেয়ার করে, তারা মনমরা হয়ে গেল ; যারা করে না, তারা তামাসা দেখবার জন্য উৎসুক হ'ল ; যারা ঘুমিয়ে আছে—তারা একবার জেগে উঠে আবার পাশ ফিরে শুলে। আর বিলেতি কাগজ-ওয়ালারা মহানন্দে বলতে লাগল,—"নারদ" "নারদ"।

যুদ্ধের প্রস্তাবে যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল, রিফরমের প্রস্তাবে সে যুদ্ধ দস্তুরমত বেধে গেল।

রিফরমের প্রতি রাম হলেন দক্ষিণ আর শ্যাম হলেন বাম। এ দেশের মেয়েরা বাড়ীতে ছেলে হলে যে রকম আনন্দে নৃত্য করে, রাম সেই রকম নৃত্য করতে লাগলেন,—আর মেয়ে হলে তারা যে রকম হা-হুতাশ করে, শ্যাম সেই রকম হা-হুতাশ করতে লাগলেন। রাম বললেন, "রিফরম গ্রাহ্য, কিন্তু তার বদল চাই"। শ্যাম অমনি বলে' উঠলেন —"রিফরম অগ্রাহ্য, কেননা, তার বদল চাই"।

এই দুটি বাক্যের ভিতর এক Syntax ছাড়া আর কি প্রভেদ আছে—দেশের লোকে প্রথমে তা ঠাহর করতে পারে নি ; তারা মনে করেছিল যে, একই কথা রাম বলছেন—positive আকারে আর শ্যাম বলছেন negative আকারে। তাঁদের সে ভুল তাঁরা দু'দিনেই ভাঙ্গিয়ে দিলেন।

রাম যখন বুঝিয়ে দিলেন যে, শ্যামের মত নেতি-মূলক" আর শ্যাম যখন বুঝিয়ে দিলেন যে, রামের মত "ইতি-অন্ত", তখন আর কারও বুঝতে বাকী থাকল না যে, রিফরমার ও বৈদান্তিকে যা প্রভেদ, এ উভয়ের মধ্যে ঠিক সেই প্রভেদ আছে ; অর্থাৎ দক্ষিণ মার্গ হচ্ছে পাশ্চাত্য আর বাম মার্গ হচ্ছে প্রাচ্য।

এর পর দু'দলে প্রকৃত লড়াই লাগল। রাম-শ্যাম উভয়েই কিন্তু একটু মুস্কিলে পড়ে' গেলেন। স্বদেশী যুগে একজন করতেন বক্তৃতা আর একজন লিখতেন কাগজ। কিন্তু স্বরাজের যুগে পরস্পরের ছাড়াছাড়ি হওয়ার দরুণ প্রত্যেককেই অগত্যা যুগপৎ লেখক ও বক্তা হ'তে হ'ল। অর্থাৎ দু'জনেই আবার বাল্য-জীবনে ফিরে গেলেন। শ্যাম বক্তৃতা সুরু করে' দিলেন, আর রাম কাগজ বার করলেন। সে কাগজের নাম রাখা হ'ল Rationalist.

বলা বাহুল্য, Rationalist-এর সঙ্গে Nationalist-এর তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ বেধে গেল। Rationalist খুলে দেখো, তাতে Nationalist-এর কেচ্ছা ছাড়া আর কিছু নেই আর Nationalist খুলে দেখো, তাতে Rationalist-এর কেচ্ছা ছাড়া আর কিছু নেই।

নির্ব্বিবাদী লোক বাঙলাতেও আছে এবং নির্বিবাদী বলে' তারা যে একেবারে নির্ব্বোধ কিম্বা পাষণ্ড, তাও নয়। ব্যাপার দেখে শুনে এই নিরীহের দল তিতিবিরক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু বিরক্ত হয়ে ঘরে বসে' থাকার ফল হচ্ছে শুধু ঘরের ভাত বেশি করে' খাওয়া, এতে করে' দেশের যে কোনও উপকার হয় না, সে জ্ঞান এই নিরপেক্ষ দলের ছিল। শেষটা তাঁরা-রাম-শ্যামের ভিতর একটা আপোষ মীমাংসা করে' দেবার জন্য হরিকে তাঁদের কাছে দুত পাঠালেন। হরিকে পাঠাবার কারণ এই যে, তার তুল্য গো-বেচারা এ দেশে খুব কমই আছে, তার উপর সে ছিল রাম-শ্যামের চিরানুগত বন্ধু।

হরি প্রস্তাব করলে যে, দুজনে মিলে যদি Rational-natioalist কিম্বা National-rationalist হন, তা হ'লে দুদিক রক্ষা পায়। এ প্রস্তাব অবশ্য উভয়েই বিনা বিচারে অগ্রাহ্য করলেন, কেননা, দু'জনের ই মতে rationalism এবং nationalism হচ্ছে দিনরাতের মত ঠিক উল্টো উল্টো জিনিস ; একটি যেমন সাদা আর একটি তেমনি কালো, যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর ও-দুই কিছুতেই এক হ'তে পারে না। হরি মধ্যস্থতা করতে গিয়ে বেজায় অপদস্থ হলেন! রামের চেলারা তাঁকে বললেন কবি, আর শ্যামের চেলারা দার্শনিক। হরির লাঞ্ছনা দেখে, আর কেউ সাহস করে' মিটমাট করতে অগ্রসর হ'ল না।

দলাদলী থেকেই গেল, শুধু থেকে গেল না, ভয়ঙ্কর বাড়তে লাগল। ঢাকে-কাঠিতে যখন মারামারি বাধে, তখন মানুষের কান কি রকম ঝালাপালা হয়, তা ত জানই। দেশের লোক মনে মনে বললে, এখন থামলে বাঁচি, কিন্তু এই গোল থামা দূরে থাক, ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে পড়ল এবং সেও কতকটা রাম-শ্যামের চালের গুণে।

এতদিনে রাম-শ্যামের এ জ্ঞান জন্মেছিল যে, বাঙালীতে কোনও বাঙালীকে বড় লোক বলে' মানে না, যতক্ষণ না সে মরে। অতএব পরস্পরের সঙ্গে পলিটিক্সের লড়াই নিরাপদে লড়তে হ'লে উভয়ের পক্ষেই এক একটি বিদেশী শিখণ্ডী সুমুখে খাড়া করা দরকার। কেননা, বাঙালীর বিশ্বাস, মানুষের মত মানুষ দেশে নেই, আছে শুধু বিদেশে।

রাম তাই মুরুব্বি পাকড়ালেন বোম্বাইয়ের চোরজি ক্রোড়জি কলওয়ালাকে। Rationalist

অমনি লিখলে,—কলওয়ালার মত অত বড় মাথা ভারতবর্ষে আর কারও নেই।

অপরপক্ষে শ্যাম মুরুব্বি পাকড়ালেন মাদ্রাজের কৃষ্ণমূর্ত্তি গৌরীপাদং আইনআচারিয়ারকে। Nationalist অমনি লিখলে,—"আইন-আচারিয়ারের মত অত বড় বুক ভারতবর্ষে আর কারও নেই।"

এর জবাবে Rationalist লিখলে,—"অব্রাহ্মণের যে ছায়া মাড়ায় না, সেই হ'ল শ্যামের মতে ডিমোক্রাটের সর্দ্দার"। পাল্টা জবাবে Nationalist লিখলে—"কলের কুলির রক্ত চুষে যে জোঁকের মত মোটা ও লাল হয়েছে—সেই হ'ল রামের মতে ডিমোক্রাটের সর্দ্দার। বেচারা কলওয়ালা—বেচারা আইন-আচারিয়ার! দু'জনেই সমান গাল খেতে লাগল।

যে সব বাঙালী দলাদলীর বাইরে ছিল, তারা এ ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। কেননা, বাঙলার নেতাদ্বয় স্বজাতকে বুঝিয়ে দিলেন যে, বাঙালীর মাথাও নেই, বুকও নেই, যে ক'জনের আছে, তারা হয় এ দলে, নয় ও-দলে ভর্ত্তি হয়েছে। এ কথার পর আমাদের আর মুখ থাকল না। লজ্জায় আমরা অধোবদন হয়ে গেলুম।

কিন্তু সব দেশেই এমন দু'চার জন অবুঝ লোক থাকে—যারা কোনও জিনিষ সহজে বোঝে না। তারা ধরে' নিলে যে, মেড়া লড়ে খোঁটার জোরে, সুতরাং তারা সেই খোঁটার অনুসন্ধানে বেরল, এবং দু'দিনেই তার খোঁজ পেলে। রাম ও শ্যাম দুজনেই তাদের কানে কানে বল্লেন যে, তাঁদের পিছনে আছে,—বিলেত। রামের বিশ্বাস, তিনি হাতিয়েছেন বিলেতের Capital আর শ্যামের বিশ্বাস, তিনি হাত করেছেন বিলেতের labour. এই ভরসায় দু'পক্ষেরই বড়রা মনে করলে যে, তারা নির্ঘাত মন্ত্রী হবে। এর পর দুদলের কি আর মিল হয়? যা হ'তে পারে, সে হচ্ছে একদম ছাড়াছাড়ি এবং হলও তাই।

রাম সদলবলে দ্বারিকায় গিয়ে এক মহাসভা করলেন, আর শ্যাম রামেশ্বরে গিয়ে আর এক মহাসভা করলেন। ফলে একদিকে মোটা ভাই চোটা-ভাই বাটুলিওয়ালা কাথলিওয়ালাদের আনন্দে বাক্‌রোধ হয়ে গেল, অন্য দিকে বেঙ্কট কেঙ্কট জম্বুলিঙ্গম কোটীলিঙ্গমদেরও উৎসাহে দশা ধরল।

রামের চেলারা বল্লেন—"আমরা ভারতবর্ষে রামরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করব," শ্যামের চেলারা সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন—"আমরা ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-রাজ্যের সংস্থাপন করব"। Nationalist বিপক্ষের উপরে এই বলে' চাপান দিলে যে, "তোমরা যা প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাচ্ছ, তার নাম রামরাজ্য নয়, তোমাদের আরাম-রাজ্য"। Rationalist অমনি উতোর গাইলে—"তোমরা যার স্থাপনা করতে চাচ্ছ—তার নাম ধর্ম্মরাজ্য নয়—তোমাদের শর্ম্ম-রাজ্য"।

লাভের মধ্যে দাঁড়াল এই যে, বাঙলায় রিফরমের কথাটা চাপা পড়ে' গেল, তার পরিবর্ত্তে রাম বড়, না শ্যাম বড়, এইটে হয়ে উঠল আসল মীমাংসার বিষয়। ছেলেবেলায় রাম-শ্যামের জীবনের যেটা ছিল রহস্য, সেইটে হয়ে উঠল এখন সমস্যা।

এ সমস্যার মীমাংসা আজ করা কিন্তু অসম্ভব, কেন না, "স্বরাজ" এখন রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত আকাশে ঝুলছে, অতঃপর তা উড়ে স্বর্গে যাবে, কি ঝরে' মর্ত্ত্যে পড়বে, সে কথা রামও বল্‌তে পারেন না, শ্যামও বলতে পারেন না। হরি বলে, ও এখন অনেক দিন ঐ মাথার উপরেই ঝুল্‌বে। কিন্তু ধরো যদি যে, রিফরম-স্কিমটি যেমন আছে, ঠিক তেমনি এদেশে ভূমিষ্ঠ হয়, তা হ'লেই যে এ সমস্যার মীমাংসা হবে, তাই বা কি করে' বলা যায়? হয় ত তখন দেখা যাবে যে, রাম হয়েছেন বাঙলার Finance minister, আর শ্যাম হয়েছেন তার Chief-secretary! তা হ'লে?—

তবে এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, ভারত-মাতা রাম-শ্যামের টানাটানিতে নিশ্চয়ই খাড়া হয়ে উঠবেন, যদি ইতিমধ্যে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে এবং তা ঘটবার সম্ভাবনা যে নেই, সে কথা চোখের মাথা না খেলে বল্‌বার যো নেই। মা এখন ইনফ্লুঞ্জা নামক মারাত্মক ক্ষয়রোগে যেরকম আক্রান্ত হয়েছেন, তাতে করে' তাঁর পক্ষে হঠাৎকারে রাম-শ্যামের হাত এড়িয়ে চলে যাবার আটক কি?—"আমার কথা ফুরল নটে-গাছটি মুরল"।

বীরবল।

পুনশ্চ।

এ গল্প পড়ে' আমার গৃহিণী বললেন—"কৈ, গল্প ত শেষ হ'ল না?" আমি কাষ্ঠহাসি হেসে উত্তর করলুম—"এ গল্পের মজাই ত এই যে, এর শেষ নেই। এ গল্প এ দেশে কবে যে সুরু হয়েছে—তা কারও স্মরণ নেই, আর কখনও যে শেষ হবে, তারও কোন আশা নেই। এ গল্প যদি কখনো শেষ হ'ত, তা হ'লে ভারতবর্ষের ইতিহাস এ পৃথিবীর সব চাইতে বড় ট্রাজেডি হ'ত না।—

কার্ত্তিক, ১৩২৫।

পদ-চারণ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

করকমলেষু—

গদ্যের কলমে-লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক্, আছে—rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ—reason.

এর প্রথমটি যে পদ্যের এবং দ্বিতীয়টি গদ্যের বিশেষ গুণ, এ সত্য আপনার কাছে অবিদিত নেই; সুতরাং আশা করি, আমার এ রচনা আপনার কাছে অনাদৃত হবে না।

পদ-চারণ

ওঁ

তোমার নামেতে সবে মিছে কথা বলে,
সকলে জানিত যদি তোমার স্বরূপ,
কিছুই থাকিত নাকো এখন যেরূপ,—
তোমার নামেতে শুধু মিছে কথা চলে।

তোমারে খুঁজিয়া কেহ কোথাও না পায়,
বাহিরেতে নাহি মেলে তোমার দর্শন,
ভিতরেতে নাহি মেলে তোমার স্পর্শন,
শোনার অধিক জানা কেহই না চায়।

তোমার কাহিনী যত, সব রূপকথা,
তোমার ব্যাখ্যান করা জ্ঞানের মূর্খতা।

কেহই বলিতে নারে তুমি কিবা হও,
আলোকে থাকো না তুমি, না থাকো আঁধারে।
কেহই বলিতে নারে তুমি কিবা নও,—
সবেতে জড়িয়ে আছ ছায়ার আকারে॥

১৯১১।

কবিতা লেখা

এ যুগে কঠিন কবিতা লেখা,
কবিরা পায় না নিজের দেখা।
ঢাকা চাপা দিয়ে মনটি রাখি,
নিজ ধনে পড়ে নিজেই ফাঁকি।

গলা চেপে গায় প্রেমের গান,
ভয়ে ভয়ে ছাড়ে প্রাণের তান।
ভাব-মদে হলে নয়ন লাল,
দশে মিলে দেয় ছুচোখো গাল।

সুরুচি সুনীতি যুগল চেড়ী
কল্পনা-চরণে পরায় বেড়ি।
কবিতা কয়েদী, রাধার মত
দায়ে পড়ে' করে গৃহিণী-ব্রত।
বাঁশী বাজে বনে বসন্ত রাগে,
জটিলা কুটিলা দুয়ারে জাগে।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯১২।

বিলাতে রবীন্দ্র

বিলাতের গেছে সে একদিন,
সুরে বাঁধা ছিল কবির বীণ,
দিগন্ত-প্রসারী ঝঙ্কার যার
আজিও কাঁপায় মনের তার।
সে সুর ভেঙেছে নূতন তন্ত্র,
এখন ক্যাঁকায় মানুষ-যন্ত্র,
দ্যুলোক পড়েছে ধোঁয়ায় চাপা,
প্রকৃতির বাণী কালিতে ছাপা।

সহসা তুলেছে জাগায়ে প্রাণ,
পুব হ'তে এসে রবির গান,
ভারতী যাহার কলম ধরে'
নিতি নব গান রচনা করে,
লিখে রাখে নভে, জলে ও স্থলে,
রূপের বারতা সোণার জলে।

২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯১২।

বন্ধুর প্রতি

লোকে বলে আছে তব কিঞ্চিৎ ক্ষ্যাপামি,
তথাপি আমার তুমি চির-প্রিয়পাত্র।
তোমাতে আমাতে আছে মিল এইমাত্র—
ঠকিতে যদিও শিখি, শিখিনে ঠকামি।
জীবনে জ্যাঠামি আর সাহিত্যে ন্যাকামি
দেখে শুধু আমাদের জলে' যায় গাত্র,
কারো গুরু নই মোরা, প্রকৃতির ছাত্র,
আজো তাই কাঁচা আছি, শিখিনি পাকামি।

নীতি আর রাজনীতি আর ধর্ম্মনীতি,
যত গরু গুরু সেজে শিক্ষা দেয় নিতি।
প্রিয় শিষ্য কারো নই তুমি আর আমি,
আমাদের রোগ খোঁজা গুরুবাক্যে মানে,—
অথচ এদেশে সবে ঠিক মনে জানে,
যা-কিছু বোকামি নয় তাহাই ক্ষ্যাপামি।

২৭শে অক্টোবর, ১৯১২।

ফস্‌লে গুল্‌মে ময়্‌সে তৌবা ?

বসন্ত এনেছে সঙ্গে পাঁচরঙা ফুল,
মখ্‌মলে কিংখাবে কেউ জবরজঙ,
ঠোঁটে গালে রঙ মেখে কেউ সাজে সঙ,—
বসন্তে বাসন্তী সুরা রঙেতে অতুল।

বসন্ত এনেছে সঙ্গে নানাগন্ধ ফুল,
কেউ তীব্র, কেউ মৃদু, কারো মিশ্র ঢঙ,
কেউ গুরু গন্ধগর্ব্বে একেবারে টঙ,—
মধুগন্ধে সীধু তুমি একেলা অতুল।

এস সখি স্ফটিকের সুরাপাত্র ভরি,
রূপরসগন্ধ-সার শুষে পান করি।
ও কি কথা ? কার ভয়ে হও তুমি ভীতু ?
সুরাপানে পাপ হবে ?—হোক্‌না তাই বা !
জীবনে কদিন আসে কুসুমের ঋতু ?
ফস্‌লে গুল্‌মে ছি ছি ময়্‌সে তৌবা ?

২৭শে অক্টোবর, ১৯১২।

পূর্ণিমার খেয়াল

আজি সখি জেলো'নাকো বিজুলির বাতি।
খুলে দাও সব দ্বার ঘর আজ হো'ক বার,
বিলায় আলোক-মেলা পূর্ণিমার রাতি।

ঝুলিছে আকাশে দেখ চাঁদের লণ্ঠন,
চারি পাশে তারে ঘিরি তারার দেয়ালগিরি,
গগনের গায়ে করে কিরণ বণ্টন।

ফোটে যেন লক্ষ ফুল স্বর্ণ-বাগিচায়।
অথবা জরির বুটা সব সাচ্চা, নয় ঝুঁটা,
চন্দ্রের সভায় পাতা নীল গালিচায়।

নানা রূপ ধরে আজি বহুরূপী ইন্দু,
কখনো মন্দির-শিরে নেমে এসে ধীরে ধীরে,
বসে যেন আকারের শিরে চন্দ্রবিন্দু।

যামিনীর গণ্ড চুমি মহা অহঙ্কার !
আলো ফেলে তার চুলে কভু থাকে যেন ঝুলে,
কামিনীর কর্ণভূষা স্বর্ণ-অলঙ্কার।

সোনার কমল কভু, লুপ্ত যার বোঁটা।
উদাস আকাশ-ভালে রচে কভু স্ব-খেয়ালে,
চন্দনের পঙ্কে লিপ্ত কেশরের ফোঁটা।

চন্দ্রের রমণী যত কৃত্তিকা ভরণী,
সীধুপানে হেসে হেসে বিধু পানে আসে ভেসে,
জ্যোৎস্না-সাগরে বেয়ে সোনার তরণী।

শশী পশি সুরাপাত্রে হয়ে প্রতিবিম্ব,
লাল হয়ে মদ-রাগে অধীর চুম্বন মাগে
সুরাসিক্ত তব সখি অধরের বিম্ব।

আজিকার এ পর্ব্বের নায়ক শশাঙ্ক,
অভিনয় সারারাত করে' যাবে প্রতি পাত,
আনন্দের নাটকের সম্পূর্ণ দশাঙ্ক।

আমি আছি, তুমি আছ, আর আছে চন্দ্র।
পাত্রে ঢালো পোখ্‌রাজ কোলে তুলে এস্‌রাজ
সুরা আর সুরে মিশ্র গাও গীত মন্দ্র।

এ রাতে কে কা'র মানে শাসন বারণ ?
তুমি আমি নিশি ভোর থাকিব নেশায় ভোর,—
বারোমাস উপবাস, আজিকে পারণ !

মাঘ, ১৩১৯।

"THE BOOK OF TEA."

(শ্রীযুক্ত কাকুৎস ওকাকুরা—করকমলেষু)

জাপানে চা-পান ব্রত শিক্ষা দিল চীন,
মনেতে লেগেছে ছোপ তারি পীত রঙ।
চায়ের রঙীন নেশা স্বপ্নে ছায় দিন,—
ভারতের খেয়ালের কিন্তু জুদা ঢঙ।

গৈরিক আমরা জানি এক পাকা বর্ণ,
—ধূলার ধূসরে লিপ্ত হৃদয়ের রক্ত।
চা-পত্র হৃদয়মুক্ত তপ্ত দ্রব স্বর্ণ,
আত্মার সবর্ণ তাহে দেখে পীত ভক্ত।

হরিৎ পাতায় লেখে পীত শেষ বাণী,
পড়ি তাই আমাদের সুবর্ণে বিরাগ।
শরতে বসন্ত পূর্ণ জানিয়া জাপানী,
সৌন্দর্য্যের সীমা মানে মৃত্যুপূর্ব্ব রাগ।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১২।

সনেট সুন্দরী

বিগাঢ়যৌবনা তন্বী, আকারে বালিকা,
পরিণত দেহখানি আঁটসাঁট ক্ষুদ্র।
শিশির-ঋতুর স্নিগ্ধ মসৃণ রউদ্র
ঘনীভূত করে' গড়া স্বর্ণ-পাঞ্চালিকা।
দৃঢ়বন্ধে সুসংযত করে কঞ্চুলিকা
পরিপূর্ণ হৃদয়ের অশান্ত সমুদ্র,
কলার শাসনে দান্ত মন তার রুদ্র,
মন্ত্রদেহ ষোড়শীর ধরেছে কালিকা।

সন্তর্পণে করি তার অঙ্গে হস্তক্ষেপ,
ভয় হয় অনিপুণ অঙ্গুলি-পরশে
ছিন্নভিন্ন হয়ে তার কাঁচুলির ডোর,
ব্যক্ত হয়ে পড়ে বুকে সংরুদ্ধ আক্ষেপ!
নির্গ্রন্থ হৃদয়মুক্ত উদ্বেলিত রসে,
সে রূপ মলিন করে নয়নের লোর।

অকাল-বর্ষা

(ভীম ভাব)

বরষা এসেছে আজ সেজে বাজিকর,
মেঘের ধরিয়ে শিরে ঘন জটাজাল।
অদ্ভুত মায়াবী ঋতু, রচি ইন্দ্রজাল,
চোখের আড়ালে রাখে গ্রীষ্মের ভাস্কর।

সঘনে বাজায়, হয়ে বদ্ধপরিকর,
অম্বরে ডমরু, লক্ষ অলক্ষ্য বেতাল,
বিদ্যুৎ-নাগিনী যত, ত্যজিয়ে পাতাল,
অন্তরীক্ষে নাচে সবে, করে ধরি' কর।

থেকে থেকে হেসে ওঠে, বিচিত্র বিশাল
গগনের কোণে কোণে রঙের মশাল!

বরষা-পরশে দিবা রাত্রিরূপ ধরে,
আগুনে জলেতে ভুলি জাতি-বৈর আজ
খেলা করে আকাশের অন্ধকার ঘরে;—
এ বাজির সব ভাল, বাদ দিয়ে বাজ!

১৫ই এপ্রিল, ১৯১৩।

বর্ষা

(কান্ত ভাব)

বরষা নিঃশ্বাস ফেলে করেছে মেদুর,
নিদাঘের আকাশের রজত-দর্পণ।
ললিত গতিতে মেঘ করি প্রসর্পণ
হেলায় আচ্ছন্ন করে বৈশাখী রোদ্দুর।

বরষা মেঘের পাখা প্রসারি' সুদূর,
মধ্যাহ্নে কপিশ ছায়া করেছে অর্পণ।
তিরস্কৃত দিবাকর হয়ে সন্তর্পণ,
আকাশের অবকাশে ছড়ায় সিঁদুর।

তাপ-খিন্ন কুসুমেরা এবে মাথা তুলি,'
নয়ন মেলিয়া দেখে অকাল-গোধূলি।

শুভ্র পীত রক্তবর্ণ পরি চারু সাজ,
ক্লান্ত তনু রেখে কান্ত আকাশের কোলে,
ভর দিয়ে ক্ষীণবৃন্তে, মন্দ মন্দ দোলে
চাঁপা আর কৃষ্ণচূড়া আর গন্ধরাজ।

২০শে এপ্রিল, ১৯১৩।

সনেট-চতুষ্টয়

কবিতা।

কবিতা লিখেছি সখি, হয়েছে কসুর!
প্রথম মুস্কিল মেলা চরণে চরণ,
দ্বিতীয় মুস্কিল শেখা একেলে ধরণ,
তৃতীয় মুস্কিল দেখি পাঠক শ্বশুর!

কাব্যলোক জয় করে সুর কি অসুর,—
ভারতী যাহার যাচে চরণ শরণ।
কবিতা না করে যদি স্বয়ং বরণ,
টানাটানি তারে করা চরিত্র পশুর।

মিলিয়ে খিলিয়ে কথা আমি লিখি পদ্য,
লোকে বলে "ও ত শুধু মিলনান্ত গদ্য"।

পদ্যে শুনি লেখা চাই মনো-ইতিহাস,—
মন কিন্তু দেখা দিয়ে লুকায় আবার।
ধরাছোঁয়া দেয় নাকো, করে পরিহাস,
ভাষায় পড়িলে ধরা, অমনি কাবার!

কাব্যকলা।

কবিতার আছে কিছু রকমসকম।
গদ্যে লেখা এক কথা, পদ্যে স্বতন্তর,—
বাক্যে যাতে কাজে লাগে, আর অবান্তর,
ভাব ভাষা দুই চলে ধরিয়া পেখম।

ভাব ছোটে, যদি হয় হৃদয় জখম,
মনোরাগে ফাগ্ খেলে কবির অন্তর
অগ্নি দেয় সুরু করে মনের যন্তর
পায়রার মত বকা বকম্ বকম্।

অথবা হৃদয় যদি অনলেতে পোড়ে,
ভাব ভাষা দুই গলে' নিজে হ'তে যোড়ে।

পোড়া কিম্বা তোড়া নয় যাহার হৃদয়,
বুক আর মুখ যার আছে মেরামত,
কবিতা তাহারে নয় সহজে সদয়,—
শব্দ ধরে জব্দ করা তারি কেরামৎ!

আমার সনেট।

আমার সনেট নাকি নিরেট সুন্দরী?
বর্ণের প্রলেপে দেহ কঠিন চিক্কণ,
চরণের আভরণে নাহিক নিক্কণ,
বুকে নাই রাজযক্ষ্মা, উদরে উদরী।

শিখর-দশনা তন্বী, শ্যামা ক্ষামোদরী,
মসীকৃষ্ণ স্থির তার নির্ভীক ঈক্ষণ।
মুগ্ধ নেত্রে মূঢ়ে শুধু করে নিরীক্ষণ,—
এ রূপ পশে না হৃদে নয়ন বিদরি'।

ভাষার সুসার আছে, নাই ভাব প্রাণ,
গোলাপের ছোপ্ আছে, নাই তার ঘ্রাণ।

আমি নাকি ভাবদেহ করি বিশ্লেষণ,
প্রাণহীন মূর্ত্তি গড়ি অঙ্গে অঙ্গ যুড়ে।
প্রতিমা দর্শনে শুধু, বিনা আশ্লেষণ,
পোরে না এদের সাধ, গাত্র যায় পুড়ে!

আমার সমালোচক।

পরের লেখার এরা করে আলোচনা,
তার পূর্ব্বে জুড়ে দিয়ে সম উপসর্গ,
এরে দেয় জাহান্নমে, ওর হাতে স্বর্গ।
আমার বিচারপতি তুমি সুলোচনা।

কবিতার মূলে মম তব প্ররোচনা,
এ লেখা তোমারে তাই করি উৎসর্গ।
ভাল যদি নাহি লাগে, লেখায় বিসর্গ
তোমার আদেশে দিব, গৌরী গোরোচনা

সনেটের গোণাগাঁথা ছত্র চতুর্দ্দশ,—
এ পাত্রে যায় না ঢালা একগঙ্গা রস॥

জানি মোর ভারতীর তনুর তনিমা,
না বধি রাবণ পদ্যে, কিম্বা রাজা কংস!
সাধনার ধন মোর ভাবের অণিমা,—
অর্থাৎ ভাষায় ধৃত মনের ভগ্নাংশ।

আষাঢ়, ১৩২১।

সনেট-সপ্তক

[ইংলণ্ডে, কোন বিশেষ অবস্থায় পড়িয়া, জনৈক বঙ্গযুবকের হৃদয় এবং মন, সহসা যুগপৎ প্রণয় এবং কবিত্বরসে আপ্লুত হইয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি পকেট-বুকে পূর্ব্বোক্ত বাহ্যিক এবং মানসিক অবস্থার বিষয় নোট করিয়া রাখেন। তৎপরে সেই নোট অবলম্বনে স্বীয় মনোভাবের বর্ণনা করিয়া ইংরাজি ভাষায় ছয়টি সনেট রচনা করেন। আমি তাঁহার হস্তলিখিত পুঁথি হইতে এই সনেট কয়েকটি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছি। সনেটগুলির প্রধান গুণ এই যে, তাহার ভাব কিম্বা ভাষায় কৃত্রিমতার লেশমাত্র নাই। এতদ্ব্যতীত Ideality এবং Reality-র এরূপ অপূর্ব্ব মিশ্রণ, কাল্পনিক এবং বাস্তব জগতের এরূপ ওতপ্রোতভাবে একত্র সমাবেশ, আমি পূর্ব্বে কখনও অন্য কোন বঙ্গকবির রচনায় দেখি নাই। অথচ কবির হৃদয় যে খাঁটি বাঙালী হৃদয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য" নামক বিখ্যাত গ্রন্থের পাতায় পাতায় এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মধুর রসে বিগলিত হইয়া অবিরল অশ্রুমোচন করিতে বাঙালী কবি যেরূপ জানে, পৃথিবীর অন্য কোন কবি তাহার সিকির সিকিও জানে না। বুকের রক্ত জল হইয়া চক্ষু হইতে নির্গত হওয়ার উপরেই যদি বাঙালী কবির কবিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই অপরিচিত যুবকটি বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ কবি। এই সনেটগুলি পাঠ করিবার সময় সহৃদয় পাঠক অন্তত দুচার ফোঁটাও চোখের জল ফেলিতে বাধ্য হইবেন। অনুবাদে মূলের ভাষার সৌন্দর্য্য রক্ষা করা যায় না এবং সেই কারণে আমি অসম্ভবকে সম্ভব করিবার কোনরূপ বৃথাচেষ্টা করি নাই। যদি মাছি-মারা তরজমা নামক কোনরূপ পদার্থ থাকে, তাহা হইলে আমার এ তরজমা তাই, অর্থাৎ আমি যতদূর সম্ভব অবিকল অনুবাদ করিয়াছি। প্রথম সনেটটি আমি কবির পকেট-বুকের নোট অবলম্বনে রচনা করিয়াছি, যাহা গদ্য আকারে ছিল, তাহা পদ্য আকারে পরিণত করিয়াছি। আমি সেই নোট নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, তদ্দৃষ্টে ইংরাজি ভাষাজ্ঞ পাঠকমাত্রে দেখিতে পাইবেন। যে, অনুবাদস্থলে আমি নিজের কলম চালাই নাই।

Note :—

(1) Winding rivulet (2) Brook vocal (3) Rustic bridge (4) Railing (5) Beautiful lady leaning against (6) Playing violin (7) Lawn (8) Rabbit running about (9) Clear stream (10) Feeling heavenly bliss.

অনুবাদক]

প্রথম।

নীচেতে চলেছে জল আঁকিয়া বাঁকিয়া,
তরল আবেগ-ভরে ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া;
কানে শুনি তারি গান শুধু কুলুকুলু,
রসাবেশে হয়ে আসে চক্ষু ঢুলু ঢুলু।

উপরেতে ভাঙ্গা সাঁকো, হেরিনু যুবতী
রেলিঙেতে ভর দিয়ে আছে রূপবতী;

আপন ভাবেতে ভোর বাজায় বেয়ালা,—
রূপে মোর ভরে' গেল নয়ন-পেয়ালা।

নির্ম্মল নির্ঝর-নীর, নাহি তাহে পঙ্ক,
রূপসী চাঁদের পারা শশ-হীন অঙ্ক,
শশক বেড়ায় ছুটে পেয়ে সমভূমি ;
চাঁদ যদি হাতে পাই একবার চুমি।

সে রূপ বর্ণনা করে বর্ণ নাই বর্গে,
না মরিয়া চলে' গেনু একদম স্বর্গে।

দ্বিতীয়।

তব হস্তে যন্ত্র করে ভ্রমরগুঞ্জন ;
কভু ধ্বনি শুনি কাছে, কভু বহু দূরে,
কভু লম্ফে উর্দ্ধে ওঠে, কভু পড়ে ঘুরে,
জানিনে সে সুর আমি স্বর কি ব্যঞ্জন।

হৃদিতন্ত্রী কিন্তু মম করে ঝন্‌ঝন্‌!
লেগেছে ভাবের নেশা বেয়ালার সুরে ;
সঙ্গীতের মধ্যে হয়ে অতি চুর্‌চুরে,
তালে তালে নাচে মোর নয়ন-খঞ্জন।

সেই সঙ্গে নাচে মোর পরাণ-পুতুল
পাগলের পারা, হয়ে আনন্দে অতুল।

চোখের সুমুখে ভাসে দিবসের চাঁদ,
চাঁদির কিরণ দেয় চৌদিকে ছড়িয়ে,
ভেঙ্গে চুরে সব মোর হৃদয়ের বাঁধ,
কবিতার রস মনে পড়িছে গড়িয়ে।

তৃতীয়।

আমার বুকের কূপে এ কি তোলপাড়!
এতদিনে বুঝি মনে জাগে ভালবাসা!
এক বৃন্তে ফুটে ওঠে ভয় আর আশা,
এ জীবনে এল বুঝি প্রথম আষাঢ়!

কখনো আশার জলে বেলোয়ারি ঝাড়,
কভু ঘিরে আসে মনে ভয়ের কুয়াশা,
ও রূপ-মদিরা পিয়ে বাড়িছে পিপাসা,
হৃদয়-মাতাল খায় বুকেতে আছাড়!

কি রস ঢালিলে প্রাণে, হৃদয়ের রাজ্ঞি!
বর্ণনা করিতে নারি, নহি আমি বাগ্মী।

প্রেমসিন্ধু পানে এবে চলি ভরাপালে,
দোলা খায় অন্তরাত্মা, মুখে নাহি বাণী।
কি করি, বুদ্ধির হালে পায় নাকো পানি,
দুর্গা বলে' ভেসে পড়ি, যা থাকে কপালে!

চতুর্থ।

ভাল তোমা বাসিবারে নাহিকো সাহস,
ভয়, পাছে লোকে বলে মোর আছে ছিট্—
গগনের তারা তুমি, আমি ক্ষুদ্র কীট!
তোমারে হেরিয়ে শুধু হয়েছি বেহোঁস।

কিন্তু যদি হইতাম আমি খরগোস্,
এ দেহে পড়িত তব নয়নের দিঠ,
নিশ্চয় ছুটিতে তুমি মোর পিঠ পিঠ,
ধরা দিয়ে মানিতাম বিনাবাক্যে পোষ।

দূরে বসি এবে দেখি তব খোলা চুল,
তোমার আমার মাঝে আছে ভাঙা পুল।

মিলন-আশায় তাই হইয়ে হতাশ,
তোমার রূপের ঢেউ বসে' বসে' গুণি,
কানে কানে বলে মোরে নিষ্ঠুর বাতাস—
কভু তুমি ও-নারীর হবে নাকো "উনি!"

পঞ্চম।

পড়িতেছে আজ শুধু লুটিয়ে লুটিয়ে
আমার মনের পাখী বুকের বাসায়।
কোথা হ'তে জল এসে নয়নে নাসায়,
ফোয়ারার মত পড়ে ছুটিয়ে ছুটিয়ে।

মনের দুখের কালি ঘুঁটিয়ে ঘুঁটিয়ে
কবিতা আজিকে লিখি ইংরাজি ভাষায়,
পড়িবে তোমার চোখে ধরি এ আশায়,
কথায় ব্যথার ফুল ফুটিয়ে ফুটিয়ে।

কবি আমি হইয়াছি অবস্থায় পড়ে',
তরণী ছন্দেতে দোলে পড়িলেক ঝড়ে।

ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে মনের বাঁধন,
কবিতায় তাই আজি করি আপশোষ।
এখন আমার কাজ শুধুই কাঁদন,—
কোথা সেই বাহুলীন, কোথা খরগোস্!

ষষ্ঠ।

আশা ছিল একদিন আমি হেসে হেসে,
বলিব মনের কথা তব কানে কানে,
তোমার দেহের শাদা চুম্বকের টানে
বসিব তোমার আমি অতি কাছে ঘেঁসে!

সে সব প্রাণের সাধ আজ গেছে ভেসে
কোন্ দূর গগনেতে, কে বা তাহা জানে।
গা ঢেলে বিরহে চলি অকূলের পানে,
—আশার ডিঙার মোর গেছে তলা ফেঁসে!

মন আজ বলে শুধু "কোথা প্রাণসই,
ফোটে যার বেয়ালাতে সঙ্গীতের খই ?"

এ বুকে লেগেছে তার বেয়ালার ছড়ি,
তারি টানে অবিরল চোখে আসে জল।
ভালবেসে পরদেশে এই হ'ল ফল,
—রহিল বুকেতে চেন—চলে' গেল ঘড়ি !

সপ্তম।

খুলে যদি দেখ মোর হৃদয়-ফলক,
দেখিবে সেথায় প্রিয়া, ঈষৎ হেলিয়ে,
চিত্রার্পিতা হয়ে আছে, কুন্তল এলিয়ে,
সুনীল কাচের চোখে না পড়ে পলক।

প্রতি অঙ্গ হ'তে ছুটে রঙের ঝলক,
মনের আঁধারে দেয় বিদ্যুৎ খেলিয়ে,
বুকের মাঝারে তাই উঠিছে ঠেলিয়ে
প্রাণের মধুর রসে প্রবল বলক !

যদিচ প্রিয়ার ছবি মনে আছে আঁকা,
প্রিয়া বিনে সব মোর লাগে ফাঁকা ফাঁকা।

কতকাল র'ব বল শুধু স্মৃতি নিয়ে ?
অশ্রুজলে যাক্ বুকে ছবি ধুয়ে মুছে।
অলীক সাদার মোহ যাক্ মনে ঘুচে—
করিব স্বদেশে ফিরে কালো মেয়ে বিয়ে !

আষাঢ়, ১৩২০।

বর্ষা

(ছড়া)

এ বুঝি আষাঢ় মাস,
তাই ছুটে' চারিপাশ,
শুধু করে হাঁসফাস
পূবের বাতাস।

কালো কালো মেঘগুলো
জল খেয়ে পেট ফুলো,
পুঁটুলি পাকিয়ে শুলো
জুড়িয়া আকাশ।

হাতীর মতন ধড়
নাহি তাহে নড়চড়,
নাক ডাকে ঘড় ঘড়
চারিদিক ছেয়ে।

এত হ'ল অন্ধকার
দিবারাত্রি একাকার,
পাখী সব চীৎকার
করে ভয় খেয়ে।

দু'হাত না চলে দৃষ্টি,
ধুঁয়ে পুঁছে সব সৃষ্টি
অবিশ্রাম ঝরে বৃষ্টি
ঝর ঝর ঝরে।

দেখে' ভয়ে কাঁপে বুক,
আকাশ ভেংচায় মুখ
বিদ্যুতের সবটুক্
জিভ্ বার করে।

চিল খায় ঘুরপাক,
ডালে বসে' কাঁপে কাক,
আকাশেতে বাজে ঢাক
ড্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ।

সারস মেলিয়া পাখা
নাচে হয়ে আঁকাবাঁকা,
ময়ূর ধরেছে কেকা,
গায় কোলা ব্যাঙ।

হাঁস, রাজ আর পাতি,
খালে বিলে সার গাঁথি
ফুলিয়ে বুকের ছাতি
হেসে ভেসে চলে।

ব্যাঙদের মক্‌মকি,
বিদ্যুতের চক্‌মকি
দেখে শুনে বক্ বকি
এক পায়ে টলে।

গাছেদের মাথা ছুঁয়ে
আকাশ পড়েছে নুয়ে
জল ঝরে চুঁয়ে চুঁয়ে
মেঘের চুলের।

শিউলি ভুঁয়েতে লুটে,
কদম উঠেছে ফুটে,
ভিজে গন্ধ আসে ছুটে
কেতকী ফুলের।

ছেলেপিলে মহানন্দ
ঘরে ঘরে হয়ে বন্ধ
পরস্পরে করে দ্বন্দ্ব
মহা তাল ঠুকে।

পা ছড়িয়ে নারীকুল
উনুনে শুকোয় চুল,
দু'নয়ন বাষ্পাকুল,
ধোঁয়া ঢুকে ঢুকে।

মাতিয়া বরষা-রসে,
ভাঙ্গা গলা মেজে ঘসে
কোন যুবা ভাঁজে কসে
সুরট-মল্লার।

কেহ বা মনের ঝোঁকে
কবিতা লিখিছে রোখে,
গেঁথে দিয়ে প্রতি শ্লোকে
কুমুদকহ্লার।

বলি শুন, ওহে বর্ষা!
আবার যে হবে ফর্সা
এমন হয় না ভর্সা—
না হয় না হোক্।

তোমার ঐ রঙ কালো,
তোমার ঐ রাঙা আলো,
তার বড় লাগে ভালো
যার আছে চোখ।

৭ই জুলাই, ১৯১৩।

কৈফিয়ৎ

(Terza Rima ছন্দে)

শুনাবো নূতন ছন্দে মম ইতিহাস,
কেমনে হইনু আমি শেষকালে কবি।
আগে শুনে কথা, শেষে করো পরিহাস।

যৌবনে বাসনা ছিল, ছুনিয়ার ছবি,
আঁকিতে উজ্জ্বল করে' সাহিত্যির পত্রে,—
বর্ণের স্বর্ণের লাগি পূজিতাম রবি।

ফলাতে সঙ্কল্প ছিল মোর প্রতি ছত্রে,
আকাশের নীল আর অরুণের লাল,—
এ ছুটি বিরোধী বর্ণ মিলিয়ে একত্রে।

দলিত-অঞ্জন কিম্বা আবির গুলাল
অথচ ছিল না বেশি অন্তরের ঘটে—
এ কবি ছিল না কভু বাণীর ছুলাল।

তাইতে আঁকিতে ছবি কাব্য-চিত্রপটে,
বুঝিলাম শিক্ষা বিনা হইব নাকাল।
চলিনু শিখিতে বিদ্যা গুরুর নিকটে।

হেথায় হয় না কভু গুরুর আকাল!
পড়িনু কত-না-জানি বিজ্ঞান দর্শন,
ভক্ষণ করিনু শত কাব্যের মাকাল।

সে কথা পড়িলে মনে রোমের হর্ষণ
আজিও ভয়েতে হয় সর্ব্ব-অঙ্গ জুড়ে,—
এ ভবসিন্ধুর সেই সৈকত-কর্ষণ!

বদ্ধ হ'ল গতিবিধি কল্পনায় উড়ে,
গড়িনু জ্ঞানেতে-ঘেরা শান্তির আলয়,—
সহসা পড়িল বালি সে শান্তির গুড়ে!

নেত্রপথে এসে ছুটি সুবর্ণ-বলয়
সোনার রঙেতে দিল দশদিক্ ছেয়ে—
সুশাসিত মনোরাজ্যে ঘটিল প্রলয়!

বলা মিছে এ বিষয়ে বেশি এর চেয়ে,
ছন্দেতে যায় না পোরা মনের হাঁপানি,—
এ সত্য সহজে বোঝে ছুনিয়ার মেয়ে।

ফল কথা, কালক্রমে ত্যজি বীণাপাণি,
ছাড়িনু হবার আশা সাহিত্যে অমর!
হেথায় বাঁচিতে কিন্তু চাই দানাপানি!

পূজাপাঠ ছেড়ে তাই, বাঁধিয়া কোমর,
সমাজের কর্ম্মক্ষেত্রে করিনু প্রবেশ,—
সুরু হ'ল সেই হ'তে সংসার-সমর।

পরিনু সবারি মত সামাজিক বেশ,
কিন্তু তাহা বসিল না স্বভাবের অঙ্গে।
সে বেশ-পরশে এল তন্দ্রার আবেশ।

কি ভাবে কাটিল দিন সংসারের রঙ্গে,
স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায়, জানে হৃষীকেশ।
কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র এক নয় বঙ্গে।

এ দিকে রূপালি হ'ল মস্তকের কেশ,
সেই সঙ্গে ক্ষীণ হ'ল আত্মার আলোক
হইল মনের দফা প্রায়শ নিকেশ।

দেখিলাম হ'তে গিয়ে সাংসারিক লোক,
বাহিরের লোভে শুধু হারিয়ে ভিতর,
চরিত্রে হইনু বৃদ্ধ, বুদ্ধিতে বালক!

এ সব লক্ষণ দেখে হইনু কাতর,—
না জানি কখন্ আসে বুজে চোখ কান,
সেই ভয়ে দূরে গেল ভাবনা ইতর।

হারানো প্রাণের ফের করিতে সন্ধান,
সভয়ে চলিনু ফিরে বাণীর ভবনে,
যেথায় উঠিছে চির-আনন্দের গান।

আবার ফুটিল ফুল হৃদয়ের বনে,
সে দেশে প্রবেশি, গেল মনের আক্ষেপ,
করিলাম পদার্পণ দ্বিতীয় যৌবনে।

এ দিকে সুমুখে হেরি সময় সংক্ষেপ,
রচিতে বসিনু আমি ছোটখাট তান,
বর্ণ সুর একাধারে করিয়া নিক্ষেপ।

আনিনু সংগ্রহ করি বিঘৎপ্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্ণেট,
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ।

এ হাতে মূরতি ধরে আজি যে সনেট,
কবিতা না হ'তে পারে, কিন্তু পাকা পদ্য,—
প্রকৃতি যাহার "জেঠ", আকৃতি "কনেঠ"।

অন্তরে যদিচ নাহি যৌবনের মদ্য,
রূপেতে সনেট কিন্তু নবীনা কিশোরী,
বারো কিম্বা তেরো নয়, পুরোপুরি 'চোদ্দ'!

আশ্বিন, ১৩২০।

পত্র

শ্রীযুক্ত "সাহিত্য"-সম্পাদক মহাশয়—
সুকরকমলেষু

১

বলি শুন বন্ধুবর, ঘুণ-ধরা বাঁশে ভর
দেয়া তব মিছে।
জীবনের তিন ভাগ তার সুর তার রাগ
পড়ে' আছে পিছে।
সিকি যাহা আছে বাকী, দিতে নাহি চাহি ফাঁকি,
—অথচ নাচার।
যার অর্থ আমি খুঁজি, ভাল করে' নাহি বুঝি—
কি করি প্রচার?
এ হেন লেখক নিয়ে, পত্রিকা চালাতে গিয়ে,
ঠেকে যাবে দায়ে।
কল্পনা কাম্বোজ-ঘোড়া, বয়েসে হয়েছে খোঁড়া,
চলে তিন পায়ে।
ভোঁতা হ'ল পঞ্চবাণ, প্রেমের উজান বান
নাহি ডাকে মনে।
সমাজের পোষা পাখী, সমাজ-খাঁচায় থাকি,
ভুলে গেছি বনে।
এখন দখিণে বায় শুধু মিষ্টি লাগে গায়,
হাড়েতে লাগে না।
মলয়ের মন্দ ফুঁয়ে হৃদয় গেলেও ছুঁয়ে,
হৃদয় জাগে না।
পাপিয়ার কলতান আজো শুনি পাতি কান
করিনু স্বীকার।
অশরীরী তার গানে আজিকে আনে না প্রাণে
তরুণ বিকার।
বসন্তে কুসুম ফোটে, নিশ্চয় ভ্রমর ছোটে
তার গন্ধ পেয়ে।
মুখ দিয়ে ফুলে ফুলে, কি যে করে অলিকুলে,
দেখি নাকো চেয়ে।
আজিও পূর্ণিমা নিশি ঢেলে দেয় দিশি দিশি
কিরণ শীতল।
কিন্তু তার দিব্যবর্ণ পারে না করিতে স্বর্ণ
মর্ত্ত্যের পিতল।

২

কপালেতে ছিল লেখা, তাই আজ লিখি লেখা
অবসর পেলে।
কথার নেশায় মাতি, কথায় কথায় গাঁথি,
স্মৃতি-বাতি জেলে।
লেখাপড়া মোর পেশা লেখাপড়া মোর নেশা,
কাজ আর খেলা।
সেই কাজ, সেই খেলা, করিয়াছি অবহেলা,
যবে ছিল বেলা।
এখন চারিটি দিকে রঙ যবে হ'ল ফিকে,
রচি গদ্যপদ্য।
তাহার পোনোরো আনা, সবাকারি আছে জানা,
মোটে নয় সদ্য।
যে কথা হয়েছে বলা, সেই কথা সেধে গলা,
বলি আরবার।
মনের পুরোণো মাল, মেজে ঘসে করি লাল,
করি কারবার।
হয় ত বা পুরোপুরি, না জেনে করেছি চুরি,
পর-মনোভাব।
অথবা জাওর কাটি, খেয়ে আমি পরিপাটী
সাহিত্যের জাব।

৩

শুনিতে আমার কথা, কার হবে মাথা-ব্যথা,
ভাবিয়া না পাই।
মানুষে কাব্যের গায় আগুন পোয়াতে চায়,
—নাহি চায় ছাই।
আমি চাই সত্য বলি, সত্য মোরে যায় ছলি,
মিথ্যা রেখে হাতে।
কাব্যে চলে মিছা কথা,— কাব্যের এ মিছে কথা
লেখা পাতে পাতে।

ভাবকে তরল করা ভাষাকে সরল করা
নয় সোজা কাজ।
মনকে উলঙ্গ করি, এত না সাহস ধরি,
সেটা জানি আজ।
তাইতে বাহিরে আনি, ঢেকে তার দেহখানি
বাক্য-কিঙখাবে।
বলি—হের পেশোয়াজ, হেন চারু কারুকাজ
আর কোথা পাবে?
আঁটসাঁট ছন্দোবন্ধ দিয়ে রচি কটিবন্ধ
মোর কবিতার।
দেখিলে পরখ করি, দেখিবে হয় ত জরি
ঝুঁটো সবি তার।
কবি চাহে নব ধাঁচে মনের পুতুল নাচে,
সাহিত্য-আসরে।
বাহবা পরের কাছে নর্ত্তকীর মত যাচে,
প্রমোদ-বাসরে।
ভাষা ভাব এলো করা, কবিতাকে খেলো করা
হয় তাহে জানি।
তাই বলে' শুধু রঙ্গ, কাব্যে করা অঙ্গভঙ্গ,
ভাল নাহি মানি।
হ'লে ভাবেতে ফতুর হই ভাষায় চতুর—
এটি নাহি ভুলি।
কেহ দেয় করতালি কেহ দেয় খর গালি,
কানে নাহি তুলি।

৪

এবে চাই গলা খুলে ছলাকলা গিয়ে ভুলে
সাদা কথা বলি।
ত্যজি সব অহঙ্কার, খুলি বস্ত্র অলঙ্কার,
রাজপথে চলি।
কিন্তু সে হবার নয়, চলিতে পাই গো ভয়
সেই পথ ধরে'।
সে পথের কোথা শেষ নাহি জানি সবিশেষ,—
না জানে অপরে।
যা না দেখি, যা না জানি, তাই নিয়ে হানাহানি,
গুরুতে গুরুতে।
সৃষ্টির আসল মানে, কেহ কিছু নাহি জানে,
শেখায় পুরুতে।
জলো ধর্ম্ম, জলো নীতি, বেচাকেনা হয় নিতি,
সাহিত্য-বাজারে।
তন্ত্র, তথ্য, তন্ত্র, মন্ত্র, জন্ম দেয় মুদ্রাযন্ত্র
হাজারে হাজারে।

হয় জ্ঞানী কাটা ঘুড়ি, নয় দেয় হামাগুড়ি,
ভুঁয়ে মুখ গুঁজে।
মুখে বলে "আবি আবি" অন্ধকারে খায় খাবি,
ভয়ে চোখ বুজে।
অথবা টানিয়ে কল্কি বলে বিশ্ব মহাভেল্কি,
জ্ঞানে যাবে উড়ে।
এ দিকে কান্নার রোল, উঠিতেছে অবিরল,
দশ দিক্ জুড়ে।
মানবের অশ্রুবারি, যাহে না মুছাতে পারি,
সেই জ্ঞান ফাঁকি।
দর্শন বিজ্ঞান তাই, উড়িয়ে কথার ছাই,
কাণা করে আঁখি।
তাই কথা বড় বড় একত্র করিতে জড়,
ভাল নাহি বাসি।
নাহি লাগে কারও কাজে, বড় কথা বড় বাজে,
নয় বড় বাঁশি।
ঢের ভাল তার চেয়ে চলে' যাওয়া গান গেয়ে
আপনার মনে।
পলে পলে যাহা ফুট', দলে দলে যায় টুটে,
হৃদয়ের বনে।

৫

মানুষেতে কিবা চায় কেন করে হায় হায়,
কি তার অভাব?
কেবা জানে, কেবা বলে, —এই মাত্র বলা চলে
এ তার স্বভাব।
রমণী ধরিলে ক্রোড়ে, সব বুক নাহি জোড়ে,
ফাঁক থেকে যায়।
শূন্য মনে বুঝাইতে, শূন্য হিয়া বুজাইতে,
আনে দেবতায়।
সে শুধু অনন্ত ধোঁয়া, নাহি দেয় ধরা-ছোঁয়া
নাহি যায় সরি।
সেই ভয়, সেই আশা, নাহি কোন জানা-ভাষা
যাহে রাখি ধরি'।
অতৃপ্ত হৃদয় কাঁদে পড়িতে প্রেমের ফাঁদে
ফিরে বার বার।
এইমাত্র আমি জানি, এইমাত্র আমি মানি
জগতের সার।
"জানি মোরা খাঁটি সত্য, ছোট বড় গূঢ় তত্ত্ব,
সকল সৃষ্টির।"
বলে' যারা করে সোর, জানে তারা কত জোর
কথার বৃষ্টির।

আমি চাহি শুধু আলো, ভাল নাহি বাসি কালো,
অন্তরের ঘরে।
আর জানি এক খাঁটি, পায়ের নীচেতে মাটি
আছে সবে ধরে'।
মাটি আর আলো নিয়ে, দিতে চাই দুয়ে বিয়ে,
সসীমে অসীম।
যত কিছু লেখাপড়া, তার অর্থ শুধু গড়া
মাটির পিদীম।
আর নাহি জোটে মিল, হাতে লেগে আসে খিল
চলে না কলম।
মস্তিষ্ক কাতরে চায়, এড়াতে চিন্তার দায়,
ঘুমের মলম।

শ্রাবণ, ১৩২০।

দুয়ানি

প্রাণহীন কবিদের বীণার ঝঙ্কার।
বাণহীন ধনুকের ছিলার টঙ্কার॥

কেবল কথার রাজ্যে বিস্তারে প্রভাব।
ছোট ছোট হৃদয়ের বড় বড় ভাব॥

ডুব দিয়ে অন্তরের অতল সাগরে।
কেহ বা মুকুতা তোলে, কেহ ডুবে মরে॥

খুঁজো নাকো সৌন্দর্য্যের গোড়াকার অঙ্ক।
ফুলের গাছের মূলে পাবে শুধু পঙ্ক॥

শ্রোতা বলে রাগ বাজে শুধু এক তারে।
তবে কেন বাজে তার সাজে ডান্ ধারে॥

কাঁদ যদি বসে' উচ্চ হিমালয়-শিরে।
প্রতি বিন্দু অশ্রু হবে হাস্যোজ্জ্বল হীরে॥

অয়স্কান্ত মহাকাশ মনের চুম্বক।
মন যার লোহা, তার সহজ কুম্ভক॥

দ্বারে এসে অবশেষে রাখ শ্রান্ত কায়া।
পড়েছে মুখেতে তাই কপাটের ছায়া॥

বহুকাল তরুতলে আছ ধ্যানে বসি'।
জান না পড়েছে সব পাতাগুলি খসি'॥

যদিচ অনন্ত বটে সুমুখের পথ।
শেষের আশার বাষ্পে চলে মনোরথ॥

বিশ্বছন্দ গড়ি, দিয়ে পদে পদে যতি।
পদে পদে স্থিতি বিনা নাহি হয় গতি॥

পাও যদি খুঁজে কোথা অসীমের সীমা।
দেখিবে সেথায় আছে দাঁড়ায়ে প্রতিমা॥

৭ই অক্টোবর ১৯১৩।

বনফুল

পত্রপুটে এলে কোথা বনবাসী ফুল?
অঙ্গরাগ হেরি তব সমুদ্রের নীল,
তোমার পরশে আছে মলয়-অনিল,—

এ তো নহে কুঙ্কনের সাগরের কূল!
হিমের আলয়ে হেথা বড় অপ্রতুল
সুখস্পর্শ সমীরণ, তরল সলিল।
সুকুমার কুসুমের কি আছে দলিল
এত উর্দ্ধে উঠিবার, না হ'লে বাতুল?
এ দেশে আকাশে ভাসে ধূসর কুয়াশা,
তারি মাঝে মাথা তোলে পর্ব্বতের শৃঙ্গ,
উজ্জ্বল কিরীটে যার হীরক তুষার।
ক্ষীণ প্রাণে ধরি কোন প্রস্ফুটিত আশা,
এসেছ এ পরদেশে, যেথা নাই ভৃঙ্গ?—
বরফের বুকে নাহি তোমার সুসার!

হিমালয়—২৪ অক্টোবর ১৩১৯।

চেরি-পুষ্প

বসন্তের আগমনে আজো আছে দেরি,
পর্ব্বতের স্তরে স্তরে বিরাজে তুষার।
চুরি করে' ফিকে রঙ গোলাপী উষার,
লাজমুখে ফুটিয়াছ ঝাঁকে ঝাঁকে চেরি!
পত্রহীন শাখাগুলি ফেলিয়াছ ঘেরি,
বর্ষিয়া তাহার অঙ্গে কুঙ্কুম আসার।
সে জানে, যে বোঝে অর্থ ফুলের ভাষার,
বসন্তের ঘোষণার তুমি রক্তভেরী!

মর্ম্মর-কঠিন-শুভ্র-তুষারের গায়ে
পড়েছে রূপের তব রঙীন আলোক,
পূর্ব্বরাগে লিপ্ত তব কর-পরশনে,
শিশিরে বসন্ত-স্মৃতি তুলেছে জাগায়ে।
রক্তিম আভায় যেন ভরিয়া ত্রিলোক
শোভিছে উমার মুখ শিব-দরশনে।

দারজিলিং

ভাল তোমা বাসি যখন বলি

"ভাল তোমা বাসি" যখন বলি
তোমায় ছলি।
প্রেমের কলি,
মরমে আমার সরমে ভয়ে
ফোটে না রক্ত কমল হয়ে।

"ভাল নাহি বাসি" যখন বলি
আপনা ছলি।
প্রেমের কলি,
ভয়ের বাধার আঁধার ঘরে
আশার বাতাসে জীবন ধরে।

ভাল তোমা আমি বাসি না বাসি,
কাছেতে আসি।
তোমার হাসি,
মনের কোণেতে প্রদীপ জেলে
নিতি নব দেয় আলোক ঢেলে।

তোমা ছেড়ে যবে দূরেতে আসি,
তোমার বাঁশী
আকাশে ভাসি,
করুণ সুরেতে ভোরে ও সাঁঝে
ব্যথার মতন বুকেতে বাজে।

২৩শে মার্চ্চ ১৯১৪

প্রেমের খেয়াল

শ্রীমান্ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু—

প্রেমের দু'চার কবিতা লিখেছি
লিখিনি গান।
প্রেমের রাগের আলাপ শিখেছি
শিখিনি তান।
কত না শুনেছি প্রণয়-কাহিনী,
কত না শুনেছি প্রেমের রাগিণী
পাতিয়া কান।
আপন মনের কখনো গাহিনি
কাঁপানো গান।
প্রেমের খেয়াল সহজে মানে না
তাল ও মান।
ছোটা বই আর নিয়ম জানে না
ফুলের বাণ।

প্রেম নাহি মানে আচার-বিচার,
গীত নহে তার, সোনার খাঁচার
পাখীর গান।
প্রেম জানে নাকো দুবেলা মিছার
করিতে ভান।

তূরীতে ভেরীতে কখনো বাজে না
তরল তান।
পরীর শরীরে কখনো সাজে না
জরীর থান।
আছে যা লুকায়ে ভাষার অন্তরে,
পার যদি দিতে মনের যন্তরে
হাল্‌কা টান,
তবে তা আসিবে সুরের মন্তরে
ধরিয়া প্রাণ।

থাকে না কবির সাজানো ভাষায়
ফুলের ঘ্রাণ।
পড়ে না কবির সাজানো পাশায়
মনের দান।
করো যদি তুমি আকাশ-ফুলের
করো যদি তুমি অনন্ত ভুলের
মদিরা পান।
তা হ'লে গাহিবে প্রাণের মূলের
রসের গান।

২২শে মার্চ্চ ১৯১৪

দ্বিজেন্দ্রলাল

উদার-আঁধার মাঝে বিদ্যুতের মত
উঠেছিল ফুটে তব ক্ষিপ্র তীব্র হা[illegible]
ঘনঘোর মেঘে ঘেরা দিগন্ত উদ্ভাসি'।
দেখায়েছ বাহিরের উদারতা কত॥

গভীর অরণ্য-মাঝে ক্রন্দনের মত
উঠেছিল বেজে তব মন্দ্র—মন্দ্র বাঁশী
রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুরে সুরে বেদনা উচ্ছ্বাসি'।
বুঝায়েছ অন্তরের গভীরতা কত॥

সে আলো হারিয়ে গেছে এ দৃশ্য ভুবনে,
সে সুর হারিয়ে গেছে এ স্পৃশ্য পবনে।

যে আলো দিয়েছ তুমি সহাস্যে বিলিয়ে,
যে সুরে দিয়েছ তুমি ছায়াময়ী কায়া,
মনের আকাশে কভু যাবে না মিলিয়ে—
রহিবে সেথায় চির, তার ধূপছায়া।

ভাদ্র ১৩২০

স্নেহ-লতা

স্বয়ংবরে বরিয়াছ তুমি বৈশ্বানরে
দেবতার আলিঙ্গন করি' অঙ্গীকার।
তব স্পর্শে উচ্ছ্বসিত জীবন্ত শিখার
আভায় তুলিছে আজ দেশ আলো করে'।

অপূর্ব্ব হোমাগ্নি জ্বালি বিবাহ বাসরে,
দিয়াছ আহুতি তাহে দেহ মল্লিকার।
"অনন্ত মরণ-মাঝে জীবন বিকার"—
এ সত্য কোথায় পেলে তব খেলা-ঘরে?

এ জগতে প্রাণ চায় স্বচ্ছন্দ বিকাশ;
ফুলের ফুটিতে চাই উদার আকাশ;

দাস মোরা চিরবন্দী শাস্ত্র-কারাগারে,
উন্মুক্ত আকাশ হেরি শুধু ভয় পাই।
জ্বেলেছ যে সত্য বহ্নি মিথ্যার মাঝারে
এ জড় সমাজ তাহে পুড়ে হোক ছাই।

ফাল্গুন, ১৩২০ সন

খেয়ালের জন্ম

(Terza Rima)

বাদশা ছিলেন এক পরম খেয়ালী,
বিলাসের অবতার জাতে আফ্‌গান।
দিনে তাঁর নিত্যদোল, রাত্তিরে দেয়ালী।

জীবন তাঁহার ছিল শুধু নাচ-গান,
—শাসন পালন রাজ্য করিতেন মন্ত্রী—
নর্ত্তকী দুবেলা দিত রূপের যোগান।

ঘিরে তাঁরে রেখেছিল শত শত যন্ত্রী,
কারো যন্ত্র রুদ্রবীণ কারো বা রবাব,—
স্পর্শে যার কেঁপে ওঠে হৃদয়ের তন্ত্রী।

কারো হাতে সপ্তস্বরা, যন্ত্রের নবাব,
ললিত গম্ভীর যার প্রসন্ন আওয়াজ,
মনের সুরের দেয় সুরেতে জবাব।

সেকালে কেবল ছিল ধ্রুপদ রেওয়াজ,—
ছয় রাগ হয়েছিল এত দরবারি,
একপা নড়িত নাকো বিনা পাখোয়াজ।

সঙ্গীতের ছোট বড় যত কারবারি-
বধিতে সুরের প্রাণ হ'ল অগ্রসর,—
দুহাতে উঁচিয়ে ধরে তাল-তরবারি।

একদিন বাদশার জাঁকিয়ে আসর
বসেছে ইয়ার যত আমির ওমরা,
সাকীদের তাগিদের নাই অবসর।

দাঁড়ি গোঁফে কেশে বেশে হোমরা চোমরা
বড় বড় ওস্তাদেরা করে গুলতান।
হেন সভা নাহি দেখি আমরা তোমরা!

সহসা বিরক্ত স্বরে কহে সুলতান,—
"শুনে কান ঝালাপালা হয়েছে আমার,
রাত্তিরে বেহাগ শুধু, দিনে মূলতান!

ভাল আর নাহি লাগে ধ্রুপদ ধামার।
সুরু করে' দাও যবে রাগের আলাপ,
ভুলে যাও শিষ্ট রীতি সময়ে থামার!

বিলম্বিত তালে যবে কর গো বিলাপ,
মূর্চ্ছনা ঝিমিয়ে পড়ে মূর্চ্ছাকে জিনিয়ে,—
নয় ত দূনেতে বকো সুরের প্রলাপ।

যে গানে দুবেলা গাও ইনিয়ে-বিনিয়ে,
সে গানে জমক আছে নাইকো চমক,
তাল হ'তে নার নিতে সুরকে ছিনিয়ে।

কারিগরি করে' যবে লাগাও গমক,
তা শুনে আমার শুধু এই মনে হয়,
রাগ যেন রাগিণীকে দিতেছে ধমক!"

গুণিগণ পরস্পরে মুখ চেয়ে রয়,
বাদশার কথা শুনে সবে হতভম্ব।
হেন সাধ্য নাহি কারো দুটি কথা কয়।

ভয়েতে সবার গায়ে ফুটিল কদম্ব,
আকাশ পড়িল যেন শিরেতে ভাঙ্গিয়া,
মুহূর্ত্তে হইল চূর্ণ ওস্তাদির দম্ভ।

নর্ত্তকীগণের মুখ উঠিল রাঙিয়া!
লাজে ভয়ে আন্দোলিত তাহাদের বুক,
মুক্ত হ'ল ছিন্ন করি জরির আঙিয়া।

বাদশা কহিল পুনঃ রাঙা করি মুখ—
"নাহি কি হেথায় হেন সঙ্গীত-নায়ক
যে পারে সৃজিতে গীতে নতুন কৌতুক?"

সভা-প্রান্তে ছিল বসে' তরুণ গায়ক,
মদের নেশায় হয়ে একদম চুর,—
রূপেতে সাক্ষাৎ দেব কুসুম-সায়ক।

জড়িত কম্পিত স্বরে কহিল "হুজুর!
নাহি মানি দুনিয়ার কোনই বন্ধন,—
সার জানি দুনিয়ার সুরা আর সুর।

অজানা সুরের এক অধীর স্পন্দন,
আজিকে হৃদয় মোর করিছে ব্যাকুল,
কি যেন বুকের দ্বারে করিছে ক্রন্দন।

বাঁধা রাগ গাঁথা তাল, এই দুই কুল
ছাপিয়ে ছোটাব আমি সঙ্গীতের বান,
উন্মত্ত উন্মুক্ত হবে সুর বিলকুল!"

এত বলি আরম্ভিল অর্থহীন গান,
তারায় চড়িয়ে সুর মহা চীৎকারি,
আকাশে উড়ায়ে দিল পাপিয়ার তান।

ধ্রুপদেরে পদে পদে দিয়া টিট্‌কারি,
যুবকের কণ্ঠ হ'তে ঝলকে ঝলক,
উথলি উছলি পড়ে ঘন গিটকারি।

অবাক বাদশাজাদা না পড়ে পলক,
চোখের সুমুখে ভাসে সুরের চেহারা—
—প্রক্ষিপ্ত চরণ শূন্যে বিক্ষিপ্ত অলক!

গায়ক বাদক ছিল সভায় যাহারা,
মনে মনে গণে সবে ঘটিল প্রলয়,—
কোথা সম্ কোথা ফাঁক ভেবে আত্মহারা!

শিহরিল নর্ত্তকীর কর-কিশলয়,—
স্ফুরিত সুরেতে লভি কম্পিত দরদ,
শিঞ্জিত হইল ত্রস্ত মণির বলয়।

শিকল ছিঁড়িয়া সুর ভাঙ্গিয়া গারদ,
শূন্যে ছুটি আক্রমিল স্বর্গের দেওয়াল,
সে গান কৌতুকে শোনে তুম্বুরু নারদ।

জন্মিল সুরার তেজে সুরের খেয়াল
নেশায় বাদশা হাঁকে—"বাহবা বাহবা।"
ধ্রুপদীরা কহে রেগে "ডাকিছে শেয়াল!"

২৯শে মে ১৯১৪

তেপাটি

(Triolet]

ঊষা

ঊষা আসে অচল-শিয়রে
তুষারেতে রাখিয়া চরণ।
স্পর্শে তার ভুবন শিহরে,
ঊষা হাসে অচল-শিয়রে,
ধরে বুকে নীহারে শীকরে
সে হাসির কনক বরণ।
বসো সখি মনের শিয়রে
হিম-বুকে রাখিয়া চরণ।

মধ্যাহ্ন

আকাশের মাটি-লেপা ঘরে
রবি এবে দেয় আলপনা।
দেখ সখি মেঘের উপরে
কত ছবি আঁকে রবি-করে।
কত রঙে কত রূপ ধরে
ছবি যেন কবিকল্পনা।
বুক মোর আছে মেঘে ভরে
তাহে সখি দাও আলপনা।

সন্ধ্যা

দেখ সখি দিবা চলে' যায়
লুটাইয়া আলোর অঞ্চল,
পিছে ফেলে অবাক্ নিশায়
দেখ সখি আলো চলে' যায়।
বিশ্ব এবে আঁধারে মিশায়,
তাই বলে' হয়ো না চঞ্চল।
বেলা গেলে সবে চলে' যায়
গুটাইয়া আলোর অঞ্চল।

মধ্যরাত্রি

দেখ সখি আঁধারের পানে
চেয়ে আছে দুটি শুভ্র তারা।
দুটি শিখা বিকম্পিত প্রাণে
চেয়ে আছে স্থিররাত্রি পানে,
আঁধারের রহস্যের টানে
দুটি আলো হয়ে আত্মহারা।
রাখো সখি জ্বেলে মোর প্রাণে
আলোভরা দুটি কালো তারা।

কার্সিয়াং, ১০ই অক্টোবর, ১৯১৪।

মিলন

জান সখি কেন ভালবাসি
ওই তব ফোটা মুখখানি,
ওই তব চোখভরা হাসি
জান সখি কেন ভালবাসি?
যবে আমি তোমা কাছে আসি,
ঠোঁটে মোর ফোটে দিব্যবাণী।
তাই সখি আমি ভালবাসি
ওই তব ফোটা মুখখানি॥

বিরহ

বলি তবে কেন চলে' যাই,
শুনে যেন মরমে কেঁদ না।
দুঃখ দিতে, দুঃখ পেতে চাই,
তাই সখি তোমা ছেড়ে যাই।
আমি চাই সেই গান গাই,
সুরে যার উছলে বেদনা।
তাই যবে দূরে যেতে চাই,
সখি মোরে থাকিতে সেধ না।

কার্সিয়াং, ৩১ অক্টোবর, ১৯১৪।

ছোট কালীবাবু

(Triolet)

লোকে বলে আঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
অপিচ বয়স তার আড়াই বছর।
কোঁচা ধরে' চলে যবে, সেজে ফুলবাবু,
লোকে বলে বাঁকা ছেলে ছোট কালীবাবু।
দিনমান বকে যায়, হয় নাকো কাবু,
সুরে গায় তালে নাচে, হাসে চরাচর।
লোকে বলে পাকা ছেলে ছোট কালীবাবু,
যদিচ বয়েস তার আড়াই বছর।

১৮ই জুন, ১৯১৮।

সমালোচকের প্রতি

তোমাদের চড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম,
লেখা হবে যথা লেখে ঘুণে,
তোমাদের কড়া কথা শুনে।
তার চেয়ে ভাল শতগুণে
দেয়া চির লেখায় অলম্,
তোমাদের পড়া কথা শুনে
যদি হয় কাটিতে কলম।

১লা নভেম্বর, ১৯১৪।

দোপাটী

(গাথা সপ্তশতী হইতে অনূদিত)

অদর্শনে প্রেম যায়, অতি দরশনে,
পরের কথায়, কিম্বা শুধু অকারণে।
কালেতে দম্পতি- প্রেম এত গাঢ় করে,
যে মরে সে বাঁচে, আর যে বাঁচে সে মরে।

সুখী যে, সে হেসে ভাল পরকে বাসায়,
নিজে ভালবেসে দুঃখী পরকে হাসায়।

অকৃত্রিম প্রেম নাহি ইহলোক-মাঝে।
বিরহ কাহার হয়? হ'লে কেবা বাঁচে?

সতৃষ্ণ নয়নে শুধু হেরেছি তোমায়,
স্বপনে করিলে পান তৃষ্ণা নাহি যায়।

প্রভুত্ব গোপন করে' ব্যক্ত করে রতি,
নারীর বল্লভ সেই—বাকী সব পতি।

দুঃখ দিয়ে সুখ দেয় চির-প্রিয়জন,
নারীর হৃদয় যাচে হৃদয়-পীড়ন।

ধন্যা যে স্বপনে দেখে দয়িত আপন,
সে বিনে বিনিদ্র আমি, না দেখি স্বপন।

মণ্ডন আধেক সেরে যাও প্রিয়-পাশে,
অসম্পূর্ণ সাজসজ্জা আগ্রহ প্রকাশে।

পতনের ভয়ে ম্লান উন্নতির সুখ,
অধঃপাত হবে জেনে স্তন কালীমুখ।

নিজের অন্তরে গাঁথা ধরি সূক্ষ্ম সুতা,
ঝুলিছে বকুল সম উর্দ্ধপাদ লূতা।

চরণে পতিত পতি, পুত্র পৃষ্ঠে চড়ে,
গৃহিণীর গেল মান, হেসে উল্টে পড়ে।

বিরল অঙ্গুলিপুটে
উর্দ্ধনেত্রে পান্থ করে পান,
ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণধারে
নারী তাহে করে বারিদান।

সিকি

এক হয়ে বসে' থাকো, নয় যাও দূরে,
হয় থাকো চুপ করে', নয় গাও সুরে।
হয় কেঁদে যাক্ দিন, নয় হেসে খেলে,
—দ্বিধার ধাঁধায় পড়ে' আধা হয়ে গেলে।

কবিতায় কেহ করে জীবনের ভাষ্য,
কেহ বা প্রকাশে ছন্দে কল্পনার লাস্য,
জ্ঞানের ঔদাস্য কিম্বা প্রণয়ের দাস্য;
এ-সব ছায়ার গায়ে আলো ফেলে হাস্য।

দুয়ানি

শীতেতে বিবর্ণা দিবা বিশীর্ণা দরিদ্রা,
হেসে ফেলে গায়ে মেখে রৌদ্রের হরিদ্রা।

অস্পষ্ট মনের ভাবে কবিতার সৃষ্টি,
আগে চাও বাষ্প, যদি শেষে চাও বৃষ্টি।

লোকে বলে কথা কয়ে কিছুই না হয়,
আমি দেখি কথা ছাড়া কিছুই না রয়।

বাঙ্গালী জাতির এটি পরম সৌভাগ্য,
হেন লোক নাই যার নাহি বৌ-ভাগ্য!

সনেট

তব দেহশ্লিষ্ট শুভ্র বসন কাষায়,
গোপন করিতে নারে যৌবন-হিল্লোল।
সবাষ্প-নয়ন-কোণে কটাক্ষ বিলোল
চকিতে বেকত করে, ভেদি কুয়াশায়,
হৃদয়-আকাশ-বহ্নি, আলোর ভাষায়।
শৈবালে আবৃত তব হৃদয়-পল্বল,
বৃথায় লুকাতে চায় প্রাণের কল্লোল,
নিরাশার ছদ্মবেশে ঢাকিয়া আশায়।

শ্রাবণে নদীর বক্ষে আবেগে চঞ্চল,
সংযত করে কি তারে সন্ধ্যার অঞ্চল?
বায়ুর পরশ বিনে তাহার অন্তরে
অবাধ্য যৌবন তোলে রসের তরঙ্গ,
অস্তের গৈরিক-রক্ত বহির্বাস পরে'
ব্যক্ত করে হৃদয়ের উদয়ের রঙ্গ।

আশ্বিন, ১৩২৩।

খসাং

ঝুলে আছ গিরিপল্লী আকাশের গায়,
অটল পর্ব্বত-পৃষ্ঠে করিয়া নির্ভর,
ধরে' আছে শিরে ব্যোম হিমের কর্পর,
শুয়ে-পড়া বঙ্গভূমি চরণে লুটায়।
ক্ষণে তব হাসিমুখ, ক্ষণে মেঘে ছায়,
ঝরে বুকে সুখেদুঃখে অশ্রুর নির্ঝর।
কানে তব অহর্নিশি বনের মর্ম্মর
গাহিছে ঘুমের গান অস্ফুট ভাষায়।

তোমার কোলেতে বসি আমি ভালবাসি
হেরিতে বিচিত্রগতি মেঘ রাশি রাশি।
কথনো হাঁসের মত ভাসে নীলাকাশে,
পলকে আবার ধরে আকার ধূঁয়ার।
ভোরে সাঁঝে মাঝে মাঝে মেঘ অবকাশে
চোখে পড়ে অলঙ্কার সোনার দুয়ার।

২ নভেম্বর, ১৯১৩।

তত্ত্বদরশী সিন্ধুদর্শন

সিন্ধু নহে শান্ত দান্ত স্তব্ধ অহঙ্কারে,
যোগী, কিন্তু মুনি নয়, সশব্দে হুঙ্কারে।
মহানদ মহানাদে বকে না প্রলাপ,
নাদসুরে মহানন্দে করে শাস্ত্রালাপ।
সিন্ধুপ্রোক্ত গুহ্যশাস্ত্র, গূঢ় তার মানে,
বোঝে যারা শাস্ত্র-জ্ঞানী, মূঢ় কিবা জানে।
সমুদ্রের ভাষা শুনি খুলি অন্তঃকর্ণ,
ব্যঞ্জন তাহাতে নাই, শুধু স্বরবর্ণ।
ব্যক্ত নিয়ে ব্যস্ত যারা, বোঝে ভাষা স্পষ্ট,
পঞ্চভূতে বদ্ধ তারা, নাহি জানে যষ্ঠ।
সিন্ধু কহে, বিশ্বগ্রন্থ উল্টো করে' পড়ো,
তা হ'লে চৈতন্য পাবে, সোজা দিকে জড়।
তত্ত্বজ্ঞানে মত্ত হয়ে, মায়া করি ধ্বংস,
অকূলেতে ভেসে যাই, হয়ে পরমহংস।

এপ্রিল, ১৯১১।

শরৎ

মেঘেরা গিয়েছে ভেসে দূর দ্বীপান্তর,
অবাধে পড়িছে ঝরে' আলোক রবির।
আকাশ জুড়িয়া ওড়ে সোনার আ[illegible],
ধরেছে সোনালি রঙ সবুজ প্রান্তর।
ক্ষীণপ্রাণ, সুকুমার, সলজ্জ, মন্থর,
বাতাস বহিয়া আনে স্পর্শ করবীর।
সোনার স্বপন আজ প্রকৃতি-কবির
এসেছে বাহিরে তার ত্যজিয়া অন্তর।

শরতের এ দিনের সুবর্ণের মায়া
না ঘুচায় অন্তরের চিরস্থির ছায়া।

আলোর সোনার পাতে মোড়া নভদেশ
ফুটিয়ে দেখায় তার অনন্ত নীলিমা।
এ বিশ্বের রহস্যের নিবিড় কালিমা
রঞ্জিয়াছে প্রকৃতির ওই নীল কেশ।

আশ্বিন, ১৩২৪।

সংসার

শক্তি নিয়ে মানুষের নিত্য পাড়াপাড়ি,
ধন নিয়ে মানুষের নিত্য কাড়াকাড়ি,
মন নিয়ে মানুষের নিত্য আড়াআড়ি,
প্রেম নিয়ে মানুষের নিত্য বাড়াবাড়ি।
ছুটিয়া চলেছে দিন বড় তাড়াতড়ি,
না ফুরোতে সেই দিন, সব ছাড়াছাড়ি।

১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯১২।

কবির সাগর-সম্ভাষণ

হে সাগর! হে অর্ণব! জলধি মহান্!
আমি শুনেছি তোমার গান,
আমি দেখেছি তোমার আলো।
শিয়রে সোনার দীপ তুমি যবে জ্বালো,
দিগঙ্গনাগণে দেখে সোনার স্বপন,
সে স্বপনে হয়ে যাই আমিও মগন।

প্রাণময়, গানময়, সিন্ধু তানময়!
তব ধ্যানে হয়েছি তন্ময়।
আমারে শেখাও তব ছড়া,
নিত্য নবছন্দে তব নিত্য ওঠাপড়া।
তব স্পর্শে খুলে গেছে হৃদয়-দুয়ার,
বহে যাক্ সেই পথে গীতের জোয়ার।

কি রাগিণী গাহ তুমি, সিন্ধু কি ভৈরবী,
হে মুখর প্রকৃতির কবি?
স্নিগ্ধঘোষ তোমার গমক
শুনিয়া এ প্রাণে মহা লেগেছে চমক।
কভু দাও ছাড়ি তান, কভু বা সম্বর,
তোমার সুরেতে আজি কাঁপিছে অম্বর।

হে অনাদি! হে অনন্ত! মহা আলোড়ন!
হে বিস্তার যোজন যোজন!
কি হুতাশে উঠিছ ফুঁসিয়া,
কি কথা কহিছ সদা রুষিয়া রুষিয়া?

বহুভাষী বহুরূপী মহাপারাবার,
মন্ত্র দেহ মোর কানে মায়া সারাবার।

হে বিরাট! হে উদার! অসীম চঞ্চল!
ধরিয়াছি তোমার অঞ্চল।
দেহ মোরে তব স্নিগ্ধ কোল,
ক্রোড়ে লয়ে দাও মোরে অহর্নিশি দোল।
তরঙ্গ-অধরে দাও কপোল চুমিয়ে,
পড়ুক আকুল হৃদি অকূলে ঘুমিয়ে।

হে সুন্দর, হে চঞ্চল তরল সাগর!
তুমি মোর প্রাণের নাগর।
তব সনে আজি জলকেলি,
পরাও আমার অঙ্গে নীলাম্বরী চেলি।
তোমার বুকেতে শুয়ে হেরিব আকাশ,
ক্রমে ধীরে নিভে যাবে আলো ও বাতাস।

হে দুর্ব্বার! হে দুর্দ্ধর্ষ উন্মাদ পাগল!
অট্টরোলে বাজাও মাদল।
অট্ট হেসে করো চীৎকার,
ফুটুক অন্তরে মম সুখ-শীৎকার।
ছুটুক আনন্দ-বন্যা উদ্‌ভ্রান্ত বিপুল,
ভেসে যাক্ সে বন্যায় মম প্রাণ-ফুল।

এ বিশ্ব ডুবিয়া গেল আনন্দের বানে,
একদৃষ্টে চাহি সিন্ধুপানে।
চেয়ে আছি নেত্রে নির্নিমেষ,
কি জানি কি বেদনার করেছ উন্মেষ,
উঠিছে মরমে বেজে যাহার "বিগল,"
করেছ পাগল সিন্ধু আমায় পাগল।

হে সাগর, কর জোরে তুফান-গর্জ্জন,
আজি মোরে দিব বিসর্জ্জন
ওই তব কৃষ্ণ লুব্ধ জলে।
আশা আছে শান্তি পাব অতলের তলে।
ডুব দিয়ে কিন্তু হায়! আমি উঠি ভাসি,
জলের উপরে ফের ফেন—হাসি হাসি।

সমাপ্ত

সনেট-পঞ্চাশৎ

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত

সনেট-পঞ্চাশৎ

সনেট

পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ,
যাঁহার প্রতিভা মর্ত্ত্যে সনেটে সাকার।
একমাত্র তাঁরে গুরু করেছি স্বীকার,
গুরুশিষ্যে নাহি কিন্তু সাক্ষাৎ সম্বন্ধ!

নীরব কবিও ভাল, মন্দ শুধু অন্ধ।
বাণী যার মনশ্চক্ষে না ধরে আকার,
তাহার কবিত্ব শুধু মনের বিকার,
এ কথা পণ্ডিতে বোঝে, মূর্খে লাগে ধন্ধ॥

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন।

ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙ্গালীর ছন্দ,
গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।
কিঞ্চিৎ থাকিবে তাহে বিজাতীয় গন্ধ,—
সরস্বতী দেখা দিবে পরিয়া বনেট!

জয়দেব

ললিত লবঙ্গলতা দুলায় পবনে।
বর্ণে গন্ধে মাথামাখি, বসন্তে অনঙ্গে।
নূপুর-ঝঙ্কারে আর গীতের তরঙ্গে,
ইন্দ্রিয় অবশ হয় তব কুঞ্জবনে॥

উন্মদ মদনরাগ জাগালে যৌবনে,
রতিমন্ত্রে কবিগুরু দীক্ষা দিলে বঙ্গে।
রণক্ষত-চিহ্ন তাই অবলার অঙ্গে
পৌরুষের পরিচয় আশ্লেষে চুম্বনে॥

পাণির চাতুরী হ'ল নীবীর মোচন।
বাণীর চাতুরী কান্ত কোমল বচন॥

আদিরসে দেশ ভাসে, অজয়ে জোয়ার!
ডাকো কল্কি, ম্লেচ্ছ আসে, করে করবাল,
ধূমকেতু কেতু সম উজ্জল করাল,
বঙ্গভূমি পদে দলে তুরুস্ক সোয়ার!

ভাষ

পদধূলি দেহ মোরে, মহাকবি ভাষ!
ভারতের নাটকের আদিম আচার্য্য!
ধন্য হব তব কাব্য করি শিরোধার্য্য,
পত্রে পত্রে স্ফুরে যার বালার্ক আভাস॥

শুদ্ধ সুরে গেয়েছিলে প্রসন্ন বিভাস,
পরিষদ ছিল তব মহাপ্রাণ আর্য্য।
সে যুগের কবিমুখে ছিল না উচ্চার্য্য
বৃন্দাবনী প্রণয়ের গদগদ ভাষ॥

স্বাধ্যায়-পবিত্র তব শূর-মুখ-বাণী।
সরাগিণী অরোগিণী তব বীণাপাণি॥

তব কাব্য গৌরবের ধরে ইতিহাস।
তুমি জানো সমরস বীর ও করুণ।
সে শুধু কাতর, যার নয়নে বরুণ।
তোমা নাটকে তাই জলে পরিহাস॥

ভর্ত্তৃহরি

যোগী তুমি, ভোগী তুমি, তুমি রাজকবি!
দেখেছ কখনো বিশ্ব শুধু নারীময়,
আবার দেখেছ বিশ্ব শুধু ব্রহ্মময়,
সুবর্ণে গৈরিকে আঁকো সেই দুই ছবি॥

ক্ষণিকের জ্যোতিকণা জানো শশিরবি,
বিশ্বরূপে মুগ্ধ তবু, সৌন্দর্য্যে তন্ময়।
অসীম আঁধার-মগ্ন অনন্ত সময়
আত্মজ্যোতি-দীপালোকে শূন্য দেখ সবি॥

নাস্তিকের শিরোমণি, আস্তিকের রাজা!
তব ধর্ম্ম মনোরাজ্য বহুরূপী সাজা॥

নাহি জান কারে বলে ভয় কিম্বা আশা।
ভুক্তি মুক্তি তোমা কাছে সমান অসার।
সত্য শুধু মানবের অনন্ত পিপাসা,—
রত্ন দিয়ে তাই গাঁথো বৈরাগ্যের হার!

চোরকবি

জলন্ত অঙ্গার, চোর! তোর প্রতি শ্লোক,
দেহ আর মন যাহে একত্র গলিয়া,
হয়েছে পুষ্পিত, রূপে মর্ত্ত্য উজলিয়া,—
কামনার অগ্নিবর্ণ রক্তাক্ত অশোক!
অশুভদর্শন যার কুহকী আলোক,
চিতাগ্নির শিখাসম হুতাশে জ্বলিয়া,
মরণের ধূম্রদেহ চরণে দলিয়া,
রক্তসন্ধ্যারূপে রাজে, ছেয়ে কাব্যলোক॥

সেই রক্তপুষ্পে করি শক্তি-আরাধনা.
করেছিলে মশানেতে নায়িকা-সাধনা।
দিয়েছিল দেখা বিশ্ব বিদ্যারূপ ধরি,'
কনকচম্পকদামে সর্ব্বাঙ্গ আবরি,
সুপ্তোত্থিতা, শিথিলাঙ্গী, বিলোলকবরী,
প্রমাদের রাশিসম অবিদ্যা-সুন্দরী॥

বসন্তসেনা

তুমি নও রত্নাবলী, কিম্বা মালবিকা,
রাজোদ্যানে বৃন্তচ্যুত শুভ্র শেফালিকা।
অনাঘ্রাত পুষ্প নও, আশ্রমবালিকা,—
বিলাসের পণ্য ছিলে, ফুলের মালিকা॥

রঙ্গালয় নয় তব পুষ্পের বাটিকা,
অভিনয় কর নাই প্রণয়-নাটিকা।
তব আলো ঘিরে ছিল পাপ-কুজ্ঝটিকা,—
ধরণী জেনেছ তুমি মৃৎ-শকটিকা!

নিষ্কণ্টক ফুলশরে হওনি ব্যথিতা।
বরেছিলে শরশয্যা, ধরায় পতিতা॥

কলঙ্কিত দেহে তব সাবিত্রীর মন
সারানিশি জেগেছিল, করিয়ে প্রতীক্ষা
বিশ্বজয়ী প্রণয়ের, প্রাণ যার পণ।—
তারি বলে সহ তুমি অগ্নির পরীক্ষা!

পত্রলেখা

অষ্টাদশ বর্ষ দেশে আছ পত্রলেখা!
শুক মুখে শুনিয়াছি তোমার সন্দেশ।
তাম্বূল-করঙ্ক করে, রক্ত পট্টবেশ,
প্রগল্ভ বচন, রাজ-অন্তঃপুরে শেখা॥

কাব্য-রাজ্যে তব সনে নিমেষের দেখা।
সুবর্ণ-মেখলাস্পর্শী মুক্ত তব কেশ,—
অশ্বপৃষ্ঠে রাজপুত্র-যায় দূরদেশ,
অঙ্কে তার আঁকা তুমি বিদ্যুতের রেখা!

চন্দ্রাপীড় মুগ্ধনেত্রে হেরে কাদম্বরী,—
রক্তাম্বরে রাখো তুমি হৃদয় সম্বরি॥

গিরি পুরী লঙ্ঘি, সিন্ধু কান্তার বিজন,
মনোরথে নীলাম্বরে ভ্রমি যবে একা,—
মম অঙ্কে এসে বস', কবির সৃজন,
তাম্বূল-করঙ্ক করে তুমি পত্রলেখা!

তাজমহল

সাজাহাঁর শুভ্রকীর্ত্তি, অটল সুন্দর!
অক্ষুণ্ণ অজর দেহ মর্ম্মরে রচিত,
নীলা পান্না পোখ্‌রাজে অন্তর খচিত।
তুমি হাস, কোথা আজ দারা সেকন্দর?

সকলি সদর তব, নাহিক অন্দর,
ব্যক্ত রূপ স্তরে স্তরে রয়েছে সঞ্চিত।
প্রেমের রহস্যে কিন্তু একান্ত বঞ্চিত,
ছায়ামায়াশূন্য তব হৃদয়-কন্দর।

মুম্‌তাজ! তাজ নহে বেদনার মূর্ত্তি।
—শিল্প-সৃষ্টি-আনন্দের অকুণ্ঠিত স্ফূর্ত্তি॥

আঁখিতে সুর্ম্মা-রেখা, অধরে তাম্বূল,
হেনায় রঞ্জিত তব নখাগ্র রাতুল,
জরিতে জড়িত বেণী, রুমালে তাম্বূল,—
বাদ্‌শার ছিলে তুমি খেলার পুতুল!

বাঙ্গলার যমুনা

তুমি নহ শ্যামা তন্বী বৃন্দাবন-পাশে,
তীরে যার সারি সারি কদম্ব বকুল,
কৃষ্ণ যেথা বেণুতানে মাতায় গোকুল,
নৃত্য করে লীলাভরে গোপীসনে রাসে॥

উজান বহ না তুমি চলিয়া বিলাসে,—
সুমুখে ছুটিয়া চল উদ্দাম ব্যাকুল,
মাটি নিয়ে খেলা কর, ভেঙ্গে ছুটি কূল,
সীমায় আবদ্ধ নহ, পরশ' আকাশে!

আরম্ভেতে ব্রহ্মপুত্র, শেষেতে যমুনা।
সৃষ্টি আর প্রলয়ের দেখাও নমুনা॥

অহর্নিশি ভাঙ্গাগড়া, এই তব রীতি,
মুক্তকণ্ঠে গাও তুমি জীবনের গান।
জগৎ গতির লীলা, সৃষ্টিছাড়া স্থিতি।
বাঙ্গলার নদী তুমি, বাঙ্গলার প্রাণ!

BERNARD SHAW

সভ্যতার প্রিয়শক্র, বার্ণার্ড শ,
সমাজের তুমি দেখ শৃঙ্খল আচার,
শিকল-বিকল-মন মানুষ নাচার,
তব শাস্ত্র শুনে তাই তারা হয় থ !

মানুষেতে ভালবাসে হ য ব র ল,
তারি লাগি সয় তারা শত অত্যাচার।
স্পষ্ট বাক্যে প্রাণ পায়, যে করে বিচার,—
অন্যের পায়ের নীচে পড়ে' যায় দ !

মানবের দুঃখে মনে অশ্রুজলে ভাসো,—
অপরে বোঝে না, তাই নাটকেতে হাসো ॥

হয় মোরা মিছে খেটে হই গলদঘর্ম্ম,
নয় থাকি বসে, রাখি করেতে চিবুক।
এ জাতে শেখাতে পারি জীবনের মর্ম্ম,
হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক !

বালিকা-বধূ

বাঙ্গলার যত নব যুবা কবিবঁধু,
যুবতী ছাড়িয়ে এবে ভজিছে বালিকা।
তাদের চাপিয়া ক্ষুদ্র হৃদয়-নালিকা,
চোঁয়াতে প্রয়াস পায় তাজা প্রেম-মধু !

গৌরীদানে লভে কবি কচিখুকি বধূ,
কবিহস্তে কিন্তু ত্রাণ পায় না কলিকা।
কুঁড়ি ছিঁড়ি ভরে তারা কাব্যের ডালিকা,—
দুগ্ধপোষ্য শিশুদের মুখে যাচে সাধু !

পবিত্র কবিত্বপূর্ণ প্রেমে হয়ে ভোর,
বালিকার বিদ্যালয়ে ঢোকে কবি চোর !

বলিহারি কবি-ভর্ত্তা M. A. আর B.A.
বাল-বধূ লতিকার ঝুলিবার তরু !
মানুষ মরুক্ সবে গলে রজ্জু দিয়ে,
বেঁচে থাক্ কবিতার যত কাম-গরু !

বন্ধুর প্রতি

বড় সাধ ছিল তব, করে ধরি' বীণ,
বাজাতে অপূর্ব্ব রাগ যৌবনের সুরে,
মুমূর্ষু মুমুক্ষু সবে দিয়ে যমপুরে,
তব গীতমন্ত্রে ধরা করিতে নবীন !

কল্পনার ছিল তব চক্ষে দূরবীণ
অসীম আকাশদেশে দূর হ'তে দূরে
খুঁজিতে কোথায় কোন্ নব জ্যোতি স্ফুরে,
যার আলো জয় করে আঁধার প্রবীণ ॥

আবিষ্কার কর নাই কোন নব তারা।
আজিও ধরণী ধরে পুরাণো চেহারা ॥

আকাশেতে উড়েছিলে রঙীন পতঙ্গ,
পূর্ব্বাহ্ণেই গেছে তব পাখা দু'টি ঝরে',
সে পক্ষ-ধুনন-ধ্বনি আজ গেছে মরে',—
মাটির বুকেতে সুখে শুয়ে আছে অঙ্গ !

ব্যর্থ জীবন

মুখস্থে প্রথম কভু হইনি কেলাসে।
হৃদয় ভাঙ্গেনি মোর কৈশোর-পরশে।
কবিতা লিখিনি কভু সাধু-আদিরসে।
যৌবন-জোয়ারে ভেসে, ডুবিনি বিলাসে ॥

চাটুপটু বক্তা নহি, বড় এজ্‌লাসে।
উদ্ধার করিনি দেশ, টানিয়া চরসে।
পুত্রকন্যা হয় নাই বরষে বরষে।
অশ্রুপাত করি নাই মদের গেলাসে !

পয়সা করিনি আমি, পাইনি খেতাব।
পাঠকের মুখ চেয়ে লিখিনি কেতাব ॥

অন্যে কভু দিই নাই নীতি-উপদেশ।
চরিত্রে দৃষ্টান্ত নহি, দেশে কি বিদেশে।
বুদ্ধি তবু নাহি পাকে, পাকে যদি কেশ।
তপস্বী হব না আমি জীবনের শেষে !

মানব-সমাজ

ঘরকন্না নিয়ে ব্যস্ত মানব-সমাজ।
মাটির প্রদীপ জ্বেলে সারানিশি জাগে,
ছোট ঘরে দোর দিয়ে ছোট সুখ মাগে,
সাধ করে' গায়ে পরে পুতুলের সাজ ॥

কেনা আর বেচা, আর যত নিত্য কাজ,
চিরদিন প্রতিদিন ভাল নাহি লাগে।
আর কিছু আছে কি না, পরে কিম্বা আগে,
জানিতে বাসনা মোর মনে জাগে আজ ॥

বাহিরের দিকে মন যাহার প্রবণ,—
সে জানে প্রাণের চেয়ে অধিক জীবন ॥

মন তার যায় তাই সীমানা ছাড়িয়ে,
করিতে অজানা দেশ খুঁজে আবিষ্কার।
দিয়ে কিন্তু মানবের সাম্রাজ্য বাড়িয়ে,
সমাজের তিরস্কার পায় পুরস্কার !

হাসি ও কান্না

সত্য কথা বলি, আমি ভাল নাহি বাসি
দিবানিশি যে নয়ন করে ছলছল,
কথায় কথায় যাহে ভরে আসে জল,—
আমি খুঁজি চোখে চোখে আনন্দের হাসি।

আর আমি ভালবাসি বিদ্রূপের হাসি,
ফোটে যাহা তুচ্ছ করি আঁধারের বল,
উজ্জ্বল চঞ্চল যার নির্ম্মম অনল
দগ্ধ করে পৃথিবীর শুষ্ক তৃণরাশি॥

হৃদয়ে কৃপণ হ'য়ে ধনী হ'তে চায়,—
সুখ তারা দেয় নাকো, তাই দুঃখ পায়॥

তাই আমি নাহি করি দুঃখেতে মমতা,
সুখী যারা, তারা মোর মনের মানুষ।
হাসিতে উড়ায় তারা নিষ্ঠুর ক্ষমতা,
মনে জেনে বিশ্ব শুধু রঙীন ফানুষ॥

ধরণী

কে বলে পৃথিবী এবে হয়েছে প্রাচীন?
আজিও বসন্তে এসে কোকিল পাপিয়া
মুক্তকণ্ঠে তারস্বরে ডাকে "পিয়া" "পিয়া",—
বার্দ্ধক্যের পক্ষে সে ত নহে সমীচীন।
বার্দ্ধক্যের স্বপ্ন দেখে যত অর্ব্বাচীন,
যৌবন যাহারা রাখে ভয়েতে চাপিয়া।
হা দেখ, প্রাণের টানে উঠেছে কাঁপিয়া,
চিরকেলে গুলিখোর পাণ্ডুবর্ণ চীন্!

আকাশে বিদ্যুৎ আজো খেলে তলোয়ার,
চাঁদের চুম্বনে ওঠে সাগরে জোয়ার।
পূর্ণিমা আজিও ঘুরে আসে পক্ষে পক্ষে,
আজিও প্রকৃতি আছে সবুজ, সৌখীন,
নরনারী আজো ধরে পরস্পরে বক্ষে,—
অমানুষে পরে শুধু ডোর ও কৌপীন!

কাঁঠালী চাঁপা

গড়নে গহনা বটে, রঙেতে সবুজ,—
ফুলের সবর্ণ নহ, বর্ণচোরা চাঁপা!
বৃথা তব গন্ধভারে গর্ব্বভরে কাঁপা,
ফিরেও চাহে না তোমা নয়ন অবুঝ॥

নেত্রধর্ম্ম খুঁজে ফেরা গোলাপ, অম্বুজ।
উপেক্ষিতা আছ তুমি, হয়ে পাতা-চাপা।
তোমার কাঁঠালী গন্ধ নাহি রহে ছাপা,—
ছুটে আসে, ভেদ করি পাতার গম্বুজ॥

ঠিক করে' হও নাই পাতা কিম্বা ফুল,—
দু'মনা করাই তব দুর্গতির মূল!

পত্রের নিয়েছ বর্ণ, ফল হ'তে গন্ধ,
আকৃতি ফুলের কাছে করিয়াছ ধার,
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়-লোভে হয়ে অন্ধ,—
স্বধর্ম্ম হারিয়ে হ'লে সর্ব্বজাতি-বার!

করবী

সুপ্ত গন্ধ, গুপ্ত বর্ণ তোমার, করবি!
শক্তি-বীজ-মন্ত্র আমি দিয়া তব কাণে,
সৌরভ জাগাতে চাহি প্রণয়ের টানে,
গৌরবে তোমায় করি ফুলের ভারবি!

তরুণ অরুণ রাগে রঞ্জিত ভৈরবী,
জীবনের পূর্ব্বরাগ আছে তার গানে।
সেই রাগ পূর্ণ হয় সারঙ্গের তানে,
আলিঙ্গন করে যবে মধ্যাহ্নের রবি॥

পূর্ণস্নেহে জ্বলে যবে জীবনের শিখা,
গাঢ় হয়ে ওঠে তবে, ছিল যাহা ফিকা॥

কত বর্ণ, কত গন্ধ অন্তঃপুরবাসী,
সুষুপ্ত রয়েছে আজি কুসুম-শয়নে।
জাগাতে তাদের নিত্য আমি ভালবাসি,
তন্দ্রাসুখে আছে যারা মুদিয়া নয়নে॥

কাঠ-মল্লিকা

তুমি নহ রক্তজবা অথবা পলাশ,
আগুন জ্বালিয়ে বন আলো করে যারা,
—যে দিব্য অনলে পুড়ে কাম অঙ্গহারা,
যে আলো ধরায় করে নকল-কৈলাস!

তুমি নহ মানবের নয়ন-বিলাস,
রতি-ভর তনু তব হিম-বিন্দু পারা,—
গন্ধ তব ভেদ করি শ্যামপত্র-কারা,
মুক্ত হয়ে ব্যক্ত করে মন-অভিলাষ॥

গুপ্ত হয়ে থাক তুমি বন-অন্তঃপুরে।
মায়া তব গন্ধরূপে ছড়াও সুদূরে॥

আকাশ দেখনি কভু সুনীল বিপুল,
ঘনচ্ছায় বনে আছ, নেত্র নত করি।
খুঁজিনি তোমায় আমি গন্ধসূত্র ধরি,
তাই তুমি মোর চির আকাশের ফুল!

রজনীগন্ধা

রাত্রি-হাতে স'পে দেয় দিবা যবে সন্ধ্যা,
পরায়ে তাহার অঙ্গে গাঢ় লাল আলো,
—নিশা যারে ক্রোড়ে ধরে দিয়া বাহু কালো—
সেই লগ্নে ফোটো তুমি, রে রজনীগন্ধা !

রাত্রির পরশে যবে পৃথ্বী হয়ে বন্ধ্যা,
না পারে ফুটাতে ফুল রূপে জম্‌কালো,
তুমি সেই অবসরে বুক খুলে ঢালো,
গোপনে সঞ্চিত গন্ধ, লো রজনীগন্ধা !

দিবসের প্রলোভনে তুমি নহ বশ্যা।
হৃদয় তোমার তাই অসূর্য্যম্পশ্যা ॥

আমার আসিবে যবে জীবনের সন্ধ্যা,
দিবসের আলো যবে ক্রমে হবে ঘোর,
কানেতে পশিবে নাকো পৃথিবীর সোর,—
মোর পাশে ফুটো তুমি, হে রজনীগন্ধা !

গোলাপ

রূপে গন্ধে মানি তুমি জগতে অতুল,
পূজায় লাগো না কিন্তু, অনার্য্য গোলাপ !
দেমাকে দেবতাসনে করো না আলাপ,—
ফুলের নবাব তুমি, নবাবের ফুল !

ইরাণের ভগ্নোদ্যানে বসি বুলবুল,
স্মরিয়া স্মরিয়া তোমা করিছে বিলাপ।
তুমি কিন্তু রমণীর কেশের কলাপ
আলো করে' বসো, কিম্বা কর্ণে হও দুল ॥

সোহাগে গলিয়া তুমি হও বা আতর,
গুল্‌ফাসনে বসে' কর বেগম কাতর !

বিলাসের অঙ্গ লাগি তুমি হও জল,
নারীর আদরে ফুল, সৌখীন গোলাপ !
নবাবেরই ভোগ্য তব রূপগুণবল,
নবাবের যোগ্য তুমি হকিমী জোলাপ !

ধুতুরার ফুল

ভাল আমি নাহি বাসি নামজাদা ফুল,—
নারীর আদর পেয়ে যারা হয় ধন্য,
ফুলের বাজারে যারা হইয়াছে পণ্য,
কবিরা যাদের নিয়ে করে হুলস্থুল।

বিলাসীর কিন্তু যারা অতি চক্ষুশূল,
রূপে গন্ধে ফুল-মাঝে যাহারা নগণ্য,
বসন্ত কি কন্দর্পের যারা নয় সৈন্য,
যার দিকে কভু নাহি ঝোঁকে অলিকুল,—

আমি খুঁজি সেই ফুল, হইয়া বিহ্বল,
যাহার অন্তরে আছে গন্ধ-হলাহল।

নয়নের পাতে যার আছে ঘুম-ঘোর,
চির দিবাস্বপ্নে যারা আছে মশ্‌গুল,
তাদের নেশায় আমি হ'তে চাই ভোর,—
ভালবাসি তাই আমি ধুতুরার ফুল ॥

অপরাহ্ণ

গোলাপ, গোলাপ, শুধু গোলাপের রাশি !
গোলাপের রঙ ছিল অনন্ত আকাশে,
গোলাপের গন্ধ ছিল ধরাতে বাতাসে,
নারীর অধরে ছিল গোলাপের হাসি ॥

রং এবে গেছে জ্বলে', গন্ধ হ'ল বাসি।
শুকানো পাতার রাশি পড়ে চারিপাশে
বসন্ত নিদাঘে পুড়ে ছাই হয়ে আসে,
পৃথিবীতে মনে হয় হয়েছি প্রবাসী ॥

অলক্ষিতে খসে' গেছে মায়া-রত্নঠুলি।
এ বিশ্ব মাটির গড়া দেখি চক্ষু খুলি ॥

আশার গোলাপী নেশা গিয়াছে ছুটিয়া,
যে নেত্রে আদর ছিল, হেরি অবহেলা।
যৌবনের স্বর্ণপুরী গিয়াছে টুটিয়া,—
মহাশূন্য-মাঝে আজি করি ধূলাখেলা ॥

ব্যর্থ বৈরাগ্য

এসেছে নূতন দিন, ধরি যোগিবেশ।
কাল্‌কের ফুল যত গিয়েছে শুকিয়ে,
কাল্‌কের ভুল যত গিয়েছে চুকিয়ে,
আগেকার জীবনের পালা হ'ল শেষ ॥

ঝরা-ফুলে ভরা বিশ্ব, গন্ধ নাহি লেশ।
জীবনের বেশিভাগ দিয়েছি ফুঁকিয়ে,
বাকিটুকু মৃত্যুপানে পড়েছে ঝুঁকিয়ে,
যে সুর বাজিত কাণে, নাহি তার রেশ ॥

জীবনের স্রোত চলে দক্ষিণবাহিনী।
উত্তরে পড়িয়া থাকে পূর্ব্বের কাহিনী ॥

উপরে উঠিছে ভাসি নব ভয় আশা,
বিরাম মানে না স্রোত, বহে খরধার।
আবার ফেলিতে হবে জীবনের পাশা,—
খেলা নিয়ে কথা শুধু, মিছে জিত হার !

অন্বেষণ

আজিও জানিনে আমি হেথায় কি চাই !
কখনো রূপেতে খুঁজি নয়ন-উৎসব,
পিপাসা মিটাতে চাই ফুলের আসব,
কভু বসি যোগাসনে, অঙ্গে মেখে ছাই ॥

কখনো বিজ্ঞানে করি প্রকৃতি যাচাই,
খুঁজি তারে যার গর্ভে জগৎ প্রসব,
পূজা করি নির্ব্বিচারে শিব কি কেশব —
আজিও জানিনে আমি তাহে কিবা পাই ॥

রূপের মাঝারে চাহি অরূপ দর্শন।
অঙ্গের মাঝারে মাগি অনঙ্গস্পর্শন ॥

খোঁজা জানি নষ্ট করা সময় বৃথায়,—
দূর তবে কাছে আসে, কাছে যবে দূর।
বিশ্রাম পায় না মন পরের কথায়,
অবিশ্রান্ত খুঁজি তাই অনাহত-সুর ॥

আত্মপ্রকাশ

প্রকৃতিরই অংশে গড়া আমাদের মন।
বিশ্বছবি দেখি স্পষ্ট রহিয়াছে আঁকা,
বিশ্বের হৃদয় কিন্তু বিশ্বদেহে ঢাকা,
আভাসে প্রকাশ তার, আসল গোপন ॥

সবারই অন্তরে আছে গুপ্ত নিকেতন,
মন-পাখী সুপ্ত যাহে, গুটাইয়া পাখা।
সে নিদ্রা যোগীরা জানে পূর্ণ জেগে থাকা,—
খুলে বলা বৃথা চেষ্টা তাহার স্বপন ॥

অন্তরের রহস্যের সঠিক বারতা
কথায় প্রকাশ পায়, এটি মিছে কথা ॥

ভাষায় যা'-কিছু ধরি, উপরেই ভাসে,
স্বেচ্ছায় করেছে যাহা আলোক বরণ।
সত্য কিন্তু তারি নীচে মুখ ঢেকে হাসে,—
কভু নাহি দেখা দেয় বিনা আবরণ ॥

বিশ্বরূপ

কে জানে কাহার বিশ্ব,—দৃশ্য চমৎকার।
আলোকে আঁধারে এই খোলা আর মেলা,
জড়েতে চৈতন্যে এই লুকোচুরি খেলা,
তারি মাঝে মূল তানে ওঠে ঝনৎকার ॥

দেখে শুনে হতবুদ্ধি আমি সনৎকার !
সুনীল আকাশ-সিন্ধু, কোথা তার বেলা,
সারি সারি ভাসে তারা, জ্যোতিষ্কের ভেলা,
কোথা যায় নাহি জানি, নহি গণৎকার !

বিশ্বটানে মন যায় বিশ্বেতে ছড়িয়ে।
অন্তর থাকিতে চায় বাহিরে জড়িয়ে ॥

আমি চাই টেনে নিয়ে ছড়ানো প্রক্ষিপ্ত,
অন্তরে সঞ্চিত করি আঁধার আলোক,
প্রতীক রচনা করি চিত্রিত সংক্ষিপ্ত,—
চতুর্দ্দশ পদে বদ্ধ চতুর্দ্দশ লোক !

শিব

রজতগিরিতে হেরি তব শুভ্রকায়া,
চন্দ্র তব ললাটের চারু আভরণ,
তব কণ্ঠে ঘনীভূত সিন্ধুর বরণ,—
বিশ্বরূপ জানি আমি তব দৃশ্য মায়া ॥

যার স্ফূর্ত্তি চরাচর, সে ত তব জায়া।
নিজদেহে করিয়াছ বিশ্ব আহরণ,
তাই হেরি কৃত্তি তব চিত্র-আবরণ,—
জীবনের আলোশ্লিষ্ট মরণের ছায়া !

তোমার দর্শন পাই মূর্ত্তিমান মন্ত্রে,
যজ্ঞসূত্রে বাঁধা যাহা হৃদয়ের তন্ত্রে ॥

সেই রূপ রেখো দেব ভরিয়া নয়নে,—
শিবমূর্ত্তি হেরি বিশ্বে, দেহ এ ক্ষমতা।
ধরিতে পারি না আমি নেত্রে কিম্বা মনে,
আকারবিহীন কোন বিশ্বের দেবতা ॥

বিশ্ব-ব্যাকরণ

বিজ্ঞান রচেছে নব বিশ্ব-ব্যাকরণ।
ক্রিয়া কিম্বা কর্ম্ম নাই, শেখায় বেদান্ত,—
ক্রিয়া আছে, কর্ত্তা নাই, বিজ্ঞান-সিদ্ধান্ত,
আগাগোড়া কর্ম্ম শুধু, নাহিক করণ ॥

সকলি বিশেষ্য, কিম্বা সবি বিশেষণ,
এই নিয়ে দ্বন্দ্ব নিত্য, লড়াই প্রাণান্ত !
সন্ধি কি সমাস সৃষ্টি, সমস্যা একান্ত,—
মীমাংসা করিতে চাই ধাতু-বিশ্লেষণ ॥

সর্ব্বনাম রূপ আছে, নাহিক অব্যয়।
কেবল বচনে হয় সৃষ্টির অন্বয় ॥

প্রকৃতির সূত্র আছে, নাই অভিধান,
জড় করে' তাই জ্ঞানী রচে মুগ্ধবোধ।
পণ্ডিতের পক্ষে তারি মুখস্থ বিধান,—
আমরা নির্ব্বোধ, তাই চাই অর্থবোধ !

বিশ্বকোষ

বিশ্বের সবাই মোরা পাঠকপাঠিকা।
পাতা তার খোলা আছে ঠিক মাঝখানে,
দেখামাত্র বুঝি মোরা স্পষ্ট তার মানে,
বাজে কাজ করা তার অন্ত্যোপান্ত টীকা ॥

ধরণীকে চূর্ণ করি, জ্ঞানের বটিকা
গড়ে কিন্তু তিতো করে' দর্শনে বিজ্ঞানে,
সেগুলি মূর্খেতে গেলে, বুজে চোখ কানে,—
জানে না তাহার মূল্য নয় বরাটিকা!

বিশ্বসনে দিনরাত শুধু বোঝাপড়া,
সে ত নয় ঘর করা, করা সে ঝগড়া!

নয়নেতে আছে আলো, মনে ভালবাসা,
অন্ধকার জীবনের অপর পৃষ্ঠেতে।
সুখ দুঃখ দুই কহে প্রণয়ের ভাষা,—
সে ভাষা না বুঝে, খোঁজো মানে অদৃষ্টেতে ॥

সুরা

সুরার সুরত্ব জানি আমি আর তুমি!
সুরা-তৈলে মনোবাতি ছড়ায় আলোক,
মনের মন্দিরে বাজে মন্দিরা ঢোলক,—
এ কথা ওমার জানে, হাফিজ্ আর রুমি ॥

রাত্রি বাড়ে, মাত্রা চড়ে, পাত্রাধর চুমি।
আকাশেতে চাঁদ ঝোলে, আলোর গোলক,
নীলাম্বরী-আড়ে দোলে মোতির নোলক,
শূন্যে উড়ে তাই ধরি, শয্যা শেষে ভূমি!

জড়েতে চৈতন্যরূপী তরল আগুন,
তোমার পরশে মাঘ গলিয়া ফাগুন!

হাবুডুবু খাই সবে ভবসিন্ধু-নীরে,
ঢোকে ঢোকে পেটে ঢোকে লবণ তরল।
সুরাসুরে তাই মথি তুলিয়াছে তীরে,
প্রকৃতির খাঁটি রস, অমৃত-গরল!

রূপক

কখনো অন্তরে মোর গভীর বিরাগ,
হেমান্তের রাত্রিহেন থাকে গো জড়িয়ে,
—যাহার সর্ব্বাঙ্গে যায় নীরবে ছড়িয়ে
কামিনী ফুলের শুভ্র অতনু পরাগ ॥

বাসনা যখন করে হৃদয় সরাগ,
শিশিরে হারানো বর্ণ, লীলায় কুড়িয়ে,
চিদাকাশে দেয় জেলে, বসন্ত গড়িয়ে
কাঞ্চন ফুলের রক্ত চঞ্চল চিরাগ ॥

কভু টানি, কভু ছাড়ি, মনের নিঃশ্বাস।
পক্ষে পক্ষে ঘুরে আসে সংশয় বিশ্বাস ॥

বসন্তের দিবা, আর হেমন্ত-যামিনী
উভয়ের দ্বন্দ্বে মেলে জীবনের ছন্দ।
দিবাগাত্রে রঙ আছে, নিশাবক্ষে গন্ধ,—
সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত সার কাঞ্চন কামিনী ॥

একদিন

একদিন একা বসি, শিরে রাখি কর,
একমনে করি যবে কবিতা বয়ন,
শব্দের কুসুম করি স্মৃতিতে চয়ন,—
সহসা ফুলের গন্ধে ভরে' গেল ঘর।
তখন ছিল না কিছু ইন্দ্রিয় গোচর,
সুপ্ত ভাব, ত্যজি মোর হৃদয়-শয়ন,
উঠেছিল সেই ক্ষণে মেলিয়া নয়ন,—
ফুলের নিঃশ্বাস প'ল চুলের উপর ॥

লিখিয়াছি সবে যবে দুই চার ছত্র,
নীলাব্জ আভায় হ'ল সুরঞ্জিত পত্র।
শেষে যেই মিলে গেল অন্তিম চরণ,
অধরে মিলিল এসে ফুলের অধর,
চোখেতে ফুলের হেরি রক্তিমবরণ,
কাণে শুনি প্রিয়া-কণ্ঠ-গলিত আদর!

ভুল

ভাল তোমা বেসেছিনু, মিছে কথা নয়।
যেদিন একেলা তুমি ছিলে মোর সাথী,
বকুলের তলে বসি, মনে মন গাঁথি।
—বকুলের গন্ধ বল কত দিন রয়?

সে দিন পৃথিবী ছিল অন্ধকারময়,
ঘন মেঘে ঢেকেছিল নক্ষত্রের বাতি,
সে তিমির চিরেছিল বিদ্যুৎ-করাতি।
—বিদ্যুতের আলো কিন্তু কতক্ষণ রয়?

স্বপ্ন মোরা ভুলে যাই নিদ্রা গেলে টুটে,
শাদা চোখে সব দেখি নেশা গেলে ছুটে ॥

নিভানো আগুন জানি জ্বলিবে না আর,
মনে কিন্তু থেকে যায় স্মৃতিরেখা তার,—
হৃদিলগ্ন আমরণ পারিজাত-হার।
হৃদয়ের ভুল শুধু জীবনের সার!

হাসি

যতই দিই না আমি হাসিতে উড়িয়ে,
সমাজের সংসারের অন্ধ ক্রূর বল,—
সে ত শুধু খেলামাত্র, শুধু বাক্‌ছল,
এখনো যায়নি প্রাণ একান্ত জুড়িয়ে ॥

নয়ন যখন দিই হাসিতে মুড়িয়ে,
লুকিয়ে তাহার নীচে থাকে অশ্রুজল।
বৃথা কাজ! জীবনের প্রতি ব্যর্থ পল
স্মৃতিতে একত্র করা, অতীতে কুড়িয়ে ॥

জেনে শুনে ছুটি মোরা আলেয়ার পিছে,
সে আলো নিভিলে তাই কান্নাকাটি মিছে ॥

জীবনের দিবসের স্বল্প পরিসর,
ঘিরে তারে আছে ঘন অনন্তের ছায়া।
যদিচ ধরেছি সবে দু'দিনের কায়া,—
হাসির, কাজের, তবু আছে অবসর ॥

রোগ-শয্যা

যখনি চেয়েছি আমি, পরি বীরসজ্জা,
কাম্যরাজ্য-বিজয়ের ধরি দৃপ্ত আশা,
দ্রুতবেগে যাই লঙ্ঘি শতদ্রু বিপাশা,—
তখনি পেয়েছি আমি শুধু রোগশয্যা ॥

ব্যথায় ভরিয়া ওঠে মম অস্থি মজ্জা,
সর্ব্বাঙ্গের মুখে ফোটে ব্যর্থ আর্ত্তভাষা,
সঙ্কল্পের ধ্বংস করে দেহ কর্ম্মনাশা,
রোগেতে লাঞ্ছিত হয়ে মন মানে লজ্জা ॥

দেহের আশ্রয়ে থাকি দিন দুই চার,
তাই সই তার নীচ অন্ধ অত্যাচার ॥

দেহের পীড়নে মনে আসে না বিকার,
শয্যাপ্রান্তে পাত্রপূর্ণ আছে ভালবাসা,
যাহাতে মিটাই তীব্র রোগীর পিপাসা,—
সে সুধার লাগি করি রোগের স্বীকার ॥

মুস্কিল-আশান

ছেলেবেলা একদিন প্রতিমা-ভাসান
একেল্য দেখিতে যাই, ঘর ছেড়ে দূরে।
পথ ভুলে রাত্রিবেলা মরি ঘুরে ঘুরে,
ভয়েতে বিহ্বল দেখি সুমুখে শ্মশান!
অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে হই পরিশান!
কাঁপে বুক ঝরে আঁখি, বাক্য নাহি স্ফুরে।

সহসা মশাল হাতে, ভিখারীর সুরে,
পথিক আসিল হাঁকি "মুস্কিল-আশান"!
তস্‌বীর মালা হাতে, গায়ে আলখাল্লা,
মুখেতে মুখস্থ বুলি "লা-আল্লা-ইলাল্লা!"

আজিও নিরাশা বুকে চাপালে পাষাণ,
কানেতে না পশে মোর দুনিয়ার হাল্লা।
হৃদয়-ফকির জপে "লা-আল্লা-ইলাল্লা",
আকাশেতে শুনি বাণী "মুস্কিল-আশান"!

বাহার

নটীবেশে তুমি এস, রাগিণী বাহার।
অঙ্গরাগ ধরি নব উজ্জ্বল শ্যামল,
মালতীর মালা চুলে, করেতে কমল,
চরণে তাড়না করি শীতের নীহার ॥

বিলাসী পবন সনে উদ্যানবিহার
কর তুমি, অঙ্গে মাখি মল্লি-পরিমল।
নেত্রপুটে ধরি' আভা কৌমুদী-কোমল,
ধরায় সলীল সুর দাও উপহার ॥

তোমার পাপিয়াকণ্ঠ কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে,
বসন্তের তানে দাও দিগন্ত ছাপিয়ে ॥

স্বরে গেঁথে সাত-ন'র বৈজয়ন্তী-হার,
ঝুলিয়ে দুলিয়ে দাও আকাশের গলে!
শোক দুঃখ ভয় বাধা করি' পরিহার,
উঠুক প্রাণের দীপ মুহূর্ত্তেক জ্বলে' ॥

পূরবী

সন্ধ্যার ছায়ায় লীন, মলিন পূরবী!
বিষাদ তোমার চোখে, অবসাদ প্রাণে।
মগ্ন তুমি হয়ে আছ সূর্য্যাস্তের ধ্যানে,
ধূম্র তব কেশপাশে ধূপের সুরভি।

উদাসিনী তুমি, নও করুণ ভৈরবী,
উন্মনা তোমার গানে, মনে সন্ধ্যা আনে।
আঁখি খোঁজে শেষ আলো অস্তাচলপানে,
লেখে যথা চিত্রস্বর্ণে, হরফে আরবী,

সূর্য্য তার রূপকথা; পড়িতে না জানি,
নিশায় মিলিত দিবা স্বপ্ন হেন মানি।
শ্রান্তিভরা শান্তি আছে তব শ্লথ সুরে,
উদাসিনি! তব মন্ত্রে হয়েছি উদাস।
তোমার প্রণয়ী ছিল কবি নিশাপুরে,
হে পূরবী! কয় মোরে তব সুরদাস ॥

শিখা ও ফুল

সতৃষ্ণ রসনা মেলি মনের পাবক,
মনোজবা রূপ ধরি ওঠে যবে হাসি,
—গলিত লোহিত ক্ষুব্ধ প্রবালের রাশি,—
সে শিখা পরায় তব চরণে যাবক ॥

তুষারে গঠিত ফুল, স্তবকে স্তবক,
মনোমাঝে জাগে যবে শুভ্র হাসি হাসি',
সে ফুলে অঞ্জলি ভরে' দিই রাশি রাশি,
যূথি জাতি শেফালিকা কুন্দ কুরুবক ॥

তুমি চাহ রূপস্পর্শ উল্ট বিলকুল,—
ফুলের আগুন, কিম্বা আগুনের ফুল ॥

আমি কিন্তু করে' যাব কুসুমের চাষ,
যতদিন এ হৃদয় না হয় উষর।
জ্বেলে রাখি বহ্নি জবাকুসুমসঙ্কাশ,—
যে বহ্নি নিভিলে হয় জগৎ ধূসর!

—

গজল

নয়ন-গোলাপ তব করিতে উজ্জ্বল,
বুলবুলের সুরে আজি বেঁধেছি সেতার।
গাহিব প্রেমের গান পারসী কেতার,
ফুলের মতন লঘু রঙিলা গজল!

যে সুর পশিয়া কাণে চোখে আনে জল,
সে সুর বিবাগী জেনো মোর কবিতার।
মম গীতে নত তব চোখের পাতার
সীমান্তে রচিয়া দিব দু'ছত্র কাজল!

বাজিয়ে দেখেছি ঢের বীণ ও রবাব,
পাইনি সে সুরে তব প্রাণের জবাব ॥

আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার,
ছুট কিতে রাখি সব আশা ভালবাসা।
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার,—
সুরে ভাবে মিল আছে, দুই ভাসা ভাসা!

—

পাষাণী

কত না করেছি আমি তোমার আদর,
চঞ্চল হয়নি তব নয়ন-কুরঙ্গ।
সুবর্ণ কঠিন তব হৃদয়-নারঙ্গ,
খোলনি সরিয়ে কভু বুকের চাদর ॥

যৌবনে আসেনি তব শ্রাবণ ভাদর,
ছাপিয়ে ওঠেনি বুকে বাসনা-তরঙ্গ।
মেঘ-রাগে বাঁধো নাই হৃদয়-সারঙ্গ,
তব মন নাহি জানে বিদ্যুৎ বাদর ॥

তব প্রাণে ভালবাসা রয়েছে ঘুমিয়ে,
জাগাতে পারিনি আমি হাজার চুমিয়ে!

বিরহে মিলনে কিম্বা হও না কাতর,
তোমার অন্তরে নাই রক্ততপ্ত রতি।
দেবীর প্রতিমা তুমি, কেবল পাথর,—
মনো-দীপে এবে করি তোমার আরতি ॥

—

প্রিয়া

কারো প্রিয়া সুললিত সারিগান গেয়ে,
—রক্তিম-কপোল ঊষা জাগে যবে হেসে,—
রূপোর ঢেউয়ের পরে তালে তালে ভেসে,
দক্ষিণ পবন সনে আসে তরী বেয়ে ॥

কারো প্রিয়া মেঘসম চতুর্দ্দিক ছেয়ে,
অকালের প্রলয়ের অমানিশা বেশে,
দুরন্ত পবনে ক্ষিপ্ত ঘনকৃষ্ণ কেশে,
প্রচণ্ড ঝড়ের মত আসে বেগে ধেয়ে ॥

তুমি প্রিয়ে এ হৃদয়ে পশি ধীরে ধীরে,
বহিছ প্রাণের মত প্রতি শিরে শিরে।
প্রচ্ছন্ন রূপেতে আছ আচ্ছন্ন করিয়া
আমার সকল অঙ্গ, সকল অন্তর।
সকল ইন্দ্রিয় মোর জ্যোতিতে ভরিয়া,
যোগাও প্রাণের মূলে রস নিরন্তর ॥

—

পরিচয়

দেখেছি তোমায় কোন মাধবী পার্ব্বণে,
প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের সৌন্দর্য্যের সার!
এসেছিলে ধরে' রূপ প্রতিমা ঊষার,
গন্ধর্ব্বশালায় কিম্বা আলেখ্য-ভবনে ॥

মেঘাচ্ছন্ন কোন দূর অতীত শ্রাবণে,
এসেছিলে কাছে কিম্বা, করি অভিসার,
আঁধারের মাঝে করি রূপের প্রসার,
গগন-সীমান্তে কোন বিস্মৃত ভুবনে!

তোমা সনে ছিল জানি পূর্ব্ব-পরিচয়,—
মন কিন্তু যুগস্মৃতি করে না সঞ্চয় ॥

ভাসিয়া চলেছি দোঁহে হাতে হাত ধরে,'
ছাড়াছাড়ি হবে কি গো পাব যবে কূল?
অথবা মিলন হ'লে জীবনের পরে,
চিনিতে আবার হবে পরস্পরে ভুল?

ফুলের ঘুম

বরফ ঢাকিয়াছিল ধরণীর বুক
অখণ্ড শীতল শুভ্র চাদর পরিয়ে।
রাশি রাশি চন্দ্রালোক নিঃশব্দে ঝরিয়ে,
আপাণ্ডুর করে' ছিল নীলিমার মুখ॥

সেদিন ছিল না ফুটে শিরীষ কিংশুক,
গিয়েছিল বর্ণ গন্ধ সকলি মরিয়ে।
তুষারের জটাভার শিরেতে ধরিয়ে
বৃক্ষলতা সমাধিস্থ ছিল হয়ে মূক॥

পাতার মর্ম্মর আর জল-কলরব,
হিমের শাসনে ছিল নিস্তব্ধ নীরব॥

পৃথিবীর বুক হ'তে তুষার সরিয়ে
সেদিন দেখিনি আমি, কোথায় গোপনে,
সুষুপ্ত ফুলেরা সবে নয়ন ভরিয়ে
রেখেছিল বসন্তের রক্তিম স্বপনে!

স্মৃতি

কত দিন কত দেশে কতশত ভোরে,
অসংখ্য ফুলেতে ভরা কত ফুলবনে,
ফিরেছি অলসভাবে, একা, আনমনে,—
তুলিনি পূজার লাগি কিন্তু সাজি ভরে'॥

কত দিন কত দেশে সারানিশি ধরে',
থেকেছি বসিয়া আমি মন্দিরের কোণে,
স্নিগ্ধদৃষ্টি কতশত দেবতার সনে,—
করিনি প্রণাম কিন্তু জুড়ি' দুই করে॥

আগে শুধু করে' গেছি এই সব ভুল।
এখন দেবতা কোথা, কোথা সেই ফুল!

আজি সে ফুলের গন্ধ রয়েছে সঞ্চিত
অস্পষ্ট স্মৃতির মত, সব মন ছেয়ে।
দেবতার স্থিরনেত্রে, পূর্ব্বপরিচিত,
রত্নদীপ-শিখা সম, দূরে আছে চেয়ে!

প্রতিমা

প্রতিমা গড়েছি আমি প্রাণপণ করে'।
আঁধারে আবৃত কত খুঁজে গুপ্ত খনি,
এনেছি তারার মত জ্যোতির্ম্ময় মণি,—
রত্ন দিয়ে দেবীমূর্ত্তি গড়িবার তরে।
স্ফটিকে গড়েছি অঙ্গ নিশিদিন ধরে',
পরায়েছি শ্যামশাটী মরকতে বুনি,
রক্তবিন্দু পারা দুটি সুলোহিত চুনি
বিন্যস্ত করেছি আমি দেবীর অধরে।

প্রজ্বলিত ইন্দ্রনীলে খচিত নয়ন,
প্রান্তে লগ্ন প্রবালেতে গঠিত শ্রবণ,
মুকুতা-নির্ম্মিত যুগ্ম ঘন-পীন-স্তন,
সুকঠিন পদ্মরাগে গঠিত চরণ।
অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি, কিন্তু অচেতন,—
না পারি পূজিতে কিম্বা দিতে বিসর্জ্জন!

উপদেশ

প্রিয় কবি হ'তে চাও, লেখো ভালবাসা,
যা' পড়ে' গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তার লাগি চাই কিন্তু দু'টি আয়োজন,—
জোর-করা ভাব, আর ধার-করা ভাষা!

বড় কবি কিম্বা হ'তে যদি তব আশা,
ভাবুক বলিবে তোমা জন-সাধারণ,
শেখো যদি সমাজের, করি প্রাণপণ,—
দরকারি ভাব, আর সরকারি ভাষা!

যত যাবে মাটি আর খাঁটিকে ছাড়িয়ে,
শূন্যে শূন্যে মূল্য তব যাইবে বাড়িয়ে॥

কবিতার জন্মস্থান কল্পনার দেশ,
সে দেশ জানো না কিন্তু মোদের ভূগোল,—
সত্যের সেখানে নেই কোন গণ্ডগোল,
দেহ নেই সেই দেশে, শুধু আছে বেশ!

স্বপ্ন-লঙ্কা

স্বপ্নলোকে আছে মোর স্বর্ণপুরী লঙ্কা,
যেথা বাজে মিরুগেল, ডান ও ঘাগর।
শিখি নাই এক লম্ফে লঙ্ঘিতে সাগর,—
সেতুর বন্ধন করি, নাই হেন টঙ্কা!

সে রাজ্যে সজোরে বাজে অনঙ্গের ডঙ্কা,
কঙ্কাবতী যেথা মেলি নয়ন ডাগর,
মোর পথ চেয়ে করে বাসর জাগর,—
স্বপ্নে আমি যাই সেথা, নাহি করি শঙ্কা॥

লীন হয়ে প্রিয়া-অঙ্কে, সুবর্ণ-পালঙ্কে,
কলঙ্কের মত রই জড়ায়ে শশাঙ্কে!

মিলনের অহঙ্কারে সালঙ্কারা কঙ্কা,
নূপুরে কঙ্কণে তোলে বীণার ঝঙ্কার,
রশনায় দেয় মুহু বিজয়-টঙ্কার,—
সে শব্দে চমকি জাগি, হেরি নবডঙ্কা!

আত্মকথা

কবিতা আমার জানি, যেমন শঙ্কুর,
দু'দিনে সবাই যাবে বেবাক্ ভুলিয়ে!
কল্পনা রাখিনে আমি আকাশে তুলিয়ে,—
নহি কবি ধূমপায়ী, নলে ত্রিবঙ্কুর॥

হৃদয়ে জন্মিলে মোর ভাবের অঙ্কুর,
ওঠে না তাহার ফুল শূন্যেতে দুলিয়ে।
প্রিয়া মোর নারী শুধু, থাকে না ঝুলিয়ে,
স্বর্গ-মর্ত্ত্য-মাঝখানে, যত ত্রিশঙ্কুর!

নাহি জানি অশরীরী মনের স্পন্দন,
আমার হৃদয় যাচে বাহুর বন্ধন॥

কবিতার যত সব লাল-নীল ফুল,
মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই,
তাদের সবারি বদ্ধ পৃথিবীতে মূল,—
মনোঘুড়ি বুঁদ হ'লে ছাড়িনে লাটাই!

—

সমাপ্ত

বীরবলের হালখাতা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত

পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণকমলেষু।

বীরবলের হালখাতা

হালখাতা

আজ পয়লা বৈশাখ। নূতন বৎসরের প্রথম দিন অপর দেশের অপর জাতের পক্ষে আনন্দ-উৎসবের দিন। কিন্তু আমরা সেদিন চিনি শুধু হালখাতায়। বছরকার দিনে আমরা গত বৎসরের দেনাপাওনা লাভলোকসানের হিসেব নিকেশ করি, নূতন খাতা খুলি এবং তার প্রথম পাতায় পুরণো খাতার জের টেনে আনি।

বৎসরের পর বৎসর যায়, আবার বৎসর আসে, কিন্তু আমাদের নূতন খাতায় কিছু নূতন লাভের কথা থাকে না। আমরা এক হালখাতা থেকে আর এক হালখাতায় শুধু লোকসানের ঘরটা বাড়িয়ে চলেছি। এ ভাবে আর কিছুদিন চল্‌লে যে আমাদের জাতকে দেউলে হ'তে হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। লাভের দিকে শূন্য ও লোকসানের দিকে অঙ্ক ক্রমে বেড়ে যাচ্চে, তবে আমরা ব্যবসা গুটিয়ে নিইনে কেন? কারণ, ভবের হাটে দোকানপাট কেউ স্বেচ্ছায় তোলে না, তার উপর আবার আশা আছে। লোকে বলে, আশা না মলে যায় না।

আমরা স্বজাতি সম্বন্ধে যে একেবারেই উদাসীন, তা নয়। গেল বৎসর, জাতি হিসেবে কায়স্থ বড় কি বৈদ্য বড়, এই নিয়ে একটা তর্ক ওঠে। যেহেতু আমরা অপরের তুলনায় সকল হিসেবেই ছোট, সেই জন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে কে ছোট কে বড়, এ নিয়ে বিবাদবিসম্বাদ করা ছাড়া আর উপায় নেই। নিজেকে বড় বলে' পরিচয় দেবার মায়া আমরা ছাড়তে পারিনে। কায়স্থ বলেন আমি বড়, বৈদ্য বলেন আমি বড়। শাস্ত্রে যখন নানা মত, তখন সূক্ষ্ম বিচার করে' এ বিষয়ে ঠিকটা সাব্যস্ত করা প্রায় অসম্ভব। বৈদ্যের ব্যবসায় চিকিৎসা,—প্রাণরক্ষা করা। ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় প্রাণবধ করা,—অতএব ক্ষত্রিয় নিঃসন্দেহ বৈদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ! সুতরাং বৈদ্য অপেক্ষা বড় হ'তে গেলে ক্ষত্রিয় হওয়া আবশ্যক, এই মনে করে' জনকতক কায়স্থসমাজের দলপতি ক্ষত্রিয় হবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এ শুভসংবাদ শুনে আমি একটু বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলুম।

কারণ, প্রথমতঃ আমি উন্নতির পক্ষপাতী;—কোন লোকবিশেষ কিম্বা জাতিবিশেষ আপন চেষ্টায় আপনার অবস্থার উন্নতি করতে উদ্যোগী হয়েছে দেখ্‌লে কিম্বা শুন্‌লে খুসী হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষতঃ বাঙ্গলার পক্ষে যখন জিনিসটে এতটা নূতন। নূতনের প্রতি মন কার না যায়, অন্ততঃ দু-দণ্ডের জন্যও। অবনতির জন্য কাউকেই আয়াস করতে হয় না। ও একটু ঢিলে দিলে আপ্‌না হতেই হয়। জড়পদার্থের প্রধান লক্ষণ নিশ্চেষ্টতা, আর জড়পদার্থের প্রধান ধর্ম্ম অধোগতি—gravitation। সম্প্রতি প্রোফেসর জে, সি, বোস্ শুনতে পাই বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রমাণ করেছেন যে, জড়ে ও জীবে আমাদের ভেদজ্ঞান শুধু ভ্রান্তিমাত্র। সে ভ্রান্তির মূল, আমাদের চর্ম্মচক্ষুর স্থূলদৃষ্টি। তিনি ইলেক্‌ট্রিসিটির আলোকের সাহায্যে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, অবস্থা অনুসারে জড়পদার্থের ভাবভঙ্গী ঠিক সজীব পদার্থের অনুরূপ। প্রোফেসর বোস্ নিজে বলেন যে, ভারতবাসীর পক্ষে এ কিছু নতুন সত্য বা তথ্য নয়, এ সত্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে বহুপূর্ব্বে ধরা পড়েছিল, তাঁদের দিব্য চক্ষু এড়িয়ে যেতে পারেনি; এক কথায় এটা আমাদের খানদানা সত্য। আমি বলি, তার আর সন্দেহ কি? এ সত্যের প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যও আবশ্যক নয়, এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছেও যাবার দরকার নেই। আমরা প্রতিদিনের ও সমগ্র জীবনের কাজে নিত্য প্রমাণ দিচ্চি যে, আমাদের দেশে জড়ে ও জীবে কোন প্রভেদ নেই। সুতরাং কেউ যদি কার্য্যতঃ ওর উল্টটা প্রমাণ করতে উদ্যত হয়, তা হ'লে নূতন জীবনের স্ফূর্ত্তির একটু আভাস পাওয়া যায়।

আমাদের বাঙ্গালী জাতির চিরলজ্জার কথা, আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় নেই! এর জন্য আমরা অপর বীরজাতির ধিক্কার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা নীরবে সহ্য করে' আস্‌ছি। ঘোষ, বোস, মিত্র, দে,

দত্ত, গুহ প্রভৃতিরা যে আমাদের এই চিরদিনের লজ্জা দূর, এই চিরদিনের অভাব মোচন করবার জন্য কোমর বেঁধেছিলেন, তার জন্য তাঁরা স্বদেশহিতৈষী ও স্বজাতিপ্রিয় লোকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হবার জন্য ঠিক পথটা অবলম্বন করেন নি, কাজেই অকৃতকার্য্য হয়েছেন। তাঁদের প্রথম ভুল, শাস্ত্রের প্রমাণের উপর নির্ভর করতে যাওয়া। কি ছিলুম, সেইটে স্থির করতে হ'লে, পুরনো পাঁজি-পুঁথি খুলে বসা আবশ্যক, কিন্তু কি হব, তা স্থির করতে হ'লে ইতিহাসের সাহায্য অনাবশ্যক। ভবিষ্যতের বিষয় অতীত কি সাক্ষী দেবে? বিশেষতঃ বিষয়টা হচ্চে যখন ক্ষত্রিয় হওয়া, তখন গায়ের জোরই যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের এমনি অভ্যাস খারাপ হয়েছে যে, আমরা শাস্ত্রের দোহাই না দিয়ে একপদও অগ্রসর হ'তে পারিনে।

পৃথিবীতে মানুষের উপর মানুষ অত্যাচার করবার জন্য দুটি মারাত্মক জিনিসের সৃষ্টি করেছে, অস্ত্রশস্ত্র ও শাস্ত্র। আমরা অত্যন্ত নিরীহ, কারও সঙ্গে মুখে ছাড়া ঝগড়া-বিবাদ করিনে, যেখানে লড়াই হচ্চে, সে পাড়া দিয়ে হাঁটিনে;—এই উপায়ে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রকে বেবাক্ ফাঁকি দিয়েছি। যা কিছু বাকী আছে ডাক্তারের হাতে। আমরা চিররুগ্ন, সুতরাং ডাক্তারকে ছেড়ে আমরা ঘর করতে পারিনে,—এই উভয়-সঙ্কটে আমরা হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজীর শরণাপন্ন হয়ে সে অস্ত্রশস্ত্রেরও সংস্পর্শ এড়িয়েছি। আমাদের যখন এত বুদ্ধি, তখন শাস্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার পাই, এমন কি কিছু উপায় বার করতে পারিনে?

কিন্তু ক্ষত্রিয় হওয়া কায়স্থের কপালে ঘট্‌ল না। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব একে কায়স্থের দলপতি, তার উপর আবার গোষ্ঠীপতি, সুতরাং তিনি যখন এ ব্যাপারে বিরোধী হ'লেন, তখন অপর পক্ষ ভয়ে নিরস্ত হলেন। যাঁরা ক্ষত্রিয় হ'তে উদ্যত, তাঁদের ভয়, জিনিসটে যে আগে হতেই ত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক, এ কথা বোঝা উচিত ছিল। ভীরুতা ও ক্ষাত্রধর্ম্ম যে একসঙ্গে থাকতে পারে না, এ কথা বোধ হয় তাঁরা অবগত ছিলেন না। তবে হয় ত মনে করেছিলেন, যখন মূর্খ ব্রাহ্মণে দেশ ছেয়ে গেছে, তখন ভীরু ক্ষত্রিয়ে আপত্তি কি? জড়পদার্থেরও একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তার কার্য্য হচ্চে চলৎশক্তি রহিত করা। আমাদের সমাজকে যে নাড়ানো যায় না, তার কারণ, এই জড়শক্তিই আমাদের সমাজে সর্ব্বজয়ী শক্তি।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ যে কায়স্থসমাজের সংস্কারের উদ্যোগে বাধা দিয়েছেন, শুধু তাই নয়,—তিনি এবার সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় সমাজসংস্কার-মহাসভার সভাপতির আসন থেকে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, হিন্দুসমাজে অনেক দোষ থাকতে পারে, এবং সে দোষ না থাকলে সমাজের উপকার হ'তে পারে, অতএব সমাজসংস্কারের চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য। সমাজের সৃষ্টি ও গঠন হয়েছে অতীতে, সুতরাং তার সংস্কার ও পরিবর্ত্তন হবে ভবিষ্যতে, বর্ত্তমানের কোনও কর্ত্তব্য নেই, কোন দায়িত্ব নেই। সমাজ গড়ে মানুষে, ইচ্ছে করলে ভাঙ্গতে পারে মানুষে,—অতএব মানুষে তার সংস্কার করতে পারে না, সে ভার সময়ের হাতে, অন্ধ প্রকৃতির হাতে। এ মত যে অস্বীকার করে, সে Burke পড়েনি।

আজকাল এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা সমাজের অবস্থা, দেশের অবস্থা, নিজেদের অবস্থা, এই সব বিষয়েই একটু আধটু চিন্তা করে' থাকেন এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, সাবধানের মার নেই। এঁরা সব জিনিসই ধীরে সুস্থে ঠাণ্ডাভাবে করবার পক্ষপাতী। এঁরা রোগ্ করে' সুমুখে এগোতে চান না বলে' কেউ যেন মনে না ভাবেন যে, এঁরা পিছনে ফিরতে চান। যেখানে আছি, সেখানে থাকাই এঁরা বুদ্ধির কাজ মনে করেন। বরং একটু অগ্রসর হওয়াই এঁরা অনুমোদন করেন,—কিন্তু সে বড় আস্তে, বড় সন্তর্পণে। যে হাড়বাঙ্গালী ভাব অধিকাংশ লোকের ভিতর অব্যক্তভাবে আছে, এঁরা কেউ কেউ পরিষ্কার সুন্দর ইংরাজীতে তা ব্যক্ত করেন। সংক্ষেপে এঁদের বক্তব্য এই যে, জীবনের গাধাবোট উন্নতির ক্ষীণ স্রোতে ভাসাও, সে একটু একটু করে' অগ্রসর হবে, যদিচ চোখে দেখতে মনে হবে চলছে না। কিন্তু খবরদার, লগি মেরো না, দাঁড় ফেলো না, গুণ টেনো না, পাল খাটিয়ো না,—শুধু চুপটি করে' হালটি ধরে' বসে' থেকো। এই মতের নাম হচ্চে বিজ্ঞতা। বিজ্ঞতার আমাদের দেশে বড় আদর, বড় মান্য। গাধাবোট চলে না দেখে, লোকে মনে করে, না জানি তাতে কত অগাধ মাল বোঝাই আছে!

বিজ্ঞতা জিনিসটে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার একটা ফল মাত্র। এ অবস্থাকে ইংরেজীতে বলে Transition period, অর্থাৎ এখন আমাদের জাতির বয়ঃসন্ধি উপস্থিত। বিদ্যাপতি ঠাকুর বয়ঃসন্ধির এই

বলে' বর্ণনা করেছেন যে, "লখইতে না পার জেঠ কি কি কনেঠ,"—এ জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ চেনা যায় না। কাজেই আমরা কাজে ও কথায় পরিচয় দিই হয় ছেলেমীর, নয় জ্যাঠামীর, না হয় একসঙ্গে দুয়ের। এই জ্যাঠাছেলের ভাবটা আমাদের বিশেষ মনঃপূত। ছোট ছেলের দুরন্ত ভাব আমরা মোটেই ভালবাসিনে। তার মুখে পাকা পাকা কথা শোনাই আমাদের পছন্দসই। এই জ্যাঠামীরই ভদ্র নাম বিজ্ঞতা।

ধরাকে সরা জ্ঞান করা আমরা সকলেই উপহাসের বিষয় মনে করি, কিন্তু সরাকে ধরা জ্ঞান করা আমাদের কাছে একটা মহৎ জিনিস। কারণ, ও মনোভাবটি না থাকলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না। Burke French Revolution-রূপ বিপুল রাজ্যবিপ্লবের সমালোচনাসূত্রে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, সেই মতামত বালবিধবাকে জোর করে' বিধবা রাখবার স্বপক্ষে, ও কৌলীন্যপ্রথা বজায় রাখবার স্বপক্ষে প্রয়োগ করলে যে আর পাঁচজনের হাসি পাবে না কেন, তা বুঝতে পারিনে।

আমাদের সমাজ ও সামাজিক নিয়ম বহুকাল হ'তে চলে' আসছে, আচারে ব্যবহারে আমরা অভ্যাসের দাস। আমাদের শিক্ষা নূতন, সে শিক্ষায় আমাদের মনের বদল হয়েছে। আমাদের সামাজিক ব্যবহারে ও আমাদের মনের ভাবে মিল নেই। যাঁরা মনকে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে' বিশ্বাস করেন, তাঁদের সহজেই ইচ্ছা হয় যে, ব্যবহার মনের অনুরূপ করে' আনি। অপর পক্ষে যাঁরা দুর্ব্বল, ভীরু ও অক্ষম, অথচ বুদ্ধিমান,—তাঁরা চেষ্টা করেন, তর্ক-যুক্তির সাহায্যে মনকে ব্যবহারের অনুরূপ করে' আনি। এই উদ্দেশ্যে যে তর্কযুক্তি খুঁজে পেতে বার করা হয়, তারি নাম বিজ্ঞভাব! আমরা বাঙ্গালীজাতি সহজেই দুর্ব্বল, ভীরু ও অক্ষম, সুতরাং স্বভাবের বলে আমরা না ভেবে চিন্তে বিজ্ঞের পদানত হই,—এই হচ্ছে সার কথা।

বৈশাখ ১৩০৯।

কথার কথা

১

সম্প্রতি বাঙ্গলা ব্যাকরণ নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সাহিত্যসমাজে একটা বড় রকম বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। আমি বৈয়াকরণ নই, হবারও কোন ইচ্ছে নেই। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরী মুসলমানরা ভস্মসাৎ করেছে বলে' সাধারণতঃ লোকে দুঃখ করে' থাকে, কিন্তু প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক Montaigne-এর মনোভাব এই যে, ও ছাই গেছে বাঁচা গেছে! কেননা, সেখানে অভিধান ও ব্যাকরণের এক লক্ষ গ্রন্থ ছিল। "বাবা! শুধু কথার উপর এত কথা!" আমিও Montaigne-এর মতে সায় দিই। যে হেতু আমি ব্যাকরণের কোন ধার ধারিনে, সুতরাং কোন ঋষিঋণমুক্ত হবার জন্য এ বিচারে আমার যোগ দেবার কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু তর্ক জিনিসটে আমাদের দেশে তরল পদার্থ, দেখতে না দেখতে বিষয় হ'তে বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে গড়িয়ে যাওয়াটাই তার স্বভাব। তর্কটা সুরু হয়েছিল ব্যাকরণ নিয়ে, এখন মাঝামাঝি অবস্থায় অলঙ্কার শাস্ত্রে এসে পৌঁচেছে, শেষ হবে বোধ হয় বৈরাগ্যে। সে যাই হোক্, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই মত প্রচার করছেন যে, আমরা লেখায় যত অধিক সংস্কৃত শব্দ আমদানি করব, ততই আমাদের সাহিত্যের মঙ্গল। আমার ইচ্ছে, বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গলা ভাষাতেই হয়। দুর্ব্বলের স্বভাব, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। বাইরের একটা আশ্রয় আঁকড়ে ধরে' রাখতে চায়। আমরা নিজের উন্নতির জন্যে পরের উপর নির্ভর করি। স্বদেশের উন্নতির জন্যে আমরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছি এবং একই কারণে নিজ ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে অপর ভাষার সাহায্য ভিক্ষা করি। অপর ভাষা যতই শ্রেষ্ঠ হোক্ না কেন, তার অঞ্চল ধরে' বেড়ানোটা কি মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়? আমি বলি, আমরা নিজেকে একবার পরীক্ষা করে' দেখি না কেন? ফল কি হবে, কেউ ব[illegible] পারে না, কারণ, কোন সন্দেহ নেই যে, সে পরীক্ষা আমরা পূর্ব্বে কখনও করি নি। যাক্ ওসব বাজে কথা; আমি বাঙ্গলাভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি, তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে। আমার মত ঠিক, কিম্বা শাস্ত্রী মহাশয়ের মত ঠিক, সে বিচার আমি করতে বসি নি। শুধু তিনি যে যুক্তি দ্বারা নিজের মত সমর্থন করতে উদ্যত হয়েছেন, তাই আমি যাচিয়ে দেখতে চাই।

২

কেউ হয় ত প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বাঙ্গলা ভাষা কাকে বলে? বাঙ্গালীর মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না! এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই

নয় যে, যে ভাষা আমরা সকলে জানি, শুনি, বুঝি; যে ভাষায় আমরা ভাবনা, চিন্তা, সুখ, দুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হ'তে প্রকাশ করে' আসছি এবং সম্ভবতঃ আরও বহুকাল পর্য্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাঙ্গলাভাষা? বাঙ্গলাভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙ্গালীর মুখে। কিন্তু অনেকে দেখ্‌তে পাই, এই অতি সহজ কথাটা স্বীকার করতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। শুনতে পাই, কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবী বলে' থাকেন যে, দিল্লীর বাদশাহ যখন উর্দ্দু ভাষা সৃষ্টি করতে বসলেন, তখন তাঁর অভিপ্রায় ছিল, একেবারে খাঁটি ফার্সীভাষা তৈয়ারী করা, কিন্তু বেচারা হিন্দুদের কান্নাকাটিতে কৃপাপরবশ হয়ে হিন্দীভাষার কতকগুল কথা উর্দ্দুতে ঢুকতে দিয়েছিলেন! আমাদের মধ্যেও হয় ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বিশ্বাস যে, আদিশূরের আদিপুরুষ যখন গৌড়ভাষা সৃষ্টি করতে উদ্যত হলেন, তখন তাঁর সঙ্কল্প ছিল যে, ভাষাটাকে বিলকুল সংস্কৃত ভাষা করে' তোলেন, শুধু গৌড়বাসীদের প্রতি পরম অনুকম্পাবশতঃ তাদের ভাষার গুটিকতক কথা বাঙ্গলাভাষায় ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন যাঁরা সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার কর্‌বার পক্ষপাতী, তাঁরা ঐ যে গোড়ায় গলদ হয়েছিল, তাই শুধরে নেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের ভাষায় অনেক অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ আছে, সেইগুলিকেই ভাষার গোড়াপত্তন ধরে' নিয়ে, তার উপর যত পার আরও সংস্কৃত শব্দ চাপাও—কালক্রমে বাঙ্গলায় ও সংস্কৃতে দ্বৈতভাব থাকবে না। আসলে জ্ঞানী লোকের কাছে এখনো নেই। মাতৃভাষার মায়ায় বদ্ধ বলে' আমরা সংস্কৃত বাঙ্গলায় অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠতে পারছিনে। বাঙ্গলায় ফার্সী কথার সংখ্যাও বড় কম নয়, ভাগ্যক্রমে ফার্সী পড়া বাঙ্গালীর সংখ্যা বড় কম। নৈলে সম্ভবতঃ তাঁরা বল্‌তেন, বাঙ্গলাকে ফার্সীবহুল করে' তোল। মধ্যে থেকে আমাদের মা সরস্বতী, কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন। এক একবার মনে হয়, ও উভয়সঙ্কট ছিল ভাল, কারণ, একেবারে পণ্ডিতমণ্ডলীর হাতে পড়ে' মা'র আশু কাশীপ্রাপ্তি হবারই অধিক সম্ভাবনা।

৩

এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের উৎপত্তি মানুষের অমর হবার ইচ্ছায়। যা কিছু বর্ত্তমান আছে, তার কুলুজি লিখ্‌তে গেলেই, গোড়ার দিক্‌টে গোঁজামিলন দিয়ে সারতে হয়। বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, যথা শঙ্কর, Spencer প্রভৃতিও ঐ উপায় অবলম্বন করেছেন। সুতরাং কোনও জিনিসের উৎপত্তির মূল নির্ণয় কর্‌তে যাওয়াটা বৃথা পরিশ্রম। কিন্তু এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, আর যা হতেই হোক, অমর হবার ইচ্ছে থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি হয়নি। প্রথমতঃ, অমরত্বের ঝুঁকি আমরা সকলে সামলাতে পারিনে, কিন্তু কলম চালাবার জন্য আমাদের অনেকেরই আঙ্গুল নিস্‌পিস্ করে। যদি ভাল মন্দ মাঝারি আমাদের প্রতি কথা, প্রতি কাজ চিরস্থায়ী হবার তিলমাত্র সম্ভাবনা থাক্‌ত, তা হ'লে মনে করে' দেখুন ত আমরা কজনে মুখ খুলতে কিম্বা হাত তুলতে সাহসী হতুম? অমরত্বের বিভীষিকা চোখের উপর থাক্‌লে, আমরা যা Perfect, তা ব্যতীত কিছু বল্‌তে কিম্বা কর্‌তে রাজি হতুম না। আর আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে, আমাদের অতি ভাল কাজ, অতি ভাল কথাও Perfection এর অনেক নীচে। আসল কথা, মৃত্যু আছে বলেই বেঁচে সুখ। পুণ্যক্ষয় হবার পর আবার মর্ত্ত্যলোকে ফিরে আসবার সম্ভাবনা আছে বলেই দেবতারা অমরপুরীতে স্ফূর্ত্তিতে বাস করেন, তা না হ'লে স্বর্গও তাঁদের অসহ্য হ'ত। সে যাই হোক্, আমরা মানুষ, দেবতা নই,—সুতরাং আমাদের মুখের কথা দৈববাণী হবে, এ ইচ্ছা আমাদের মনে স্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ, যদি কেউ শুধু অমর হবার জন্য লিখব, এই কঠিন পণ করে' বসেন,—তা হ'লে সে ইচ্ছা সফল হবার আশা কত কম বুঝতে পারলে, তিনি যদি বুদ্ধিমান হন, তা হ'লে লেখা হ'তে নিশ্চয়ই নিবৃত্ত হবেন। কারণ, সকলেই জানি যে, হাজারে নশ' নিরনব্বই জনের সরস্বতী মৃতবৎসা। তা ছাড়া সাহিত্য-জগতে মড়ক অষ্টপ্রহর লেগে রয়েচে। লাখে এক বাঁচে, বাদবাকির প্রাণ দু'দণ্ডের জন্যও নয়। চরক পরামর্শ দিয়েছেন, যে দেশে মহামারীর প্রকোপ, সে দেশ ছেড়ে পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। অমর হবার ইচ্ছায় ও আশায়, কে সে রাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে চায়?

৪

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আরও বক্তব্য এই যে, জীয়ন্ত ভাষার ব্যাকরণ কর্‌তে নেই, তা হলেই নির্ঘাত মরণ। সংস্কৃত মৃতভাষা, কারণ, ব্যাকরণের

নাগপাশে বদ্ধ হয়ে সংস্কৃত প্রাণত্যাগ করেছে। আরও বক্তব্য এই যে, মুখের ভাষার ব্যাকরণ নেই, কিন্তু লিখিত ভাষার ব্যাকরণ নইলে চলে না। প্রমাণ —সংস্কৃত শুধু অমরত্ব লাভ করেছে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষা একেবারে চিরকালের জন্ম মরে' গেছে। অর্থাৎ, এক কথায় বলতে গেলে, যে কোন ভাষারই হোক্ না কেন, চিরকালের জন্ম বাঁচতে হ'লে আগে মরা দরকার। তাই যদি হয়, তা হ'লে বাঙ্গলা যদি ব্যাকরণের দড়ি গলায় দিয়ে আত্মহত্যা কর্‌তে চায়, তাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের আপত্তি কি? তাঁর মতানুসারে ত যমের দুয়োর দিয়ে অমরপুরীতে ঢুক্‌তে হয়! তিনি আরও বলেন যে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃত ভাষায় হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু প্রাকৃত সংস্কৃত নয় ব'লে পালি প্রভৃতি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, বাঙ্গলা যতটা সংস্কৃতের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পার, ততই তার মঙ্গল। যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের মত সত্য হয়, তা হ'লে সংস্কৃতবহুল বাঙ্গলায় লেখা কেন, একেবারে সংস্কৃত ভাষাতেই ত আমাদের লেখা কর্ত্তব্য। কারণ, তা হ'লে অমর হবার বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু একটা কথা আমি ভাল বুঝতে পারছিনে; পালি প্রভৃতি ভাষা মৃত সত্য, কিন্তু সংস্কৃতও কি মৃত নয়? ও দেবভাষা অমর হ'তে পারে, কিন্তু ইহলোকে নয়। এ সংসারে মৃত্যুর হাত কেউ এড়াতে পারে না। পালিও পারে নি, সংস্কৃতও পারে নি, আমাদের মাতৃভাষাও পারবে না। তবে যে ক'দিন বেঁচে আছে, সে ক'দিন সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বেড়াতে হবে, বাঙ্গলার উপর এ কঠিন পরিশ্রমের বিধান কেন? বাঙ্গলার প্রাণ একটুখানি, অতখানি চাপ সইবে না।

৫

এ বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য যদি ভুল না বুঝে থাকি, তা হ'লে তাঁর মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বাঙ্গলাকে প্রায় সংস্কৃত করে' আনলে, আসামী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি বিদেশী লোকদের পক্ষে বঙ্গভাষা শিক্ষাটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়তঃ অন্য ভাষার যে সুবিধাটুকু নেই, বাঙ্গলার তা আছে,—যে-কোন সংস্কৃত কথা যেখানে হোক্ লেখায় বসিয়ে দিলে বাঙ্গলা ভাষার বাঙ্গলাত্ব নষ্ট হয় না। অর্থাৎ যাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, তাঁরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে, সাধারণ বাঙ্গালীর পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দুর্ব্বোধ করে' তুলতে হবে। কথাটা এতই অদ্ভুত যে, এর কি উত্তর দেব ভেবে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর অপর মতটি ঠিক কি না দেখা যাক্। আমাদের দেশে ছোট ছেলেদের বিশ্বাস যে, বাঙ্গলা কথার পিছনে অনুস্বর জুড়ে দিলে সংস্কৃত হয়, আর প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মত যে, সংস্কৃত কথায় অনুস্বর বিসর্গ ছেঁটে দিলেই বাঙ্গলা হয়। দুটো বিশ্বাসই সমান সত্য। বাঁদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়? শাস্ত্রী মহাশয় উদাহরণস্বরূপে বলেছেন, হিন্দীতে "ঘরমে যায়গা" চলে, কিন্তু "গৃহমে যায়গা" চলে না,—ওটা ভুল হিন্দী হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় ঘরের বদলে গৃহ যেখানে সেখানে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ সকল ভাষার একটা নিয়ম আছে, শুধু বাঙ্গলা ভাষার নেই। যার যা খুসী লিখতে পারি, ভাষা বাঙ্গলা হতেই বাধ্য। বাঙ্গলা ভাষার প্রধান গুণ যে, বাঙ্গালী কথায় লেখায় যথেচ্ছাচারী হ'তে পারে! শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্ব্বাচিত কথা দিয়েই তাঁর ও ভুল ভাঙ্গিয়ে দেওয়া যায়। "ঘরের ছেলে ঘরে যাও, ঘরের ভাত বেশী করে' খেয়ো", এই বাক্যটি হ'তে কোথাও "ঘর" তুলে দিয়ে "গৃহ" স্থাপনা করে' দেখুন ত কানেই বা কেমন শোনায়, আর মানেই বা কত পরিষ্কার হয়?

৬

আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোন প্রভেদ নেই? ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন। একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপর দিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই, সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়! ভাষা মানুষের মুখ হ'তে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হ'তে মানুষের মুখে নয়। উল্টোটা চেষ্টা কর্‌তে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। কেউ কেউ বলেন যে, আমাদের ভাবের ঐশ্বর্য্য এতটা বেড়ে গেছে যে, বাপ-ঠাকুর-দাদার ভাষার ভিতর তা আর ধরে' রাখা যায় না। কথাটা ঠিক হ'তে পারে, কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যে তার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। কণাদের মতে "অভাব" একটা পদার্থ। আমি হিন্দুসন্তান, কাজেই আমাকে বৈশেষিক দর্শন

মানতে হয়; সেই কারণেই আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রচলিত বাঙ্গলা সাহিত্যেও পদার্থ অনেকটা আছে। ইংরাজী সাহিত্যের ভাব, সংস্কৃত ভাষার শব্দ ও বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ,—এই তিন চিজ্ মিলিয়ে যে খিচুড়ি তয়ের করি, তাকেই আমরা বাঙ্গলা সাহিত্য বলে' থাকি। বলা বাহুল্য, ইংরেজী না জান্‌লে তার ভাব বোঝা যায় না। আমার এক এক সময়ে সন্দেহ হয় যে, হয় ত বিদেশের ভাব ও পুরাকালের ভাষা, এই দুয়ের আওতার ভিতর পড়ে' বাঙ্গলা সাহিত্য ফুটে উঠতে পারছে না। এ কথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনবার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিন খোরাক যোগাতে হবে। আর আমাদের ভাষার দেহপুষ্টি কর্‌তে হ'লে প্রধানতঃ অমরকোষ থেকেই নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার কর্‌বেন, তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে' প্রতি কথা-টির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর্‌তে হবে; তা যদি না পারেন, তা হ'লে বঙ্গ-সরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরান হবে। বিচার না করে' একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড় কর্‌লেই, ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে' ব্যক্ত করা হবে না। ভাষার এখন শানিয়ে ধার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ান নয়। যে কথাটা নিতান্ত নহিলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এসো, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ্ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশী ভিক্ষে, ধার, কিম্বা চুরি করে' এনো না। ভগবান্ পবননন্দন বিশল্যকরণী আন্‌তে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে' এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।

জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯।

আমরা ও তোমরা

১

তোমরা ও আমরা বিভিন্ন। কারণ, তোমরা তোমরা, এবং আমরা আমরা! তা যদি না হ'ত, তা হ'লে ইউরোপ ও এসিয়া এ দুই, দুই হ'ত না,—এক হ'ত। আমি ও তুমির প্রভেদ থাকৃত না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে, হয় শুধু আমরা হতুম, না হয় শুধু তোমরা হতে।

২

আমরা পূর্ব্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানব-সভ্যতার সূতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্মশান। আমরা উষা, তোমরা গোধূলি। আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।

৩

আমাদের রং কালো, তোমাদের রং সাদা। আমাদের বসন সাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি। আমরা খাই সাদা জল, তোমরা খাও লাল পানি। আমাদের আকাশ আগুন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া। নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের চোখে, সোনা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়; নীল আমাদের শূন্যে, সোনা আমাদের মাটির নীচে। তোমাদের ও আমাদের অনেক বর্ণভেদ। ভুলে যেন না যাই যে, তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান। কালাপানি পার হ'লে আমাদের জাত যায়, না হ'লে তোমাদের জাত থাকে না।

৪

তোমরা দৈর্ঘ্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, তোমরা চঞ্চল। আমরা ওজনে ভারি, তোমরা দামে চড়া। অপরকে বশীভূত কর্‌বার তোমাদের মতে একমাত্র উপায় গায়ের জোর, আমাদের মতে একমাত্র উপায় মনের নরম ভাব। তোমাদের পুরুষের হাতে ইস্পাৎ, আমাদের মেয়েদের হাতে লোহা। আমরা বাচাল, তোমরা বধির। আমাদের বুদ্ধি সূক্ষ্ম—এত সূক্ষ্ম যে, আছে কি না বোঝা কঠিন। তোমাদের বুদ্ধি স্থূল,—এত স্থূল যে, কতখানি আছে, তা বোঝা কঠিন। আমাদের কাছে যা সত্য, তোমাদের কাছে তা কল্পনা,—আর তোমাদের কাছে যা সত্য, আমাদের কাছে তা স্বপ্ন।

৫

তোমরা বিদেশে ছুটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ্। তোমার নেশা মদ, আমাদের নেশা আফিং। তোমাদের সুখ ছট্‌ফটানিতে, আমাদের সুখ ঝিমুনিতে। সুখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real। তোমরা চাও দুনিয়াকে জয়

বুবার বল, আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার বল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।

৬

তোমাদের মেয়ে প্রায় পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায় মেয়ে। বুড়ো হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না,—ছেলেবেলাও আমরা বুড়ামিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আস্‌তে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হ'লে। তোমরা যখন সবে গৃহপ্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই।

৭

তোমাদের আগে ভালবাসা, পরে বিবাহ,—আমাদের আগে বিবাহ, পরে ভালবাসা। আমাদের বিবাহ "হয়," তোমরা বিবাহ "কর।" আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু "ভূ," তোমাদের ভাষায় "কৃ।" তোমাদের রমণীদের রূপের আদর আছে, আমাদের রমণীদের গুণের কদর নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলঙ্কারশাস্ত্রে।

৮

অর্থাৎ এক কথায়, তোমরা যা চাও, আমরা তা চাইনে, আমরা যা চাই, তোমরা তা চাও না,—তোমরা যা পাও, আমরা তা পাইনে, আমরা যা পাই, তোমরা তা পাও না। আমরা চাই এক, তোমরা চাও অনেক। আমরা একের বদলে পাই শূন্য, তোমরা অনেকের বদলে পাও একের পিঠে অনেক শূন্য। তোমাদের দার্শনিক চায় যুক্তি, আমাদের দার্শনিক চায় মুক্তি। তোমরা চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ীর বাইরে, আমাদের পুরুষের মরণ বাড়ীর ভিতর। আমাদের গান, আমাদের বাজনা তোমাদের মতে শুধু বিলাপ; তোমাদের গান, তোমাদের বাজনা আমাদের মতে শুধু প্রলাপ। তোমাদের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সব জেনে কিছু না জানা, আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য কিছু না জেনে সব জানা। তোমাদের পরলোক স্বর্গ, আমাদের ইহলোক নরক। কাজেই পরলোক তোমাদের গম্য, ইহলোক আমাদের ত্যজ্য। তোমাদের ধর্ম্মমতে আত্মা অনাদি নয়, কিন্তু অনন্ত, আমাদের ধর্ম্মমতে আত্মা অনাদি, কিন্তু অনন্ত নয়,—তার শেষ নির্ব্বাণ। পূর্ব্বেই বলেছি, প্রাচী ও প্রতীচী পৃথক্‌। আমরাও ভাল, তোমরাও ভাল,—শুধু তোমাদের ভাল আমাদের মন্দ, ও আমাদের ভাল তোমাদের মন্দ। সুতরাং অতীতের আমরা ও বর্ত্তমানের তোমরা, এই দুয়ে মিলে যে ভবিষ্যতের তারা হবে—তাও অসম্ভব।

শ্রাবণ ১৩০৯।

তর্জ্জমা

আমরা ইংরাজ জাতিকে কতকটা জানি এবং আমাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীন হিন্দু জাতিকে তার চাইতেও বেশী জানি; আমরা চিনিনে শুধু নিজেদের।

আমরা নিজেদের চেন্‌বার কোন চেষ্টাও করিনে, কারণ, আমাদের বিশ্বাস যে, সে জানার কোন ফল নেই, তা ছাড়া নিজেদের ভিতর জানবার মত কোন পদার্থ আছে কি না, সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ আছে।

বাঙ্গালীর নিজস্ব বলে' মনে কিম্বা চরিত্রে যদি কোন পদার্থ থাকে, তাকে আমরা ডরাই,—তাই চোখের আড়াল করে' রাখতে চাই। আমাদের ধারণা যে, বাঙ্গালী তার বাঙ্গালিত্ব না হারালে আর মানুষ হয় না। অবশ্য অপরের কাছে তিরস্কৃত হ'লে আমরা রাগ করে' ঘরের ভাত, (যদি থাকে ত) বেশী করে' খাই; কিন্তু উপেক্ষিত হলেই আমরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হই। মান এবং অভিমান এক জিনিস নয়। প্রথমটির অভাব হতেই দ্বিতীয়টি জন্মলাভ করে।

আমরা যে নিজেদের মান্য করিনে, তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা উন্নতি অর্থে বুঝি,—হয় বর্ত্তমান ইউরোপের দিকে এগোনো, নয় অতীত ভারতবর্ষের দিকে পিছোনো। আমরা নিজের পথ জানিনে বলে' আজও মনস্থির করে' উঠতে পারিনি যে, পূর্ব্ব এবং পশ্চিম এই দুটির মধ্যে কোন্ দিক অবলম্বন করলে আমরা ঠিক গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছব। কাজেই আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার দিকে তিন পা এগিয়ে, আবার ভারতবর্ষের দিকে দু'পা পিছিয়ে আসি—আবার অগ্রসর হই, আবার পিছু হটি। এই কুর্নিস করাটাই আমাদের নব-সভ্যতার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম।

উক্ত ক্রিয়াটি আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরব-সূচক না হলেও, মেনে নিতে হবে। যা মনে সত্য বলে' জানি, সে সম্বন্ধে মনকে চোখ ঠেরে কোন লাভ নেই! আমরা দোটানার ভিতর পড়েছি—এই সত্যটি সহজে স্বীকার করে' নিলে, আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়ে আসবে। যা আজ উভয়-সঙ্কট বলে' মনে হচ্ছে, তাই আমাদের উন্নতির স্রোতকে একটি নির্দ্দিষ্ট পথে বদ্ধ রাখবার উভয়কূল বলে' বুঝতে পারব। আমরা যদি চল্‌তে চাই ত, আমাদের এ কূল ও কূল দুকূল রক্ষা করে'ই চলতে হবে।

আমরা স্পষ্ট জানি আর না জানি, আমরা এই উভয়কূল অবলম্বন করেই চলবার চেষ্টা করছি। সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে। সেই যুগধর্ম্ম অনুসারে চল্‌তে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। আমাদের এ যুগ সত্যযুগও নয়, কলিযুগও নয়,—শুধু তর্জ্জমার যুগ। আমরা শুধু কথায় নয়, কাজেও, একেলে বিদেশী এবং সেকেলে স্বদেশী সভ্যতার অনুবাদ করেই দিন কাটাই। আমাদের মুখের প্রতিবাদও ঐ একই লক্ষণাক্রান্ত। আমরা সংস্কৃতের অনুবাদ করে' নূতনের প্রতিবাদ করি এবং ইংরেজীর অনুবাদ করে' পুরাতনের প্রতিবাদ করি। আসলে রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সাহিত্য,—সকল ক্ষেত্রেই তর্জ্জমা করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান যুগটি তর্জ্জমার যুগ বলে' গ্রাহ্য করে' নিয়ে, ঐ অনুবাদ কার্য্যটি ষোলআনা ভালরকম করার উপর আমাদের পুরুষার্থ এবং কৃতিত্ব নির্ভর করছে।

পরের জিনিসকে আপনার করে' নেবার নামই তর্জ্জমা। সুতরাং ও কার্য্য কর্‌তে আমাদের কোন ক্ষতি নেই এবং নিজেদের দৈন্যের পরিচয় দেওয়া হয় মনে করেও লজ্জিত হবার কারণ নেই। কেননা, নিজের ঐশ্বর্য্য না থাকলে লোকে যেমন দান করতে পারে না, তেমনি, নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকলে লোকে গ্রহণও করতে পারে না। স্মৃতির মতে, দাতা এবং গ্রহীতার পরস্পর যোগ না হ'লে দানক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। মৃত ব্যক্তি দাতাও হ'তে পারে না, গ্রহীতাও হতে পারে না; কারণ, দান এবং গ্রহণ উভয়ই জীবনের ধর্ম্ম। বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদের নিকট কোটি কোটি মানব ধর্ম্মের জন্য ঋণী। কিন্তু তাঁদের দত্ত অমূল্য রত্ন তাঁদের হাত থেকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র তাঁদের সমকালবর্ত্তী জনকতক মহাপুরুষেরই ছিল এবং শিষ্যপরম্পরায় তাঁদের মত আজ লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে গুরু হওয়া বেশী শক্ত, কিম্বা শিষ্য হওয়া বেশী শক্ত, বলা কঠিন। যাঁদের বেদান্ত শাস্ত্রের সঙ্গে স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে, তাঁরাই জানেন যে, পুরাকালে গুরুরা কাউকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করবার পূর্ব্বে, শিষ্যের সে বিদ্যা গ্রহণ করবার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা করতেন। উপনিষদকে গুহ্যশাস্ত্র করে' রাখবার উদ্দেশ্যই এই যে, যাদের শিষ্য হবার সামর্থ্য নেই, এমন লোকেরা ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিদ্যে ফলাতে না পারে। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, শক্তিমান গুরু হবার একমাত্র উপায়—পূর্ব্বে ভক্তিমান শিষ্য হওয়া। বর্ত্তমান যুগে আমরা ভক্তি পদার্থটি ভুলে গেছি, আমাদের মনে আছে শুধু অভক্তি ও অতিভক্তি। এ দুয়ের একটিও সাধুতার লক্ষণ নয়, তাই ইংরাজী-শিক্ষিত লোকের পক্ষে অপর কাউকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।

আমরা কথায় বলি, জ্ঞানলাভ করি; কিন্তু আসলে জ্ঞান উত্তরাধিকারিসত্ত্বে কিম্বা প্রসাদস্বরূপে লাভ করবার পদার্থ নয়। আমরা সজ্ঞানে জন্মলাভ করিনে, কেবল জ্ঞান অর্জ্জন করবার ক্ষমতামাত্র নিয়ে ভূমিষ্ঠ হই। জানা ব্যাপারটি মানসিক চেষ্টার অধীন, জ্ঞান একটি মানসিক ক্রিয়া মাত্র এবং সে ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির একটি বিশেষ বিকাশ। মন পদার্থটি একটি বেওয়ারিশ শ্লেট নয়, যার উপর বাহ্যজগৎরূপ পেন্‌সিল শুধু হিজিবিজি কেটে যায়; অথবা ফটো-গ্রাফিক প্লেটও নয়, যা কোনরূপ অন্তর্গূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বাহ্যজগতের ছায়া ধরে' রাখে। যে প্রক্রিয়ার বলে আমরা, জ্ঞাতব্য বিষয়কে নিজের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা অনুসারে নিজের অন্তর্ভূত করে' নিতে পারি,—তারই নাম জ্ঞান। আমরা মনে মনে যা তর্জ্জমা করে' নিতে পারি, তাই আমরা যথার্থ জানি; যা পারিনে, তার শুধু নামমাত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ঐ তর্জ্জমা করার শক্তির উপরই মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। সুতরাং একাগ্রভাবে তর্জ্জমা-কার্য্যে ব্রতী হওয়াতে আমাদের পুরুষকার বৃদ্ধি পাবে বৈ ক্ষীণ হবে না।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, আমরা সকলে মিলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই, হয় ইউরোপীয় নয় আর্য্য সভ্যতার তর্জ্জমা করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ফলে আমরা তর্জ্জমা না করে' শুধু নকলই করছি। নকল করার মধ্যে কোনরূপ গৌরব বা মনুষ্যত্ব নেই।

মানসিক শক্তির অভাববশতঃই মানুষে যখন কোনও জিনিস রূপান্তরিত করে' নিজের জীবনের উপযোগী করে' নিতে পারে না, অথচ লোভবশতঃ লাভ করতে চায়, তখন তার নকল করে। নকলে বাইরের পদার্থ বাইরেই থাকে, আমাদের অন্তর্ভূত হয় না, তার দ্বারা আমাদের মনের এবং চরিত্রের কান্তি পুষ্ট হয় না, ফলে মানসিক শক্তির যথেষ্ট চর্চ্চার অভাববশতঃ দিন দিন সে শক্তি হ্রাস হ'তে থাকে। ইউরোপীয় সভ্যতা আমরা নিজেদের চারিপাশে জড় করে'ও সেটিকে অন্তরঙ্গ করতে পারিনি, তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা মাঝে মাঝে সেটিকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য ছট্‌ফট্‌ করি। মানুষে যা আত্মসাৎ করতে পারে না, তাই ভস্মসাৎ করতে চায়। আমরা মুখে যাই বলিনে কেন, কাজে, পূর্ব্ব সভ্যতা নয়, পশ্চিম সভ্যতারই নকল করি; তার কারণ, ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের চোখের সুমুখে সশরীরে বর্ত্তমান, অপর পক্ষে আর্য্য-সভ্যতার প্রেতাত্মামাত্র অবশিষ্ট। প্রেতাত্মাকে আয়ত্ত করতে হ'লে বহু সাধনার আবশ্যক। তা ছাড়া প্রেতাত্মা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, দেহমুক্ত আত্মার সম্পর্কে আসতে হ'লে অপর একটি দেহতে তাকে আশ্রয় দেওয়া চাই; একটি প্রাণীর মধ্যস্থতা ব্যতীত, প্রেতাত্মা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আমাদের সমাজের প্রাচীন দেহ আছে বটে, কিন্তু প্রাণ নেই। শব প্রেতাত্মা কর্ত্তৃক আবিষ্ট হ'লে মানুষ হয় না, বেতাল হয়। বেতাল সিদ্ধ হবার দুরাশা খুব কম লোকেই রাখে, কাজেই শুধু মন নয়, পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য যে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের প্রত্যক্ষ রয়েছে, সাধারণতঃ লোকে তারই অনুকরণ করে। অনুকরণ ত্যাগ করে' যদি আমরা এই নব সভ্যতার অনুবাদ করতে পারি, তা হ'লেই সে সভ্যতা 'নজস্ব হয়ে উঠবে এবং ঐ ক্রিয়ার সাহায্যেই আমরা নিজেদের প্রাণের পরিচয় পাব এবং বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব ফুটিয়ে তুলব।

তর্জ্জমার আবশ্যকত্ব স্থাপনা করে', এখন কি উপায়ে আমরা সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হব, সে সম্বন্ধে আমার দু'চারটি কথা বলবার আছে।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, কথার চাইতে কাজ শ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাস বৈষয়িক হিসাবে সত্য, এবং আধ্যাত্মিক হিসাবে মিথ্যা। মানুষমাত্রেই নৈসর্গিক প্রবৃত্তির বলে সংসারযাত্রার উপযোগী সকল কার্য্য করতে পারে; কিন্তু তার অতিরিক্ত কর্ম্ম, যার ফল একে নয়, দশে লাভ করে, তা' করবার জন্য মনোবল আবশ্যক। সমাজে, সাহিত্যে যা কিছু মহৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মূলে মন পদার্থটি বিদ্যমান। যা মনে ধরা পড়ে, তাই প্রথমে কথায় প্রকাশ পায়, সেই কথা অবশেষে কার্য্যরূপে পরিণত হয়; কথার সূক্ষ্মশরীর কার্য্যরূপ স্থূলদেহ ধারণ করে। আগে দেহটি গড়ে' নিয়ে, পরে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টাটি একেবারেই বৃথা। কিন্তু আমরা রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণের সন্ধান না করে' শুধু তার দেহটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করায় নিত্যই ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্ট হচ্ছি। প্রাণ নিজের দেহ নিজের রূপ নিজেই গড়ে' নেয়। নিজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বলেই বীজ ক্রমে বৃক্ষরূপ ধারণ করে। সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌তে পারি, তা হ'লেই আমাদের সমাজ নব কলেবর ধারণ করবে। এই নবসভ্যতাকে মনে সম্পূর্ণরূপ পরিপাক করতে পারলেই আমাদের কান্তি পুষ্ট হবে। কিন্তু যতদিন সে সভ্যতা আমাদের মুখস্থ থাকবে, কিন্তু উদরস্থ হবে না, ততদিন তার কোন অংশই আমরা জীর্ণ করতে পারব না।—আমরা যে ইউরোপীয় সভ্যতা কথাতেও তর্জ্জমা করতে পারিনি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমাদের নূতন শিক্ষালব্ধ মনোভাবসকল, শিক্ষিত লোকদেরই রসনা আশ্রয় করে' রয়েছে, সমগ্রজাতির মনে স্থান পায়নি। আমরা ইংরেজীভাব ভাষায় তর্জ্জমা করতে পারিনে বলেই, আমাদের কথা দেশের লোকে বোঝে না।—বোঝে শুধু ইংরেজী-শিক্ষিত লোকে। এ দেশের জনসাধারণের নেবার ক্ষমতা কিছু কম নয়, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তারা যে কিছু পায় না, তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্যকে দেবার মত কিছু নেই—আমাদের নিজস্ব বলে' কোন পদার্থ নেই—আমরা পরের সোনা কানে দিয়ে অহঙ্কারে মাটিতে পা দিইনে। অপরপক্ষে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দেবার মত ধন ছিল, তাই তাঁদের মনোভাব নিয়ে আজও সমগ্র জাতি ধনী হয়ে আছে। ঋষিবাক্যসকল লোকমুখে এমনি সুন্দরভাবে তর্জ্জমা হয়ে গেছে যে, তা আর তর্জ্জমা বলে' কেউ বুঝতে পারেন না। এ দেশের অশিক্ষিত লোকের রচিত বাউলের গান কাউকে আর উপনিষদের ভাষায় অনুবাদ করে' বোঝাতে হয় না, অথচ একই মনোভাব ভাষান্তরে বাউলের গানে এবং উপনিষদে দেখা দেয়! আত্মা যেমন এক দেহ ত্যাগ করে' অপর দেহ গ্রহণ করলে, পূর্ব্বদেহের স্মৃতিমাত্রও রক্ষা করে না, মনোভাবও যদি তেমনি এক ভাষার দেহত্যাগ করে' অপর একটি ভাষার

দেহ অবলম্বন করে, তা হলেই সেটি যথার্থ অনূদিত হয়।

উপযুক্ত তর্জ্জমার গুণেই বৈদান্তিক মনোভাব-সকল হিন্দু-সন্তানমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর জড়িয়ে আছে। এ দেশে এমন লোক বোধ হয় নেই, যার মনটিকে নিংড়ে নিলে অন্ততঃ এক ফোঁটাও গৈরিক রঙ না পাওয়া যায়। আর্য্য সভ্যতার প্রেতাত্মা উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টাটা একেবারেই অনর্থক, কারণ, তার আত্মাটি আমাদের দেহাভ্যন্তরে সুযুপ্ত অবস্থায় রয়েছে—যদি আবশ্যক হয় ত সেটিকে সহজেই জাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ঠিক কথাটি বল্‌তে পার্‌লে অপরের মনের দ্বার, আরব্য-উপন্যাসের দস্যুদের ধনভাণ্ডারের দ্বারের মত, আপনি খুলে যায়। আমরা ইংরেজীশিক্ষিত লোকেরা জনসাধারণের মনের দ্বার খোল্‌বার সঙ্কেত জানিনে, কারণ, আমরা তা জানবার চেষ্টাও করিনে। যে সকল কথা আমাদের মুখের উপর আল্‌গা হয়ে রয়েছে, কিন্তু মনে প্রবেশ করেনি, সেগুলি আমাদের মুখ থেকে খসে পড়লেই যে অপরের অন্তরে প্রবেশলাভ কর্‌বে—এ আশা বৃথা।

আমরা যে আমাদের শিক্ষালব্ধ ভাবগুলি তর্জ্জমা কর্‌তে অকৃতকার্য্য হয়েছি, তার প্রমাণ ত সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে দুবেলাই পাওয়া যায়। যেমন সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত, সংস্কৃত "ছায়ার" সাহায্য ব্যতীত বুঝ্‌তে পারা যায় না, তেমনি আমাদের নব-সাহিত্যের কৃত্রিম প্রাকৃত, ইংরাজী ছায়ার সাহায্য ব্যতীত বোঝা যায় না। সমাজে না হোক্, সাহিত্যে "চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।" কিন্তু আমাদের নব-সাহিত্যের বস্তু যে চোরাই মাল, তা ইংরাজী-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই কাছে ধরা পড়ে। আমরা ইংরাজী-সাহিত্যের সোনা-রূপো যা চুরি করি, তা গলিয়ে নিতেও শিখি নি। এই ত গেল সাহিত্যের কথা। রাজনীতি বিষয়ে আমাদের সকল ব্যাপার যে আগাগোড়াই নকল, এ বিষয়ে বোধ হয় আর দু'মত নেই, সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের মনে মনে বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম এবং দর্শন এই দুটি জিনিস আমাদের একচেটে এবং অন্য কোন বিষয়ে না হোক্, এই দুই বিষয়ে আমাদের সহজ কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বে না। ইংরেজী-শিক্ষিত ভারতবাসীদের এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক, তার প্রমাণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, ঐ শ্রেণীর লোকের হাতে মনুর ধর্ম্ম religion হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভুল তর্জ্জমার বলে ব্যবহার-শাস্ত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্রের ভেদজ্ঞান আমাদের লুপ্ত হয়েছে। ধর্ম্মের অর্থ ধরে' রাখা, এবং মোক্ষের অর্থ ছেড়ে দেওয়া, সুতরাং এ দুয়ের কাজ যে এক নয়, তা শুধু ইংরেজী-নবিস আর্য্য-সন্তানরাই বুঝতে পারেন না।

গীতা আমাদের হাতে পড়্‌বামাত্র তার হরিভক্তি উড়ে যায়। সেই কারণে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত "গীতায় ঈশ্বরবাদের' প্রতিষ্ঠা কর্‌তে গিয়ে নব্য পণ্ডিতসমাজে শুধু বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি করে-ছিলেন। তার পর গীতার কর্ম্ম ইংরাজী work রূপ ধারণ করে' আমাদের কাছে গ্রাহ্য হয়েছে; অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের কর্ম্ম কাণ্ডহীন হয়েই আমাদের কাছে উচ্চ বলে' গণ্য হয়েছে। এই ভুল তর্জ্জমার প্রসাদেই, যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য পরের হিত এবং নিজের আত্মার উন্নতি-সাধন—পরলোকের অভ্যুদয়ও নয়—সেই কর্ম্ম আজকাল ইহলোকের অভ্যুদয়ের জন্য ধর্ম্ম বলে' গ্রাহ্য হয়েছে। যে কাজ মানুষে পেটের দায়ে নিত্য করে' থাকে, তা করা কর্ত্তব্য, এইটুকু শেখাবার জন্য ভগবানের যে ভোগায়তন দেহ ধারণ করে' পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আবশ্য-কতা ছিল না,—এ সোজা কথাটাও আমরা বুঝতে পারিনে। ফলে আমাদের কৃত গীতার অনুবাদ বক্তৃতাতেই চলে, জীবনে কোন কাজে লাগে না।

একদিকে আমরা এ দেশের প্রাচীন মতগুলিকে যেমন ইংরেজী পোষাক পরিয়ে তার চেহারা বিল্‌কুল্ বদ্‌লে দিই, তেমনি অপর দিকে, ইউ-রোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানকেও আমরা সংস্কৃত ভাষার ছদ্মবেশ পরিয়ে লোক-সমাজে বার করি।

নিত্যই দেখ্‌তে পাই যে, খাঁটি জর্ম্মান মাল স্বদেশী বলে' পাঁচজনে সাহিত্যের বাজারে কাটাতে চেষ্টা কর্‌ছে। হেগেলের দর্শন শঙ্করের নামে বেনামি করে' অনেকে কতক পরিমাণে অজ্ঞ লোকদের কাছে চালিয়েও দিয়েছেন। আমাদের মুক্তির জন্য হেগেলেরও আবশ্যক আছে, শঙ্করেরও আবশ্যক আছে; কিন্তু তাই বলে' হেগেলের মস্তক মুণ্ডন করে' তাঁকে আমাদের স্বহস্তরচিত শতগ্রন্থিময় কন্থা পরিয়ে শঙ্কর বলে' সাহিত্য-সমাজে পরিচিত করে' দেওয়াতে কোন লাভ নেই। হেগেলকে ফকির না করে' যদি শঙ্করকে গৃহস্থ কর্‌তে পারি, তা'তে আমাদের উপকার বেশী।

বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ ভুল তর্জ্জমা অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে! উদাহরণস্বরূপ Evolution এর

কথাটা ধরা যাক্। ইভলিউসানের দোহাই না দিয়ে আমরা আজকাল কথাই কইতে পারিনে। আমরা উন্নতিশীল হই, আর স্থিতিশীলই হই, আমাদের সকলপ্রকার শীলই ঐ ইভলিউসান আশ্রয় করে' রয়েছে। সুতরাং ইভলিউসানের যদি আমরা ভুল অর্থ বুঝি, তা হ'লে, আমাদের সকল কার্য্যই যে আরম্ভে পর্য্যবসিত হবে, সে ত ধরা কথা। বাঙ্গলায় আমরা ইভলিউসান "ক্রম-বিকাশবাদ" "ক্রমোন্নতিবাদ" ইত্যাদি শব্দে তর্জ্জমা করে' থাকি। ঐরূপ তর্জ্জমার ফলে, আমাদের মনে এই ধারণা জন্মে গেছে যে, মাসিকপত্রের গল্পের মত, জগৎপদার্থটি ক্রমশঃ প্রকাশ্য। সৃষ্টির বইখানি আদ্যোপান্ত লেখা হয়ে গেছে, শুধু প্রকৃতির ছাপাখানা থেকে অল্প অল্প করে' বেরুচ্চে এবং যে অংশটুকু বেরিয়েছে, তার থেকেই তার রচনাপ্রণালীর ধরণ আমরা জানতে পেরেছি। সে প্রণালী হচ্ছে ক্রমোন্নতি; অর্থাৎ যত দিন যাবে, তত সমস্ত জগতের এবং তার অন্তর্ভূত জীবজগতের এবং তার অন্তর্ভূত মানবসমাজের, এবং তার অন্তর্ভূত প্রতি মানবের, উন্নতি অনিবার্য্য। প্রকৃতির ধর্ম্মই হচ্ছে আমাদের উন্নতিসাধন করা। সুতরাং আমাদের তার জন্য নিজের কোনও চেষ্টার আবশ্যক নেই। আমরা শুয়েই থাকি আর ঘুমিয়েই থাকি, জাগতিক নিয়মের বলে আমাদের উন্নতি হবেই। এই কারণেই এই ক্রমোন্নতিবাদ-আকারে ইভলিউসান আমাদের স্বাভাবিক জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতার অনুকূল মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া এই "ক্রম" শব্দটি আমাদের মনের উপর এমন আধিপত্য স্থাপন করেছে যে, সেটিকে অতিক্রম করা পাপের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়েছে। তাই আমরা নানা কাজের উপক্রমণিকা করেই সন্তুষ্ট থাকি, কোন বিষয়েরই উপসংহার করাটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিনে; প্রস্তাবনাতেই আমাদের জীবন-নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আসলে ইভলিউসান, ক্রম-বিকাশও নয়, ক্রমোন্নতিও নয়। কোনও পদার্থকে প্রকাশ করবার শক্তি জড়প্রকৃতির নেই এবং তার প্রধান কাজই হচ্ছে সকল উন্নতির পথে বাধা দেওয়া। ইভলিউসান জড়জগতের নিয়ম নয়, জীবজগতের ধর্ম্ম। ইভলিউসানের মধ্যে শুধু ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ পরিস্ফুট। ইভলিউসান অর্থে দৈব নয়,—পুরুষকার। তাই ইভলিউসানের জ্ঞান মানুষকে অলস হ'তে শিক্ষা দেয় না, সচেষ্ট হ'তে শিক্ষা দেয়। আমরা ভুল তর্জ্জমা করে' ইভলিউসানকে আমাদের চরিত্র-হীনতার সহায় করে' এনেছি।

ইউরোপীয় সভ্যতার হয় আমরা তর্জ্জমা করতে কৃতকার্য্য হচ্ছি নে, নয় ভুল তর্জ্জমা করছি, তাই আমাদের সামাজিক জীবনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং অপচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ আমাদের বিশ্বাস যে, আমরা দু'পাতা ইংরাজী পড়ে' নব্যব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হয়ে উঠেছি। তাই আমরা নিজেদের শিক্ষার দৌড় কত, সে বিষয়ে লক্ষ্য না করে', জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এ সত্য আমরা ভুলে যাই যে, ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান থেকে যদি আমরা নতুন প্রাণ লাভ করে' থাকতুম, তা হ'লে জনসাধারণের মধ্যে আমরা নব প্রাণের সঞ্চারও করতে পারতুম। আমরা অধ্যয়ন করে' যা লাভ করেছি, তা অধ্যাপনার দ্বারা দেশশুদ্ধ লোককে দিতে পারতুম। আমরা আমাদের Cultureকে nationalise করতে পারিনি বলেই, গবর্ণমেণ্টকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, আইনের দ্বারা বাধ্য করে' জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হোক্। মান্যবর গোপালকৃষ্ণ গোখলে যে হুজুগটির মুখপাত্র ছিলেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনও মনোভাব ছিল না। তাই গবর্ণমেণ্টকে ভজাবার জন্য, দিবারাত্রি খালি বিলেতি নজিরই দেখান হয়েছিল। শিক্ষা শব্দের অর্থ শুধু লিখ্‌তে ও পড়্‌তে শেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবর্ণমেণ্টই স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে' আমাদের লিখতে পড়্‌তে শিখিয়েছেন। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকেই গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করে' রাজ্যিশুদ্ধ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে, এই হচ্ছে আমাদের হাল রাজনৈতিক আবদার। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা আমাদের নব-শিক্ষা মজ্জাগত করতে না পারব, ততদিন জনসাধারণকে পড়্‌তে শিখিয়ে তাদের যে কি বিশেষ উপকার করা হবে, তা ঠিক বোঝা যায় না। আমরা আজ পর্য্যন্ত ছোট ছেলেদের উপযুক্ত একখানিও পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে পারিনি। পড়তে শিখলে এবং পড়বার অবসর থাকলে এবং বই কেন্‌বার সঙ্গতি থাকলে, প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত চাষার ছেলেরা সেই রামায়ণ-মহাভারতই পড়বে,—আমাদের নব-শিক্ষার ভাগ তারা কিছু পাবে না। রামায়ণ-মহাভারতের কথা যে বইয়ে পড়ার চাইতে মুখে শোনা অনেক বেশী শিক্ষাপ্রদ, তা নব-শিক্ষিত ভারতবাসী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবেন না। মুখের বাক্যে প্রাণ আছে, লেখার ধ্বনিহীন বাক্য আধমরা। সে যাই হোক্, আমাদের দেশের লৌকিক

শিক্ষার জ্ঞান যদি আমাদের থাকৃত এবং সেই শিক্ষার প্রতি অযথা অবজ্ঞা যদি আমাদের মনে না স্থান পেত, তা হ'লে না ভেবে-চিন্তে, লোকশিক্ষার দোহাই দিয়ে, সেই চিরাগত লৌকিক শিক্ষা নষ্ট করতে আমরা উদ্যত হতুম না। সংস্কৃত-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা লোকাচার, লৌকিক ধর্ম্ম, লৌকিক ন্যায় এবং লৌকিক বিদ্যাকে কিরূপ মান্য করতেন। কেবলমাত্র বর্ণপরিচয় হ'লেই লোকে শিক্ষিত হয় না; কিন্তু ঐ পরিচয় লাভ করতে গিয়ে যে বর্ণধর্ম্ম হারানো অসম্ভব নয়, তা সকলেই জানেন। মাসিক পাঁচটাকা বেতনের গুরু নামক গরুর দ্বারা তাড়িত হওয়া অপেক্ষা চাষার ছেলের পক্ষে গরু তাড়ানো শ্রেয়। "ক" অক্ষর যে কোন লোকের পক্ষেই গোমাংস হওয়া উচিত নয়, এ কথা আমরা সকলেই মানি, কিন্তু "ক" অক্ষর যে আমাদের রক্তমাংস হওয়া উচিত, এ ধারণা সকলের নেই। কেবল স্বাক্ষর করতে শেখার চাইতে নিরক্ষর-থাকাও ভাল, কারণ, পৃথিবীতে আঙ্গুলের ছাপ রেখে যাওয়াতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আমাদের আহার, পরিচ্ছদ, গৃহ, মন্দির, সব জিনিসেই আমাদের নিরক্ষর লোকদের আঙ্গুলের ছাপ রয়েছে। শুধু আমরা শিক্ষিতসম্প্রদায়ই ভারতমাতাকে পরিষ্কার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাচ্ছি। পতিতের উদ্ধার কার্য্যটি খুব ভাল; ওর একমাত্র দোষ এই যে, যাঁরা পরকে উদ্ধার করবার জন্য ব্যস্ত, তাঁরা নিজেদের উদ্ধার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমরা যত দিন শুধু ইংরাজীর নীচে স্বাক্ষর দিয়েই ক্ষান্ত থাকব, কিন্তু সাহিত্যে আমাদের আঙ্গুলের ছাপ ফুটবে না, তত দিন আমরা নিজেরাই যথার্থ শিক্ষিত হব না, পরকে শিক্ষা দেওয়া ত দূরের কথা। আমি জানি যে, আমাদের জাতিকে খাড়া করবার জন্য অসংখ্য সংস্কারের দরকার আছে। কিন্তু আর যে কোন সংস্করণের আবশ্যক থাক্ না কেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাজার হাজার বটতলার সংস্করণের আবশ্যক নেই।

মাঘ, ১৩১৯।

বইয়ের ব্যবসা

সাধারণতঃ লোকের একটা বিশ্বাস আছে যে, বই জিনিসটে পড়া সহজ, কিন্তু লেখা কঠিন। অপর দেশে যাই হোক, এ দেশে কিন্তু নিজে বই লেখার চাইতে অপরকে পড়ানো ঢের বেশী শক্ত। শুনতে পাই যে, কোন বইয়ের এক হাজার কপি ছাপালে, এক বৎসরে তার একশ'ও বিক্রী হয় না। সাধারণ লেখকের কথা ছেড়ে দিলেও, নামজাদা লেখকদেরও বই বাজারে কাটে কম, কাটে বেশী পোকায়। বাঙ্গলাদেশে লেখকের সংখ্যা বেশী কিংবা পাঠকের সংখ্যা বেশী, বলা কঠিন। এ বিষয়ে যখন কোন Statistics পাওয়া যায় না, তখন ধরে' নেওয়া যেতে পারে যে, মোটামুটি দুই সমান। কেউ কেউ এমন কথাও বলে থাকেন যে, লেখা ও পড়া এ দুটি কাজ অনেক স্থলে একই লোকে করে' থাকেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে অধিকাংশ লেখকের পক্ষে নিজের লেখা নিজে পড়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কেননা, পরের বই কিনতে পয়সা লাগে, কিন্তু নিজের বই বিনে পয়সায় পাওয়া যায়। অবশ্য কখন কখন কোনও কোনও বই উপহারস্বরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সব বই প্রায়ই অপাঠ্য। এরূপ অবস্থায় বঙ্গ-সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হওয়া প্রায় একরূপ অসম্ভব। কারণ, সাহিত্য পদার্থটি যাই হোক না কেন, বই হচ্ছে শুধু বেচাকেনার জিনিস, একেবারে কাঁচামাল। ও মাল ধরে' রাখা চলে না। গাছের পাতার মত বইয়ের পাতাও বেশী দিন টেঁকে না এবং একবার ঝরে' গেলে উনুনধরানো ছাড়া অন্য কোনও কাজে লাগে না।

এ অবস্থা যে সাহিত্যের পক্ষে শোচনীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কার দোষে যে এরূপ অবস্থা ঘটেছে, লেখকের কি পাঠকের, সে কথা বলা কঠিন। অবশ্য লেখকের পক্ষে এই বলবার আছে যে, এক টাকা দিয়ে একখানি বই কেনার চাইতে, একশ' টাকা দিয়ে একখানি বই ছাপানো ঢের বেশী কষ্টসাধ্য। অপর পক্ষে পাঠক বলতে পারেন যে, একশটি টাকা অন্ততঃ ধার করে'ও যে-সে বাঙ্গলা বই ছাপানো যেতে পারে, কিন্তু নিজের বুদ্ধি অপরকে ধার না দিয়ে যে সে বাঙ্গলা বই পড়া যেতে পারে না। অর্থকষ্টের চাইতে মনঃকষ্ট অধিক অসহ্য। আমার মতে দু'পক্ষের মত এক হিসেবে সত্য হলেও আর এক হিসেবে মিথ্যা। বই লিখিলেই যে ছাপাতে হবে, এইটি হচ্ছে লেখকদের ভুল; আর বই কিনলেই যে পড়তে হবে, এইটি হচ্ছে পাঠকদের ভুল। বই লেখা জিনিসটে একটা সখ মাত্র হওয়া উচিত নয়,—কিন্তু বই কেনাটা সখ ছাড়া আর কিছু হওয়া উচিত নয়।

বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলা-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে আমি কোন আলোচনা

করতে চাইনে। কারণ, সাহিত্য শব্দ উচ্চারণ করবামাত্র নানা তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়। অমনি চারধার থেকে এই সব দার্শনিক প্রশ্ন ওঠে, সাহিত্য কাকে বলে? সাহিত্যে কার কি ক্ষতি হয় এবং কার কি উপকার হয়? তার পর সাহিত্যকে সমাজের শাসনাধীন করে', তার শান্তির জন্য সমালোচনার দণ্ডবিধি আইন গড়বার কথা হয়। সমালোচকেরা একাধারে ফরিয়াদি, উকীল, বিচারক এবং জল্লাদ হয়ে ওঠেন। সুতরাং কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, সাহিত্য যে কি, সে সম্বন্ধে যখন এখনও একটা জাতীয় ধারণা জন্মে যায়নি, তখন এ বিষয়ে এক কথা বললে হাজার কথা শুনতে হয়। কিন্তু বই জিনিসটে কি, তা সকলেই জানেন; এবং বাঙ্গলা বই যে বাজারে চলা উচিত, সে বিষয়ে বোধ হয়—দু'মত নেই, কারণ, ও জিনিসটে স্বদেশী শিল্প। যদি কারও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তা হ'লে তা ভাঙ্গাবার জন্যে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে যে, নব্য স্বদেশী শিল্পের যে দুটি প্রধান লক্ষণ, সে দুটিই এতে বর্ত্তমান। প্রথমতঃ নব্য-সাহিত্য পদার্থটা স্বদেশী নয়, দ্বিতীয়তঃ তাতে শিল্পের কোন পরিচয় নেই।

লেখা ব্যাপারটা যত দিন আমরা মানুষের একটা প্রধান কাজ হিসেবে না দেখে, বাজে সখ হিসেবে দেখব, তত দিন বইয়ের ব্যবসা ভাল করে' চলবে না। সুতরাং বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি অর্থাৎ বিস্তার করতে হ'লে, আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এ যুগে সাহিত্য প্রধানতঃ লেখা-পড়ার জিনিস নয়, কেনা-বেচার জিনিস। কোন রচনাকে যদি অপরে অমূল্য বলে, তা হ'লে রচয়িতার রাগ করা উচিত, কারণ, সে পদার্থের মূল্য নেই, তা যত্ন করে' গড়া সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

ব্যবসার দুটি দিক আছে,—production (তৈরী করা), দ্বিতীয়তঃ distribution (কাটানো)। মানব-জীবনের এবং মালের জীবনের একই ইতিহাস, তার একটা আরম্ভ আছে, একটা শেষ আছে। যে তৈরী করে, তার হাতে মালের জন্ম এবং যে কেনে, তার হাতে তার মৃত্যু। জন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত কোন একটি মালকে দশ হাত ফিরিয়ে নিয়ে বেড়ানর নাম হচ্ছে distribution। সুতরাং বইয়ের জন্ম-বৃত্তান্ত এবং ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, দুটির প্রতিই আমাদের সমান লক্ষ্য রাখতে হবে।

এ স্থলে বলে' রাখা আবশ্যক যে, আমি সাহিত্য-ব্যবসায়ী নই। অর্থাৎ অদ্যাবধি বই আমি কিনেই আসছি, কখনও বেচিনি। সুতরাং কি কি উপায় অবলম্বন করলে বই বাজারে কাটানো যেতে পারে, সে বিষয়ে আমি ক্রেতার দিক্ থেকে যা বলবার আছে, তাই বলতে পারি, বিক্রেতা হিসেবে কোন কথাই বলতে পারি নে।

সচরাচর দেখতে পাই যে, বই বিক্রী করবার জন্য, বিজ্ঞাপন দেওয়া, অর্দ্ধমূল্যে কিম্বা সিকিমূল্যে বিক্রী করা, ফাউ দেওয়া এবং উপহার দেওয়া প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা হয়ে থাকে। এ সকল উপায়ে যে বইয়ের কাটতির কতকটা সাহায্য করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে বাধাও যে দেয়, সে ধারণাটি বোধ হয় বিক্রেতাদের মনে তত স্পষ্ট নয়।

প্রথমতঃ, বিশখানি বইয়ের যদি একসঙ্গে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় এবং তার প্রতিখানিকেই যদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, তা হ'লে তার মধ্যে কোন্‌খানি যে কেনা উচিত, সে বিষয়ে অধিকাংশ পাঠক মন স্থির করে' উঠতে পারে না। অপরাপর মালের একটি সুনির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ আছে। বিজ্ঞাপনেই আমাদের জানিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে কোন্‌টি পয়লা নম্বরের, কোন্‌টি দোসরা নম্বরের, কোন্‌টি তেসরা নম্বরের ইত্যাদি; এবং সেই ইতরবিশেষ অনুসারে দামেরও তারতম্য হয়ে থাকে। সুতরাং সে সব মাল কিনতে ক্রেতাকে বাঁশবনে ডোমকানা হ'তে হয় না, প্রত্যেকে নিজের অবস্থা এবং রুচি অনুসারে নিজের আবশ্যকীয় জিনিস কিনতে পারে। কিন্তু বই সম্বন্ধে এরূপ শ্রেণীবিভাগ করে' বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্ভব নয়; কেননা, যদিচ সাহিত্যে ভালমন্দের তারতম্য অগাধ, তবুও কোনও লেখক, তাঁর লেখা যে [illegible]মশ্রেণীর নয়, এ কথা নিজ মুখে সমাজের কাছে জাহির করবেন না। সুতরাং বিজ্ঞাপনের উপর আস্থা স্থাপন করে,' হয় আমাদের বিশখানি বই একসঙ্গে কিনতে হয়, নয় কেনা থেকে নিরস্ত থাকতে হয়। ফলে দাঁড়ায় এই যে, বই বিক্রী হয় না,—কেননা, যাঁর বিশখানি বই কেনবার সঙ্গতি আছে, তাঁর বিশ্বাস যে, সাহিত্য নিয়ে কারবার করে শুধু লক্ষ্মী-ছাড়ার দল।

অর্দ্ধমূল্যে এবং সিকিমূল্যে বিক্রী করবার দোষ যে, লোকের সহজেই সন্দেহ হয় যে, বস্তাপচা সাহিত্যই শুধু ঐ উপায়ে ঝেড়ে ফেলা হয়। পয়সা খরচ করে' গোলামচোর হ'তে লোকের বড় একটা উৎসাহ হয় না।

কোন বই ফাউ হিসেবে দেবার আমি সম্পূর্ণ বিপক্ষে। আর পাঁচজনের বই লোকে পয়সা দিয়ে কিনবে এবং আমার বইখানি সেইসঙ্গে বিনে পয়সায়

পাবে, এ কথা ভাবতে গেলেও লেখকের দোয়াতের কালি জল হয়ে আসে। লেখকদের এইরূপ প্রকাশ্যে অপমান করে,' সাহিত্যের মান কিম্বা পরিমাণ দুয়ের কোনটিই বাড়ানো যায় না। যদি কোন বই বিনামূল্যে বিতরণ করতেই হয়, ত প্রথম থেকে প্রথম সংস্করণ এইরূপ বিতরণ করা উচিত, যাতে করে' পাঠকদের সঙ্গে সহজে সে বইটির পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায়। উক্ত উপায়ে Tab সিগারেট এদেশে চালানো হয়েছে। প্রথমে কিছুদিন বিলিয়ে দিয়ে তার পর দ্বিগুণ দাম চড়িয়ে সে সিগারেট আজকাল বাজারে বিক্রী করা হচ্ছে এবং এত বিক্রী বোধ হয় অন্য কোনও সিগারেটের নেই। বই জিনিসটিকে ধূমপত্রের সঙ্গে তুলনা করাটাও অসঙ্গত নয়। কারণ, অধিকাংশ বই, কাগজে-মোড়া ধোঁয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে এই যে, বিজ্ঞাপনাদির দ্বারা লোকের মনে শুধু কেনবার লোভ জন্মে দেওয়া যায়, কিন্তু কেনানো যায় না। কোন জিনিস কাউকে কেনাতে হ'লে, সেটি প্রথমতঃ তার হাতের গোড়ায় এগিয়ে দেওয়া চাই, তার পর সেটি তাকে গতিয়ে দেওয়া চাই। এ দুই বিষয়ে যে পুস্তক-বিক্রেতারা বিশেষ কোন যত্ন করেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমার বিশ্বাস যে, নতুন বাঙ্গলা বই যদি ঘরে ঘরে ফেরি করে' বিক্রী করা হয়, তা হ'লে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়বে।

সাহিত্যে production সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, demand-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে সাহিত্য supply করতে হবে। যে বই লোকে পড়তে চায় না, সে বই অপর যে-কোন উদ্দেশ্যেই লেখা হোক না কেন, বেচবার উদ্দেশ্যে লেখা চলে না এবং কি ধরণের বই লোকে পড়তে চায়, সে বিষয়ে একটা সাধারণ কথা বলা যেতে পারে। এটি একটি প্রত্যক্ষ সত্য যে, সাধারণ পাঠক-সমাজ দুই শ্রেণীর বই পছন্দ করে না ;—এক হচ্ছে ভাল, আর এক হচ্ছে মন্দ। যে বই ভালও নয়, মন্দও নয়, অমনি একরকম মাঝামাঝি গোছের,—সেই বই মানুষে পড়তে ভালবাসে এবং সেই জন্য কেনে।—প্রতি দেশে প্রতি যুগে প্রতি জাতির একটি বিশেষ সামাজিক বুদ্ধি থাকে। সে বুদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা এবং সামাজিক জীবনের কাজেতেই সে বুদ্ধির সার্থকতা। কিন্তু সচরাচর লোকে সেই বুদ্ধির মাপকাটিতেই দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, আর্ট প্রভৃতি মনোজগতের পদার্থগুলোও মেপে নেয়। সে মাপে যে পদার্থটি ছোট সাব্যস্ত হয়, সেটিও যেমন গ্রাহ্য হয় না, তেমনি যেটি বড় সাব্যস্ত হয়, সেটিও গ্রাহ্য হয় না। সামাজিক বুদ্ধির সঙ্গে যদি কোন বিশেষ ব্যক্তির বুদ্ধি খাপে খাপে না মিলে যায়, তা হ'লে হয় তা অতিবুদ্ধি, নয় নির্বুদ্ধি ; এবং এই উভয় শ্রেণীর বুদ্ধির সহিত সামাজিক মানব পারৎপক্ষে কোনরূপ সম্পর্ক রাখতে চায় না। এই কারণেই সাধারণতঃ লোকে নির্ব্বুদ্ধিতার প্রতি অবজ্ঞা এবং অতিবুদ্ধির প্রতি বিদ্বেষভাব ধারণ করে। উঁচুদরের লেখক এবং নীচুদরের লেখক সমসাময়িক পাঠক-সমাজের কাছে সমান অনাদর পায়। কারণ, বুদ্ধি, চরিত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে লোক-সমাজ উঁচুতেও উঠ্তে চায় না, নীচুতেও নামতে চায় না,—যেখানে আছে, সেই-খানেই থাক্‌তে চায়। কেননা, ওঠা এবং নামা দুটি ক্রিয়াই বিপজ্জনক। সমাজ "বিষয়-বালিসে আলিস্" রেখে, নাটক-নভেলের দর্পণে নিজের পোষাকী চেহারা দেখতে চায়, কবির মুখে নিজের স্তুতি শুন্‌তে ভালবাসে এবং যে গুরুর কাছ থেকে নিজ মতের ভাষ্য লাভ করে, তাঁকেই দার্শনিক বলে' মান্য করে। প্রমাণ-স্বরূপ দেখানো যেতে পারে, George Meredithএর অপেক্ষা Marie Corelliর নভেলের হাজারগুণ কাট্‌তি বেশী এবং যে কবি সমাজের সুমনোভাব ব্যক্ত করেন, তাঁর চাইতে,—যিনি সমাজের কুমনোভাব ব্যক্ত করেন, তাঁর আদর কিছু কম নয়। Kiplingএর বই Tennysonএর বইয়ের চাইতে কম পয়সায় বিক্রী হয় না। সুতরাং সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের পক্ষে ভাল বই লেখবার চেষ্টা করবার কোন দরকার নেই,—বই যাতে খারাপ না হয়, এই চেষ্টাটুকু করলেই কার্য্যোদ্ধার হবে এবং কি ভাল আর কি মন্দ, তা নির্ণয় করতে সমাজের প্রচলিত মতামতগুলি আয়ত্ত করতে হবে। এক কথায়, ব্যবসা চালাতে হ'লে, যে রকমের সাহিত্য সমাজ চায়, তাই আমাদের যোগাতে হবে।

"নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
ভারত যেমত চাহে, সেই খেলা খেল হে"

এরূপ অনুরোধ করে' যে কোন ফল নেই, তা স্বয়ং ভারতচন্দ্র টের পেয়েছিলেন,—আমরা ত কোন্ ছার। বাঙ্গলাদেশে কি রকমের বইয়ের সব চাইতে বেশী কাট্‌তি, সেইটি জান্‌তে পারলে, বাঙ্গালী-জাতির মানসিক খোরাক যোগানো আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। শুনতে পাই, বাজারে শুধু রূপকথা, রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যান, এবং গল্পের বই কাটে। এ কথা যদি সত্য হয় ত,

আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, বালবৃদ্ধবনিতাতেই বাঙ্গলা বইয়ের ব্যবসা টিঁকিয়ে রেখেছে। আর এ কথা যে সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই, কেননা, মানুষ সব চাইতে ভালবাসে—গল্প। আমাদের অধিকাংশ লোকের জীবনের ইতিহাস সম্পূর্ণ ঘটনাশূন্য, অর্থাৎ আমাদের বাহিক কিম্বা মানসিক জীবনে কিছু ঘটে না। দিনের পর দিন আসে, দিন যায়। আর সে সব দিনও একটি অপরটির যমজ ভ্রাতার ন্যায়। বিশেষতঃ এ দেশে যেমন রাম না জন্মাতে রামায়ণ লেখা হয়েছিল, তেমনি আমরা না জন্মাতেই আমাদের জীবনের ইতিহাস সমাজ কর্তৃক লিখিত হয়ে থাকে। আমরা শুধু চিরজীবন তার আবৃত্তি করে' যাই। সেই আবৃত্তির এখানে ওখানে ভুলভ্রান্তিটুকুতেই পরস্পরের ভিতর যা বৈচিত্র্য। কিন্তু যন্ত্রবৎ চালিত হ'লেও, মানুষ এ কথা একেবারে ভুলে যায় না যে, তারা কলের পুতুল নয়,—ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট স্বাধীন জীব। তাই নিজের জীবন ঘটনাশূন্য হ'লেও, অপর লোকের ঘটনাপূর্ণ জীবনের ইতিহাস চর্চ্চা করে' মানুষে সুখ পায়। অনুরূপ অবস্থায় পড়লে নিজের জীবনও নিতান্ত একঘেয়ে না হয়ে অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যপূর্ণ হ'তে পারত—এই মনে করে' আনন্দ অনুভব করে। মানুষের উপবাসী হৃদয়ের ক্ষুধা মেটাবার প্রধান সামগ্রী হচ্ছে গল্প,—তা সত্যই হোক আর মিথ্যাই হোক। স্ত্রী সংগ্রহ করবার জন্য আমাদের ধনুর্ভঙ্গও করতে হয় না, লক্ষ্যভেদও করতে হয় না,—সেই জন্য আমরা দ্রৌপদীস্বয়ংবর এবং রামচন্দ্রের বিবাহের কথা শুনতে ভালবাসি। আমাদের বাড়ীর ভিতর "কুন্দ"ও ফোটে না এবং বাড়ীর বাহিরে "রোহিণী"ও জোটে না,—তাই আমরা "বিষবৃক্ষ" ও "ভ্রমর" একবার পড়ি, দুবার পড়ি, তিনবার পড়ি। আমরা দশটায় আপিস যাই এবং পাঁচটায় ঠিক সেই একই পথ দিয়ে হয় গাড়িতে, নয় ট্রামে, নয় পদব্রজে বাড়ী ফিরে আসি; তাই আমরা কল্পনায় সিন্ধবাদের সঙ্গে দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসি।

তা হ'লে স্থির হ'ল এই যে, আমাদের প্রধান কার্য্য হবে গল্প বলা,—শুধু নভেল-নাটকে নয়, সকল বিষয়ে। ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস,—যত উপন্যাসের মত হবে, ততই লোকের মনঃপূত হবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এই যে, গল্প যত পুরোনো হয়, ততই সমাজের প্রিয় হয়ে ওঠে। প্রমাণ, রূপকথা এবং রামায়ণ-মহাভারতের কথা। এর কারণও স্পষ্ট। পুরোনোর প্রধান গুণ যে তা নতুন নয়, অর্থাৎ অপরিচিত নয়। নতুনের প্রধান দোষ যে তা পরীক্ষিত নয়; সুতরাং তা সত্য কি মিথ্যা, উদ্ভাবনা কি আবিষ্কার, মানুষের পক্ষে শ্রেয় কি হেয়, তা একনজর দেখে কেউ বলতে পারেন না। তা ছাড়া নতুন কথা যদি সত্যও হয়, তা হ'লেও বিনা ওজরে গ্রাহ্য করা চলে না। মানুষের মন একটি হ'লেও, মনোভাব অসংখ্য এবং সে মন যতই ছোট হোক না কেন, একাধিক মনোভাব তা'তে বাস করে। একত্রে বাস করতে হ'লে পরস্পর দিবারাত্র কলহ করা চলে না। তাই যে সকল মনোভাব বহুকাল থেকে আমাদের মন অধিকার করে' বসে' আছে, তারা ঐ সহবাসের গুণেই পরস্পর একটা সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়,—এবং সুখে না হোক, শান্তিতে ঘর করে। কিন্তু নতুন সত্যের ধর্ম্মই হচ্ছে, মানুষের মনের শান্তিভঙ্গ করা। নতুন সত্য প্রবেশ করে'ই আমাদের মনের পাতা-ঘরকন্না কতকটা এলো-মেলো করে' দেয়। সুতরাং ও-পদার্থ মনের ভিতর ঢুকলেই আমাদের মনের ঘর নতুন করে' গোছাতে হয়, যে সব মনোভাব তার সঙ্গে একত্র থাকতে পারে না, তাদের বহিষ্কৃত করে' দিতে হয় এবং বাদবাকীগুলিকে একটু বদলে সদলে নিয়ে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিতে হয়। তা ছাড়া, নতুন সত্য মনে উদয় হয়ে অনেক নতুন কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদ্রেক করে। আমরা চিরপরিচিত কর্ত্তব্যগুলির দাবীই রক্ষে করতে হিমসিম্ খেয়ে যাই, তার পর আবার যদি নিত্যনতুন কর্ত্তব্য এসে নতুন নতুন দাবী করতে আরম্ভ করে, তা হ'লে জীবন যে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তার আর সন্দেহ কি? মানুষে সুখ পায় না, তাই সোয়াস্তি চায়। যে লেখক পাঠকের মনের সেই সোয়াস্তিটুকু নষ্ট করতে ব্রতী হবেন, তাঁর প্রতি অধিকাংশ লোক বিমুখ ও বিরক্ত হবেন। সুতরাং "সাবধানের মার নেই," এই সূত্রের বলে যে লেখক, যে কথা সকলে জানে, সেই কথা গদ্যেপদ্যে অনর্গল বলে যাবেন, বাজারে তাঁর কথার মূল্য হবে। উপরে যা বলা গেল, তার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই যে, ব্যবসার হিসেবে সাহিত্যে গল্প বলা এবং পুরোনো গল্প বলাই শ্রেয়।

সাহিত্যের অবশ্য demand না বাড়লে supply বাড়বে না। সুতরাং সাহিত্যের ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি অনেকপরিমাণে পাঠকের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে, লেখকের কৃতিত্বের উপর নয়। এ দেশের শিক্ষিত লোকদের বই পড়া জিনিসটে বড় একটা অভ্যেস

নেই। সাহিত্য চর্চ্চা করাটা,—নিত্য-নৈমিত্তিক কিম্বা কাম্য কোনরূপ কর্ম্মের মধ্যেই গণ্য নয়। এর বহুতর কারণ আছে,—যথা অবসরের অভাব, অর্থের অভাব এবং ফায়দার অভাব; কারণ, সাহিত্য-চর্চ্চা কর্‌বার লাভটি কেউ টাকায় কষে বার করে' দিতে পারেন না। যে বিদ্যে বাজারে ভাঙ্গানো যায় না, তার যে মূল্য থাকৃতে পারে,—এ বিশ্বাস সকলের নেই। কিন্তু স্কুলকলেজের বাইরে যে আমরা কোন বই পড়ি না, তার প্রধান কারণ,—স্কুলপাঠ্যপুস্তক পাঠ্য-পুস্তকের প্রধান শত্রু। বছর বছর ধরে' স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থাবলী গলাধঃকরণ করে' যার মানসিক মন্দাগ্নি না জন্মায়, এমন লোক নিতান্ত বিরল। সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সাহিত্যচর্চ্চা কর্‌বার উপদেশ দিয়ে কোনও লাভ নেই। কিন্তু বই কেনাটা যে একটি সখমাত্র হ'তে পারে এবং হওয়া উচিত,—এই ধারণাটি আমি স্বদেশী সমাজের মনে জন্মিয়ে দিতে চাই।

বই গৃহসজ্জার একটি প্রধান উপকরণ এবং সেই কারণে শুধু ঘর সাজাবার জন্যে আমাদের বই কেনা উচিত। আমরা যে হিসেবে ছবি কিনি এবং ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখি, সেই একই হিসেবে বই কেনা এবং ঘরে সাজিয়ে রাখা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা ছবি পড়িনে বলে' ছবি কেনাটা যে অন্যায়, এ কথা কেউ বলেন না,—সুতরাং বই পড়িনে বলে' যে কিনব না, এরূপ মনোভাব অসঙ্গত। এ স্থলে বলে' রাখা আবশ্যক যে, বইয়ের মত ছবিও একটা পড়বার জিনিস। ছবিরও একটা অর্থ আছে, একটা বক্তব্য কথা আছে। বইয়ের সঙ্গে ছবির একমাত্র তফাৎ হচ্ছে যে, উভয়ের ভাষা স্বতন্ত্র। যা একজন কালি ও কলমের সাহায্যে ব্যক্ত করেন, তাই অপর একজন রং ও তুলির সাহায্যে প্রকাশ করেন। তা ছাড়া, বাঙ্গলা বইয়ের সপক্ষে বিশেষ করে' এই বলবার আছে যে, বাঙ্গালী ক্রেতা ইচ্ছে করুলে তা পড়তে পারেন,—কিন্তু ছবি জিনিসটা ইচ্ছে করুলেও পড়তে পারেন না।

সচরাচর লোকে ঘর সাজায়, গৃহের শোভা বৃদ্ধি কর্‌বার জন্য নয়,—কিন্তু নিজের ধন এবং সুরুচির পরিচয় দেবার জন্য। শেষোক্ত হিসেব থেকে দেখ্‌লেও দেখা যায় যে, বৈঠকখানার দেয়ালে হাজার টাকার একখানি নোট না ঝুলিয়ে, হাজার টাকা দামের একখানি ছবি ঝোলানতে যেমন অধিক সুরুচির পরিচয় দেয়, তেমনি নানা আকারের নানা বর্ণের রাশি রাশি বই সারি সারি সাজিয়ে রাখাতে প্রমাণ হয় যে, গৃহকর্ত্তা একাধারে ধনী এবং গুণী।

পূর্ব্বোক্ত কারণে আমি এ দেশের ধনী লোকদের বই কিন্‌তে অনুরোধ করি,—গিলৃতে নয়। তাঁরা যদি এ বিষয়ে একবার পথ দেখান, তা হ'লে তাঁদের দৃষ্টান্ত সদ্দৃষ্টান্ত হিসেবে বহুলোকে অনুসরণ করবে। যত দিন না বাঙ্গালী সমাজ নিজেদের পাঠক হিসেবে না দেখে,' পুস্তকক্রেতা হিসেবে দেখতে শিখবেন, তত দিন বঙ্গ-সাহিত্যের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে না।

আমার শেষ কথা এই যে, গ্রন্থক্রেতা যে শুধু নিঃস্বার্থ পরোপকার করেন, তা নয়। চারিদিকে বইয়ের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকাতে একটা উপকার আছে। বই চব্বিশ ঘণ্টা চোখের সম্মুখে থেকে এই সত্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ পৃথিবীতে চামড়ায় ঢাকা মন নামক একটি পদার্থ আছে।

বৈশাখ, ১৩২০।

বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগ

নানারূপ গদ্যপদ্য লেখবার এবং ছাপবার যতটা প্রবল ঝোঁক যত বেশী লোকের মধ্যে আজকাল এ দেশে দেখা যায়, তা পূর্ব্বে কখনো দেখা যায় নি। এমন মাস যায় না, যাতে অন্ততঃ একখানি মাসিক পত্রের না আবির্ভাব হয় এবং সে সকল মাসিক পত্রে সাহিত্যের সকলরকম মালমসলার কিছু না কিছু নমুনা থাকেই থাকে। সুতরাং এ কথা অস্বীকার কর্‌বার যো নেই যে, বঙ্গ-সাহিত্যের একটি নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছে। এই নবযুগের শিশু-সাহিত্য আঁতুড়েই মরুবে, কিম্বা তার একশ' বৎসর পরমায়ু হবে,—সে কথা বলতে আমি অপারগ। আমার এমন কোনও বিদ্যে নেই, যার জোরে আমি পরের কুষ্ঠি কাটতে পারি। আমরা সমুদ্রপার হ'তে যে সকল বিদ্যার আমদানি করেছি, সামুদ্রিক বিদ্যা তার ভিতর পড়ে না। কিন্তু এই নবসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণগুলির বিষয় যদি আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মায়, তা হ'লে যুগধর্ম্মানুযায়ী সাহিত্য-রচনা আমাদের পক্ষে অনেকটা সহজ হয়ে আসবে। পূর্ব্বোক্ত কারণে নব্য লেখকরা তাঁদের লেখায় যে হাত দেখাচ্ছেন, সেই হাত দেখবার চেষ্টা করাটা একেবারে নিষ্ফল নাও হ'তে পারে।

প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এই নব-সাহিত্য রাজ-ধর্ম্ম ত্যাগ করে' গণধর্ম্ম অবলম্বন করছে। অতীতে অন্য দেশের ন্যায় এ দেশের সাহিত্য-জগৎ যখন দুচার জন লোকের দখলে ছিল, যখন লেখা

দূরে থাক্, পড়বার অধিকারও সকলের ছিল না—তখন সাহিত্যরাজ্যে রাজা সামন্ত প্রভৃতি বিরাজ করুতেন; এবং তাঁরা কাব্য, দর্শন ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে, মন্দির, অট্টালিকা, স্তূপ, স্তম্ভ, গুহা প্রভৃতি আকারে বহু চিরস্থায়ী কীর্ত্তি রেখে গেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আমাদের দ্বারা কোনরূপ প্রকাণ্ড কাণ্ড করে' তোলা অসম্ভব, এই জ্ঞানটুকু জন্মালে, আমাদের কারও আর সাহিত্যে রাজা হবার লোভ থাকৃবে না এবং শব্দের কীর্ত্তিস্তম্ভ গড়বার বৃথা চেষ্টায় আমরা দিন ও শরীর পাত করব না। এর জন্য আমাদের কোনরূপ দুঃখ করবার আবশ্যক নেই। বস্তুজগতের ন্যায়, সাহিত্য-জগতেরও প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি দূর থেকে দেখতে ভাল—কিন্তু নিত্যব্যবহার্য্য নয়।

দর্শনের কুতবমিনারে চড়লে আমাদের মাথা ঘোরে, কাব্যের তাজমহলে রাত্রিবাস করে' চলে না,—কেননা, অত সৌন্দর্য্যের বুকে ঘুমিয়ে পড়া কঠিন। ধর্ম্মের পর্ব্বতগুহার অভ্যন্তরে খাড়া হয়ে দাঁড়ান যায় না, আর হামাগুড়ি দিয়ে অন্ধকারে হাতড়ে বেড়ালেই যে কোন অমূল্য চিন্তামণি আমাদের হাতে ঠেকতে বাধ্য,—এ বিশ্বাসও আমাদের চলে' গেছে। পুরাকালে মানুষে যা-কিছু গড়ে' গেছে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে সমাজ হ'তে আলগা করা, দুচারজনকে বহুলোক হ'তে বিচ্ছিন্ন করা। অপরপক্ষে নবযুগের ধর্ম্ম হচ্ছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন করা, সমগ্র সমাজকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করা,—কাউকেও ছাড়া নয়, কাউকেও ছাড়তে দেওয়া নয়। এ পৃথিবীতে বৃহৎ না হ'লে যে কোনও জিনিস মহৎ হয় না, এরূপ ধারণা আমাদের নেই; সুতরাং প্রাচীন সাহিত্যের কীর্ত্তির তুলনায় নবীন সাহিত্যের কীর্ত্তিগুলি আকারে ছোট হয়ে আসবে, কিন্তু প্রকারে বেড়ে যাবে; আকাশ আক্রমণ না করে', মাটির উপর অধিকার বিস্তার করবে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কাব্যদর্শনাদি আর গাছের মত উঁচুর দিকে ঠেলে উঠ্‌বে না, ঘাসের মত চারিদিকে চারিয়ে যাবে। এক কথায় বহুশক্তিশালী স্বল্পসংখ্যক লেখকের দিন চলে' গিয়ে, স্বল্পশক্তিশালী বহুসংখ্যক লেখকের দিন আসছে। আমাদের মনোজগতে যে নবসূর্য্য উদয়োন্মুখ, তার সহস্র রশ্মি অবলম্বন করে' অন্ততঃ ষষ্টি সহস্র বালখিল্য লেখক এই ভূভারতে অবতীর্ণ হবেন। এরূপ হবার কারণও সুস্পষ্ট। আজকাল আমাদের ভাববার সময় নেই, ভাববার অবসর থাকলেও লেখবার যথেষ্ট সময় নেই, লেখবার অবসর থাকলেও লিখতে শেখবার অবসর নেই; অথচ আমাদের লিখতেই হবে,—নচেৎ মাসিক পত্র চলে না। এ যুগের লেখকেরা যেহেতু গ্রন্থকার নন, শুধু মাসিক পত্রের পৃষ্ঠপোষক, তখন তাঁদের ঘোড়ায় চড়ে' লিখতে না হলে'ও ঘড়ির উপর লিখতে হয়; কেননা, মাসিক পত্রের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে, পয়লা বেরনো,—কি যে বেরলো, তাতে বেশী কিছু আসে যায় না। তা ছাড়া, আমাদের সকলকেই সকল বিষয়ে লিখতে হয়। নীতির জুতো-শেলাই থেকে ধর্ম্মের চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত,—সকল ব্যাপারই আমাদের সমান অধিকারভুক্ত। আমাদের নব-সাহিত্যে কোনরূপ "শ্রমবিভাগ" নেই—তার কারণ, যে-ক্ষেত্রে "শ্রম" নামক মূল পদার্থেরই অভাব, সে স্থলে তার বিভাগ আর কি করে' হ'তে পারে?

তাই আমাদের হাতে জন্মলাভ করে শুধু ছোট গল্প, খণ্ডকাব্য, সরল বিজ্ঞান ও তরল দর্শন।

দেশকালপাত্রের সমবায়ে সাহিত্য যে ক্ষুদ্রধর্ম্মাবলম্বী হয়ে উঠেছে, তার জন্য আমার কোনও খেদ নেই। এ কালের রচনা ক্ষুদ্র বলে' আমি দুঃখ করিনে, আমার দুঃখ যে, তা যথেষ্ট ক্ষুদ্র নয়। একে স্বল্পায়তন, তার উপর লেখাটি যদি ফাঁপা হয়,—তা হ'লে সে জিনিসের আদর করা শক্ত। বালা গালাভরা হ'লেও চলে,—কিন্তু আংটি নিরেট হওয়া চাই। লেখকরা এই সত্যটি মনে রাখলে গল্প স্বল্প হয়ে আসবে, শোক শ্লোকরূপ ধারণ করবে, বিজ্ঞান বামনরূপ ধারণ করে'ও ত্রিলোক অধিকার করে' থাকবে, এবং দর্শন নখদর্পণে পরিণত হবে। যাঁরা মানসিক আরামের চর্চ্চা না করেছেন, তাঁরা সকলেই জানেন যে, যে সাহিত্যে দম নেই, তাতে অন্ততঃ কস (Grip) থাকা আবশ্যক।

২

বর্ত্তমান ইউরোপের সম্যক্ পরিচয়ে এই জ্ঞান লাভ করা যায় যে, গণধর্ম্মের প্রধান ঝোঁক হচ্ছে বৈশ্যধর্ম্মের দিকে; এবং সেই ঝোঁকটি না সামলাতে পারলে সাহিত্যের পরিণাম অতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আমাদের এই আত্ম-সর্ব্বস্ব দেশে লেখকেরা যে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করবেন না, এ কথাও জোর করে' বলা চলে না। লক্ষ্মীলাভের আশায় সরস্বতীর কপট সেবা করতে অনেকে প্রস্তুত, তার প্রমাণ "ভ্যালুপেয়বল্ পোষ্ট" নিত্য ঘরে ঘরে দিচ্ছে। আমাদের নব-সাহিত্যের যেন তেন প্রকারেণ বিকিয়ে যাবার প্রবৃত্তিটি যদি

দমন করতে না পারা যায়, তা হ'লে বঙ্গসরস্বতীকে যে পথে দাঁড়াতে হবে, সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কোন শাস্ত্রেই এ কথা বলে না যে, "বাণিজ্যে বসতি সরস্বতী"। সাহিত্যসমাজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করবার ইচ্ছে থাকলে—দারিদ্র্যকে ভয় পেলে সে আশা সফল হবে না। সাহিত্যের বাজার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যত বাড়বে, সেই সঙ্গে তার মূল্য সম্বন্ধে জ্ঞান আমাদের লোপ পেয়ে আসবে। সুতরাং আমাদের নব-সাহিত্যে লোভ নামক রিপুর অস্তিত্বের লক্ষণ আছে কি না, সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক,—কেননা, শাস্ত্রে বলে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

৩

এ যুগের মাসিক পত্র সকল যে সচিত্র হয়ে উঠেছে, সেটি যেমন আনন্দের কথা, তেমনি আশঙ্কারও কথা। ছবির প্রতি গণসমাজের যে একটি নাড়ীর টান আছে, তার প্রচলিত প্রমাণ হচ্ছে মার্কিণ সিগারেট। ঐ চিত্রের সাহচর্য্যেই যত অচল সিগারেট বাজারে চলে' যাচ্ছে এবং আমরা চিত্রমুগ্ধ হয়ে মহানন্দে তামকূট জ্ঞানে খড়ের ধূম পান করছি। ছবি ফাউ দিয়ে মেকি মাল বাজারে কাটিয়ে দেওয়াটা আধুনিক ব্যবসার একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ দেশে শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলীতেই চিত্রের প্রথম আবির্ভাব। পুস্তিকায় এবং পত্রিকায় ছেলে-ভুলানো ছবির বহুল প্রচারে চিত্রকলার যে কোন উন্নতি হবে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে,—কেননা, সমাজে গোলাম পাশ করে' দেওয়াতেই বণিকবুদ্ধির সার্থকতা; কিন্তু সাহিত্যের যে অবনতি হবে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। নর্ত্তকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সারঙ্গীর মত, চিত্রকলার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাব্যকলার অনুধাবন করাতে তার পদমর্য্যাদা বাড়ে না, এক জন যা করে, অপরে তার দোষগুণ বিচার করে,—এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। সুতরাং ছবির পাশাপাশি তার সমালোচনাও সাহিত্যে দেখা দিতে বাধ্য। এই কারণেই, যে দিন থেকে বাঙ্গলাদেশে চিত্রকলা আবার নব কলেবর ধারণ করেছে, তার পরদিন থেকেই তার অনুকূল এবং প্রতিকূল সমালোচনা সুরু হয়েছে এবং এই মতদ্বৈধ থেকে, সাহিত্যসমাজে একটি দলাদলির সৃষ্টি হবার উপক্রম হয়েছে। এই তর্কযুদ্ধে আমার কোন পক্ষ অবলম্বন করবার সাহস নেই। আমার বিশ্বাস, এ দেশে একালের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে চিত্রবিদ্যায় বৈদগ্ধ্য এবং আলেখ্যব্যাখ্যানে নিপুণতা অতিশয় বিরল, কারণ, এ যুগের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ। তবে বঙ্গদেশের নব্যচিত্র সম্বন্ধে সচরাচর যে-সকল আপত্তি উত্থাপন করা হয়ে থাকে, সেগুলি সঙ্গত কি অসঙ্গত, তা বিচার করবার অধিকার সকলেরই আছে; কেননা, সে সকল আপত্তি কলাজ্ঞান নয়, সাধারণ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদূর আমি জানি, নব্যচিত্রকরদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তাঁদের রচনায় বর্ণে বর্ণে বানানভুল এবং রেখায় রেখায় ব্যাকরণ-ভুল দৃষ্ট হয়। এ কথা সত্য কি মিথ্যা, শুধু তাঁরাই বলতে পারেন, যাঁদের চিত্রকর্ম্মের ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার জন্মেছে; কিন্তু সে ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তি বাঙ্গলাদেশের রাস্তা-ঘাটে দেখতে পাওয়া যায় না, যদিচ ওসকল স্থানে সমালোচকের দর্শন পাওয়া দুর্লভ নয়। আসল কথা হচ্ছে, এ শ্রেণীর চিত্রসমালোচকেরা অনুকরণ অর্থে ব্যাকরণ শব্দ ব্যবহার করেন। এঁদের মতে ইউরোপীয় চিত্রকরেরা প্রকৃতির অনুকরণ করেন, সুতরাং সেই অনুকরণের অনুকরণ করাটাই এ দেশের চিত্রশিল্পীদের কর্ত্তব্য। প্রকৃতি নামক বিরাট পদার্থ এবং তার অংশভূত ইউরোপ নামক ভূভাগ, এ উভয়ের প্রতি আমার যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাই বলে' তার অনুকরণ করাটাই যে পরমপুরুষার্থ, এ কথা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি নে। প্রকৃতির বিকৃতি ঘটানো কিম্বা তার প্রতিকৃতি গড়া কলাবিদ্যার কার্য্য নয়—কিন্তু তাকে আকৃতি দেওয়াটাই হচ্ছে আর্টের ধর্ম্ম। পুরুষের মন প্রকৃতি-নর্ত্তকীর মুখ দেখবার আয়না নয়। আর্টের ক্রিয়া অনুকরণ নয়,—সৃষ্টি। সুতরাং বাহ্যবস্তুর মাপজোকের সঙ্গে, আমাদের মানসজাত বস্তুর মাপজোক যে হুবাহুব মিলে যেতেই হবে, এমন কোন নিয়মে আর্টকে আবদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে প্রতিভার চরণে শিকলী পরানো। আর্টে অবশ্য যথেচ্ছাচারিতার কোনও অবসর নেই। শিল্পীরা কলাবিদ্যার অনন্ত-সামান্য কঠিন বিধি-নিষেধ মানতে বাধ্য,—কিন্তু জ্যামিতি কিম্বা গণিত শাস্ত্রের শাসন নয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে আমার পূর্ব্বোক্ত মতের যাথার্থ্যের প্রমাণ অতি সহজেই দেওয়া যেতে পারে। একে একে যে দুই হয় এবং একের পিঠে এক দিলে যে এগারো হয়,—বৈজ্ঞানিক হিসেবে এর চাইতে খাঁটি সত্য পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। অথচ একে একে দুই না হয়েও, এবং একের পিঠে

একে এগারো না হয়েও, ঐরূপ যোগাযোগে যে বিচিত্র নক্সা হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নীচে দেওয়া যাচ্ছে।
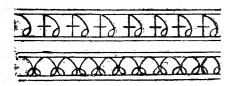
সম্ভবতঃ আমার প্রদর্শিত যুক্তির বিরুদ্ধে কেউ এ কথা বল্‌তে পারেন যে, "চিত্রে আমরা গণিতশাস্ত্রের সত্য চাইনে, কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সত্য দেখতে চাই।" প্রত্যক্ষ সত্য নিয়ে মানুষে মানুষে মতভেদ এবং কলহ যে আবহমান কাল চলে' আস্‌ছে, তার কারণ অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায়ে নির্ণীত হয়েছে। প্রকৃতির যে অংশ এবং যে ভাবটির সঙ্গে যার চোখের এবং মনের যতটুকু সম্পর্ক আছে, তিনি সেইটুকুকেই সমগ্র সত্য বলে' ভুল করেন। সত্যভ্রষ্ট হ'লে বিজ্ঞানও হয় না, আর্টও হয় না,—কিন্তু বিজ্ঞানের সত্য এক, আর্টের সত্য অপর। কোন সুন্দরীর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং ওজনও যেমন এক হিসাবে সত্য, তার সৌন্দর্য্যও তেমনি আর এক হিসাবে সত্য। কিন্তু সৌন্দর্য্য নামক সত্যটি তেমন ধরাছোঁওয়ার মত পদার্থ নয় বলে', সে সম্বন্ধে কোনরূপ অকাট্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। এই সত্যটি আমরা মনে রাখলে, নব্যশিল্পীর কৃশাঙ্গী মানসীকন্যাদের ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নেবার জন্য অত ব্যগ্র হতুম না; এবং চিত্রের ঘোড়া ঠিক ঘোড়ার মত নয়, এ আপত্তিও উত্থাপন করতুম না। এ কথা বলার অর্থ,—তার অস্থিসংস্থান, পেশীর বন্ধন প্রভৃতি প্রকৃত ঘোড়ার অনুরূপ নয়। Anatomy অর্থাৎ অস্থি-বিদ্যার সাহায্যে দেখান যেতে পারে যে, চিত্রের ঘোটক, গঠনে ঠিক আমাদের শকটবাহী ঘোটকের সহোদর নয়, এবং উভয়কে একত্রে জুড়িতে যোতা যায় না! এ সম্বন্ধে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, অস্থিবিদ্যা কঙ্কালের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নয়। কঙ্কালের সঙ্গে সাধারণ লোকের চাক্ষুষ পরিচয় নেই; কারণ, দেহ-তাত্ত্বিকের জ্ঞাননেত্রে যাই হোক্, আমাদের চোখে প্রাণিজগৎ কঙ্কালসার নয়। সুতরাং দৃষ্টজগৎকে অদৃষ্টের কষ্টি-পাথরে কষে নেওয়াতে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে—কিন্তু রূপজ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না।—দ্বিতীয় কথা এই যে, কি মানুষ, কি পশু, জীবমাত্রেরই দেহযন্ত্রগঠনের একমাত্র কারণ হচ্ছে উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করা। গঠন যে ক্রিয়াসাপেক্ষ, এই হচ্ছে দেহ-বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব। ঘোড়ার দেহের বিশেষ গঠনের কারণ হচ্ছে ঘোড়া তুরঙ্গম। যে ঘোড়া দৌড়িবে না, তার anatomy ঠিক জীবন্ত ঘোড়ার মত হবার কোন বৈধ কারণ নেই। পটস্থ ঘোড়া যে তটস্থ, এ বিষয়ে বোধ হয় কোন মতভেদ নেই। চিত্রার্পিত অশ্বের anatomy ঠিক চড়্‌বার কিম্বা হাঁকাবার ঘোড়ার অনুরূপ করাতেই বস্তুজ্ঞানের অভাবের পরিচয় দেওয়া হয়। চলৎ-শক্তিরহিত অশ্ব,—অর্থাৎ যাকে চাবুক মার্‌লে ছিঁড়বে, কিন্তু নড়্‌বে না, এ হেন ঘোটক,—অর্থহীন অনুকরণের প্রসাদেই জীবন্ত ঘোটকের অবিকল আকার ধারণ করে' চিত্রকর্ম্মে জন্মলাভ করে। এই পঞ্চভূতাত্মক পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরে একটি মানস-প্রসূত দৃশ্যজগৎ সৃষ্টি করাই চিত্রকলার উদ্দেশ্য, সুতরাং এ উভয়ের রচনার নিয়মের বৈচিত্র্য থাকা অবশ্যম্ভাবী। তথাকথিত নব্যচিত্র যে নির্দ্দোষ কিম্বা নির্ভুল, এমন কথা আমি বলি না। যে বিদ্যা কাল জন্মগ্রহণ করেছে, আজ যে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল সম্পূর্ণ আত্মবশে আস্‌বে, এরূপ আশা করাও বৃথা।

শিল্প হিসাবে তার নানা ত্রুটি থাকা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কোথায় কলার নিয়মের ব্যভিচার ঘটছে, সমালোচকদের তাই দেখিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য। অস্থি নয়, বর্ণের সংস্থানে,—পেশী নয়, রেখার বন্ধনে,—যেখানে অসঙ্গতি এবং শিথিলতা দেখা যায়, সেই স্থলেই সমালোচনার সার্থকতা আছে। অব্যবসায়ীর অযথা নিন্দায় চিত্রশিল্পীদের মনে শুধু বিদ্রোহিভাবের উদ্রেক করে, এবং ফলে তাঁরা নিজেদের দোষগুলিকেই গুণ ভ্রমে বুকে আঁকড়ে ধরে' রাখতে চান।

আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সাহিত্য, চিত্র নয়। যেহেতু এ যুগের সাহিত্য চিত্রধনাথ হয়ে উঠেছে, সেই কারণেই চিত্রকলার বিষয় উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। আমার ও-প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্‌বার অপর একটি কারণ হচ্ছে, এইটি দেখিয়ে দেওয়া যে, যা চিত্রকলায় দোষ বলে' গণ্য, তাই আবার আজকাল এ দেশে কাব্যকলায় গুণ বলে' মান্য।

প্রকৃতির সহিত লেখকদের যদি কোনরূপ পরিচয় থাকৃত, তা হ'লে শুধু বর্ণের সঙ্গে বর্ণের যোজনা কর্‌লেই যে বর্ণনা হয়, এ বিশ্বাস তাঁদের মনে জন্মাত

না,—এবং যে বস্তু কখনও তাঁদের চর্ম্মচক্ষুর পথে উদয় হয়নি, তা অপরের মনশ্চক্ষুর সুমুখে খাড়া করে' দেবার চেষ্টারূপ পণ্ডশ্রম তাঁরা করতেন না। সম্ভবতঃ এ যুগের লেখকদের বিশ্বাস যে, ছবির বিষয় হচ্ছে দৃশ্যবস্তু, আর লেখার বিষয় হচ্ছে অদৃশ্য মন—সুতরাং বাস্তবিকতা চিত্রকলায় অর্জ্জনীয় এবং কাব্যকলায় বর্জ্জনীয়। সাহিত্যে সেহাইকলমের কাজ করতে গিয়ে যাঁরা শুধু কলমের কালি ঝাড়েন—তাঁরাই কেবল নিজের মনকে প্রবোধ দেবার জন্য পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাটিকে সত্য বলে' গ্রাহ্য করেন। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল। বাহ্যজ্ঞানশূন্যতা অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক নয়। দূরদৃষ্টি লাভ করার অর্থ চোখে চালশে ধরা নয়। দেহের নবদ্বার বন্ধ করে' দিলে, মনের ঘর অলৌকিক আলোকে কিম্বা পারলৌকিক অন্ধকারে পূর্ণ হয়ে উঠবে—বলা কঠিন। কিন্তু সর্ব্বলোকবিদিত সহজ সত্য এই যে, যাঁর ইন্দ্রিয় সচেতন এবং সজাগ নয়—কাব্যে কৃতিত্ব লাভ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার অপপ্রয়োগে যাঁদের চক্ষু উন্মীলিত না হয়ে কাণা হয়েছে, তাঁরাই কেবল সত্য মানতে নারাজ হবেন। প্রকৃতিদত্ত উপাদান নিয়েই মন বাক্যচিত্র রচনা করে। সেই উপাদান সংগ্রহ করবার, বাছাই করবার এবং ভাষায় সাকার করে' তোলবার ক্ষমতার নামই কবিত্বশক্তি। বস্তুজ্ঞানের অটল ভিত্তির উপরেই কবিকল্পনা প্রতিষ্ঠিত। মহাকবি ভাস বলেছেন যে, "সুনিবিষ্ট লোকের রূপ-বিপর্য্যয়" করা অন্ধকারের ধর্ম্ম। সাহিত্যে ওরূপ করাতে প্রতিভার পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ, প্রতিভার ধর্ম্ম হচ্ছে প্রকাশ করা, অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা,—প্রত্যক্ষকে অপ্রত্যক্ষ করা নয়। অলঙ্কার-শাস্ত্রে বলে অপ্রকৃত, অতিপ্রকৃত এবং লৌকিক জ্ঞানবিরুদ্ধ বর্ণনা, কাব্যে দোষ হিসেবে গণ্য। অবশ্য পৃথিবীতে যা সত্যই ঘটে' থাকে, তার যথাযথ বর্ণনাও সব সময়ে কাব্য নয়। আলঙ্কারিকেরা উদাহরণস্বরূপ দেখান যে, "গৌঃ তৃণম্ অত্তি" কথাটা সত্য হ'লেও, ও কথা বলায় কবিত্ব-শক্তির বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় না। তাই বলে' "গরুরা ফুলে ফুলে মধুপান করছে" এরূপ কথা বলাতে, কি বস্তুজ্ঞান কি রসজ্ঞান, কোনরূপ জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া হয় না। এ স্থলে বলে' রাখা আবশ্যক যে, নিজেদের সকলপ্রকার ত্রুটির জন্য আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের দায়ী করা, বর্ত্তমান ভারতবাসীদের একটা রোগের মধ্যে হয়ে পড়েছে। আমাদের বিশ্বাস, এ বিশ্ব নশ্বর এবং মায়াময় বলে' আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাহ্য-জগতের কোনরূপ খোঁজখবর রাখতেন না। কিন্তু এ কথা জোর করে' বলা যেতে পারে যে, তাঁরা কস্মিন্‌কালেও অবিদ্যাকে পরাবিদ্যা বলে' ভুল করেন নি, কিম্বা একলম্ফে যে মনের পূর্ব্বোক্ত প্রথম অবস্থা হ'তে দ্বিতীয় অবস্থায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়—এরূপ মতও প্রকাশ করেন নি। বরং শাস্ত্র এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, অপরাবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত না হ'লে, কারও পক্ষে পরাবিদ্যা লাভের অধিকার জন্মায় না, কেননা, বিরাটের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই স্বরাটের জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়। আসল কথা হচ্ছে, মানসিক আলস্যবশতঃই আমরা সাহিত্যে সত্যের ছাপ দিতে অসমর্থ। আমরা যে কথায় ছবি আঁকতে পারিনে, তার একমাত্র কারণ—আমাদের চোখ ফোটবার আগে মুখ ফোটে।

একদিকে আমরা বাহ্য বস্তুর প্রতি যেমন বিরক্ত, অপর দিকে অহংয়ের প্রতি ঠিক তেমনি অনুরক্ত; আমাদের বিশ্বাস যে, আমাদের মনে যে সকল চিন্তা ও ভাবের উদয় হয়, তা এতই অপূর্ব্ব এবং মহার্ঘ্য যে, স্বজাতিকে তার ভাগ না দিলে ভারতবর্ষের আর দৈন্য ঘুচবে না। তাই আমরা অহর্নিশি কাব্যে ভাবপ্রকাশ করতে প্রস্তুত। ঐ ভাবপ্রকাশের অদম্য প্রবৃত্তিটিই আমাদের সাহিত্যে সকল অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনোভাবের মূল্য আমার কাছে যতই বেশী হোক্ না, অপরের কাছে তার যা কিছু মূল্য, সে তার প্রকাশের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অনেকখানি ভাব মরে' একটুখানি ভাষায় পরিণত না হ'লে, রসগ্রাহী লোকের নিকট তা মুখরোচক হয় না। এই ধারণাটি যদি আমাদের মনে স্থান পেত, তা হ'লে আমরা সিকি পয়সার ভাবে আত্মহারা হয়ে কলার অমূল্য আত্মসংযম হ'তে ভ্রষ্ট হতুম না। মানুষমাত্রেরই মনে দিবারাত্র নানারূপ ভাবের উদয় এবং বিলয় হয়—এই অস্থির ভাবকে ভাষায় স্থির করবার নামই হচ্ছে রচনাশক্তি। কাব্যের উদ্দেশ্য ভাবপ্রকাশ করা নয়, ভাব উদ্রেক করা। কবি যদি নিজেকে বীণা হিসেবে না দেখে, বাদক হিসেবে দেখেন,—তা হ'লে পরের মনের উপর আধিপত্য লাভ করবার সম্ভাবনা তাঁর অনেক বেড়ে যায় এবং যে মুহূর্ত্ত থেকে কবিরা নিজেদের পরের মনোবীণার বাদক হিসেবে দেখতে শিখবেন, সেই মুহূর্ত্ত থেকে তাঁরা বস্তুজ্ঞানের এবং কলার নিয়মের একান্ত শাসনাধীন হবার সার্থকতা বুঝতে পারবেন। তখন আর নিজের ভাববস্তুকে এমন দিব্যরত্ন মনে করবেন না যে,

সেটিকে আকার দেবার পরিশ্রম থেকে বিমুখ হবেন। অবলীলাক্রমে রচনা করা আর অবহেলাক্রমে রচনা করা যে এক জিনিস নয়, এ কথা নবধর্ম্মাবলম্বীরা সহজে মান্‌তে চান না,—এই কারণেই এত কথা বলা। আমার শেষ বক্তব্য এই যে, ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেও যে মহত্ব আছে, আমাদের নিত্যপরিচিত লৌকিক পদার্থের ভিতরেও যে অলৌকিকতা প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, তার উদ্ধারসাধন করুতে হ'লে, অব্যক্তকে ব্যক্ত করুতে হ'লে, সাধনার আবশ্যক ; এবং সে সাধনার প্রক্রিয়া হচ্ছে, দেহমনকে বাহ্য জগৎ এবং অন্তর্জগতের নিয়মাধীন করা। যাঁর চোখ নেই, তিনিই কেবল সৌন্দর্য্যের দর্শন লাভের জন্য শিবনেত্র হন ; এবং যাঁর মন নেই, তিনিই মনস্বিতা লাভের জন্য অন্যমনস্কতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। নব্য লেখকদের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন দেশী বিলাতী কোনরূপ বুলির বশবর্ত্তী না হয়ে, নিজের অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় লাভ করুবার জন্য ব্রতী হন। তাতে পরের না হোক্, অন্ততঃ নিজের উপকার করা হবে।

আশ্বিন, ১৩২০।

সবুজ পত্র

বাঙ্গলা দেশ যে সবুজ, এ কথা বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য লোকেও অস্বীকার করুবেন না। মা'র শস্যশ্যামলরূপ বাঙ্গলার এত গদ্যেপদ্যে এতটা পল্লবিত হয়ে উঠেছে যে, সে বর্ণনার যাথার্থ্য বিশ্বাস করুবার জন্য চোখে দেখবারও আবশ্যক নেই। পুনরুক্তির গুণে এটি সেই শ্রেণীর সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার সম্বন্ধে চক্ষুকর্ণের যে বিবাদ হ'তে পারে, এরূপ সন্দেহ আমাদের মনে মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান পায় না। এ ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশতঃ নাম ও রূপের বাস্তবিকই কোন বিরোধ নেই। একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, তরাই হ'তে সুন্দরবন পর্য্যন্ত, এক ঢালা সবুজবর্ণ দেশটিকে আদ্যোপান্ত ছেয়ে রেখেছে। কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কোথাও তার বিরাম নেই ;—শুধু তাই নয়, সেই রং বাঙ্গলার সীমানা অতিক্রম করে', উত্তরে হিমালয়ের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে, ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ভিতর চারিয়ে গেছে।

সবুজ, বাঙ্গলার শুধু দেশযোড়া রং নয়,—বারোমেসে রং। আমাদের দেশে প্রকৃতি বহুরূপী নয় এবং ঋতুর সঙ্গে সঙ্গে বেশ পরিবর্ত্তন করে না। বসন্তে বিয়ের কনের মত ফুলের জহরতে আপাদমস্তক সালঙ্কারা হয়ে দেখা দেয় না ; বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হয়ে শরতের পূজার তসর ধারণ করে' আসে না, শীতে বিধবার মত শাদা সাড়ীও পরে না। মাধব হ'তে মধু পর্য্যন্ত ঐ সবুজের টানা সুর চলে ; ঋতুর প্রভাবে সে সুরের যে রূপান্তর হয়, সে শুধু কড়ি-কোমলে। আমাদের দেশে অবশ্য বর্ণের বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আকাশে ও জলে, ফুলে ও ফলে, আমরা বর্ণগ্রামের সকল সুরেরই খেলা দেখতে পাই। কিন্তু মেঘের রং ও ফুলের রং ক্ষণস্থায়ী ; প্রকৃতির ও-সকল রাগরঙ্গ তার বিভাব ও অনুভাব মাত্র। তার স্থায়ী ভাবের, তার মূল রসের পরিচয় শুধু সবুজে। পাঁচরঙা ব্যভিচারী-ভাবসকলের সার্থকতা হচ্ছে বঙ্গদেশের এই অখণ্ড-হরিৎ স্থায়ী ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা।

এরূপ হবার অবশ্য একটা অর্থ আছে। বর্ণমাত্রেই ব্যঞ্জনবর্ণ,—অর্থাৎ বর্ণের উদ্দেশ্য শুধু বাহ্যবস্তকে লক্ষণান্বিত করা নয়, কিন্তু সেই সুযোগে নিজেকেও ব্যক্ত করা। যা স্বপ্রকাশ নয়, তা অপর কিছুই প্রকাশ করুতে পারে না।—তাই রং রূপও বটে, রূপকও বটে। যতক্ষণ আমাদের বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ ব্যক্তিত্বের জ্ঞান না জন্মায়, ততক্ষণ আমাদের প্রকৃতির বর্ণপরিচয় হয় না এবং আমরা তার বক্তব্য কথা বুঝতে পারিনে। বাঙ্গলার সবুজ পত্রে যে সুসমাচার লেখা আছে, তা পড়বার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক হবার আবশ্যক নেই—কারণ, সে লেখার ভাষা বাঙ্গলার প্রাকৃত। তবে আমরা সকলে যে তার অর্থ বুঝতে পারিনে, তার কারণ হচ্ছে, যিনি গুপ্ত জিনিস আবিষ্কার করুতে ব্যস্ত, ব্যক্ত জিনিস তাঁর চোখে পড়ে না।

যাঁর ইন্দ্রধনুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে আর তার জন্ম কথা জানা আছে, তিনিই জানেন যে, সূর্য্যকিরণ নানা বর্ণের একটি সমষ্টিমাত্র এবং শুধু সিধে পথেই সে শাদা ভাবে চলতে পারে। কিন্তু তার সরল গতিতে বাধা পড়লেই, সে সমষ্টি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বক্র হয়ে বিচিত্র ভঙ্গী ধারণ করে এবং তার বর্ণ সকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত হয়ে যায়। সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি এবং নিজগুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে' থাকে। বেগুনী কিশলয়ের রং,—জীবনের পূর্ব্বরাগের রং। লাল রক্তের রং,—জীবনের পূর্ণরাগের রং। নীল আকাশের রং,—অনন্তের রং। পীত শুষ্কপত্রের রং,—মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং,—রসের

ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি। তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পূর্ব্ব-সীমায় বেগুনী আর পশ্চিম সীমায় লাল। অন্ত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবুজের, অর্থাৎ সরস প্রাণের স্বধর্ম্ম।

যে বর্ণ বাঙ্গলার ওষধিতে ও বনস্পতিতে নিত্য বিকশিত হয়ে উঠ্‌ছে, নিশ্চয় সেই একই বর্ণ আমাদের হৃদয়-মনকেও রঙ্গিয়ে রেখেছে। আমাদের বাহিরের প্রকৃতির যে রং, আমাদের অন্তরের পুরুষেরও সেই রং। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে, সজীবতা ও সরসতাই হচ্ছে বাঙ্গালীর মনের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। প্রমাণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, আমাদের দেবতা হয় শ্যাম, নয় শ্যামা। আমাদের হৃদয়মন্দিরে রজত-গিরিসন্নিভ কিম্বা জবাকুসুমসঙ্কাশ দেবতার স্থান নেই; আমরা শৈবও নই, সৌরও নই।

আমরা হয় বৈষ্ণব, নয় শাক্ত। এ উভয়ের মধ্যে বাঁশী ও অসির যা প্রভেদ, সেই পার্থক্য বিদ্যমান, তবুও বর্ণসামান্যতার গুণে শ্যাম ও শ্যামা আমাদের মনের ঘরে নির্ব্বিবাদে পাশাপাশি অবস্থিতি করে। তবে বঙ্গ-সরস্বতীর দূর্ব্বাদলশ্যামরূপ আমাদের চোখে যে পড়ে না, তার জন্য দোষী আমরা নই, দোষী আমাদের শিক্ষা। একালের বাণীর মন্দির হচ্ছে বিদ্যালয়। যেখানে আমাদের গুরুরা এবং গুরু-জনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমাদের মন তার কায়িক এবং বাচিক সেবায়, দিন দিন নীরস ও নির্জ্জীব হয়ে পড়েছে। আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিনে, তার কারণ, আমাদের নিজের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না।—আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শুধু এক-জনকে আর-পাঁচজনের মত হ'তে বলে, ভুলেও কখনও আর-পাঁচজনকে এক জনের মত হ'তে বলে না। সমাজের ধর্ম্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম্ম নষ্ট করা। সমাজের যা মন্ত্র, তারি সাধন-পদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে "অপরের মত হও" আর তার নিষেধ হচ্ছে "নিজের মত হয়ো না।" এই শিক্ষার কৃপায় আমাদের মনে এই অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আমাদের স্বধর্ম্ম এতই ভয়াবহ যে, তার চাইতে পরধর্ম্মে নিধনও শ্রেয়। সুতরাং কাজে ও কথায়, লেখায় ও পড়ায়, আমরা আমাদের মনের সরস সতেজ ভাবটি নষ্ট কর্‌তে সদাই উৎসুক। এর কারণও স্পষ্ট,—সবুজ রং ভালমন্দ দুই অর্থেই কাঁচা। তাই আমাদের কর্ম্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা,—অর্থাৎ শাস্ত্রীর দল,—আমাদের মনটিকে রাতারাতি পাকা করে' তুলতে চান। তাঁদের বিশ্বাস যে, কোনরূপ কর্ম্ম কিম্বা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেলতে পার্‌লেই—আমাদের মনের রং পেকে উঠবে। তাঁদের রাগ এই যে, সবুজ বর্ণমালার অন্তস্থ বর্ণ নয়, এবং ও রং কিছুরই অন্তে আসে না,—জীবনেরও নয়, বেদেরও নয়, কর্ম্মেরও নয়, জ্ঞানেরও নয়।—এঁদের চোখে সবুজ-মনের প্রধান দোষ যে, সে মন পূর্ব্বমীমাংসার অধিকার ছাড়িয়ে এসেছে এবং উত্তরমীমাংসার দেশে গিয়ে পৌঁছায় নি। এঁরা ভুলে যান যে, জোর করে' পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি,—প্রাণকে মৃত্যুর দ্বারস্থ করি। অপর দিকে এ দেশের ভক্তিযোগীরা,—অর্থাৎ কবির দল,—কাঁচাকে কচি কর্‌তে চান। এঁরা চান যে, আমরা শুধু গদগদভাবে আধ-আধ কথা কই। এঁদের রাগ সবুজের সজীবতার উপর। এঁদের ইচ্ছা, সবুজের তেজটুকু বহিষ্কৃত করে' দিয়ে, ছাঁকা রসটুকু রাখেন। এঁরা ভুলে যান যে, পাতা কখনও আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না। প্রাণ পশ্চাৎপদ হ'তে জানে না,—তার ধর্ম্ম হচ্ছে এগোনো, তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমৃতত্ব, নয় মৃত্যু। যে মন একবার কর্ম্মের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই,—কেবলমাত্র ভক্তির শান্তিজলে সে তার সমস্ত হৃদয় পূর্ণ করে' রাখ্‌তে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিম্বা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এ উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বাঙ্গালীর মন এখন অর্দ্ধেক অকাল-পক্ব এবং অর্দ্ধেক অযথা-কচি। আমাদের আশা আছে যে, সবুজ ক্রমে পেকে লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের অন্তরের আজকের সবুজরস কালকের লালরক্তে তবেই পরিণত হবে, যদি আমরা স্বধর্ম্মের পরিচয় পাই এবং প্রাণপণে তার চর্চ্চা করি। আমরা তাই দেশী কি বিলাতী পাথরে গড়া সরস্বতীর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে, বাঙ্গলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা করে', তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোনও গর্ভ-মন্দির থাক্‌বে না, কারণ, সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই, আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়। বদ্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে পাণ্ডু হয়ে যায়। আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের

অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। ঊষার গোলাপী, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীললোহিত, বিরোধালঙ্কারস্বরূপে সবুজ পত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যুতি কখনও উজ্জ্বল, কখনও কোমল করে' তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্ক পত্রের।

বৈশাখ, ১৩২১।

"যৌবনে দাও রাজটীকা"

গত মাসের সবুজ পত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটীকা দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার কোনও টীকাকার বন্ধু এই প্রস্তাবের বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করেছেন :—

"যৌবনকে টীকা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য,—তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এ স্থলে রাজটীকা অর্থ—রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টীকা—সেই টীকা। উক্ত পদ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।"

উল্লিখিত ভাষ্য আমি রহস্য বলে' মনে করতুম, যদি না আমার জানা থাকত যে, এ দেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্ত-ঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল—দুই অসাবেস্তা, অতএব শাসনযোগ্য। এ উভয়কে জুড়ীতে যুতলে আর বাগ মানান যায় না;—অতএব এদের প্রথমে পৃথক করে', পরে পরাজিত করতে হয়।

বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠে;—অবশ্য তাই বলে' পৃথিবী তার আলিঙ্গন হ'তে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে না এবং পোষমাসকেও বারোমাস পুষে রাখে না! শীতকে অতিক্রম করে' বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্ব্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।

প্রকৃতির যৌবন শাসনযোগ্য হলেও, তাকে শাসন করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই; কেননা, প্রকৃতির ধর্ম্ম মানবধর্ম্ম-শাস্ত্রবহির্ভূত। সেই কারণে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বারণ করেন এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির উল্টো টান টানতে পরামর্শ দেন; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হ'তে দূরে রাখা আবশ্যক। অন্যথা, যৌবন ও বসন্ত এ দুয়ের আবির্ভাব যে একই দৈবীশক্তির লীলা—এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের মনে স্থানলাভ করতে পারে।

এ দেশে লোকে যে, যৌবনের কপালে রাজটীকার পরিবর্ত্তে তার পৃষ্ঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস, মানবজীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া—কোনরকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান্ যে, একলম্ফে বাল্য হ'তে বার্দ্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা, তার অন্তরে শক্তি আছে। অপরপক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই; বালকের জ্ঞান নেই, বৃদ্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্ছে, দেহের জড়তার সঙ্গে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধিস্থাপন করা। তাই আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইঁচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।

আমাদের উপরিউক্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নি, তার প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন। আজকের দিনে এদেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে একদিকে বালক, অপর দিকে বৃদ্ধ; সাহিত্য-ক্ষেত্রে একদিকে স্কুলবয়, অপর দিকে স্কুলমাষ্টার; সমাজে এক দিকে বাল্যবিবাহ, অপর দিকে অকালমৃত্যু; ধর্ম্মক্ষেত্রে একদিকে শুধু "ইতি" "ইতি", অপর দিকে শুধু "নেতি" "নেতি";—অর্থাৎ একদিকে লোষ্ট্রকাষ্ঠও দেবতা, অপর দিকে ঈশ্বরও ব্রহ্ম নন। অর্থাৎ আমাদের জীবন-গ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে;—ভিতরে কিছু নেই। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারি অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে, অন্ত আছে;—শুধু মধ্য নেই।

বার্দ্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেল্লেও, আমরা তার মিলন সাধন করতে পারি নি, কারণ, ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তা ছাড়া যা আছে,—তা নেই বললেও, তার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বললেও তা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না, এবং আত্মাকে ছায়া বললেও তা অদৃশ্য হয়ে যায়

না। বরং কোনও কোনও সত্যের দিকে পিঠ ফিরালে, তা অনেক সময়ে আমাদের ঘাড়ে চড়ে' বসে। যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দিই নি, তা এখন নানা বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন করে' রয়েছে। যাঁর সমাজের সুমুখে জীবনের শুধু নান্দী ও ভরতবচন পাঠ করেন, তাঁদের জীবনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরালেই হয়ে থাকে। রুদ্ধ ও বদ্ধ করে' রাখলে পদার্থমাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায় এবং সেই জন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য্য। গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।

আমরা যে যৌবনকে গোপন করে' রাখতে চাই,—তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কোনও বিখ্যাত ইংরাজ লেখক বলেন যে, literature হচ্ছে criticism of life;—ইংরাজি সাহিত্য জীবনের সমালোচনা হ'তে পারে, কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।

সংস্কৃত সাহিত্যে যুবকযুবতী ব্যতীত আর কারও স্থান নেই। আমাদের কাব্যরাজ্য হচ্ছে সূর্য্যবংশের শেষ নৃপতি অগ্নিবর্ণের রাজ্য এবং সে দেশ হচ্ছে অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াদের স্বদেশ। যৌবনের যে ছবি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যে ফুটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভোগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃত কাব্যজগৎ, মাল্য-চন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত—এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ, ও মাল্যচন্দন তার উপসর্গ। এ কাব্যজগতের স্রষ্টা কিম্বা দ্রষ্টা কবিদের মতে, প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা যোগানো, এবং পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন যোগানো। হিন্দুযুগের শেষ কবি জয়দেব নিজের কাব্যসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে যে কথা বলেছেন, তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই একই কথা বলেছেন। সে কথা এই যে—"যদি বিলাস-কলায় কুতূহলী হও ত আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো।" এক কথায়, যে যৌবন যযাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃত কবিরা সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।

এ কথা যে কত সত্য, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। কৌশাম্বির যুবরাজ উদয়ন এবং কপিলাবস্তুর যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই পরম রূপবান্ এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন ভোগের, আর একজন হচ্ছেন ত্যাগের পূর্ণ অবতার। ভগবান্ গৌতম-বুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহনাশ করে' তাকে সংসারের সকল শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল, ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজগামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মুগ্ধ করে' পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃত কাব্যে বুদ্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়ন-কথায় তা পরিপূর্ণ।

সংস্কৃত ভাষায় যে বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয় নি, তা নয়;—তবে ললিতবিস্তরকে আর কেউ কাব্য বলে' স্বীকার করবেন না; এবং অশ্বঘোষের নাম পর্য্যন্তও লুপ্ত হয়ে গেছে। অপর দিকে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে' যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন,—যথা, ভাস, গুণাঢ্য, সুবন্ধু ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি,—তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃত সাহিত্যের অর্দ্ধেক বাদ পড়ে' যায়। কালিদাস বলেছেন যে, কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধেরা উদয়ন-কথা শুনতে ও বলতে ভালবাসতেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল কৌশাম্বির গ্রামবৃদ্ধ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক। সংস্কৃত সাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না যে, বুদ্ধের উপদেশের বলে জাতীয় জীবনে যৌবন এনে দিয়েছিল এবং উদয়নের দৃষ্টান্তের ফলে অনেকের যৌবনে অকাল-বার্দ্ধক্য এনে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলনের ফলে—রাজা অশোক লাভ করেছিলেন সাম্রাজ্য; আর উদয়ন-ধর্ম্মের অনুশীলন করে' রাজা অগ্নিবর্ণ লাভ করেছিলেন রাজযক্ষ্মা। সংস্কৃত কবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরি ধর্ম্ম। বার্দ্ধক্য কিছু অর্জ্জন করতে পারে না বলে' কিছু বর্জ্জনও করতে পারে না। বার্দ্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না বলে' কিছু ছাড়তেও পারে না;—দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশকোটি কালো লোকের জন্যও নয়।

পাছে লোকে ভুল বোঝেন বলে' এখানে আমি একটি কথা বলে' রাখতে চাই। কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে সংস্কৃত কাব্য 'বয়কট' করতে বলছি, কিম্বা নীতি এবং রুচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করবার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে, যা সত্য, তা গোপন করা সুনীতি নয়, এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃত কাব্যে যে-যৌবনধর্ম্মের বর্ণনা আছে, তা যে সামান্য মানব-ধর্ম্ম—এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য এবং মানবজীবনের

উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল—তাও অস্বীকার কর্‌বার জো নেই।

তবে এই একদেশদর্শিতা ও অত্যুক্তি—ভাষায় যাকে বলে এক-রোখামি ও বাড়াবাড়ি,—তাই হচ্ছে সংস্কৃত কাব্যের প্রধান দোষ। যৌবনের স্থূলশরীরকে অত আস্কারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হ'তে স্থূলতর হয়ে ওঠে, এবং সেই সঙ্গে তার সূক্ষ্ম শরীরটি সূক্ষ্ম হ'তে এত সূক্ষ্মতম হয়ে উঠে যে, তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময়, কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হ'লে, সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে, মন পদার্থটি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ ও মন পৃথক হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্ত্তে জ্ঞাতিশত্রুতা জন্মায়। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের নিরামিষের প্রতিবাদ-স্বরূপ হিন্দু কবিরা তাঁদের কাব্যে এতটা আমিষের আমদানী করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক, প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহ মনের পরস্পরের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার প্রমাণ—প্রাচীন সমাজের এক দিকে বিলাসী, অপর দিকে সন্ন্যাসী; এক দিকে পত্তন, অপর দিকে বন; এক দিকে রঙ্গালয়, অপর দিকে হিমালয়;—এক কথায় এক দিকে কামশাস্ত্র, অপর দিকে মোক্ষশাস্ত্র। মাঝামাঝি আর-কিছু, জীবনে থাক্‌তে পারত, কিন্তু সাহিত্যে নেই; এবং এ দুই বিরুদ্ধ মনোভাবের পরস্পর মিলনের যে কোনও পন্থা ছিল না, সে কথা ভর্ত্তৃহরি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন—

"একা ভার্য্যা সুন্দরী বা দরী বা!"

এই হচ্ছে প্রাচীনযুগের শেষ কথা। যাঁরা দরী-প্রাণ, তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা করা যেমন স্বাভাবিক,—যাঁরা সুন্দরী প্রাণ, তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। যতির মুখের যৌবন-নিন্দা অপেক্ষা কবির মুখের যৌবন-নিন্দার, আমার বিশ্বাস, অধিক ঝাঁঝ আছে। তার কারণ, ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীরা অভ্যাসবশতঃ কথায় ও কাজে বেশী অসংযত।

যাঁরা স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন, তাঁরাই যে স্ত্রী-নিন্দার ওস্তাদ—এর প্রমাণ জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। স্ত্রীনিন্দুকের রাজা হচ্ছেন, রাজকবি ভর্ত্তৃহরি ও রাজকবি Solomon। চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ কর্‌তে না পেরে, এঁরা শেষবয়সে স্ত্রীজাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাকে মাল্যচন্দন হিসাবে ব্যবহার করেন, তাঁরা শুকিয়ে গেলে সেই বনিতাকে মাল্যচন্দনের মতই ভূতলে নিক্ষেপ করেন এবং তাকে পদদলিত কর্‌তেও সঙ্কুচিত হন না। প্রথমবয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চ্চা করলে, শেষবয়সে তিতো হয়ে ওঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শৃঙ্গার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।

একই কারণে, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন, তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাক্‌বারই কথা। যাঁরা যৌবন জোয়ারে গা-ভাসিয়ে দেন, তাঁরা ভাঁটার সময় পাঁকে পড়ে' গত-জোয়ারের কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাঁদের রাগ এই যে, তা পালিয়ে যায় এবং একবার চলে' গেলে আর ফেরে না। যযাতি যদি পুরুর কাছে ভিক্ষা করে' যৌবন ফিরে না পেতেন, তা হ'লে তিনি যে কাব্য কিম্বা ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা কর্‌তেন, তাতে যে কি সুতীব্র যৌবন-নিন্দা থাকত—তা আমরা কল্পনাও কর্‌তে পারিনে। পুরু যে পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ভিতর পিতার প্রতি কতটা ভক্তি ছিল এবং তাতে পিতারই যে উপকার করা হয়েছিল, তা বল্‌তে পারিনে,—কিন্তু তাতে দেশের মহা অপকার হয়েছে; কারণ, নীতির একখানা বড় গ্রন্থ মারা গেছে।

যযাতি-কাঙ্ক্ষিত যৌবনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অনিত্য। এ বিষয়ে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, নগ্নক্ষপণক ও নাগরিক, সকলেই এক মত।

"যৌবন ক্ষণস্থায়ী"—এই আক্ষেপে এ দেশের কাব্য ও সঙ্গীত পরিপূর্ণ।

"ফাগুন গয়ী হয়, বহুরা ফিরি আয়ী হয়
গয়ে রে যোবন, ফিরি আওত নাহি।"

এই গান আজও হিন্দুস্থানের পথে ঘাটে অতি করুণ সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। যৌবন যে চিরদিন থাকে না, এ আপশোষ রাখবার স্থান ভারতবর্ষে নেই।

যা অতি প্রিয় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী, তার স্থায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ নিজের অধিকার বিস্তার করবার উদ্দেশ্যেই, এ দেশে যৌবন শৈশবের উপর আক্রমণ করেছিল। বাল্য-বিবাহের মূলে হয় ত এই যৌবনের মেয়াদ বাড়াবার ইচ্ছাটাই বর্ত্তমান। জীবনের গতিটি উল্টো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে। পৃথিবীর

অপর সব দেশে, লোকে গাছকে কি করে' বড় করতে হয়, তারি সন্ধান জানে, কিন্তু গাছকে কি করে' ছোট করতে হয়, সে কৌশল শুধু জাপানীরাই জানে। একটি বটগাছকে তারা চিরজীবন একটি টবের ভিতর পূরে রেখে দিতে পারে। শুনতে পাই, এই সব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয় বট। জাপানীদের বিশ্বাস যে, গাছকে হ্রস্ব করলে তা আর বৃদ্ধ হয় না। সম্ভবতঃ আমাদেরও মনুষ্যত্বের চর্চ্চা সম্বন্ধে এই জাপানী আর্ট জানা আছে, এবং বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই আর্টের একটি প্রধান অঙ্গ; এবং উক্ত কারণেই, অপর সকল প্রাচীন সমাজ উৎসন্নে গেলেও আমাদের সমাজ আজও টিঁকে আছে। মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করে' মানব-সমাজটাকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ কিছু অহঙ্কার করবার আছে, তা আমার মনে হয় না। সে যাই হোক, এ যুগে যখন কেউ যৌবনকে রাজটীকা দেবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি সমাজের কথা ভাবেন—ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়।

ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হলেও মানব সমাজের হিসেবে ও দুই পদার্থ নিত্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হলেও হ'তে পারে।

কি উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে, তাই হচ্ছে বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

এ বিচার করবার সময়, এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানবজীবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি,—যৌবন।

যৌবনে মানুষের বাহেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে উঠে এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে, মানুষে সেই প্রেরণা তার সকল অঙ্গে, সকল মনে অনুভব করে।

দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও, দেহমনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেহ সঙ্কীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন, অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার যো নেই;—কিন্তু একের মনের যৌবন, লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে' দেওয়া যেতে পারে।

পূর্ব্বে বলেছি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র প্রাণ-শক্তিই জড় ও চৈতন্যের যোগসাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই, সেখানে জড়ে ও চৈতন্যে মিলনও দেখা যায় না। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে মধ্যস্থতা করছে। প্রাণের পায়ের নীচে হচ্ছে জড়জগৎ, আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম্ম যে, জীবন-প্রবাহ রক্ষা করা, নব নব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করা,—এটি সর্ব্বলোকবিদিত। কিন্তু প্রাণের আর একটি বিশেষ ধর্ম্ম আছে, যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রাণ প্রতিমুহূর্ত্তে রূপান্তরিত হয়। হিন্দু-দর্শনের মতে, জীবের প্রাণময় কোষ অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রাণের গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা—দুই সম্ভব। প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড়জগতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়; আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তর্ভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন স্ফূর্ত্তিতে বাধা দিলেই জড়তা প্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে' নেয়;—বাইরের নিয়মে তাকে বদ্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণিজগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই, তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্ম্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্দ্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক—প্রাণ-শক্তি যে দৈবী শক্তি—এই বিশ্বাস।

এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য এবং কি উপায়ে তা সাধিত হ'তে পারে, তাই হচ্ছে আলোচ্য।

আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তিহিসেবে দেখলেও, আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহুব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে স্থায়ী করতে হ'লে, —শৈশব নয়, বার্দ্ধক্যের দেশ আক্রমণ এবং অধিকার করতে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে, বার্দ্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ করতে

পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাল্গুন একবার চলে' গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাল্গুন চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা, নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবন-প্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই এবং তিনিই আবার কথায় ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।

এ যৌবনের কপালে রাজটীকা দিতে আপত্তি করবেন,—এক জড়বাদী, আর এক মায়াবাদী; কারণ, এঁরা উভয়েই একমত। এঁরা উভয়েই বিশ্ব হ'তে তার অস্থির প্রাণটুকু বার করে' দিয়ে যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল, আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক,—প্রভেদ যা, তা নামে।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

বর্ষার কথা

আমি যদি কবি হতুম, তা হ'লে আর যে বিষয়েই হোক, বর্ষার সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখতুম না। কেন?—তার কারণগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ কবিতা হচ্ছে আর্ট। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দের মতে আর্ট জিনিসটি দেশকালের বহির্ভূত। এ মতের সার্থকতা তাঁরা উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করতে চান। Hamlet, তাঁদের মতে, কালেতে ক্ষয় প্রাপ্ত হবে না এবং তার জন্মস্থানেও তাকে আবদ্ধ রাখবার জো নেই। কিন্তু সঙ্গীতের উদাহরণ থেকে দেখানো যেতে পারে যে, এ দেশে আর্ট কালের সম্পূর্ণ অধীন। প্রতি রাগ-রাগিণীর স্ফূর্তির ঋতু, মাস, দিন, ক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। যাঁর সুরের দৌড় শুধু ঋষভ পর্য্যন্ত পৌঁছায়, তিনিও জানেন যে, ভৈরবীর সময় হচ্ছে সকাল, আর পূরবীর বিকাল। যেহেতু কবিতা গান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে—সে কারণ সাহিত্যে সময়োচিত কবিতা লেখবারও ব্যবস্থা আছে। মাসিক পত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের কবিতা, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষার, পয়লা আশ্বিনে পূজার, আর পয়লা ফাল্গুনে প্রেমের কবিতা বেরোনো চাই-ই চাই। এই কারণে আমার পক্ষে বর্ষার কবিতা লেখা অসম্ভব। যে কবিতা আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্ততঃ জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে। আমার মনের কল্পনার এত বাষ্প নেই, যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন করে' তুলতে পারে। তা ছাড়া, যখন বাইরে অহরহ আগুন জ্বলছে, তখন মনে বিরহের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে কালিদাসের যক্ষও সক্ষম হতেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর বিরহ বাদ দিয়ে বর্ষার কাব্য লেখাও যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটক লেখাও তাই।

দ্বিতীয়তঃ, বর্ষার কবিতা লিখতে আমার ভরসা হয় না এই কারণে যে, এক ভরসা ছাড়া বরষা আর কোনও শব্দের সঙ্গে মেলে না। বাঙ্গলা-কবিতায় মিল চাই, এ ধারণা আমার আজও যে আছে, এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারিনে। যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিললে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিললে কেন যে তা কবিতা না হয়ে পদ্য হবে, তা আমি বুঝতে পারিনে। তা ছাড়া, বাস্তব জীবনে যখন আমাদের কোন কথাই মেলে না, তখন অন্ততঃ একটা জায়গা থাকা চাই যেখানে তা মিলবে,—এবং সে দেশ হচ্ছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি। আর এক কথা, অমিত্রাক্ষরের কবিতা যদি শ্রাবণের নদীর মত দুকূল ছাপিয়ে না বয়ে যায়, তা হ'লে তা নিতান্ত অচল হয়ে পড়ে। মিল অর্থাৎ অন্ত্য-অনুপ্রাস বাদ দিয়ে, পদ্যকে হিল্লোলে কল্লোলে ভরপুর করে' তুলতে হ'লে, মধ্য-অনুপ্রাসের ঘনঘটা আবশ্যক। সে কবিতার সঙ্গে সতত সঞ্চরমান নব-জলধরপটলের সংযোগ করিয়ে দিতে হয় এবং তার চলোর্ম্মির গতি যাদঃপতিরোধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ রোধ মানে না। আমার সরস্বতী হচ্ছেন প্রাচীন সরস্বতী,—শুষ্কা না হ'লেও ক্ষীণা; দামোদর নন যে, শব্দের বন্যায় বাঙ্গলার সকল ছাঁদ-বাঁধ ভেঙ্গে বেরিয়ে যাবেন। অতএব মিলের অভাববশতঃই আমাকে ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। অবশ্য দরশ, পরশ, সরস, হরষ প্রভৃতি শব্দকে আকার দিয়ে বর্ষার সঙ্গে মেলান যায়। কিন্তু সে কাজ রবীন্দ্রনাথ আগেই করে' বসে' আছেন। আমি যদি ঐ সকল শব্দকে সাকার করে' ব্যবহার করি, তা হ'লে আমার চুরি বিদ্যে ঐ আকারেই ধরা পড়ে' যাবে।

ঐরূপ শব্দসমূহ আত্মসাৎ করা চৌর্য্যবৃত্তি কি না—সে বিষয়ে অবশ্য প্রচণ্ড মতভেদ আছে। নব্য কবিদের মতে, মাতৃভাষা যখন কারও পৈতৃক-সম্পত্তি নয়, তখন তা নিজের কার্য্যোপযোগী করে' ব্যবহার করবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ঈষৎ বদল-সদল করেছেন বলে' রবীন্দ্রনাথ ও-সব কথার আর কিছু পেটেণ্ট নেন নি যে, আমরা তা ব্যবহার করলে চোর-দায়ে ধরা পড়ব,—বিশেষতঃ যখন তাদের কোন বদ্‌লি পাওয়া যায় না। যে কথা একবার ছাপা হয়ে গেছে, তাকে আর চাপা দিয়ে রাখবার জো নেই; সে যার-তার কবিতায় নিজেকে ব্যক্ত করবে। নব্য কবিদের আর একটি কথা বলবার আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি অনেক কথা আগে না ব্যবহার করে' ফেলতেন, তা হ'লে পরবর্ত্তী কবিরা তা ব্যবহার করতেন। পরে জন্মগ্রহণ করার দরুণ সে সুযোগ হারিয়েছি বলে', আমাদের যে চুপ করে' থাকতে হবে, সাহিত্য-জগতের এমন কোনও নিয়ম নেই। এ মত গ্রাহ্য করলেও বর্ষার বিষয়ে কবিতা লেখার আর একটি বাধা আছে। কলম ধরলেই মনে হয়, মেঘের সম্বন্ধে লিখব আর কি ছাই?

বর্ষার রূপগুণ সম্বন্ধে যা কিছু বক্তব্য ছিল, তা কালিদাস সবই বলে' গেছেন,—বাকী যা ছিল, তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এ বিষয়ে একটি নূতন উপমা কিম্বা নূতন অনুপ্রাস খুঁজে পাওয়া ভার। যদি পরিচিত সকল বসন-ভূষণ বাদ দিয়ে বর্ষার নগ্ন-মূর্ত্তির বর্ণনা করতে উদ্যত হই, তা হ'লেও বড় সুবিধে করতে পারা যায় না। কারণ, বর্ষার রূপ কালো, রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়—পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে, এবং শব্দ বেজায়। সুতরাং যে বর্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে, কিন্তু কবিত্ব থাকবে কি না, তা বলা কঠিন।

কবিতার যা দরকার, এবং যা নিয়ে কবিতার কারবার, সেই সব আনুষঙ্গিক উপকরণও এ ঋতুতে বড়-একটা পাওয়া যায় না। এ ঋতু পাখী-ছুট। বর্ষায় কোকিল মৌন, কেননা, দর্দ্দুর বক্তা,—চকোর আকাশ-দেশত্যাগী, আর চাতক ঢের হয়েছে বলে' ফটিকজল শব্দ আর মুখে আনে না। যে সকল চরণ ও চঞ্চুসার পাখী—যথা বক, হাঁস, সারস, হাড়-গিলে ইত্যাদি—এ ঋতুতে স্বেচ্ছামত জলে, স্থলে ও নভোমণ্ডলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাদের গঠন এতই অদ্ভুত এবং তাদের প্রকৃতি এতই তামসিক যে, তারা যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। বস্তুতন্ত্রতার খাতিরে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হ'তে রাজি আছি, কিন্তু বিশ্বামিত্রের জগৎ পর্য্যন্ত নয়। তার পর কাব্যের উপযোগী ফুল, ফল, লতা, পাতা, গাছ, বর্ষায় এতই দুর্ল্লভ যে, মহাকবি কালিদাসও ব্যাঙের ছাতার বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃত-ভাষার ঐশ্বর্য্যের মধ্যে এ দৈন্য ধরা পড়ে না—তাই কালিদাসের কবিতা বেঁচে গেছে। বর্ষার দুটি নিজস্ব ফুল হচ্ছে কদম আর কেয়া। অপূর্ব্বতায় পুষ্পজগতে এ দুটির আর তুলনা নেই। অপরাপর সকল ফুল অর্দ্ধবিকশিত ও অর্দ্ধ-নিমীলিত। রূপের যে অর্দ্ধপ্রকাশ ও অর্দ্ধগোপনেই তার মোহিনীশক্তি নিহিত, এ সত্য স্বর্গের অপ্সরারা জানতেন। মুনিঋষিদের তপোভঙ্গ করবার জন্য তাঁরা উক্ত উপায়ই অবলম্বন করতেন। কারণ, ব্যক্ত দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং অব্যক্ত দ্বারা কল্পনাকে অভি-ভূত না করতে পারলে, দেহ ও মনের সমষ্টিকে সম্পূর্ণ মোহিত করা যায় না। কদম কিন্তু একেবারেই খোলা—আর কেয়া একেবারেই বোজা। একের ব্যক্তরূপ নেই—অপরের গুপ্তগন্ধ নেই; অথচ উভয়েই কণ্টকিত। এ ফুল দিয়ে কবিতা সাজানো যায় না। এ দুটি ফুল বর্ষার ভূষণ নয়,—অস্ত্র। গোলা এবং সঙ্গীনের সঙ্গে এদের সাদৃশ্য স্পষ্ট।

পূর্ব্বে যা দেখানো গেল, সে সব ত অঙ্গহীনতার পরিচয়। কিন্তু এ ঋতুর প্রধান দোষ হচ্ছে, আর পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। আর পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এ ঋতু খাপ খায় না। এ ঋতু বিজাতীয় এবং বিদেশী, অতএব অস্পৃশ্য। এই প্রক্ষিপ্ত ঋতু আকাশ থেকে পড়ে;—দেশের মাটির ভিতর থেকে আবির্ভূত হয় না। বসন্তের নবীনতা, সজীবতা ও সরসতার মূল হচ্ছে ধরণী। বসন্তের ঐশ্বর্য্য হচ্ছে দেশের ফুলে, দেশের কিশলয়ে। বসন্তের দক্ষিণ-পবনের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষের মলয়-পর্ব্বত, তার পরিচয় তার স্পর্শেই পাওয়া যায়;—সে পবন আমাদের দেহে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দেয়। বসন্তের আলো,—সূর্য্য ও চন্দ্রের আলো। ও দুটি দেবতা ত সম্পূর্ণ আমাদেরই আত্মীয়; কেননা, আমরা হয় সূর্য্যবংশীয়, নয় চন্দ্রবংশীয়—এবং ভবলীলাসংবরণ করে' আমরা হয় সূর্য্যলোকে, নয় চন্দ্রলোকে ফিরে যাই। অপর পক্ষে, মেঘ যে কোন্ দেশ থেকে আসে, তার কোনও ঠিকানা নেই। বর্ষা যে জল বর্ষণ করে, সে কালাপানির জল। বর্ষার

হাওয়া এতই দুরন্ত, এতই অশিষ্ট, এতই প্রচণ্ড এবং এতই স্বাধীন যে, সে যে কোনও অসভ্য দেশ থেকে আসে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তার পর বর্ষার নিজস্ব আলো হচ্ছে বিদ্যুৎ। বিদ্যুত্যের আলো এতই হাস্যোজ্জ্বল, এতই চঞ্চল, এতই বক্র এবং এতই তীক্ষ্ণ যে, এই প্রশান্ত মহাদেশের এই প্রশান্ত মহাকাশে সে কখনই জন্মলাভ করে নি। আর এক কথা—বসন্ত হচ্ছে, কলকণ্ঠ কোকিলের পঞ্চম সুরে মুখরিত! আর বর্ষার নিনাদ?—তা শুনে শুধু যে কাণে হাত দিতে হয়, তা নয়, চোখও বুজতে হয়।

বর্ষার প্রকৃতি যে আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ও-ঋতুর ব্যবহারে। এ ঋতু শুধু বেথাপ্পা নয়,—অতি বেয়াড়া। বসন্ত যখন আসে, সে এত অলক্ষিতভাবে আসে যে, পঞ্জিকার সাহায্য ব্যতীত কবে মাঘের শেষ হয়, আর কবে ফাল্গুনের আরম্ভ হয়, তা কেউ বল্‌তে পারেন না। বসন্ত, বঙ্কিমের রজনীর মত, ধীরে ধীরে অতি ধীরে, ফুলের ডালা হাতে করে' দেশের হৃদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। তার চরণ-স্পর্শে ধরণীর মুখে, শব-সাধকের শবের ন্যায়, প্রথমে বর্ণ দেখা দেয়, তার পরে ভ্রূ-কম্পিত হয়, তার পরে চক্ষু উন্মীলিত হয়; তার পর তার নিশ্বাস পড়ে, তার পর তার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে। এ সকল জীবনের লক্ষণ শুধু পর্য্যায়ক্রমে নয়,—ধীরে ধীরে, অতি ধীরে প্রকটিত হয়। কিন্তু বর্ষা ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে' একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আকাশে তার চুল ওড়ে, চোখে তার বিদ্যুৎ খেলে, মুখে তার প্রচণ্ড হুঙ্কার;—সে যেন একেবারে প্রমত্ত। ইংরাজেরা বলেন, কে কার সঙ্গ রাখে, তার থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন। আর বর্ষার সখা?—পবননন্দন নন, কিন্তু তাঁর বাবা! ইনি এক লম্ফে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে ফুল ছেঁড়েন, ডাল ভাঙ্গেন, গাছ ওপড়ান। আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনেই লণ্ডভণ্ড করে' দেন এবং যে সূর্য্য আমাদের ঘরে বাঁধা রয়েছে, তাকে বগলদাবা করেন। আর চন্দ্রের দেহ ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে তার কলঙ্কের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এক কথায়, বর্ষার ধর্ম্ম হচ্ছে জল-স্থল-আকাশ সব বিপর্য্যস্ত করে' ফেলা। এ ঋতু কেবল পৃথিবী নয়, দিবারাত্রেরও সাজানো তাস ভেস্তে দেয়। তা ছাড়া বর্ষা কখন হাসেন, কখন কাঁদেন;—ইনি ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট! এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ঋতুকে ছন্দোবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।

এ স্থলে এই আপত্তি উঠতে পারে যে, বর্ষার চরিত্র যদি এতই উদ্ভট হয়, তা হ'লে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা কেন ও-ঋতুকে তাঁদের কাব্যে অতখানি স্থান দিয়েছেন? তার উত্তর হচ্ছে যে, সেকালের বর্ষা আর একালের বর্ষা এক জিনিস নয়,—নাম ছাড়া এ উভয়ের ভিতর আর কোনও মিল নেই। মেঘদূতের মেঘ,—শান্ত-দান্ত। সে বন্ধুর কথা শোনে এবং যে পথে যেতে বল, সেই পথে যায়। সে যে কতদুর রসজ্ঞ, তা তার উজ্জয়িনী-প্রয়াণ থেকেই জানা যায়। সে রমণীর হৃদয়জ্ঞ,—স্ত্রীজাতির নিকট কোন্ ক্ষেত্রে হুঙ্কার কর্‌তে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে অল্পভাষে জল্পনা কর্‌তে হয়, তা তার বিলক্ষণ জানা আছে। সে করুণ,—সে কনকনিকষস্নিগ্ধ বিজুলির বাতি জ্বেলে, সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাদের পথ দেখায়,—কিন্তু তাদের গায়ে জলবর্ষণ করে না। সে সঙ্গীতজ্ঞ,—তার সখা অনিল যখন কীচক-রন্ধ্রে মুখ দিয়ে বংশীবাদন করেন, তখন সে মৃদঙ্গের সঙ্গত করে। এক কথায় ধীরোদাত্ত নায়কের সকল গুণই তাতে বর্ত্তমান। সে মেঘ ত মেঘ নয়,—পুষ্পকরথে আরূঢ় স্বয়ং বরুণদেব। সে রথ অলকার প্রাসাদের মত ইন্দ্রচাপে সচিত্র, ললিতবনিতাসনাথ, মুরজধ্বনিতে মুখরিত। সে মেঘ কখনো শিলাবৃষ্টি করে না,—মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃষ্টি করে। এ হেন মেঘ যদি কবিতার বিষয় না হয়, তা হ'লে সে বিষয় আর কি হ'তে পারে?

কিন্তু যেহেতু আমাদের পরিচিত বর্ষা নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত, উচ্ছৃঙ্খল; সেই কারণেই তার বি[illegible] কবিত্ব করা সম্ভব হ'লেও অনুচিত। পৃথিবীতে [illegible]ষের সব কাজের ভিতর একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার বিশ্বাস, প্রকৃতির রূপ-বর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সৌন্দর্য্যের সাহায্যে মানব-মনকে শিক্ষাদান করা। যদি তাই হয়, তা হ'লে কবিরা কি বর্ষার চরিত্রকে মানুষের মনের কাছে আদর্শস্বরূপ ধরে' দিতে চান? আমাদের মত শান্ত, সমাহিত, সুসভ্য জাতির পক্ষে বর্ষা নয়—হেমন্ত হচ্ছে আদর্শ ঋতু। এ মত আমার নয়,—শাস্ত্রের, নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যগুলির দ্বারাই তা প্রমাণিত হবে:—

"ঋতুগণের মধ্যে হেমন্তই স্বাহাকার, কেননা, হেমন্ত এই প্রজাসমূহকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখে এবং সেইজন্য হেমন্তে ওষধিসমূহ ম্লান হয়, বনস্পতিসমূহের পত্রনিচয় নিপতিত হয়, পক্ষিসমূহ যেন অধিকতরভাবে স্থির হইয়া থাকে ও অধিকতর নীচে উড়িয়া বেড়ায় এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের লোমসমূহ যেন

(শীতপ্রভাবে) নিপতিত হইয়া যায়, কেননা, হেমন্ত এই সমস্ত প্রজাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যে (ভূমি) ভাগে থাকেন, তাহাকেই শ্রী ও শ্রেষ্ঠ অন্নের জন্য নিজের করিয়া তোলেন।" (শতপথব্রাহ্মণ)।

আমরা যে শ্রীভ্রষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ-অন্নহীন, তার কারণ, আমরা হেমন্তকে এইরূপে জানিনে; এবং জানিনে যে, তার কারণ, কবিরা হেমন্তের স্বরূপের বর্ণনা করেন না, বর্ণনা করেন শুধু বর্ষার— যে বর্ষা ওষধিসমূহকে ম্লান না করে, সবুজ করে' তোলে।

আষাঢ়, ১৩২১।

চুট্‌কি

সমালোচকেরা আমার রচনার এই একটি দোষ ধরেন যে, আমি কথায়-কথায় বলি "হচ্ছে"। এটি যে একটি মহাদোষ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই, কেননা, ও কথা বলায় সত্যের অপলাপ করা হয়। সত্য কথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, বাঙ্গলায় কিছু "হচ্ছে না"। এ দেশের কর্ম্মজগতে যে কিছু হচ্ছে না, সে ত প্রত্যক্ষ—কিন্তু মনোজগতেও যে কিছু হচ্ছে না, তার প্রমাণ বর্দ্ধমানের গত সাহিত্য-সম্মিলন।

উক্ত মহাসভার পঞ্চ সভাপতি সমস্বরে বলেছেন যে, বাঙ্গলায় কিছু হচ্ছে না,—না দর্শন, না বিজ্ঞান, না সাহিত্য, না ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রধান বক্তব্য এই যে, আমরা না পাই সত্যের সাক্ষাৎ, না করি সত্যাসত্যের বিচার। আমরা সত্যের স্রষ্টাও নই, দ্রষ্টাও নই; কাজেই আমাদের দর্শন-চর্চ্চা realও নয়, criticalও নয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, কি "মূর্ত্ত-বিজ্ঞান", কি "অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান",—এ দুয়ের কোনটিই বাঙ্গালী অদ্যাবধি আত্মসাৎ করতে পারে নি। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগও আমাদের হাতে পড়ে নি, তার তন্ত্রভাগও আমাদের মনে ধরে নি। আমরা শুধু বিজ্ঞানের স্থূলসূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করেছি এবং তার পরিভাষার নামতা মুখস্থ করেছি। যে বিদ্যা প্রয়োগপ্রধান, কেবলমাত্র তার মন্ত্রের শ্রবণে এবং উচ্চারণে বাঙ্গালী জাতির মোক্ষলাভ হবে না। এক কথায় আমাদের বিজ্ঞান-চর্চ্চা real নয়।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে ইতিহাস-চর্চ্চার উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার এবং উদ্ধার—এ সত্য নিত্য এবং গুপ্ত সত্য নয়, অনিত্য এবং লুপ্ত সত্য,—অতএব এ সত্যের দর্শন লাভের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক। অতীতের জ্ঞান লাভ করবার জন্য হীরেন্দ্রবাবুর বর্ণিত বোধীর (Intuition) প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন আছে শুধু শিক্ষিত বুদ্ধির। অতীতের অন্ধকারের উপর বুদ্ধির আলো ফেলাই হচ্ছে ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্ত্তব্য,—সে অন্ধকারে ঢিল ছোড়া নয়। অথচ আমরা সে অন্ধকারে শুধু ঢিল নয়, পাথর ছুড়ছি,—ফলে পূর্ব্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের ঐতিহাসিকদের পরস্পরের শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছে। এক-কথায় আমাদের ইতিহাস-চর্চ্চা critical নয়।

অতএব দেখা গেল যে, সম্মিলনের সকল শাখা-পতি এ বিষয়ে একমত যে, কিছু হচ্ছে না। কিন্তু কি যে হচ্ছে, সে কথা বলেছেন স্বয়ং সভাপতি। তিনি বলেন, বাঙ্গলা-সাহিত্যে যা হচ্ছে, তার নাম চুট্‌কি। এ কথা লাখ কথার এক কথা। সকলেই জানেন যে, যখন আমরা ঠিক কথাটি ধরতে না পারি, তখনই আমরা লাখ কথা বলি। এই "চুট্‌কি" নামক বিশেষণটি খুঁজে না পাওয়ায়, আমরা বঙ্গ-সরস্বতীর গায়ে "বিজাতীয়" "অভিজাতীয়" "অবাস্তব" "অবাস্তর" প্রভৃতি নানা নামের ছাপ মেরেছি—অথচ তার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারি নি।

তার কারণ—এই সকল ছোট ছোট বিশেষণের অর্থ কি, তার ব্যাখ্যা করতে বড় বড় প্রবন্ধ লিখতে হয়, কিন্তু চুট্‌কি যে কি পদার্থ, তা যে আমরা সকলেই জানি; তার প্রমাণ হাতে-হাতেই দেওয়া যায়।

শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিভাষণ যে চুট্‌কি নয়, এ কথা স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করতে বাধ্য,—কেননা, এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভাবে ও ভাষায় এর চাইতে ভারি অঙ্গের গন্ধবন্ধ জার্ম্মানীর বাইরে পাওয়া দুষ্কর।

হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণও চুট্‌কি নয়। তবে শাস্ত্রী মহাশয় এ মতে সায় দেবেন কি না জানিনে, কেননা, হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ একে সংক্ষিপ্ত, তার উপর আবার সহজবোধ্য, অর্থাৎ সকল দেশের সকল যুগের সকল দার্শনিক তত্ত্ব যে পরিমাণে বোঝা যায়, হীরেন্দ্রবাবুর দার্শনিক তত্ত্বও ঠিক সেই পরিমাণে বোঝা যায়—তার কমও নয়, বেশীও নয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, যে কাব্য মহাকায়, তাই হচ্ছে

মহাকাব্য। গজমাপে যদি সাহিত্যের মর্য্যাদা নির্ণয় করতে হয়, তা হ'লে হীরেন্দ্রবাবুর রচনা অবশ্য চুট্‌কি —কেননা, তার ওজন যতই হোক্ না কেন, তার আকার ছোট।

অপরপক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণযুগল যে চুট্‌কি-অঙ্গের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের কথা এই :—"একখানি বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যত দিন বাঁচিব, তত দিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব"—এ রকম যাতে হয় না, তারি নাম চুট্‌কি। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে জিজ্ঞাসা করি, বাঙ্গলায় এরকম কজন পাঠক আছেন, যাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়ে' তাঁদের ভিতরটা সব ওলটপালট হয়ে গেছে ?

শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গলা-সাহিত্যে চুট্‌কির চেয়ে কিছু বড় জিনিস চান। বড় বইয়ের যদি ধর্ম্মই এই হয় যে, তা পড়বামাত্র আমাদের মনের ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে,—তা হ'লে সে রকম বই যত কম লেখা হয়, ততই ভাল, কারণ, দিনে একবার করে' যদি পাঠকের অন্তরাত্মার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে—তা হ'লে বড় বই লেখবার লোক যেমন বাড়বে, পড়বার লোকও তেমনি কমে আসবে। তিনি চুট্‌কির সম্বন্ধে যে চুটি ভাল কথা বলেন নি, তা নয় —কিন্তু সে অতি মুরুব্বিয়ানা করে'। ইংরাজেরা বলেন, স্বল্পস্তুতির অর্থ অতিনিন্দা। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ চুট্‌কি সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের পক্ষে একটু যাচিয়ে দেখা দরকার। তিনি বলেন—চুট্‌কির একটি দোষ আছে, "যখনকার তখনই, বেশী দিন থাকে না।" এ কথা যে ঠিক নয়—তা তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণ করা যায়, সংস্কৃত অভিধানে চুট্‌কি শব্দ নেই,—কিন্তু ও-বস্তু যে সংস্কৃত সাহিত্যে আছে, সে কথা শাস্ত্রী মহাশয়ই আমাদের বলে' দিয়েছেন। তাঁর মতে "কালিদাস ও ভবভূতির পর চুট্‌কি আরম্ভ হইয়াছিল, কেননা, শতক, দশক, অষ্টক, সপ্তশতী, এই সব ত চুট্‌কি সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।" তথাস্তু। শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণিত সংস্কৃত চুট্‌কির চুটি একটি নমুনার সাহায্যেই দেখানো যেতে পারে যে, আর্য্যযুগেও চুট্‌কি কাব্যাচার্য্যদিগের নিকট অতি উপাদেয় ও মহার্হ বস্তু বলেই প্রতিপন্ন হ'ত। ভর্তৃহরির শতক তিনটি সকলের নিকটই সুপরিচিত, এবং "গাথা সপ্তশতী"ও বাঙ্গলাদেশে একেবারে অপরিচিত নয়। ভর্তৃহরি ভবভূতির পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, কেননা, জনরব এই যে, তিনি কালিদাসের ভ্রাতা, এবং ইতিহাসের অভাবে কিম্বদন্তীই প্রামাণ্য। সে যাই হোক, "গাথা সপ্তশতী" যে কালিদাসের জন্মের অন্ততঃ দু তিন শ' বছর পূর্ব্বে সংগৃহীত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তা হ'লে দাঁড়ালো এই যে, আগে আসে চুট্‌কি, তার পর আসে মহাকাব্য এবং মহানাটক। অভিব্যক্তির নৈসর্গিক নিয়মই এই যে, এ জগতে সব জিনিসই ছোট থেকে ক্রমে বড় হয়। সাহিত্যও ঐ একই নিয়মের অধীন। তার পর পূর্ব্বোক্ত শতকত্রয় এবং পূর্ব্বোক্ত সপ্তশতী যখনকার তখনকারই নয়,—চিরদিনকারই। এ মত আমার নয়—বাণভট্টের। গাথা সপ্তশতী শুধু চুট্‌কি নয়—একেবারে প্রাকৃত-চুট্‌কি,—তথাপি শ্রীহর্ষকারের মতে—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎ সাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥"

তার পর ভর্তৃহরি যে এক-ন'র পান্না, এক-ন'র চুণি এবং এক-ন'র নীলা—এই তিন-ন'র রত্নমালা সরস্বতীর কণ্ঠে পরিয়ে গেছেন,—তার প্রতি রত্নটি যে বিশুদ্ধজাতীয় এবং অবিনাশী, তার আর সন্দেহ নেই। যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর এই তিন শত বর্ণোজ্জ্বল শ্লোক সরস্বতীর মন্দির অহর্নিশি আলোকিত করে' রাখবে।

আসল কথা, চুট্‌কি যদি হেয় হয়, তা হ'লে কাব্যের চুট্‌কিত্ব তার আকারের উপর [illegible], তার প্রকারের অথবা বিকারের উপর [illegible] করে— নচেৎ সমগ্র সংস্কৃত-কাব্যকে চুট্‌কি বলতে হয়। কেননা, সংস্কৃত-ভাষায় চার ছত্রের বেশী কবিতা নেই —কাব্যেও নয়, নাটকেও নয়। শুধু কাব্য কেন, হাতে-বহরে বেদও চুট্‌কির অন্তর্ভূত হয়ে পড়ে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান্ ব'লে বেদাভ্যাস করেন না। কর্ণবেধের জন্য যতটুকু বেদ দরকার, ততটুকুই এ দেশে ব্রাহ্মণসন্তানের করায়ত্ত। অথচ বাঙ্গালী বেদপাঠ না করেও এ কথা জানে যে, ঋক্ হচ্ছে ছোট কবিতা এবং সাম গান। সুতরাং আমরা যখন ছোট কবিতা ও গান রচনা করি, তখন আমরা ভারতবর্ষের কাব্যরচনার সনাতন রীতিই অনুসরণ করি।

শাস্ত্রী মহাশয় মুখে যাই বলুন—কাজে তিনি চুট্‌কিরই পক্ষপাতী। তিনি আজীবন চুট্‌কিতেই গলা সেধেছেন, চুট্‌কিতেই হাত তৈরী করেছেন—

সুতরাং কি লেখায়, কি বক্তৃতায়, আমরা তাঁর এই অভ্যস্ত বিষ্ঠারই পরিচয় পাই। তিনি বাঙ্গালীর যে বিংশপর্ব্ব মহাগৌরব রচনা করেছেন, তা ঐতিহাসিক চুটকি বৈ আর কিছুই নয়,—অন্ততঃ সে রচনাকে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অন্য কোনও নামে অভিহিত করবেন না।

এ কথা নিশ্চিত যে, তিনি সরকারমহাশয়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন নি, সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসে যে, বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি অনুসারে আবিষ্কৃত সত্য বাঙ্গালীর পক্ষে পুষ্টিকর হ'তে পারে, কিন্তু রুচিকর হবে না। সরকারমহাশয় বলেন যে, এদেশের ইতিহাসের সত্য যতই অপ্রিয় হোক্—বাঙ্গালীকে তা বলতেও হবে, শুনতে হবে। অপরপক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের উদ্দেশ্য তাঁর রচনা লোকের মুখরোচক করা এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তিনি নানারকম সত্য ও কল্পনা এক-সঙ্গে মিলিয়ে ঐতিহাসিক সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ রচনায় যে মাল আছে, তাও মশলা থেকে পৃথক্ করে' নেওয়া যায় না। শাস্ত্রী মহাশয়ের কথিত বাঙ্গলার পুরাবৃত্তের কোনও ভিত্তি আছে কি না বলা কঠিন। তবে এ ইতিহাসের যে গোড়া- পত্তন করা হয় নি— সে বিষয়ে আর দ্বিমত নেই। ইতিহাসের ছবি আঁকতে হ'লে প্রথমে ভূগোলের জমি করতে হয়। কোনও একটি দেশের সীমার মধ্যে কালকে আবদ্ধ না করতে পারলে, সে কালের পরিচয় দেওয়া যায় না। অসীম আকাশের জিওগ্রাফি নেই—অনন্ত কালেরও হিষ্টরি নেই। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় সেকালের বাঙ্গালীর পরিচয় দিতে গিয়ে সেকালের বাঙ্গলার পরিচয় দেন নি,—ফলে গৌরবটা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে আমাদের কি অপরের প্রাপ্য—এ বিষয়েও সন্দেহ থেকে যায়। শাস্ত্রীমহাশয়ের শক্ত হাতে পড়ে' দেখতে পাচ্ছি অঙ্গ ভয়ে বঙ্গের ভিতর সেঁধিয়েছে—কেননা, যে "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" আমাদের সর্ব্বপ্রথম গৌরব, সে শাস্ত্র অঙ্গরাজ্যে রচিত হইয়াছিল। বাঙ্গলার লম্বা-চৌড়া অতীতের গুণ বর্ণনা করতে হ'লে, বাঙ্গলা দেশটাকেও একটু লম্বা-চৌড়া করে' নিতে হয়, সম্ভবতঃ সেইজন্য শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের হয়ে অঙ্গকেও বে-দখল করে' বসেছেন। তাই যদি হয়, তা হ'লে বরেন্দ্রভূমিকে ছেঁটে দেওয়া হ'ল কেন? শুনতে পাই, বাঙ্গলার অসংখ্য প্রত্নরাশি বরেন্দ্রভূমি নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে। বাঙ্গলার পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় দিতে গিয়ে বাঙ্গলার যে ভূমি সব চেয়ে প্রত্নগর্ভা, সে প্রদেশের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ না করবার কারণ কি? যদি এই হয় যে, পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গের আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না এবং থাকলেও সে দেশ বঙ্গের বহির্ভূত ছিল—তা হ'লে সে কথাটাও ব'লে দেওয়া উচিত। নচেৎ বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি আমাদের মনের একটা ভুল ধারণা এমনি বদ্ধমূল করে' দেবে যে, তার "আমূল পরিবর্ত্তন" কোন চুটকি ইতিহাসের দ্বারা সাধিত হবে না।

শাস্ত্রী মহাশয় যে তাম্রশাসনে শাসিত নন, তার প্রমাণ,—তিনি পাতায় পাতায় বলেন, "আমি বলি", "আমার মতে" এই সত্য। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাস বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারে না, অর্থাৎ এক কথায় তা কাব্য;—এবং যখন তা কাব্য, তখন তা যে চুটকি হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শাস্ত্রী মহাশয়ের দেখতে পাই, আর একটি এই অভ্যাস আছে যে, তিনি নামের সাদৃশ্য থেকে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু এবং ব্যক্তির ঐক্য প্রমাণ করেন। একীকরণের এ পদ্ধতি অবশ্য বৈজ্ঞানিক নয়। কৃষ্ট এবং খৃষ্ট, এ দুটি নামের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও, ও দুটি অবতারের প্রভেদ শুধু বর্ণগত নয়, বর্গগতও বটে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের অবলম্বিত পদ্ধতির এই একটি মহাগুণ যে, ঐ উপায়ে অনেক পূর্ব্বগৌরব আমাদের হাতে আসে, যা বৈজ্ঞানিক হিসাবে ন্যায়তঃ অপরের প্রাপ্য। কিন্তু উক্ত উপায়ে অতীতকে হস্তান্তর করার ভিতর বিপদও আছে। এদিকে যেমন গৌরব আসে—অপরদিকে তেমনি অগৌরবও আসতে পারে। অগৌরব শুধু যে আসতে পারে, তাই নয়, বস্তুতঃ এসেওছে।

স্বয়ং শাস্ত্রী মহাশয় ঐতরেয় আরণ্যক হ'তে এই সত্য উদ্ধার করেছেন যে, প্রাচীন আর্য্যেরা বাঙ্গালী-জাতিকে পাখী বলে' গালি দিতেন। সে বচনটি এই:—

"বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদ।"

প্রথম পরিচয়ে আর্য্যেরা যে বাঙ্গালী-জাতির সম্বন্ধে অনেক অকথা কুকথা বলেন, তার পরিচয় আমরা এ যুগেও পেয়েছি। Vide Macaulay. সুতরাং প্রাচীন আর্য্যেরাও যে প্রথম পরিচয়ে বাঙ্গালীদের প্রতি নানারূপ কটুকাটব্য প্রয়োগ করেছিলেন, এ কথা সহজেই বিশ্বাস হয়। তবে এ ক্ষেত্রে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, যদি গালি দেওয়াই তাঁদের অভিপ্রায় ছিল, তা হ'লে আর্য্যেরা

আমাদের পাখী বল্লেন কেন?—পাখী বলে' গাল দেবার প্রথা ত কোনও সভ্যসমাজে প্রচলিত দেখা যায় না। বরং "বুলবুল" "ময়না" প্রভৃতি এ দেশে আদরের ডাক বলেই গণ্য এবং ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হ'লে আমরা তাকে "ঘুঘু" উপাধি দানে সম্মানিত করি। অপমান করবার উদ্দেশ্যে মানুষকে যে সব প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে, তারা প্রায়শঃই ভূচর এবং চতুষ্পদ,—দ্বিপদ এবং খেচর নয়। পাখী বলে' নিন্দা কর্‌বার একটিমাত্র শাস্ত্রীয় উদাহরণ আমার জানা আছে। বাণভট্ট তাঁর সমসাময়িক কুকবিদের কোকিল বলে' ভর্ৎসনা করেছেন—কেননা, তারা বাচাল, কামকারী এবং তাদের "দৃষ্টি রাগাধিষ্ঠিত"—অর্থাৎ তাদের চক্ষু রক্তবর্ণ। গাল হিসেবে এ যে যথেষ্ট হ'ল না—সে কথা ভাণভট্টও বুঝেছিলেন, কেননা, পরবর্ত্তী শ্লোকেই তিনি বলেছেন যে, কুকুরের মত কবি ঘরে ঘরে অসংখ্য মেলে, কিন্তু শরভের মত কবি মেলাই দুর্ঘট। এ স্থলে কবিকে প্রশংসাচ্ছলে কেন শরভ বলা হ'ল—এ কথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন,—তার উত্তর, শরভ জানোয়ার হ'লেও চতুষ্পদ নয়, অষ্টপদ,—এবং তার অতিরিক্ত চারিখানি পা ভূচর নয়, খেচর।

এই সব কারণে, কেবলমাত্র শব্দের সাদৃশ্য থেকে এ অনুমান করা সঙ্গত হবে না যে, আর্য্য ঋষিরা অপর এত কড়াকড়া গাল থাকতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কেবলমাত্র পাখী বলে' গাল দিয়েছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে আমাদের সঙ্গে মাগধ এবং চের জাতিও এ গালির ভাগ পেয়েছে। কেননা, তাঁর মতে বঙ্গা হচ্ছে বাঙ্গালী, বগধা হচ্ছে মগধা এবং চেরপাদা হচ্ছে চের নামক অসভ্য জাতি। "চেরপাদা" যে কি করে' "চের"তে দাঁড়াল, তা বোঝা কঠিন। বাক্যের পদচ্ছেদের অর্থ পা কেটে ফেলা নয়। অথচ শাস্ত্রী মহাশয় "চেরপাদা"র পা-দুখানি কেটে ফেলেই "চের" খাড়া করেছেন।

"বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা"—এই যুক্তপদের শুনতে পাই সেকেলে পণ্ডিতেরা এইরূপ পদচ্ছেদ করেন—

বঙ্গা+অবগধাঃ+চ+ইরপাদা।

ইরপাদা অর্থে সাপ। তা হ'লে দাঁড়াল এই যে, বাঙ্গালী ও বেহারীকে প্রথমে পাখী এবং পরে সাপ বলা হয়েছে। উক্ত বৈদিক নিন্দার ভাগ আমি বেহারীদের দিতে পারিনে। অবগধা মানে যে মাগধ, এর কোনও প্রমাণ নেই। অতএব শাস্ত্রী মহাশয় যেমন "চেরপাদা"র শেষ দুই বর্ণ ছেঁটে দিয়ে "চের" লাভ করেছেন, আমিও তেমনি "অবগধা" শব্দের প্রথম দুটি বর্ণ বাদ দিয়ে পাই "গধা"। এইরূপ বর্ণ-বিচ্ছেদের ফলে উক্ত বচনের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আর্য্য ঋষিদের মতে বাঙ্গালী আদিতে পক্ষী, অন্তে সর্প, এবং ইতিমধ্যে গর্দ্দভ।

"অবগধা"কে "গধা"য় রূপান্তরিত করা সম্বন্ধে কেউ কেউ এই আপত্তি উত্থাপন কর্‌তে পারেন যে, সেকালে যে গাধা ছিল, তার কোনও প্রমাণ নেই। শাস্ত্রী মহাশয় বাঙ্গালীর প্রথম গৌরবের কারণ দেখিয়েছেন যে, পুরাকালে বাঙ্গলায় হাতী ছিল—কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বিতীয় গৌরবের এ কারণ দেখান নি যে, সেকালে এ দেশে গাধাও ছিল। কিন্তু গাধা যে ছিল, এ অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। কেননা, যদি সে কালে গাধা না থাকৃত ত এ কালে এ দেশে এত গাধা এল কোথা থেকে? ঘোড়া যে বিদেশ থেকে এসেছে, তার পরিচয় ঘোড়ার নামেই পাওয়া যায়, যথা—পেগয়া, ভুটিয়া, তাজি, আরবী ইত্যাদি। কিন্তু গর্দ্দভদের এরূপ কোনও নামরূপের প্রভেদ দেখা যায় না। এবং ও জাতি যে, যে-কোনও অর্ব্বাচীন যুগে বঙ্গদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তারও কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।—অতএব ধরে' নেওয়া যেতে পারে—রাসভকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এ দেশে এখনও আছে, পূর্ব্বেও ছিল। তবে একমাত্র নামের সাদৃশ্য থেকে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হবে যে, আর্য্য ঋষিরা পুরাকালের বাঙ্গালীদের এরূপ তিরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন। সংস্কৃত-ভাষায় "বঙ্গ" শব্দের অর্থ বৃক্ষ। সুতরাং [illegible] নেওয়া যেতে পারে যে, আরণ্যক শাস্ত্রে বৃক্ষ, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি আরণ্য জীবজন্তরই উল্লেখ করা হয়েছে—বাঙ্গালীর নামও করা হয় নি। অতএব আমাদের অতীত অতি গৌরবেরও বস্তু নয়—অতি অগৌরবেরও বস্তু নয়।

আর একটি কথা। হীরেন্দ্রবাবু দর্শন-শব্দের এবং যোগেশ বাবু বিজ্ঞান-শব্দের নিরুক্তের আলোচনা করেছেন, কিন্তু যদুবাবু ইতিহাসের নিরুক্ত সম্বন্ধে নীরব। ইতিহাস-শব্দ সম্ভবতঃ হস্‌ ধাতু হ'তে উৎপন্ন—অন্ততঃ শাস্ত্রী মহাশয়ের ইতিহাস যে হাস্যরসের উদ্রেক করে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। এমন কি, আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, শাস্ত্রী মহাশয় পুরাতত্ত্বের ছলে আত্ম-শ্লাঘাপরায়ণ বাঙ্গালীজাতির সঙ্গে একটি মস্ত রসিকতা করেছেন।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।

সাহিত্যে খেলা

১

জগৎ-বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোডঁ্যা—যিনি নিতান্ত জড় প্রস্তরের দেহ থেকে অসংখ্য জীবিত-প্রায় দেব-দানব কেটে বার করেছেন, তিনিও শুনতে পাই, যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে, আঙ্গুলের টিপে মাটির পুতুল তয়ের করে' থাকেন। এই পুতুল-গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা। শুধু রোডঁ্যা কেন, পৃথিবীর শিল্পীমাত্রেই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। যিনি গড়্তে জানেন, তিনি শিবও গড়্তে পারেন, বাঁদরও গড়্তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড় বড় শিল্পীদের তফাৎ এইটুকু যে, তাঁদের হাতে এক করুতে আর হয় না। সম্ভবতঃ এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুসি-তাই করুবার যে অধিকার আছে, ইতর-শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হ'তে দেবতারা মধ্যে মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে কেউ আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্ত্ত্যবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, যখন এ জগতে দশটা দিক্ আছে, তখন এই সব-দিকেই গতায়াত করবার প্রবৃত্তিটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মন উঁচুতেও উঠ্তে চায়, নীচুতেও নাম্তে চায়; বরং সত্য কথা বলতে গেলে, সাধারণ লোকের মন স্বভাবতই যেখানে আছে, তারি চারপাশে ঘুরে বেড়াতে চায়—উড়্তেও চায় না, ডুবতেও চায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে, সাধারণ লোককে, কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি কাব্য,—সকল রাজ্যেই অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাকতেই পরামর্শ দেয়। একটু উঁচুতে না চড়্লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন-মন আকর্ষণ করুতে পারিনে। বেদীতে না বস্লে, আমাদের উপদেশ কেউ মানে না; রঙ্গমঞ্চে না চড়্লে, আমাদের অভিনয় কেউ দেখে না; আর কাষ্ঠমঞ্চে না দাঁড়ালে, আমাদের বক্তৃতা কেউ শোনে না। সুতরাং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে থাকবার লোভে আমরাও অগত্যা চব্বিশ ঘণ্টা টংয়ে চড়ে' থাক্তে চাই,—কিন্তু পারিনে। অনেকের পক্ষে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত উচ্চস্থানে ওঠবার চেষ্টাটাই মহা-পতনের কারণ হয়। এ সব কথা বলবার অর্থ এই যে, কষ্টকর হ'লেও আমাদের পক্ষে অবশ্য মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু ডাইনে-বাঁয়ে ছোট-খাট গলিঘুঁজিতে খেলাচ্ছলে প্রবেশ করবার যে অধিকার তাঁদের আছে, সে অধিকারে আমরা কেন বঞ্চিত হব? গান করুতে গেলেই যে সুর তারায় চড়িয়ে রাখ্তে হবে, কবিতা লিখ্তে হ'লেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রখর ভাব প্রকাশ করুতে হবে, এমন কোন নিয়ম থাকা উচিত নয়। শিল্পরাজ্যে খেলা করুবার প্রবৃত্তির ন্যায় অধিকার বড়-ছোট সকলেরি সমান আছে। এমন কি, এ কথা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না যে, এ পৃথিবীতে একমাত্র খেলার ময়দানে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ নাই। রাজার ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের ছেলেরও খেলায় যোগ দিবার অধিকার আছে। আমরা যদি একবার সাহস করে' কেবল-মাত্র খেলা করবার জন্য সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করি, তা হ'লে নির্ব্বিবাদে সে জগতের রাজা-রাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সে ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লেই নিম্ন-শ্রেণীতে পড়ে' যেতে হবে।

২

লেখকেরাও অবশ্য দশের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন, বাহবা না পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন—কেননা, তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ সামাজিক জীব,—বাদ-বাকী সকলে কেবলমাত্র পারিবারিক। বিশ্বমানবের মনের সঙ্গে নিত্যনূতন সম্বন্ধ পাতানোই হচ্ছে কবি-মনের নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম। এমন কি, কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতি-কবিতাতে রঙ্গ-ভূমির স্বগতোক্তিস্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে' সেই মর্ম্মকথা, হাজার লোকের কাণের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু উচ্চমঞ্চে আরো-হণ করে' উচ্চৈঃস্বরে উচ্চবাচ্য না করলে যে জনসাধা-রণের নয়নমন আকর্ষণ করা যায় না, এমন কোন কথা নেই। সাহিত্য-জগতে যাঁদের খেলা করবার প্রবৃত্তি আছে, সাহস আছে ও ক্ষমতা আছে—মানুষের নয়নমন আকর্ষণ করবার সুযোগ বিশেষ করে' তাঁদের কপালেই ঘটে। মানুষে যে খেলা দেখ্তে ভালবাসে, তার পরিচয় ত আমরা এই জড় সমাজেও নিত্যই পাই। টাউনহলে বক্তৃতা শুনতেই বা ক'জন যায়—আর গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখ্তেই বা ক'জন যায়? অথচ এ কথাও সত্য যে, টাউনহলের বক্তৃতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ—ভারত উদ্ধার—আর গড়ের মাঠের খেলোয়াড়দের ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশূন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীন। আসল কথা এই যে, মানুষের দেহমনের সকলপ্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ—কেননা, তা উদ্দেশ্যহীন।

মানুষে যখন খেলা করে, তখন সে এক আনন্দ ব্যতীত অপর কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই, কিন্তু উপরি-পাওনার আশা আছে, তার নাম খেলা নয়, জুয়াখেলা;—ও ব্যাপার সাহিত্যে চলে না, কেননা, ধর্ম্মতঃ জুয়াখেলা লক্ষ্মীপূজার অঙ্গ, সরস্বতীপূজার নয় এবং যেহেতু খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয়, সে কারণ তা কারও নিজস্ব হ'তে পারে না। এ আনন্দে সকলেরই অধিকার সমান।

সুতরাং সাহিত্যে খেলা করবার অধিকার যে আমাদের আছে, শুধু তাই নয়—স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের যুগপৎ-সাধনের জন্য মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে লেখক সাহিত্য-ক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে ব্রতী হন, যিনি কোনরূপ কার্য্য-উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন,—তিনি গীতের মর্ম্মও বোঝেন না, গীতার ধর্ম্মও বোঝেন না; কেননা, খেলা হচ্ছে জীব-জগতে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। স্বয়ং ভগবান্ বলেছেন, যদিচ তাঁর কোনই অভাব নেই, তবুও তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন; অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ—সে সৃজনের মূলে কোনও অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই—সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্ত্তি, এবং তার ফুল আনন্দ। এক কথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র, এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত—কেননা, জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ।

৩

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া,—কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে' পরের জন্যে খেলনা তৈরী করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাঙ্গলা-দেশে আজ দুর্ল্লভ নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্ম্মের জয়ঢাক,—এই সব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্য-রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হ'তে পারে, কিন্তু তা গড়ে' লেখকের মনস্তুষ্টি হ'তে পারে না। কারণ, পাঠকসমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙ্গে ফেলে;—সে প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জার্ম্মানীরই হোক্, দুদিন ধরে' তা কারও মনোরঞ্জন করতে পারে না। আমি জানি যে, পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শঃই বেদনা বোধ করে' থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই—কেননা, কাব্য-জগতে যার নাম আনন্দ, তারি নাম বেদনা। সে যাই হোক, পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন—তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হ'লে তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব্ব মিলন সঙ্ঘটিত হ'ত; কেননা, Knowledge এবং Art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। "বিদ্যা-সুন্দর" খেলনা হ'লেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা—সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত; তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে,—অন্ততঃ জহুরীর কাছে। অপরপক্ষে এ যুগে পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ—সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হ'লে, আমাদের অতি সস্তা খেলনা গড়তে হবে—নইলে তা বাজারে কাটবে না এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সঙ্গত। অতএব সাহিত্যে আর যাই কর না কেন, পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা কোরো না।

৪

তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া? অবশ্য নয়। কেননা, কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হ'লে যে খেলার সময় আসে না, এ ত সকলেরি জানা কথা। কিন্তু সাহিত্য রচনা যে আত্মার লীলা, এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং, শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্ম্মকর্ম্ম যে এক নয়—এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে' দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ, শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু, যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে,—কেননা, শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো; সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো। কাব্য যে সংবাদপত্র নয়—

এ কথা সকলেই জানেন। তৃতীয়তঃ, অপরের মনের অভাব পূর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে—কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দ দান করা—শিক্ষা দান করা নয়—একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি আদিতে মুনিঋষিদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন,—জনগণের জন্য নয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বড় বড় মুনিঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে' মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ—তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি, কৌপীন পর্য্যন্ত পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্যহিসাবে যে অমর এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে পঠনে আনন্দ উপভোগ করে, তার একমাত্র কারণ, আনন্দের ধর্ম্মই এই যে, তা সংক্রামক। অপর পক্ষে লাখে একজনও যে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের ছায়া মাড়ান না, তার কারণ, সে বস্তু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জন্যে নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কস্মিন্‌কালেও স্কুলমাষ্টারির ভার নেয়নি। এতে দুঃখ করবার কোনও কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাষ্টারেরা একালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।

কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী—এ যুগের স্কুল এবং তার মাষ্টার। কাব্য—পড়বার ও বোঝবার জিনিস; কিন্তু স্কুলমাষ্টারের কাজ হচ্ছে—বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুলমাষ্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে যাক্, চার চক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমরা কাব্যের রূপ দেখতে পাইনে,—শুধু তার গুণ শুনি। টীকাভাষ্যের প্রসাদে আমরা কাব্যসম্বন্ধে সকল নিগূঢ়তত্ত্ব জানি, কিন্তু সে যে কি বস্তু, তা চিনি নে। আমাদের শিক্ষকদের প্রসাদে আমাদের এ জ্ঞানলাভ হয়েছে যে, পাথুরে' কয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র—অপর পক্ষে হীরক ও কাচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, অপরটির মানুষের হাতে; এবং এ উভয়ের ভিতর এক দা-কুমড়ার সম্বন্ধ ব্যতীত অপর কোনও সম্বন্ধ নেই। অথচ এত জ্ঞান সত্ত্বেও আমরা সাহিত্যে কাচকে হীরা এবং হীরাকে কাচ ব'লে নিত্য ভুল করি এবং হীরা ও কয়লাকে এক-শ্রেণীভুক্ত করতে তিলমাত্র দ্বিধা করি নে;—কেননা, ওরূপ করা যে সঙ্গত, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের মুখস্থ আছে। সাহিত্য—শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা, মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উল্টো। কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তার পরে তার শবচ্ছেদ করা—এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এই সব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়,—কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়। বিচারের সাহায্যে এই মাত্রই প্রমাণ করা যায়। তবে বস্তু যে কি, তার জ্ঞান অনুভূতি-সাপেক্ষ, তর্ক-সাপেক্ষ নয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে—এ কথার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয়, তা হ'লে কোন সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পষ্টতর করা আমার অসাধ্য।

এই সব কথা শুনে আমার জনৈক শিক্ষাভক্ত বন্ধু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়। এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, সরস্বতীকে কিণ্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত করবার জন্য যতদূর শিক্ষা বাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার, আমি আজও ততদূর হ'তে পারিনি।

শ্রাবণ, ১৩২২।

কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বন্দরে কন্‌গ্রেসের জন্ম হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে তা সাবালক হয়। তার পরবৎসর সুরাট নগরীতে তার মৃত্যু হয়। এ বৎসর আবার তার জন্মস্থানে তার পুনর্জন্ম হয়েছে।

এবার কিন্তু কন্‌গ্রেসের ধড়ে প্রাণ আসে নি, তার প্রাণে ধড় এসেছে। সকলেই জানেন, সুরাটে কন্‌গ্রেসের মৃত্যু হয়নি, তার অপমৃত্যু ঘটেছিল; আর যেমন-তেমন অপমৃত্যু নয়—একসঙ্গে খুন এবং আত্মহত্যা। এ দেশে কারও অপমৃত্যু ঘটলে তার আত্মার তত দিন সদ্গতি হয় না, যত দিন-না তা

আবার একটি নূতন দেহে প্রবেশ লাভ করতে পারে। কন্‌গ্রেসের সূক্ষ্মশরীর তাই এ-কয়-বৎসর একটি স্থূল শরীরের তল্লাসে এ দেশে ও দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অতঃপর বোম্বাই-ধামে তা লাভ করেছে। গত কন্‌গ্রেসে বিশ-হাজার লোক জমায়েৎ হয়েছিল।

কন্‌গ্রেসওয়ালাদের মতে কিন্তু কন্‌গ্রেসের কস্মিন্‌-কালেও মৃত্যু হয়নি। স্থরাটে শুধু স্বরাট পাগল হয়ে কন্‌গ্রেসকে জখম করে' নিজে করেছিলেন আত্ম-হত্যা। তার পর, যেহেতু সে স্বরাট কন্‌গ্রেসেই জন্মলাভ করেছিল, সেই জন্য তার ভূত তার জন্ম-দাতার স্কন্ধে ভর করবার চেষ্টায় ফিরছিল। সেই ভূতের ভয়ে কন্‌গ্রেস এতদিন ঘরের দুয়োর বন্ধ করে' বসেছিল। এই বদ্ধ ঘরের দূষিত বায়ুতেই তার শরীর কাহিল হয়ে গিয়েছিল। অথচ কন্‌গ্রেস এই ভূতের উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনও উপায় বার করতে পারে নি। এবার নব মন্ত্রের বলে স্বরাটের ভূত—ভবিষ্যৎ হয়ে গেছে। তাই কন্‌গ্রে-সের দেহটি আবার নাদুসনুদুস্‌ হয়ে উঠেছে। এক কথায় কন্‌গ্রেস এবার বেঁচে উঠে নি—বেঁচে গিয়েছে।

সে যাই হোক। কন্‌গ্রেসের এবার ভোল ফিরেছে এবং সেই সঙ্গে তার বোল ফিরেছে। এতদিন কন্‌গ্রেস ছিল বড়দিনের দুর্গোৎসব। তিনদিন ধ'রে "ধনং দেহি মানং দেহি" বলে' দু'সন্ধ্যা ইংরাজীতে মন্ত্র আওড়ান এবং সেই উপলক্ষে খানাপিনা নাচ-তামাসা আমোদ-আহ্লাদ, এবং তার পরে বিসর্জ্জন এবং তার পরে কন্‌গ্রেসওয়ালাদের পরস্পর কোলা-কুলি করে' গৃহাভিমুখে যাত্রা,—এই ছিল কন্‌গ্রেসের হাল ও চাল।

ভবিষ্যতে শুনছি কন্‌গ্রেসের সপ্তমী অষ্টমী নবমী থাকবে, কিন্তু দশমীতেই সব শেষ হবে না। তার পর বারোমাস ধরে' কন্‌গ্রেস তার স্বধর্ম্ম প্রচার করবে। অর্থাৎ কন্‌গ্রেস এবার জাতীয়-রাজনৈতিক-শিক্ষা-পরিষদে পরিণত হ'ল। কনগ্রেসের এ সঙ্কল্প অতি সাধু-সংকল্প সন্দেহ নেই—কিন্তু যে বিষয়ে সন্দেহ আছে, তা হচ্ছে এই যে, এ সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হবে কি না!

প্রথমতঃ রাজনীতি বলতে যা বোঝায়, তা দেশ-শুদ্ধ লোককে বোঝানো কঠিন। ও-পদার্থ আমরা ইউরোপ থেকে আমদানী করেছি। সে দেশে একালে ও-বস্তু হচ্ছে তাই, যার ভিতর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে রাজাও নেই, নীতিও নেই, আবার আর-একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, ও-দুইই আছে। এই দুটো দিক যাতে একসঙ্গে চোখে পড়ে, এমন-করে' দেশের চোখফোটানোর জন্য যে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার আবশ্যক, তা দেশী ভাষা নয়। ব্রহ্ম যে একাধারে সগুণ এবং নির্গুণ, এ সত্য বোঝাতে হ'লে যেমন সংস্কৃত-ভাষার সাহায্য চাই,—তেমনি রাজনীতি যে একসঙ্গে রাজতন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র হ'তে পারে, এ সত্য বোঝাতে হ'লে ইংরাজির সহায্য চাই।

কন্‌গ্রেস অবশ্য এতে পিছপাও হবে না। কেননা, কন্‌গ্রেসের পাণ্ডারা ঐ এক ইংরাজি-ভাষাই জানেন এবং ঐ এক ইংরাজি-ভাষাই মানেন। তবে তাঁদের কথা বোঝে, এমন লোক দেশে ক'টি? অত-এব তাঁরা যদি দেশকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে বসেন ত ফলে দাঁড়াবে এই যে, কন্‌গ্রেসওয়া-লারাই পালা করে' পরস্পর পরস্পারের গুরুশিষ্য হবেন। সুতরাং যত দিন না ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি লোক ইংরাজি-শিক্ষিত হয়ে ওঠে, ততদিন এই রাজনৈতিক শিক্ষার কার্য্যটা মুলতবি রাখাই কর্ত্তব্য। সে শিক্ষা যে শুধু নিষ্ফল হবে, তাই নয়, তার কুফলও হ'তে পারে। শিক্ষা দিতে গিয়ে হয় ত কন্‌গ্রেসকে দুদিন পরে দেশের লোককে বলতে হবে—"উল্টা বুঝলি রাম!" এ বিপদ যে আছে, তার প্রমাণও আছে। আর এরূপ উল্টা বোঝাটা রামের পক্ষে আরামের নয়। এবং সে অবস্থায় কন্‌গ্রেসের পক্ষে তাকে ভ্যাবাগঙ্গারাম বলাটাও সঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় রাজনৈতিক-শিক্ষার জন্য একটা জাতীয় রাজনৈতিক-আদর্শ থাকা আবশ্যক। একটা আইডিয়াল্‌ যে থাকা চাই-ই চাই, এ কথা কন্‌গ্রেসও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। এ স্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কন্‌গ্রেস কি আজও তেমন কোন রাজনৈতিক আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন? তা হ'লে কন্‌গ্রেসওয়ালারা উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিবেন—অবশ্য পেয়েছি; এবং সে আদর্শের নাম হচ্ছে—"সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য।"

নিত্য দেখ্‌তে পাই যে, একদলের মতে ভারতবর্ষে স্বরাজকতার অর্থ হচ্ছে অরাজকতা আর একদলের মতে অরাজকতার অর্থই হচ্ছে স্বারাজকতা। এই দুটি হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক গগনের শুক্ল আর কৃষ্ণপক্ষ। কন্‌গ্রেস অবশ্য এই দুই মতই সমান অগ্রাহ্য করেন; কেননা, এই দুয়ের মধ্যস্থ দল হচ্ছে কন্‌গ্রেস। এ মতে শুদ্ধ-স্বরাজ্য সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ হ'তে পারে, কিন্তু "সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য" সম্বন্ধে হতে' পারে না। কেননা, সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য যে খাপ খাওয়ানো যেতে পারে, তার উদাহরণ ক্যানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সাউথ-আফ্রিকা প্রভৃতি। সুতরাং যার এত নজির আছে, সেই আদর্শের পক্ষে ওকালতি করায় বাধা নেই; অতএব এ আদর্শ বিদ্যাসঙ্গতও বটে, বুদ্ধিসঙ্গতও বটে; কেননা, যদি বর্ত্তমানের উপাদান নিয়ে ভবিষ্যতের মূর্ত্তি গড়তে হয়, তা হ'লে এ ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ হ'তে পারে না। তবে এই আদর্শকে বিপক্ষ-পক্ষ হেসে এই প্রশ্ন করেন যে—

"তুমি কোন্ গগনের ফুল?
তুমি কোন্ বামনের চাঁদ?"

এর উত্তরে স্বয়ং প্রশ্নকর্ত্তাই বলেন যে, এ আদর্শ ইংরাজি-শিক্ষিত ভারতবর্ষের চিদ্ আকাশের ফুল এবং ইংরাজি-শিক্ষিত ভারতবর্ষের অমাবস্যার চাঁদ।

এ কথা শুনে কন্‌গ্রেস বলেন, এ ভবিষ্যতের আদর্শ;—এবং সে ভবিষ্যৎও এত দূর-ভবিষ্যৎ যে, বর্ত্তমানের ধূলো যাঁদের চোখে ঢুকেছে, সেই সকল অন্ধলোকেই এর সাক্ষাৎ পান না বলে' এর অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন না। এ আদর্শ ভারতবর্ষের কল্পনার ধন। এত হাতে নাগাল পাবার জিনিস নয়—মনশ্চক্ষে দূরবীণ কশে এ আদর্শ দেখতে হয়। কন্‌গ্রেসের সকল বাণীই সে ভবিষ্যদ্বাণী, এ জ্ঞান থাকলে বিপক্ষ-পক্ষ কন্‌গ্রেসের কথা শুনে আর হাস্‌ত না।

ভবিষ্যতে কি হ'তে পারে আর না হ'তে পারে, সে বিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ স্বয়ং ভগবান্ ছাড়া আর কেউ কিছু বল্‌তে পারেন না। সুতরাং দূর-ভবিষ্যতে যে ঐ আদর্শ চাঁদ ভারতবাসীর হাতে আসবে না এবং তাদের মাথায় ঐ আকাশকুসুমের পুষ্পবৃষ্টি হবে না—এ কথা জোর করে' কে বল্‌তে পারে! তবে এখন ঐ চাঁদকে ডেকে "আয় আয় আমাদের মাথায় টী দিয়ে যা"—আর ঐ আকাশকুসুমকে ডেকে—"যেখানে আছ সেখানেই থাকো, দেখো যেন ঝরে' আমাদের গায়ে পড়ো না"—এ কথা বলা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। কেননা, বেশী আলোয় আমাদের চোখ ঝল্‌সে যায়, আমরা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাই।

তবে কথা হচ্ছে এই যে, বর্ত্তমানকে আমরা একেবারেই উপেক্ষা করতে পারি নে, কেননা, এ পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যা সম্বন্ধ, তা বর্ত্তমানেরই সম্বন্ধ। "চোখ বুজলেই অন্ধকার"—এ প্রবাদ ত সকলেই জানেন। সুতরাং আমাদের খোলাচোখের জন্যও একটা আদর্শ থাকা দরকার। আমরা চাই সেই ফুল, যার দ্বারা মা'র নিত্যপূজা চল্‌বে, আর সেই চাঁদ, যার আলোতে আমরা রাত্তিরে পথ দেখ্‌তে পাব। বলা বাহুল্য যে, এদেশে এখন রাত্তির, আর আমরা জাতকে-জাত রাত-কাণা।

অতএব কন্‌গ্রেসের পক্ষে জাতীয় রাজনৈতিক-শিক্ষা-পরিষৎ হবার পূর্ব্বে, জাতীয় রাজনৈতিক-আদর্শ-অনুসন্ধান-সমিতি হওয়া কর্ত্তব্য।

ইতিমধ্যে আমি একটি আটপৌরে আদর্শ দেশের হাতে ধরে' দিতে চাই। আমার কথা এই—এস আমরা ঘরে বসে' নিজের নিজের চরকায় বিলেতি তেল দিই, তা হলেই সকলে মিলে ভারতমাতার চরকায় স্বদেশী তেল দেওয়া হবে এবং তাতে মা আমাদের যে কাট্‌না কাটবেন, তার সুতো মাকড়সার সুতোর চাইতেও সূক্ষ্ম হবে—এবং সেই সুতোর জাল বুনে সেই ফাঁদে আমরা আকাশের চাঁদ ধরব।

ফাল্গুন, ১৩২২।

প্রত্ন-তত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস

১

ভারতবর্ষের যে কোনও ভবিষ্যৎ নেই, সে বিষয়ে বিদেশীর দল ও স্বদেশীর দল উভয়েই একমত। আমাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা ভবিষ্যৎ নিয়ে কারবার করেন; এক যাঁরা রাজ্যের সংস্কার চান, আর এক যাঁরা সমাজের সংস্কার চান। বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতে পরিণত করতে হ'লে, তার সংস্কার অর্থাৎ পরিবর্ত্তন করা

আবশ্যক। এই নিয়েই ত যত গোল! যা আছে, তার বদল করা যে রাজ্য-শাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে রাজ্য-শাসকদের মত; আর যা আছে, তার বদল করা যে সমাজ শাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে সমাজ-শাসিতদের মত। অতএব দেখা গেল যে, ভারতবর্ষের যে ভবিষ্যৎ নেই এবং থাকা উচিত নয়,---এ সত্য ইংরাজি ও সংস্কৃত উভয় শাস্ত্রমতেই প্রতিপন্ন হচ্ছে।

২

ভবিষ্যৎ না থাক্, গতকল্য পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অতীত বলে' একটা পদার্থ ছিল; শুধু ছিল বলে' ছিল না,—আমাদের দেহের উপর, আমাদের মনের উপর তা একদম চেপে বসেছিল। কিন্তু আজ শুনছি, সে অতীত ভারতবর্ষের নয়,—অপর দেশের। এ কথা শুনে আমরা সাহিত্যিকের দল বিশেষ ভীত হয়ে পড়েছি। কেননা, এতদিন আমরা এই অতীতের কালিতে কলম ডুবিয়ে বর্ত্তমান সাহিত্য রচনা করছিলুম। এই অতীত নিয়ে আমাদের ভিতর যাঁর অন্তরে বীররস আছে, তিনি বাহ্বাস্ফোটন করুতেন, যাঁর অন্তরে করুণরস আছে, তিনি ক্রন্দন করুতেন, যাঁর অন্তরে হাস্যরস আছে, তিনি পরিহাস করুতেন, যাঁর অন্তরে শান্তরস আছে, তিনি বৈরাগ্য প্রচার করুতেন, আর যাঁর অন্তরে বীভৎস রস আছে, তিনি কেলেঙ্কারী করুতেন। কিন্তু অতঃপর এই যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, ভারতবর্ষের অতীত আমাদের পৈতৃক ধন নয়, কিন্তু তা পরের,—তা হ'লে সে ধন নিয়ে সাহিত্যের বাজারে আমাদের আর পোদ্দারি করা চলুবে না। এক কথায় ইতিহাসের পক্ষে যা পোষ মাস, সাহিত্যের পক্ষে তা সর্ব্বনাশ।

৩

আমাদের এতকালের অতীত যে রাতারাতি হস্তান্তরিত হয়ে গেল, সেও আমাদের অতিবুদ্ধির দোষে। এ অতীত যতদিন সাহিত্যের অধিকারে ছিল, ততদিন কেউ তা আমাদের হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে নি। সাহিত্যকে উচ্ছেদ করে', বিজ্ঞান অতীতকে দখল করুতে যাওয়াতেই, আমরা ঐ অমূল্য বস্তু হারাতে বসেছি। সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষের অতীত থাকুলেও, তার ইতিহাস ছিল না। কাজেই এই অতীতের সাদা কাগজের উপর আমরা এতদিন, স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে, আমাদের মনোমত ইতিহাস লিখে যাচ্ছিলুম। ইতিমধ্যে বাঙ্গলায় একদল বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করে' সে ইতিহাসকে উপন্যাস বলে' হেসে উড়িয়ে দিয়ে, এমন ইতিহাস রচনা করুতে কৃতসংকল্প হলেন, যার ভিতর রসের লেশমাত্র থাক্‌বে না—থাকুবে বস্তুতন্ত্রতা। এঁরা আহেলা বিলাতি শিক্ষার মোহে এ কথা ভুলে গেলেন যে, অতীতে হিন্দুর প্রতিভা, ইতিহাসে নয়—পুরাণে, বিজ্ঞানে নয়—দর্শনে ফুটে উঠেছিল। অতীতের মর্ম্মগ্রহণ না করে', তার চর্ম্মগ্রহণ করুতে যাওয়াতেই সে দেশত্যাগী হ'তে বাধ্য হ'ল। এতে তাঁদের কোনও ক্ষতি নেই, মধ্যে থেকে সাহিত্য শুধু দেউলে হয়ে গেল। বিজ্ঞানের প্রদীপ যে সাহিত্যের লালবাতি—এ কথা কে না জানে?

৪

আমরা সাহিত্যিকের দল অতীতকে আকাশ হিসেবে দেখতুম—অর্থাৎ আমাদের কাছে ও-বস্তু ছিল একটি অখণ্ড মহাশূন্য। সুতরাং সেই আকাশে আমরা কল্পনার সাহায্যে এমন সব গিরি-পুরী নির্ম্মাণ করে' চলেছিলুম, যার ত্রিসীমানার ভিতর বিজ্ঞানের গোলাগুলি পৌঁছয় না। বাঙ্গলার নবীন প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এ কার্য্যটি অকার্য্য ব'লেই স্থির হ'ল, কেননা, বৈজ্ঞানিক মতে ইতিহাস গড়বার জিনিসও নয়, পড়বার জিনিসও নয়—শুধু খোঁড়বার জিনিস। সুতরাং ও জিনিসের অন্বেষণ পায়ের নীচে করুতে হবে,—মাথার উপরে নয়। যাঁরা আবিষ্কার করুতে চান, তাঁদের কর্ম্মক্ষেত্র ভূলোক,--দ্যুলোক নয়; কেননা, আকাশদেশ ত স্বতঃ আবিষ্কৃত।

এই কারণে, সক্রেটিস যেমন দর্শনকে আকাশ থেকে নামিয়ে মাটির উপরে এনে ফেলেছিলেন, আমাদের বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরাও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আকাশ থেকে পেড়ে মাটির নীচে পুঁতে ফেলেছেন।

৫

এ দলের মতে, ভারতবর্ষের অতীত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলেও পঞ্চভূতে মিশিয়ে যায় নি,—কেননা, কাল, অতীতের অগ্নিসংকার করে না, শুধু তার গোর দেয়। এক কথায়, অতীতের আত্মা স্বর্গে গমন করুলেও তার দেহ পাতালে প্রবেশ করে। তাই

ভারতবর্ষ, ইতিহাসের মহাশ্মশান নয়,—মহা-গোরস্থান। অতএব ভারতবর্ষের কবর খুঁড়ে তার ইতিহাস বার করতে হবে। এই জ্ঞান হবামাত্র আমাদের দেশের যত বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ লোকে কোদাল পাড়তে সুরু করলেন,—এই আশায় যে, এ দেশের উত্তরে-দক্ষিণে, পূর্ব্বে-পশ্চিমে, যেখানেই কোদাল মারা যাবে, সেখানেই লুপ্ত সভ্যতার গুপ্তধন বেরিয়ে পড়বে। আর সে ধনে আমরা এমনি ধনী হয়ে উঠব যে, মনোজগতে খোরপোষের জন্য আমাদের আর চাষ-আবাদ করতে হবে না।

এই খোঁড়াখুঁড়ির ফলে, সোনা না হোক্—তামা বেরিয়েছে, হীরে না হোক্—পাথর বেরিয়েছে। কিন্তু এ যে-সে তামা, যে-সে পাথর নয়,—সব হরফ কাটা। এই সব মুদ্রাঙ্কিত তাম্রফলকের বিশেষ কিছু মূল্য নেই,—তা পয়সারই মত সস্তা। এ কালেও আমরা শিল কুটি, কিন্তু সেই কোটা-শিল পড়া যায় না, কেননা, তার অক্ষর সব রেখাক্ষর। কিন্তু অতীতের এই ক্ষোদিত পাষাণের কথা স্বতন্ত্র। —বিদ্যা বলেছিলেন :—

"শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়" :—

কিন্তু আজকাল যদি কেউ বলেন যে—

"কপি জলে ভেসে যায়, পাষাণে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়"—

তা হ'লে তিনি অবিদ্যারই পরিচয় দেবেন। কেননা, আজকাল পাষাণের সঙ্গীতে দেশ মাতিয়ে তুলেছে। অতীত আজ তার পাষাণ-বদনে, তারস্বরে আত্মপরিচয় দিচ্ছে। কাগজের কথায় আমরা আর কাণ দিই নে। রামায়ণ-মহাভারত এখন উপন্যাস হয়ে পড়েছে এবং ইতিহাস এখন বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছে। তার কারণ, আমরা মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছি যে, যাকে আমরা হিন্দু সভ্যতা বলি, সেটি একটি অর্ব্বাচীন পদার্থ,—বৌদ্ধ সভ্যতার পাকা বুনিয়াদের উপরেই তা প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্ব্বনিম্নস্তরে যা পাওয়া যায়, সে হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম্ম। ফলে, আমরা হিন্দু হলেও বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়েই গৌরব করছিলুম। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, পাটলীপুত্রই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল,—একাধারে জন্মভূমি এবং পীঠস্থান।

৬

কথা-সরিৎ-সাগরের প্রসাদে পাটলীপুত্রের জন্মকথা আমরা সকলেই জানতুম এবং আমরা,—কাব্যরসের রসিকেরা,—সেই জন্ম-বৃত্তান্তই সাদরে গ্রাহ্য করে' নিয়েছিলুম ; কেননা, সে কথায় বস্তুতন্ত্রতা না থাকলেও রস আছে,—তাও আবার একটি নয়, তিন তিনটি,—মধুর, বীর এবং অদ্ভুত রস। পুত্র কর্ত্তৃক পাটলী-হরণের বৃত্তান্ত—কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণী-হরণ এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা-হরণের চাইতেও অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। কৃষ্ণ প্রভৃতি রথে চড়ে' স্থলপথে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু পুত্র পাটলীকে ক্রোড়স্থ করে', মায়া-পাদুকায় ভর দিয়ে নভোমার্গে উড্ডীন হয়েছিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন স্ব স্ব নগরীতে প্রস্থান করেছিলেন ;—পুত্র কিন্তু তাঁর মায়া-যষ্টির সাহায্যে যে-পুরী আকাশে নির্ম্মাণ করেছিলেন, সেই পুরী ভূমিষ্ঠ হয়ে পাটলীপুত্র নাম ধারণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু যাদুতে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক মতে পাটলীপুত্রকে খনন করা অবশ্যকর্ত্তব্য হয়ে পড়েছিল এবং সে কর্ত্তব্যও সম্প্রতি কার্য্যে পরিণত করা হয়েছে। খোঁড়া জিনিসটের ভিতর একটা বিপদ আছে, কেননা, কোনও কোনও স্থলে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

Dr. Spooner নামক জনৈক প্রত্নতত্ত্বের কর্ত্তাব্যক্তি এই ভূমধ্য রাজধানী খনন করে' আবিষ্কার করেছেন যে, এ দেশের মাটি খুঁড়লে দেখা যায় যে, তার নীচে ভারতবর্ষ নেই,—আছে শুধু পারস্য। Palimpsest নামক এক প্রকার প্রাচীন পুথি পাওয়া যায়, যার উপরে এক ভাষায় লেখা থাকে, আর নীচে আর এক ভাষায়। বলা বাহুল্য, উপরে যা লেখা থাকে, তা জাল,—আর নীচে যা লেখা থাকে, তাই আসল। Dr. Spooner-এর দিব্য-দৃষ্টিতে এতকাল পরে ধরা পড়েছে যে, আমরা যাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলি, সে হচ্ছে একটি বিরাট Palimpsest,—তার উপরে পালি কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় যা লেখা আছে, তা জাল, আর তার নীচে যা লেখা আছে, তাই আসল। সে লেখা অবশ্য ফার্সি —কেননা, আমরা কেউ তা পড়তে পারি নে! Dr. Spooner-এর কথা বৈজ্ঞানিকেরা মেনে না নিন্, মান্য করতে বাধ্য,—কেননা, সেকালের কাব্যের যাদুবর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু একালের যাদুবরের কাব্যকে তা করা চলে না।

Dr. Spooner তাঁর নবমত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নানা প্রমাণ, নানা অনুমান, নানা-দর্শন, নানা নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। এ সকলের মূল্য যে কি, তা নির্ণয় করা আমার সাধ্যের অতীত। এই পর্য্যন্ত

বল্‌তে পারি যে, তিনি এমন একটি যুক্তি বাদ দিয়েছেন, যার আর কোনও খণ্ডন নেই। Spooner সাহেবের মতে, যার নাম অসুর,তারই নাম দানব,—এবং যার নাম দানব, তারই নাম শক্,—এবং যার নাম শক্, তারই নাম পার্শি। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্বীকার করতেই হবে যে, এ দেশের মাটি খুঁড়লে পার্শি সহর বেরিয়ে পড়তে বাধা। দানবপুরী যে পাতালে অর্থাৎ মাটির নীচে অবস্থিত, এ কথা ত হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।

৭

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের ভবিষ্যৎও নেই, অতীতও নেই। এক বাকী থাকল—বর্ত্তমান। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যকে এখন থেকে এই বর্ত্তমান নিয়েই কারবার করতে হবে। এ অবশ্য মহা মুস্কিলের কথা। বই পড়ে' বই লেখা এক, আর নিজে বিশ্বসংসার দেখেশুনে লেখা আর। এ কাজ করতে হ'লে চোখকাণ খুলে রাখতে হবে, মনকে খাটাতে হবে,—এক কথায় সচেতন হ'তে হবে। তার পর এত কষ্ট স্বীকার করে' যে সাহিত্য গড়তে হবে, সে সাহিত্য সকলে সহজে গ্রাহ্য করবেন না। মানুষে বর্ত্তমানকেই সব চাইতে অগ্রাহ্য করে। যাঁদের চোখকাণ বোজা, আর মন পঙ্গু, তাঁরা এই নব সাহিত্যকে নবীন ব'লে নিন্দা করবেন। তবে এর মধ্যে আরামের কথা এই যে, বর্ত্তমানের কোনও ইতিহাস নেই,—সুতরাং এখন হ'তে বঙ্গ-সরস্বতীর ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাবে।

আষাঢ়, ১৩২৩।

শিশু-সাহিত্য

যে-কোনও ভাষাতেই হো'ক না কেন, সমাস ব্যবহারের ভিতর যে বিপদ আছে, সে বিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক আমাদের সতর্ক করে' দিয়েছেন। আমরা যদি কথার গায়ে কথা জড়িয়ে লিখি, তা হ'লে পাঠকদের পক্ষে তা ছাড়িয়ে নিয়ে পড়া কঠিন। ত্বষ্টা পুত্র বৃত্রকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন—"ইন্দ্রশত্রু হও"। কিন্তু সমাসের কৃপায় সে বর যে কি মারাত্মক শাপে পরিণত হয়েছিল, তার আমূল বিবরণ শতপথব্রাহ্মণে দেখতে পাবেন। সুতরাং পাঠক যাতে উল্টো না বোঝেন, সে-কারণ এ প্রবন্ধের সমস্ত-নামটির অর্থ প্রথমেই বলে' রাখা আবশ্যক। এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত শিশু-সাহিত্যের অর্থ বঙ্গ-সাহিত্য নয়। শিশুদের জন্য বাঙ্গলাভাষায় যে সাহিত্য আজকাল নিত্য-নব সৃষ্টি করা হচ্ছে, সেই সাহিত্যই আমার বিচার্য্য।

শিশু-সাহিত্য বলে' কোনও জিনিস আছে কি না? যা বিশেষ করে' শিশুদের জন্যই লেখা হয়, তাকে সাহিত্য বলা চলে কি না?—এ বিষয়ে অনেকের মনে বিশেষ সন্দেহ আছে; আমার মনে কিন্তু নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শিশু-সাহিত্য বলে' কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না। কেননা, শিশু-পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর কেউ রচনা করতে পারে না, আর শিশুরা সমাজের উপর আর যে অত্যাচারই করুক না কেন,—সাহিত্য রচনা করে না।

বিলেতে Childrenএর সাহিত্য থাকতে পারে, এ দেশে নেই; কেননা, সে দেশের Child-এর সঙ্গে এ দেশের শিশুর ঢের তফাৎ—বয়সে। এ দেশে আর কিছু বাড়ুক আর না বাড়ুক, বয়েস বাড়ে,—আর সে এত তেড়ে যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যত সত্বর শৈশব অতিক্রম করে, পৃথিবীর অপর কোনও দেশে তত শীঘ্র করে না; অন্ততঃ এই হচ্ছে আমাদের ধারণা। ফলে, যে বয়সে ইউরোপের মেয়েরা ছেলেখেলা করে, সেই বয়সে আমাদের মেয়েরা ছেলে মানুষ করে; এবং সেই ছেলে যাতে শীঘ্র মানুষ হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা শৈশবের মেয়াদ পাঁচ বৎসরের বেশী দিই নে। আজকাল আবার দেখতে পাই, অনেকে তার মধ্যেও ছ'বছর কেটে নেবার পক্ষপাতী। শৈশবটা হচ্ছে মানব-জীবনের পতিত জমি এবং আমাদের বিশ্বাস, সেই পতিত জমি যত শীঘ্র আবাদ করা যাবে, তাতে তত বেশী সোনা ফলবে।

বাপমা'র এই সুবর্ণের লোভবশতঃ, এ দেশের ছেলেদের বর্ণপরিচয়টা অতি শৈশবেই হয়ে থাকে। এ কালের শিক্ষিত লোকেরা, ছেলে হাঁটতে শিখলেই তাকে পড়তে বসান। শিশুদের উপর এরূপ অত্যাচার করাটা যে ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; কেননা, যে শৈশবে শিশু ছিল না, সে যৌবনে যুবক হতে পারবে না। আর এ কথা বলা বাহুল্য, শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিশুর শিশুত্ব নষ্ট করা। অর্থাৎ যার আনন্দ উপভোগ করবার শক্তি অপরিমিত, তাকে জ্ঞানের ভোগ ভোগানো। সে ভোগ যে কি কর্ম্মভোগ, তা চেষ্টা করলে আমরাও কল্পনা

করতে পারি। ধরুন, যদি আমরা স্বর্গে যাবামাত্র স্বর্গীয় মাষ্টারমহাশয়দের দল এসে আমাদের স্বর্গ-রাজ্যের হিষ্টরি জিওগ্রাফি শেখাতে এবং দেবভাষার শিশুবোধ-ব্যাকরণ মুখস্থ করাতে বসান, তা হ'লে আমাদের মধ্যে ক'জন নির্ব্বাণ-মুক্তির জন্য লালায়িত না হবেন? আর এ কথাও সত্য যে, শিশুর কাছে এ পৃথিবী স্বর্গ। তার কাছে সবই আশ্চর্য্য, সবই চমৎকার, সবই আনন্দময়।

এ সব কথা অবশ্য বলা বৃথা, কেননা, আমরা শিশুকে শিক্ষা দেবই দেব। মেয়েরা কথায় বলে, "পড়লে শুনলে দুধু ভাতু, না পড়লে ঠেঙ্গার গুঁতো"। কথাটা অবশ্য ষোল-আনা সত্য নয়। সংসারে প্রায়ই দেখা যায়, সরস্বতীর বরপুত্রেরাই লক্ষ্মীর ত্যজ্যপুত্র। আমাদের কিন্তু মেয়েলি শাস্ত্রে ভক্তি এত অগাধ যে, আমরা ছেলেদের ভবিষ্যতের "দুধু-ভাতুর" ব্যবস্থা করবার জন্য বর্ত্তমানে দু'বেলা "ঠেঙ্গার গুঁতোর" ব্যবস্থা করি। ছেলেদের দেহ-মনের উপর মারপিট, বছর সাতেকের জন্য মুলতুবি রাখলে যে কিছু ক্ষতি হয়—অবশ্য তা নয়। যে ছেলে সাত বৎসর বয়সে "সিদ্ধিরস্তু" লিখবে, তিন সাত্তা একুশ বয়সে তার মনস্কামনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে; অর্থাৎ সে সাবালক হবার সঙ্গে সঙ্গেই উপাধিগ্রস্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করবে। তবে যদি কারও চৌদ্দ বৎসরেও স্কুলবাস অস্ত না হয়, তা হ'লে বুঝতে হবে, ভগবান্ তার কপালে উপবাস লিখেছেন। তাকে যত দিন ধরে' যতই লেখাও, সে ঐ এক কপালের লেখাই লিখবে।

শিশু-শিক্ষা জিনিসটে আমরা কেউ বন্ধ করতে পারব না—কিন্তু তাই বলে' কি আমাদের ও-ব্যাপারের যোগাড় দেওয়া উচিত? সাহিত্যের কাজ ত আর সমাজকে এলম দেওয়া নয়,—আক্কেল দেওয়া। সুতরাং আমরা যদি পাঁচ বছর বয়েসের ছেলের যোগ্য এবং উপভোগ্য সাহিত্য লিখতেও পারি, তা হ'লেও আশা করি, কোনও পাঁচ বছরের ছেলে তা পড়তে পারবে না। আর ও-বয়সের কোনও ছেলে যদি পঠনপাঠনে অভ্যস্ত হয়—তা হ'লে তার হাতে শিশু-সাহিত্য নয়, বেদান্ত দেওয়া কর্ত্তব্য! কেননা, সে যত শীঘ্র "বালাযোগী" হয়, তত তার এবং সমাজের উভয়েরই পক্ষে মঙ্গল। প্রথমতঃ ওরকম ছেলের বাঁচা কঠিন, আর যদি সে বাঁচে—তা হ'লে সমাজের বাঁচা কঠিন! কেননা, অমন বাধ্য। অকাল-পক্কতার প্রশ্রয় দেওয়াটা একেবারেই অন্যায়; কেননা, কাঁচা একদিন পাকতে পারে, কিন্তু অকালপক্ক আর ইহজীবনে বাঁচতে পারে না। ইতিহাসে এর প্রমাণ আছে। শিক্ষাবাতিক-গ্রস্ত বাপের তাড়নায় বারো বৎসর বয়সে সর্ব্ব-শাস্ত্রের পারগামী হওয়ার দরুণ, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হৃদয়মন যে কতদূর ইঁচড়ে পেকে গিয়েছিল—তার পরিচয় তিনি নিজমুখেই দিয়েছেন। ফলে, তিনি বৃদ্ধবয়সে কাঁচতে গিয়ে বিবাহ করেন।

অতএব দাঁড়াল এই যে, শিশু-সাহিত্য বলে' কোনও জিনিস নেই এবং থাকা উচিত নয়। তবে শিশুপাঠ্য না হোক, বালপাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত। এ সাহিত্য সৃষ্টি করবার সঙ্কল্প অতি সাধু। কেননা, শিশুশিক্ষার পুস্তকে যে বস্তু বাদ পড়ে' যায়,—অর্থাৎ আনন্দ—সেই বস্তু যুগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এ সাহিত্যের সৃষ্টি। পৃথিবীতে অবশ্য সাধুসঙ্কল্পমাত্রেই আমরা কার্য্যে পরিণত করতে পারিনে। সুতরাং এ স্থলে জিজ্ঞাস্য,—আমরা পণ করে' বসলেই কি সে সাহিত্য রচনা করতে পারব? আমি বলি,—না। এর প্রমাণ, ছেলেরা যে সাহিত্য পড়ে আর পড়তে ভালবাসে, তা মুখ্যতঃ কি গৌণতঃ ছেলেদের জন্য নয়,—বড়দের জন্য লেখা হয়েছিল। রূপকথা, রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস, Don Quixote, Gulliver's Travels, Robinson Crusoe,—এ সবের কোনটিই আদিতে শিশুদের জন্য রচিত হয় নি। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যেরই একটি বিশেষ অঙ্গ ছেলেরা আত্মসাৎ করে' নেয়।

আসলে ছেলেরা ভালবাসে শুধু রূপকথা,—স্বরূপ কথাও নয়, অরূপ কথাও নয়; অর্থাৎ জ্ঞানের কথাও নয়, নীতির কথাও নয়। উপরে যে সব বই-য়ের নাম করা গেল, তার প্রতিটিতেই রূপকথার রূপ আছে। আমরা যে শিশু-সাহিত্য রচনা করতে পারিনে, তার কারণ, আমরা চেষ্টা করলেও রূপকথা তৈরী করতে পারি নে। যে যুগে রূপকথার সৃষ্টি হয়, সে যুগ হচ্ছে মানব-সভ্যতার শৈশব। সে কালে লোক মনে শিশু ছিল, সে যুগে সম্ভব অসম্ভবের ভেদ-জ্ঞান মানুষের মনে তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এ কালের আমরা মনে জানি সবই অসম্ভব,—আর ছেলেরা মনে করে সবই সম্ভব। তা ছাড়া, আমাদের কাছে পৃথিবীর সব জিনিসই আবশ্যক, কোন

জিনিসই চমৎকার, কোন জিনিসই আবশ্যক নয়—সুতরাং আমাদের পক্ষে তাদের মনোমত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব। আমরা রূপকথা লিখতে বসলে, হয় তা কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে; কেননা, রূপকথার জন্ম সত্যযুগে, আর রূপকের জন্ম সভ্যযুগে।

এই রূপকের মধ্যেই হাজারে একখানা ছেলেদের কাছে নবরূপকথা হয়ে দাঁড়ায়,—যথা Don Quixote, Gulliver's Travels ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ জাতের রূপকথা রচনা করবার জন্য অসামান্য প্রতিভার আবশ্যক। অসম্ভবকে সম্ভব, কল্পনাকে বাস্তব করে' তোলা,—এক কথায় বস্তুজগতের নিয়ম অতিক্রম করে' একটি নববস্তুজগৎ গড়ে তোলা,—তোমার আমার কর্ম্ম নয়। আর যাঁর অসামান্য প্রতিভা আছে, তাঁর বই লেখার উদ্দেশ্য ছেলেদের এ বোঝানো নয় যে, তারা মনে পাকা,—কিন্তু বুড়োদের এই বোঝানো যে, তারা মনে কাঁচা। বয়সে বৃদ্ধ কিন্তু মনে বালক, এমন সাহিত্যিক যে নেই, এ কথা আমি বল্‌তে চাইনে। কিন্তু সে সাহিত্যিকের দ্বারাও শিশু সাহিত্য রচিত হ'তে পারে না, তার কারণ—ছোট ছেলে ও বুড়োখোকা, এ দুই একজাতীয় জীব নয়। বয়স্কলোকের বালিশতার মূল হচ্ছে সত্য ধরবার অক্ষমতা, আর বালকের বালকত্বের মূল হচ্ছে কল্পনা করবার সক্ষমতা। সুতরাং আমার মতে, বিশেষ করে' শিশু-সাহিত্য রচনা হ'তে আমাদের নিরস্ত থাকাই শ্রেয়। আমরা যদি ঠিক আমাদের উপযোগী বই লিখি, খুব সম্ভবতঃ তা শিশু-সাহিত্যই হবে।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৩।

সুরের কথা

১

আপনারা দেশী বিলেতী সঙ্গীত নিয়ে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছেন, সে গোলযোগে আমি গলাযোগ কর্‌তে চাই।

এ বিষয়ে বক্তৃতা কর্‌তে পারেন এক তিনি, যিনি সঙ্গীত-বিদ্যার পারদর্শী,—আর এক তিনি, যিনি সঙ্গীতশাস্ত্রের সারদর্শী; অর্থাৎ যিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে হয় সর্ব্বজ্ঞ, নয় সর্ব্বাজ্ঞ। আমি শেষোক্ত শ্রেণীর লোক, অতএব এ বিষয়ে আমার কথা বলবার অধিকার আছে।

আপনাদের সুরের আলোচনা থেকে আমি যা সারসংগ্রহ করেছি, সংক্ষেপে তাই বিবৃত কর্‌তে চাই। বলা বাহুল্য, সঙ্গীতের সুর ও সার, পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। এর প্রথমটি হচ্ছে কাণের বিষয়, আর দ্বিতীয়টি জ্ঞানের। আমরা কথায় বলি সুরসার,—কিন্তু সে দ্বন্দ্বসমাস হিসেবে।

সব বিষয়েরই শেষ কথা তার প্রথম কথার উপরেই নির্ভর করে; যে বস্তুর আমরা আদি জানিনে, তার অন্ত পাওয়া ভার। অতএব কোনও সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা কর্‌তে হ'লে, তার আলোচনা ক, খ, থেকে সুরু করাই সনাতন পদ্ধতি এবং এ ক্ষেত্রে আমি সেই সনাতন পদ্ধতিই অনুসরণ কর্‌ব।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এমন লোক ঢের আছে, যারা দিব্য বাংলা বলতে পারে অথচ ক, খ, জানে না—আমাদের দেশের বেশীর ভাগ স্ত্রী-পুরুষই ত ঐ দলের। অপরপক্ষে এমন প্রাণীরও অভাব নেই, যারা ক, খ, জানে, অথচ বাংলা ভাল বল্‌তে পারে না—যথা আমাদের ভদ্রশিশুর দল। অতএব এরূপ হওয়াও আশ্চর্য্য নয় যে—এমন গুণী ঢের আছে, যারা দিব্যি গাইতে বাজাতে পারে, অথচ সঙ্গীতশাস্ত্রের ক, খ, জানে না; অপরপক্ষে এমন জ্ঞানীও ঢের থাকতে পারে, যারা সঙ্গীতের শুধু ক, খ, নয়, অনুস্বর বিসর্গ পর্য্যন্ত জানে—কিন্তু গান-বাজনা জানে না।

তবে যারা গানবাজনা জানে, তারা গায় ও বাজায়; যারা জানে না, তারা ও-বস্তু নিয়ে তর্ক করে। কলধ্বনি না কর্‌তে পারি, কলরব কর্‌বার অধিকার আমাদের সকলেরি আছে। সুতরাং এই তর্কে যোগ দেওয়াটা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা হবে না। অতএব আমাকে ক, খ, থেকেই সুরু কর্‌তে হবে,—অ, আ, থেকে নয়। কেননা, আমি যা লিখ্‌তে বসেছি, সে হচ্ছে সঙ্গীতের ব্যঞ্জনলিপি, স্বরলিপি নয়। আমার উদ্দেশ্য সঙ্গীতের তত্ত্ব ব্যক্ত করা, তার স্বত্ব সাব্যস্ত করা নয়। আমি সঙ্গীতের সারদর্শী—সুরস্পর্শী নই।

২

হিন্দুসঙ্গীতের ক, খ, জিনিষটে কি?—বল্‌ছি।

আমাদের সকল শাস্ত্রের মূল যা, আমাদের সঙ্গীতেরও মূল তাই—অর্থাৎ শ্রুতি।

শুন্‌তে পাই, এই শ্রুতি নিয়ে সঙ্গীতাচার্য্যের দল বহুকাল ধরে' বহু বিচার করে' আস্‌ছেন, কিন্তু

আজতক্ এমন কোনও মীমাংসা কর্‌তে পারেন নি, যাকে "উত্তর" বলা যেতে পারে—অর্থাৎ যার আর উত্তর নেই।

কিন্তু যেহেতু আমি পণ্ডিত নই, সে কারণ আমি ও-বিষয়ের একটি সহজ মীমাংসা করেছি, যা সহজ মানুষের কাছে সহজে গ্রাহ্য হ'তে পারে।

আমার মতে শ্রুতির অর্থ হচ্ছে সেই স্বর, যা কাণে শোনা যায় না; যেমন দর্শনের অর্থ হচ্ছে সেই সত্য, যা চোখে দেখা যায় না। যেমন দর্শন দেখবার জন্য দিব্য-চক্ষু চাই, তেমনি শ্রুতি শোনবার জন্য দিব্য-কর্ণ চাই। বলা বাহুল্য, তোমার আমার মত সহজ মানুষদের দিব্য চক্ষুও নেই, দিব্য কর্ণও নেই; তবে আমাদের মধ্যে কারও দিব্যি চোখও আছে, দিব্যি কাণও আছে! ওতেই ত হয়েছে মুস্কিল। চোখ ও কাণ সম্বন্ধে দিব্য এবং দিব্যি—এ দুটি বিশেষণ, কাণে অনেকটা এক শোনালেও, মানেতে ঠিক উল্টো।

সঙ্গীতে সে সাতটি সাদা আর পাঁচটি কালো সুর আছে, এ সত্য পিয়ানো কিম্বা হারমোনিয়ামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখ্‌তে পাবেন। এই পাঁচটি কালো সুরের মধ্যে যে চারটি কোমল আর একটি তীব্র—তা আমরা সকলেই জানি এবং কেউ কেউ তাদের চিনিও। কিন্তু চেনাশুনো জিনিসে পণ্ডিতের মনস্তুষ্টি হয় না। তাঁরা বলেন যে, এ দেশে ঐ পাঁচটি ছাড়া আরও কালো এবং এমন কালো সুর আছে, যেমন কালো বিলেতে নেই। শাস্ত্রমতে সে সব হচ্ছে অতিকোমল ও অতিতীব্র। ঐ নামই প্রমাণ যে, সে সব অতীন্দ্রিয় সুর, এবং তা শোনবার জন্যে দিব্য-কর্ণ চাই,—যা তোমার আমার ত নেই, শাস্ত্রী মহাশয়দেরও আছে কি না সন্দেহ। আমার বিশ্বাস, তাঁদেরও নেই। শ্রুতি সেকালে থাকলেও, একালে তা স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। স্মৃতিই যে শ্রুতিধরদের একমাত্র শক্তি, এ সত্য ত জগদ্বিখ্যাত, সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাওয়া, অর্থাৎ পরের কাণে মিষ্টি শোনা যাঁদের অভ্যাস—শুধু তাঁদের কাছেই শ্রুতি শ্রুতিমধুর। আমি স্থির করেছি যে, আমাদের পক্ষে ঐ বারোই ভাল। অবশ্য সাতপাঁচ ভেবেচিন্তে। ও দ্বাদশকে ছাড়াতে গেলে, অর্থাৎ ছাড়্‌লে, আমাদের কাণকে একাদশী কর্‌তে হবে।

আর ধরুন, যদি ঐ দ্বাদশ সুরের ফাঁকে ফাঁকে সত্য সত্যই শ্রুতি থাকে, তা হ'লে সে সব স্বর হচ্ছে অনুস্বর। সা এবং রি'র অন্তর্ভুক্ত দশটি স্বরের গায়ে যদি কোনও অসাধারণ পণ্ডিত দশটি অনুস্বর জুড়ে দিতে পারেন, তা হ'লে সঙ্গীত এমনি সংস্কৃত হয়ে উঠবে যে, আমাদের মত প্রাকৃতজনেরা তার এক বর্ণও বুঝতে পার্‌বে না।

৩

এ সব ত গেল সঙ্গীতের বর্ণ-পরিচয়ের কথা,—শব্দবিজ্ঞানের নয়। শব্দেরও যে একটা বিজ্ঞান আছে, এ জ্ঞান সকলের নেই। সুতরাং সুরের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্রাহ্য না হ'লেও আলোচ্য।

শব্দজ্ঞানের মতে শ্রুতি অপৌরুষেয়। অর্থাৎ স্বরগ্রাম কোনও পুরুষ কর্তৃক রচিত হয় নি—প্রকৃতির বক্ষ থেকে উত্থিত হয়েছে। একটি এক-টানা তারের গায়ে ঘা মার্‌লে প্রকৃতি অমনি সাতসুরে কেঁদে ওঠেন। এর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা ধরে' নিয়েছেন যে, প্রকৃতি তাঁর একতারায় যে সকাতর সার্গম আলাপ করেন, মানুষে শুধু তার নকল করে। কিন্তু সে নকলও মাছিমারা হয় না। মানুষের গলগ্রহ কিম্বা যন্ত্রস্থ হয়ে প্রকৃতিদত্ত স্বরগ্রামের কোনও সুর একটু চড়ে, কোনও সুর একটু ঝুলে যায়। তা'ত হবারই কথা। প্রকৃতির হৃদয়তন্ত্রী থেকে এক ঘায়ে যা বেরোয়, তা যে একঘেয়ে হবে—এ ত স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং মানুষে এই সব প্রাকৃত সুরকে সংস্কৃত করে' নিতে বাধ্য।

এ মত লোকে সহজে গ্রাহ্য করে; কেননা, প্রকৃতি যে একজন মহা ওস্তাদ—এ সত্য লৌকিক ন্যায়েও সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি অন্ধ এবং অন্ধের সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি যে সহজ, এ সত্য ত লোকবিশ্রুত।

প্রকৃতির ভিতর যে শব্দ আছে,—শুধু শব্দ নয়, গোলযোগ আছে—এ কথা সকলেই জানেন; কিন্তু তাঁর গলায় যে সুর আছে, এ কথা সকলে মানেন না। এই নিয়েই ত আর্ট ও বিজ্ঞানে বিরোধ।

আর্টিষ্টরা বলেন—প্রকৃতি শুধু অন্ধ নন, উপরন্তু বধির। যাঁর কাণ নেই, তাঁর কাছে গানও নেই। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ দ্রষ্টা, এবং প্রকৃতি নর্তকী। কিন্তু প্রকৃতি যে গায়িকা, এবং পুরুষ শ্রোতা,—এ কথা কোন দর্শনেই বলে না। আর্টিষ্টদের মতে তৌর্য্যত্রিকের একটিমাত্র অঙ্গ—নৃত্যই প্রকৃতির অধিকারভুক্ত, অপর দুটি—গীতবাদ্য—তা নয়।

এর উত্তরে বিজ্ঞান বলেন, এ বিশ্বের সকল রূপরসগন্ধস্পর্শ শব্দের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ হচ্ছে ঐ প্রকৃতির নৃত্য। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া চলে

না, অতএব পুড়িয়ে দেখা যাক্, ওর ভিতর কতটুকু খাঁটি মাল আছে।—

শাস্ত্রে বলে, শব্দ আকাশের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান বলে, শব্দ আকাশের নয়—বাতাসের ধর্ম্ম। আকাশের নৃত্য অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গের স্বচ্ছন্দ কম্পন থেকে যে আলোকের এবং বাতাসের উক্তরূপ কম্পন থেকে যে ধ্বনির উৎপত্তি হয়েছে,—তা বৈজ্ঞানিকেরা হাতেকলমে প্রমাণ করে' দিতে পারেন। কিন্তু আর্ট বলে, আত্মার কম্পন থেকে সুরের উৎপত্তি, সুতরাং জড়প্রকৃতির গর্ভে তা জন্মলাভ করে নি। আত্মা কাঁপে আনন্দে, সৃষ্টির চরম আনন্দে; আর আকাশ বাতাস কাঁপে বেদনায়, সৃষ্টির প্রসববেদনায়। সুতরাং আর্টিষ্টদের মতে, সুর শব্দের অনুবাদ নয়—প্রতিবাদ।

যেখানে আর্টে ও বিজ্ঞানে মতভেদ হয়, সেখানে আপোষমীমাংসার জন্য দর্শনকে সালিশ মানা ছাড়া আর উপায় নেই। দার্শনিকেরা বলেন, শব্দ হ'তে সুরের, কিম্বা সুর হ'তে শব্দের উৎপত্তি—সে বিচার করা সময়ের অপব্যয় করা। এ স্থলে আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, রাগ ভেঙ্গে সুরের, না সুর জুড়ে রাগের সৃষ্টি হয়েছে—এক কথায় সুর আগে, না রাগ আগে?—অবশ্য রাগের বাইরে সার্গমের কোনও অস্তিত্ব নেই, এবং সার্গমের বাইরে রাগের কোনও অস্তিত্ব নেই। সুতরাং সুর পূর্ব্বরাগী কি অনুরাগী—এই হচ্ছে আসল সমস্যা। দার্শনিকেরা বলেন যে, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই দিতে পারেন, যাঁরা বল্‌তে পারেন, বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে—অর্থাৎ কেউ পারেন না!

আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, উক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের আর কোনও খণ্ডন নেই। তবে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদীরা নিশ্চয়ই বল্‌বেন যে, বৃক্ষ আগে কি বীজ আগে, সে রহস্যের ভেদ তাঁরা বাৎলাতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা, ও কথা শোন্‌বামাত্র আর এক দলের বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ পরমাণুবাদীরা জবাব দেবেন যে, সঙ্গীত আয়ুর্ব্বেদের নয়—বায়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভূত। অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে।

আসল কথা এই যে, আমি কর্ত্তা, তুমি ভোক্তা—এ জ্ঞান যাঁর নেই, তিনি আর্টিষ্ট নন। সুতরাং সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রকৃতিকে সম্বোধন করে'—তুমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা—এ কথা কোনও আর্টিষ্ট কখনও বল্‌তে পারবেন না এবং ও কথা মুখে আন্‌বার কোন দরকারও নেই। প্রকৃতির হাতে-গড়া এই বিশ্বসংসার যে আগাগোড়া বেসুরো, তার অকাট্য প্রমাণ—আমরা পৃথিবীশুদ্ধ লোক পৃথিবী ছেড়ে সুরলোকে যাবার জন্য লালায়িত।

অতএব দাঁড়াল এই যে, সঙ্গীতের উৎপত্তির আলোচনায় তার লয়ের সম্ভাবনাই বেড়ে যায়। তাই সহজমানুষে চায় তার স্থিতি,—ভিত্তি নয়।

৪

অতঃপর দেশী বিলাতি সঙ্গীতের ভেদাভেদ নির্ণয় কর্‌বার চেষ্টা করা যাক্।—

এ দুয়ের মধ্যে আর যা প্রভেদই থাক্, তা অবশ্য ক, খ-গত নয়। যে বারো সুর এ দেশের সঙ্গীতের মূলধন, সে বারো সুরই যে সে দেশের সঙ্গীতের মূলধন,—এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। তবে আমরা বলি যে, সে মূলধন আমাদের হাতে সুদে বেড়ে গিয়েছে। আমাদের হাতে কোনও ধন যে সুদে বাড়ে, তার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আমি পূর্ব্বে দেখিয়েছি যে, সুরের এই অতিসুদের লোভে, আমরা সঙ্গীতের মূলধন হারাতে বসেছি। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

দেশীর সঙ্গে বিলাতি সঙ্গীতের আসল প্রভেদটা ক, খ, নিয়ে নয়—কর, খল নিয়ে। B, L, A=ব্লে; C, L, A=ক্লের সঙ্গে কর খলের,—কাণের দিক্ থেকেই হোক্ আর মানের দিক্ থেকেই হোক্—একটা যে প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে, এ হচ্ছে একটি "প্রকাণ্ড সত্য"। এ প্রভেদ উপাদানের নয়।—গড়নের। অতএব রাগ ও মেলডির ভিতর পার্থক্য হচ্ছে ব্যাকরণের এবং একমাত্র ব্যাকরণেরই।

সুতরাং আমরা যদি বিলাতি ব্যাকরণ অনুসারে সুর সংযোগ করি, তা হ'লে তা রাগ না হয়ে মেলডি হবে এবং তাতে অবশ্য রাগের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমরা ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসারে ইংরাজি ভাষা লিখ্‌লে সে লেখা ইংরাজিই হয় এবং তাতে বাংলা-সাহিত্যের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না—যদিচ এ ক্ষেত্রে শুধু ব্যাকরণ নয়, শব্দও বিদেশী। কিন্তু যেমন কতকটা ইংরাজি এবং কতকটা বাংলা ব্যাকরণ মিলিয়ে এবং সেই সঙ্গে বাংলা শব্দের অনুবাদের গোঁজামিলন দিলে, তা Babu English হয় এবং উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বাংলা লিখ্‌লে ত সাধুভাষা হয়—তেমনি ঐ দুই ব্যাকরণ মেলাতে বস্‌লে সঙ্গীতেও আমরা রাগ মেলডির একটি খিচুড়ি

পাকাব। সাহিত্যের খিচুড়িভোগে যখন আমার রুচি নেই, তখন সঙ্গীতের ও-ভোগ যে আমি ভোগ করতে চাইনে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

৫

দেশী বিলাতি সঙ্গীতের মধ্যে আর একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। বিলাতি সঙ্গীতে Harmony আছে —আমাদের নেই।

এই হারমণি জিনিসটে স্বরের যুক্তাক্ষর বই আর কিছুই নয়—অর্থাৎ ও বস্তু হচ্ছে সঙ্গীতের বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকারে। আমাদের সঙ্গীত এখনও প্রথম ভাগের দখলেই আছে। আমাদের পক্ষে সঙ্গীতের দ্বিতীয় ভাগের চর্চ্চা করা উচিত কি না—সে বিষয়ে কেউ মনস্থির করতে পারেন নি। অনেকে ভয় পান যে, দ্বিতীয় ভাগ ধরলে তাঁরা প্রথম ভাগ ভুলে যাবেন, তা ভুলুন আর না ভুলুন, তাঁরা যে প্রথম ভাগকে আর আমল দেবেন না—সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

আমাদের সাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একবার যুক্তাক্ষর শিখলে আমরা অযুক্তাক্ষরের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত মনে করিনে এবং অপর কেউ করতে গেলে অমনি বলে' উঠি—সাহিত্যের সর্ব্বনাশ হ'ল, ভাষাটা একদম অসাধু এবং অশুদ্ধ হয়ে গেল। তবে সঙ্গীতে এ বিপদ ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। সেদিন একজন ইংরাজ বলছিলেন যে, যে সঙ্গীতে ছয়টি রাগ এবং প্রতি রাগের ছয়টি করে' স্ত্রী আছে, সেখানে harmony কি করে' থাকতে পারে? আমি বলি, ও ত ঠিকই কথা, বিশেষতঃ স্বামী যখন মূর্ত্তিমান রাগ, আর স্ত্রীরা প্রত্যেকেই এক একটি মূর্ত্তিমতী রাগিণী! অবশ্য এরূপ হবার কারণ আমাদের সঙ্গীতের কৌলীন্য। আমাদের রাগসকল যদি কুলীন না হ'ত, তা হ'লেও আমরা harmonyর চর্চ্চা করতে পারতুম না—কেননা, ও-বস্তু আমাদের ধাতে নেই। আমাদের সমাজের মত আমাদের সঙ্গীতেও জাতিভেদ আছে, আর তার কেউ আর কারও সঙ্গে মিশ্রিত হ'তে পারে না। মিশ্রিত হওয়া দূরে থাক, আমরা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করতে ভয় পাই, কেননা, জাতির ধর্ম্মই হচ্ছে জাত বাঁচিয়ে মরা। আর মিলে মিশে এক হয়ে যাবার নামই হচ্ছে harmony.

পৌষ, ১৩২৩।

রূপের কথা

১

এ দেশে সচরাচর লোকে যা লেখে ও ছাপায়, তাই যদি তাদের মনের কথা হয়,—তা হ'লে স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা মানব-সভ্যতার চরম পদ লাভ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রকাণ্ড সত্যটা বিদেশীরা মোটেই দেখতে পায় না। এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়—কেননা, সভ্যতারও একটা চেহারা আছে; এবং যে সমাজের সুচেহারা নেই, তাকে সুসভ্য বলে' মানা কঠিন। বিদেশী বলতে দু'শ্রেণীর লোক বোঝায়—এক পরদেশী, আর এক বিলেতি। আমরা যে বড় একটা কারও চোখে পড়ি নে, সে বিষয়ে এই দুই দলের বিদেশীই একমত।

যাঁরা কালাপানি পার হয়ে আসেন, তাঁরা বলেন যে, আমাদের দেশ দেখে তাঁদের চোখ জুড়োয়—কিন্তু আমাদের বেশ দেখে সে চোখ ক্ষুণ্ণ হয়; এর কারণ—আমাদের দেশের মোড়কে রঙ আছে, আমাদের দেহের মোড়কে নেই। প্রকৃতি বাংলা দেশকে যে কাপড় পরিয়েছেন, তার রঙ সবুজ; আর বাঙ্গালী নিজে যে কাপড় পরেছে, তার রঙ আর যেখানেই পাওয়া যাক্—ইন্দ্রধনুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা আপাদমস্তক রঙছুট ব'লেই অপর কারো নয়নাভিরাম নই। সুতরাং যারা আমাদের দেশ দেখতে আসে, তারা আমাদের দেখে খুসি হয় না। যাঁর বোম্বাই সহরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তিনিই জানেন, কলিকাতার সঙ্গে সে সহরের প্রভেদটা কোথায় এবং কত জাজ্বল্যমান। সে দেশে জনসাধারণ পথে-ঘাটে সকালসন্ধ্যে রঙের ঢেউ খেলিয়ে যায় এবং সে রঙের বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্য্যের আর অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের গায়ে জড়িয়ে আছে চির-গোধূলি,—তাই শুধু বিলেতি নয়, পরদেশী ভারতবাসীর চোখেও আমরা এতটা দৃষ্টিকটু। বাকী ভারতবর্ষ সাজসজ্জায় স্বদেশী, —আমরা আধ-স্বদেশী হাফ-বিলেতি। আর বিলেতি মতে, হয় কালো নয় সাদা নইলে সভ্যতার লজ্জা নিবারণ হয় না; রঙ চাই শুধু সঙ সাজবার জন্যে। আমাদের নবসভ্যতাও কার্য্যতঃ এই মতে সায় দিয়েছে।

২

আপনারা বলতে পারেন যে, এ কথা যদি সত্যও হয়, তাতে আমাদের কি যায় আসে? বিদেশীর

মনোরঞ্জন করবার জন্য আমরা ত আর জাতকে জাত আমাদের পরন-পরিচ্ছদ, আমাদের হাল-চাল সব বদলে ফেল্‌তে পারি নে? জীবনযাত্রা ব্যাপারটা ত আর অভিনয় নয় যে, দর্শকের মুখ চেয়ে সে জীবন গড়্‌তে হবে এবং তার উপর আবার রং ফলাতে হবে?—এ কথা খুব ঠিক। জীবন আমরা কিসের জন্য ধারণ করি, তা না জান্‌লেও, এটা জানি যে, পরের জন্য আমরা তা ধারণ করি নে,—অপর দেশের অপর লোকের জন্য ত নয়ই। তবে বিদেশীর কথা উত্থাপন করবার সার্থকতা এই যে, জাতীয় জীবনের ত্রুটি বিদেশীর চোখে যেমন এক নজরে ধরা পড়ে, স্বদেশীর চোখে তা পড়ে না। কেননা, আজন্ম দেখে দেখে লোকের চোখে যা সয়ে গেছে, যারা প্রথম দেখে, তাদের চোখে তা সয় না।

এই বিদেশীরাই আমাদের সজ্ঞান করে' দিয়েছে যে, রূপ সম্বন্ধে আমরা চোখ থাকৃতেও কাণা। আমাদের রূপজ্ঞান যে নেই—কিম্বা যদি থাকে ত অতি কম—সে বিষয়ে বোধ হয় কোনও মতভেদ নেই। কেননা, এ জ্ঞানের অভাবটা আমরা জাতীয় মনের দৈন্য বলে' মনে করি নে। বরং সত্য কথা বল্‌তে গেলে—আমাদের বিশ্বাস যে, এই রূপান্ধতাটাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। রূপ ত একটা বাইরের জিনিস—শুধু তাই নয়, বাহ্যবস্তুরও বাইরের জিনিস; ও জিনিসকে যারা উপেক্ষা, এমন কি, অবজ্ঞা করৃতে না শিখেছে, তারা আধ্যাত্মিকতার সন্ধান জানে না। আর আমরা আর কিছু হই আর না হই—বালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে আধ্যাত্মিক,—সে কথা যে অস্বীকার করবে, সে নিশ্চয়ই স্বদেশ এবং স্বজাতিদ্রোহী।

৩

রূপ জিনিসটাকে যাঁরা একটা পাপ মনে করেন, তাঁদের মতে অবশ্য রূপের প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া, কিন্তু দলে পাতলা হ'লেও, পৃথিবীতে এমন সব লোক আছে, যারা রূপকে মান্য করে, শ্রদ্ধা করে, এমন কি, পূজা করতেও প্রস্তুত—অথচ নিজেদের মহাপাপী মনে করে না। এই রূপভক্তের দল অবশ্য স্বদেশীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য,—অর্থাৎ প্রমাণ-প্রয়োগসহকারে রূপের স্বত্বসাব্যস্ত করৃতে বাধ্য। মাপশোনের কথা এই যে, যে সত্য সকলের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, সেই সত্য এ দেশে প্রমাণ করৃতে হয়;—অর্থাৎ একটা সহজ কথা বলৃতে গেলে, আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের তর্কস্রোতের উজান ঠেলে যেতে হয়।

যা সকলে জানে আছে,—তা নেই বলাতে অতিবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হ'তে পারে, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এই "অতির" অতিভক্তি হওয়াতে আমাদের ইতির জ্ঞান নষ্ট হয়েছে।

বস্তুর রূপ বলে' যে একটি ধর্ম্ম আছে, এ হচ্ছে শোনা কথা নয়,—দেখা জিনিস। যাঁর চোখ নামক ইন্দ্রিয় আছে, তিনিই কখন-না-কখনও তার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং আমাদের সকলেরি চোখ আছে,—সম্ভবতঃ শুধু তাঁদের ছাড়া, যাঁরা সৌন্দর্য্যের নাম করৃলেই অতীন্দ্রিয়তার ব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাখ্যান সুরু করেন। কিন্তু আমি এই রূপ জিনিসটিকে অতি-বর্জ্জিত ইন্দ্রিয়ের কোঠাতেই টিঁকিয়ে রাখ্‌তে চাই—কেননা, অতীন্দ্রিয় জগতে রূপ নিশ্চয়ই অরূপ হয়ে যায়।

৪

রূপের বিষয় দার্শনিকেরা কি বলেন আর না বলেন, তাতে কিছু যায় আসে না; কেননা, যা দৃষ্টির অগোচর, তাই দর্শনের বিষয়। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, বস্তুর রূপ বলে যে একটি গুণ আছে, তা মানুষমাত্রেই জানে এবং মানে। তবে সেই গুণের পক্ষপাতী হওয়াটা গুণের কি দোষের—এই নিয়েই যা মতভেদ!

রূপকে আমরা ভক্তি করি নে, সম্ভবতঃ ভালও বাসি নে, আপনারা সকলেই জানেন যে, হালে একটা মতের বহুল প্রচার হয়েছে, যার ভিতরকার কথা এই যে, জাতীয় আত্মমর্য্যাদা হচ্ছে পরশ্রীকাতরতারই সদর পিঠ। সম্ভবতঃ এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে' শ্রীকাতরতাও যে ঐ জাতীয় আত্মমর্য্যাদার লক্ষণ—এ কথা স্বীকার করা যায় না; কেননা, বিশ্বমানবের সভ্যতার ইতিহাস এর বিরুদ্ধে চিরদিন সাক্ষী দিয়ে আসছে।

স্বদেশের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেই, অপর সভ্যজাতির কাছে রূপের মর্য্যাদা যে কত বেশী তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া যাবে। বর্ত্তমান ইউরোপ সুন্দরকে সত্যের চাইতে নীচে আসন দেয় না,—সে দেশে জ্ঞানীর চাইতে আর্টিষ্টের মান কম নয়। তারা সভ্যসমাজের দেহটাকে—অর্থাৎ দেশের রাস্তাঘাট, বাড়ী-ঘরদোর, মন্দির-প্রাসাদ

মানুষের আসন-বসন, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি—নিত্য নূতন করে', সুন্দর করে' গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছে। সে চেষ্টার ফল সু কি কু হচ্ছে—সে স্বতন্ত্র কথা। ইউরোপীয় সভ্যতার ভিতর অবশ্য একটা কুৎসিত দিক্ আছে—যার নাম Commercialism—কিন্তু এই দিকটে কদর্য্য বলেই তার সর্ব্বনাশের দিক।—Commercialism-এর মূলে আছে লোভ। আর লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আপনারা সকলেই জানেন যে, রূপের সঙ্গে মোহের সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু লোভের নেই।

ইউরোপ ছেড়ে এশিয়াতে এলে দেখতে পাই যে, চীন ও জাপান রূপের এতই ভক্ত যে, রূপের আরাধনাই সে দেশের প্রকৃত ধর্ম্ম বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। রূপের প্রতি এই পরা-প্রীতিবশতঃ, চীন-জাপানের লোকের হাতে-গড়া এমন জিনিস নেই যার রূপ নেই—তা সে ঘটিই হোক্ আর বাটিই হোক্। যাঁরা তাদের হাতের কাজ দেখেছেন, তাঁরাই তাদের রূপ-সৃষ্টির কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। মোঙ্গল জাতিকে ভগবান্ রূপ দেন নি,—সম্ভবতঃ সেই কারণে সুন্দরকে তাদের নিজের হাতে গড়ে' নিতে হয়েছে! এই ত গেল বিদেশের কথা।

৫

আবার শুধু স্বদেশের নয়, স্বকালের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলে, আমরা ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই। প্রাচীন গ্রীকো-ইতালীয় সভ্যতার ঐকান্তিক রূপচর্চ্চার ইতিহাস ত জগৎ-বিখ্যাত। প্রাচীন ভারতবর্ষও রূপ সম্বন্ধে অন্ধ ছিল না; কেননা, আমরা যাই বলি নে কেন, সে সভ্যতাও মানব সভ্যতা,—একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ নয়। সে সভ্যতারও শুধু আত্মা নয়,—দেহ ছিল—এবং সে দেহকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সুঠাম ও সুন্দর করেই গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। সে দেহ আমাদের চোখের সম্মুখে নেই বলেই আমরা মনে করি যে, সেকালে যা ছিল, তা হচ্ছে শুধু অশরীরী আত্মা। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁদের কতটা সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল। আমরা যাকে সংস্কৃত-কাব্য বলি, তাতে রূপবর্ণনা ছাড়া আর বড় কিছু নেই; আর সে রূপবর্ণনাও আসলে দেহের—বিশেষতঃ রমণীর দেহের বর্ণনা—কেননা, সে কাব্য-সাহিত্যে যে প্রকৃতিবর্ণনা আছে, তাও বস্তুতঃ রমণীর রূপবর্ণনা। প্রকৃতিকে তাঁরা সুন্দরী রমণী হিসেবেই দেখেছিলেন। তার যে অংশ নারী-অঙ্গের উপমেয় কি উপমান নয়, তার স্বরূপ হয় তাঁদের চোখে পড়ে নি, নয় তা তাঁরা রূপ বলে' গ্রাহ্য করেন নি। সংস্কৃত-সাহিত্যে হরেক রকমের ছবি আছে, কিন্তু Landscape নেই বল্লেই হয়,—অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক প্রকৃতির অস্তিত্বের বিষয়ে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। Landscape প্রাচীন গ্রীস কিম্বা রোমের হাত থেকেও বেরয় নি।—তার কারণ, সে কালে মানুষে, মানুষ বাদ দিয়ে বিশ্বসংসার দেখতে শেখে নি। এর প্রমাণ শুধু আর্টে নয়, দর্শনে বিজ্ঞানেও পাওয়া যায়। আমরা আমাদের নব-বিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষকে এ বিশ্বের পরমাণুতে পরিণত করেছি, সম্ভবতঃ সেই কারণে আমরা মানবদেহের সৌন্দর্য্য অবজ্ঞা করতে শিখেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিন্তু সে সৌন্দর্য্যকে একটি অমূল্য বস্তু বলে' মনে করতেন; শুধু স্ত্রীলোকের নয়—পুরুষের রূপের উপরও তাঁদের ভক্তি ছিল। যাঁর অলোকসামান্য রূপ নেই, তাঁকে এ দেশে পুরাকালে মহাপুরুষ বলে' কেউ মেনে নেয় নি। শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই সৌন্দর্য্যের অবতার ছিলেন। রূপগুণের সন্ধি-বিচ্ছেদ করা সেকালের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল না। শুধু তাই নয়,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কদাকারের উপর এতটাই ঘৃণা ছিল যে, পুরাকালের শূদ্রেরা যে দাসত্ব হ'তে মুক্তি পায় নি, তার একটি প্রধান কারণ,—তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ এবং কুৎসিত—অন্ততঃ আর্য্যদের চোখে। সেকালের দর্শনের ভিতর অরূপের জ্ঞানের কথা থাকলেও, সেকালের ধর্ম্ম রূপজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পরব্রহ্ম নিরাকার হলেও, ভগবান্ মন্দিরে মন্দিরে মূর্ত্তিমান। প্রাচীন মতে নির্গুণ ব্রহ্ম অরূপ এবং সগুণ ব্রহ্ম সরূপ।

৬

সভ্যতার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবার কারণ, সভ্য সমাজ বলতে বোঝায় গঠিত সমাজ। যে সমাজের গড়ন নেই, তাকে আমরা সভ্য সমাজ বলিনে। এ কালের ভাষায় বলতে হ'লে, সমাজ হচ্ছে একটি organism; আর আপনারা সকলেই জানেন যে, সকল organism এক-জাতীয় নয়—ও বস্তুর ভিতর উঁচুনীচুর প্রভেদ বিস্তর। Organic জগতে protoplasm হচ্ছে সব চাইতে

নীচে, এবং মানুষ সব চাইতে উপরে এবং মানুষের সঙ্গে protoplasm-এর প্রত্যক্ষ পার্থক্য হচ্ছে রূপে ;—অপর কোনও প্রভেদ আছে কি না, সে হচ্ছে তর্কের বিষয়। মানুষে যে protoplasm-এর চাইতে রূপবান্,—এ বিষয়ে আশা করি কোনও মতভেদ নেই। এই থেকে প্রমাণ হয় যে, যে সমাজের চেহারা যত সুন্দর, সে সমাজ তত সভ্য। এরূপ হবার একটি স্পষ্ট কারণও আছে। এ জগতে রূপ হচ্ছে শক্তির চরম বিকাশ ; সমাজ গড়বার জন্য মানুষের শক্তি চাই—এবং সুন্দর করে' গড়বার জন্য তার চাইতেও বেশী শক্তি চাই। সুতরাং মানুষ যেমন বাড়বার মুখে ক্রমে অধিক সুশ্রী হয়ে ওঠে এবং মরবার মুখে ক্রমে অধিক কুশ্রী হয়—জাতের পক্ষেও সেই একই নিয়ম খাটে। কদর্য্যতা দুর্ব্বলতার বাহ্য লক্ষণ,—সৌন্দর্য্য শক্তির। এই ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, যখনই দেশে নবশক্তির আবির্ভাব হয়েছে, তখনই মাঠে-মন্দিরে, বেশে-ভূষায়, মানুষের আশায় ভাষায় নব সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। ভারতবর্ষের আর্টের বৌদ্ধযুগ ও বৈষ্ণবযুগ এই সত্যেরই জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

আমাদের এই কোণঠাসা দেশে যে দিন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়—সেই দিনই বাঙ্গালী সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করে। এর পরিচয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যবুদ্ধি যে টি'কল না, বাঙ্গলার ঘরে-বাইরে যে তা নানারূপে নানা আকারে ফুটল না, তার কারণ চৈতন্যদেব যা দান করতে এসেছিলেন, তা ষোল-আনা গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল না। যে কারণে বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালী সমাজকে একাকার করবার চেষ্টায় বিফল হয়েছে, হয় ত সেই একই কারণে তা বাঙ্গালী সভ্যতাকে সাকার করে' তুলতে পারে নি। ভক্তির রস আমাদের বুকে ও মুখে গড়িয়েছে—আমাদের মনে ও হাতে তা জমে নি। ফলে, এক গান ছাড়া আর কিছুকেই আমরা নবরূপ দিতে পারি নি।

৭

এ সব কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের রূপজ্ঞানের অভাবটা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় না। কিন্তু এ কথা মুখ ফুটে বললেই আমাদের দেশের অন্ধের দল লগুড় ধারণ করবেন। এর কারণ কি, তা বলছি।

সত্য ও সৌন্দর্য্য, এ দুটি জিনিসকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না। হয় এদের ভক্তি করতে হবে—নয় অভক্তি করতে হবে। অর্থাৎ সত্যকে উপেক্ষা করলে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে ; আর সুন্দরকে অবজ্ঞা করলে কুৎসিতের প্রশ্রয় দিতেই হবে। এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক সু আর এক কু। 'সু'কে অর্জ্জন না করলে 'কু'কে বর্জ্জন করা কঠিন। আমাদের দশাও হয়েছে তাই। আমাদের সুন্দরের প্রতি যে অনুরাগ নেই, শুধু তাই নয়—ঘোরতর বিরাগ আছে।

আমরা দিনে দুপুরে চীৎকার করে' বলি যে, সাহিত্যে যে ফুলের কথা জ্যোৎস্নার কথা লেখে, সে লেখক নিতান্তই অপদার্থ।

এঁদের কথা শুনলে মনে হয় যে, সব ফলই যদি ডুমুর হয়ে ওঠে, আর অমাবস্যা যদি বারোমেসে হয়, তা হ'লেই এ পৃথিবী ভূস্বর্গ হয়ে উঠবে—এবং সে স্বর্গে অবশ্য কোনও কবির স্থান হবে না। চন্দ্র যে সৌরমণ্ডলের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত গোলক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ও reflector ভগবান্ আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন—সুতরাং জ্যোৎস্না যে আছে, তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী স্বয়ং ভগবান্। কিন্তু এই জ্যোৎস্না-বিদ্বেষ থেকেই এঁদের প্রকৃত মনোভাব বোঝা যায়। এ রাগটা আসলে আলোর উপর রাগ। জ্ঞানের আলোক যখন আমাদের চোখে পুরোপুরি সয় না—তখন রূপের আলোক যে মোটেই সইবে না, তাতে আর বিচিত্র কি? জ্ঞানের আলো বস্তুজগৎকে প্রকাশ করে, সুতরাং এমন অনেক বস্তু প্রকাশ করে, যা আমাদের পেটের ও প্রাণের খোরাক যোগাতে পারে ; কিন্তু রূপের আলো শুধু নিজেকেই প্রকাশ করে, সুতরাং তা হচ্ছে শুধু আমাদের চোখের ও মনের খোরাক। বলা বাহুল্য উদর ও প্রাণ protoplasm-এরও আছে,—কিন্তু চোখ ও মন শুধু মানুষেরই আছে। সুতরাং যাঁরা জীবনের অর্থ বোঝেন একমাত্র বেঁচে থাকা এবং তজ্জন্য উদরপূর্ত্তি করা,—তাঁদের কাছে জ্ঞানের আলো গ্রাহ্য হলেও, রূপের আলো অবজ্ঞাত। এ দুয়ের ভিতর প্রভেদও বিস্তর। জ্ঞানের আলো সাদা ও একঘেয়ে, অর্থাৎ ও হচ্ছে আলোর মূল। অপরপক্ষে রূপের আলো রঙীন ও বিচিত্র, অর্থাৎ আলোর ফুল। আদিম মানবের কাছে ফুলের কোনও আদর নেই—কেননা, ও-বস্তু আমাদের কোনও আদিম ক্ষুধার নিবৃত্তি করে না,—ফুল আর যাই হোক, চর্ব্ব্য, চোষ্য কিম্বা লেহ্য, পেয় নয়।

৮

এ সব কথা শুনে আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, আমি যা বলছি, সে সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা নয়—সেরেফ কবিত্ব। বিজ্ঞানের কথা এই যে, যে আলোকে আমি সাদা বল্‌ছি, সেই হচ্চে এ বিশ্বের একমাত্র অখণ্ড আলো; সেই সমস্ত আলো refracted অর্থাৎ ব্যস্ত হয়েই আমাদের চোখে বহুরূপী হয়ে দাঁড়ায়।—তথাস্ত। এই refraction-এর একাধারে নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ হচ্ছে, পঞ্চভূতের বহির্ভূত ইথার নামক রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দের অতিরিক্ত একটি পদার্থ এবং এই হিল্লোলিত পদার্থের ধর্ম্ম হচ্ছে—এই জড়জগৎ-টাকে উৎফুল্ল করা, রূপান্বিত করা। রূপ যে আমাদের স্থূল-শরীরের কাজে লাগে না, তার কারণ, বিশ্বের স্থূল-শরীর থেকে তার উৎপত্তি হয় নি। আমাদের ভিতর যে সূক্ষ্ম-শরীর অর্থাৎ ইথার আছে, বাইরের রূপের স্পর্শে সেই সূক্ষ্ম-শরীর স্পন্দিত হয়, আনন্দিত হয়, পুলকিত হয়, প্রস্ফুটিত হয়। রূপ-জ্ঞানেই মানুষের জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ স্থূল-শরীরের বন্ধন হ'তে মুক্তি। রূপজ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করবে। রূপবিদ্বেষটা হচ্ছে আত্মার প্রতি দেহের বিদ্বেষ,—আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিদ্রোহ। রূপের গুণে অবিশ্বাস করাটা নাস্তিকতার প্রথম সূত্র।

ইন্দ্রিয়জ বলে' বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন,—কেননা, ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসূত্র, এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম। অন্তরের রূপও যে আমাদের সকলের মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে না, তার প্রমাণস্বরূপ একটা চল্‌তি উদাহরণ নেওয়া যাক্।

রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি অনেকের বিরক্তির কারণ এই যে, সে লেখার রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ইথার আছে, তাই সে মনের ভিতর দিয়ে যে ভাবের আলো refracted হয়ে আসে, তা ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত ও ছন্দে মূর্ত্ত হয়ে আস্‌তে বাধ্য। স্থূল-শরীর স্থূলদৃষ্টিতে তা হয় অসত্য, নয় অশিব ব'লে ঠেকা কিছু আশ্চর্য্য নয়।

মানুষে তিনটি কথাকে বড় বলে' স্বীকার করে, তার অর্থ তারা বুঝুক আর না বুঝুক। সে তিনটি হচ্চে—সত্য, শিব আর সুন্দর। যার রূপের প্রতি বিদ্বেষ আছে, যে সুন্দরকে তাড়না করতে হ'লে, হয় সত্যের নয় শিবের দোহাই দেয়;—যদিচ সম্ভবতঃ সে ব্যক্তি সত্য কিম্বা শিবের কখনও একমনে সেবা করে নি। যদি কেউ বলেন যে, সুন্দরের সাধনা করো—অমনি দশজনে বলে' ওঠেন, কি দুর্নীতির কথা! বিষয়-বুদ্ধির মতে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বিলাসিতা এবং রূপের চর্চ্চা চরিত্রহীনতার পরিচয় দেয়। সুন্দ-রের উপর এ দেশে সত্যের অত্যাচার কম, কেননা, এ দেশে সত্যের আরাধনা করবার লোকও কম। শিবই হচ্চে এখন আমাদের একমাত্র, কেননা, অমনি-পাওয়া ধন। এ তিনটির প্রতিটি যে প্রতি অপরটির শত্রু, তার কোনও প্রমাণ নেই। সুতরাং এদের একের প্রতি অভক্তি অপরের প্রতি ভক্তির পরিচায়ক নয়। সে যাই হোক, শিবের দোহাই দিয়ে কেউ কখনও সত্যকে চেপে রাখতে পারে নি,—আমার বিশ্বাস, সুন্দরকেও পারবে না। যে জানে, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে, সে সে-সত্য স্বীকার করতে বাধ্য এবং সামাজিক জীবনের উপর তার কি ফলাফল হবে, সে কথা উপেক্ষা করে' সে-সত্য প্রচার করতেও বাধ্য। কেননা, সত্যসেবকদের একটা বিশ্বাস আছে যে, সত্যজ্ঞানের শেষ ফল ভাল বই মন্দ নয়। তেমনি যার রূপজ্ঞান আছে, সে সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা এবং সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি করতে বাধ্য—তার আশু সামা-জিক ফলাফল উপেক্ষা করে,—কেননা, রূপের পূজারীদেরও বিশ্বাস যে, রূপজ্ঞানের শেষ ফল ভাল বই মন্দ নয়। তবে মানুষের এ জ্ঞানলাভ করতে দেরী লাগে।

শিবজ্ঞান আসে সব চাইতে আগে—কেননা, মোটামুটি ও জ্ঞান না থাক্‌লে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া ত দূরের কথা। ও জ্ঞান বিষয়-বুদ্ধির উত্তমাঙ্গ হ'লেও, একটা অঙ্গমাত্র।

তার পর আসে সত্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান শিব-জ্ঞানের চাইতে ঢের সূক্ষ্মজ্ঞান, এবং এ জ্ঞান আংশিকভাবে বৈষয়িক, অতএব জীবনের সহায়—এবং আংশিকভাবে তার বহির্ভূত, অতএব মনের সম্পদ।

সব শেষে আসে রূপজ্ঞান, কেননা, এ জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম এবং সাংসারিক হিসেবে অকেজো। রূপ-জ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্য সমাজের গোড়ার কথা হ'লেও, সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি, সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।

অবশ্য হার্বার্ট স্পেনসর বলেছেন যে, মানুষের রূপজ্ঞান আসে আগে এবং সত্যজ্ঞান তার পরে।

তার কারণ, যে জ্ঞান তাঁর জন্মায় নি, তিনি মনে করতেন, সে জ্ঞান বাতিল হয়ে গিয়েছে। সত্য কথা এই যে, মানব-সমাজের পক্ষে রূপজ্ঞান লাভ করাই সাধনাসাপেক্ষ,—খোয়ানো সহজ। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের সাধনার সেই সঞ্চিত ধন আমরা অবহেলাক্রমে হারিয়ে বসেছি। বিলেতি সভ্যতার কেজো অংশের সংস্পর্শে আমাদের মনের ভিত টলুক আর না টলুক, তার চূড়া ভেঙ্গে পড়েছে।

এ বিষয়ে বৌদ্ধদর্শনের মত প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধ-দার্শনিকেরা কল্পনা করেন যে, এ জগতে নানা লোক আছে। সব নীচে কামলোক, তার উপরে রূপলোক, তার উপরে ধ্যানলোক ইত্যাদি।

আমার ধারণা, আমরা সব জন্মতঃ কামলোকের অধিবাসী; সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।

আর এক কথা, রূপের চর্চ্চার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আমরা দরিদ্র জাতি—অতএব ও আমাদের সাধনার ধন নয়। এ ধারণার কারণ, ইউরোপের Commercialism আমাদের মনের উপর এ যুগে রাজার মত প্রভুত্ব করছে। সত্য-কথা এই যে, জাতীয় শ্রীহীনতার কারণ অর্থের অভাব নয়,—মনের দারিদ্র্য। তার প্রমাণ, আমাদের হালফ্যাসানের বেশভূষা, সাজ-সজ্জা, আচার-অনুষ্ঠানের শ্রীহীনতা, সোনার-জলে ছাপানো বিয়ের কবিতার মত, আমাদের ধনি-সমাজেই বিশেষ করে' ফুটে উঠেছে। আসল কথা, আমাদের নবশিক্ষার বৈজ্ঞানিক আলোক আমাদের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করুক আর নাই করুক—আমাদের রূপকাণা করেছে। "গুণ হয়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়"—ভারতচন্দ্রের এ কথা সুন্দরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, আমাদের সকলের পক্ষেই সমান খাটে। আর যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি নে—তা হ'লে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়ঃ। তাতে পৃথিবীর কারও কোন ক্ষতি হবে না,—এমন কি, আমাদেরও নয়।

ফাল্গুন, ১৩২৩।

ফাল্গুন

১

আমাদের দেশে কিছুরই হঠাৎ বদল হয় না, ঋতুরও নয়। বর্ষা কেবল কখন কখন বিনা নোটিশে একেবারে হুড়্‌দুম্ করে' এসে গ্রীষ্মের রাজ্য জবর-দখল করে' নেয়। ও ঋতুর চরিত্র কিন্তু আমাদের দেশের ধাতের সঙ্গে মেলে না। প্রাচীন কবিরা বলে' গেছেন, বর্ষা আসে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার মত,—আকাশে জয়ঢাক বাজিয়ে, বিদ্যুতের নিশান উড়িয়ে, অজস্র বরুণাস্ত্র বর্ষণ করে'; এবং দেখ্‌তে না দেখ্‌তে আসমুদ্র হিমালয় সমগ্র দেশটার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। এক বর্ষাকে বাদ দিলে, বাকী পাঁচটা ঋতু যে ঠিক কবে আসে আর কবে যায়, তা এক জ্যোতিষী ছাড়া আর কেউ বল্‌তে পারেন না। আমাদের ছয় রাগের মধ্যে এক মেঘ ছাড়া আর পাঁচটি যেমন এক সুর থেকে আর একটিতে বেমালুম ভাবে গড়িয়ে যায়, আমাদের স্বদেশী পঞ্চঋতুও তেমনি ভূমিষ্ঠ হয় গোপনে, ক্রমবিকশিত হয় অলক্ষিতে, ক্রমবিলীন হয় পরঋতুতে।

ইউরোপ কিন্তু ক্রমবিকাশের জগৎ নয়। সে দেশের প্রকৃতি লাফিয়ে চলে, এক ঋতু থেকে আর এক ঋতুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বছরে চারবার নব-কলেবর ধারণ করে, নবমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। তাদের প্রতিটির রূপ যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি স্পষ্ট। যাঁর চোখ আছে, তিনিই দেখ্‌তে পান যে, বিলেতের চারিটি ঋতু চতুর্ব্বর্ণ। মৃত্যুর স্পর্শে বহু যে এক হয়, আর প্রাণের স্পর্শে এক যে বহু হয়, এ সত্য সে দেশে প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে শীতের রং তুষার-গৌর, সকল বর্ণের সমষ্টি; আর বসন্তের রং ইন্দ্রধনুর, সকল বর্ণের ব্যষ্টি। তার পর নিদাঘের রং ঘন-সবুজ, আর শরতের গাঢ়-বেগনি। বিলেতি ঋতুর চেহারা শুধু আলাদা নয়, তাদের আসাযাওয়ার ভঙ্গীও বিভিন্ন।

সে দেশে বসন্ত শীতের শব-শীতল কোল থেকে রাতারাতি গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে, মহাদেবের যোগভঙ্গ কর্‌বার জন্য মদন-সখা বসন্ত যে-ভাবে একদিন অকস্মাৎ হিমাচলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোন এক সুপ্রভাতে, ঘুমভেঙ্গে চোখ মেলে হঠাৎ দেখা যায় যে, রাজ্যির গাছ মাথায় একরাশ ফুল পরে' দাঁড়িয়ে হাসছে—অথচ তাদের পরনে একটিও পাতা নেই। সে রাজ্যে বসন্তরাজ তাঁর আগমনবার্ত্তা আকাশের নীল পত্রে সাতরঙা ফুলের হরফে এমন স্পষ্ট, এমনি

উজ্জ্বল করে' ছাপিয়ে দেন যে, সে বিজ্ঞাপন—মানুষের কথা ছেড়ে দিন,—পশুপক্ষীরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রম-বিলয়ও নেই; শরৎও সে দেশে কাল-ক্রমে জরাজীর্ণ হয়ে, অলক্ষিতে শিশিরের কোলে দেহত্যাগ করে না। সে দেশে শরৎ তার শেষ উইল, পাণ্ডুলিপিতে নয়—রক্তাক্ষরে লিখে রেখে যায়, কেননা, মৃত্যুর স্পর্শে তার পিত্ত নয়,—রক্ত প্রকুপিত হয়ে উঠে, প্রদীপ যেমন নেভ্‌বার আগে জ্বলে' ওঠে, শরতের তাম্রপত্রও তেমনি ঝর-বার আগে অগ্নিবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন দেখ্‌তে মনে হয়, অস্পৃশ্য শত্রুর নির্ম্মম আলিঙ্গন হ'তে আত্মরক্ষা করবার জন্য, প্রকৃতিসুন্দরী যেন রাজপুত-রমণীর মত স্বহস্তে চিতা রচনা করে' সোল্লাসে অগ্নি-প্রবেশ করছেন।

২

এ দেশের ঋতুর গমনাগমনটি অলক্ষিত হ'লেও, তার পূর্ণাবতারটি ইতিপূর্ব্বে আমাদের নয়নগোচর হ'ত। কিন্তু আজ যে ফাল্গুন মাসের পোনেরো তারিখ, এ সুখবর পাঁজি না দেখলে জান্‌তে পেতুম না। চোখের সুমুখে যা দেখ্‌ছি, তা বসন্তের চেহারা নয়, একটা মিশ্রঋতুর,—শীত ও বর্ষার যুগলমূর্ত্তি। আর এদের পরস্পরের মধ্যে পালায় পালায় চল্‌ছে সন্ধি ও বিগ্রহ। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শীত ও বর্ষার দাম্পত্যবন্ধন এ ভাবে চিরস্থায়ী হওয়াটা আমার মতে মোটেই ইচ্ছনীয় নয়। কেননা, এহেন অসবর্ণ বিবাহের ফলে শুধু সঙ্কীর্ণবর্ণ দিবা-নিশার জন্ম হবে।

এই ব্যাপার দেখে আমার মনে ভয় হয় যে, হয় ত বসন্ত ঋতুর খাতা থেকে নাম কাটিয়ে চিরদিনের মত এদেশ থেকে সরে' পড়্‌ল। এ পৃথিবীটি অতিশয় প্রাচীন হয়ে পড়েছে; হয় ত সেই কারণে বসন্ত এটিকে ত্যাগ করে', এই বিশ্বের এমন কোনও নবীন পৃথিবীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে ফুলের গন্ধে, পত্রের বর্ণে, পাখীর গানে, বায়ুর স্পর্শে আজও নরনারীর হৃদয় আনন্দে আকুল হয়ে ওঠে।

আমরা আমাদের জীবনটা এমন দৈনিক করে' তুলেছি যে, ঋতুর কথা দূরে যাক্—মাস-পক্ষের বিভাগটারও আমাদের কাছে কোনও প্রভেদ নেই। আমাদের কাছে শীতের দিনও কাজের দিন, বসন্তের দিনও তাই; এবং অমাবস্যাও ঘুমবার রাত, পূর্ণিমাও তাই। যে জাত মনের আপিস কামাই করতে জানে না, তার কাছে বসন্তের অস্তিত্বের কোনও অর্থ নেই, কোনও সার্থকতা নেই,—বরং ও একটা অনর্থেরই মধ্যে; কেননা, ও ঋতুর ধর্ম্মই হচ্ছে মানুষের মনভোলানো, তার কাজ ভোলানো! আর আমরা সব ভুল্‌তে, সব ছাড়্‌তে রাজি আছি—এক কাজ ছাড়া; কেননা, অর্থ যদি কোথাও থাকে ত ঐ কাজেই আছে! বসন্তে প্রকৃতিসুন্দরী নেপথ্যবিধান করেন; সে সাজগোজ দেখবার যদি কোনও চোখ না থাকে, তা হ'লে কার জন্যই বা নবীন পাতার রঙীন শাড়ী পরা, কার জন্যই বা ফুলের অলঙ্কার ধারণ, আর কার জন্যই বা তরুণ আলোর অরুণ হাসি হাসা?—তার চাইতে চোখের জল ফেলা ভাল। অর্থাৎ এ অবস্থায় শীতের পাশে বর্ষাই মানায় ভাল। শুন্‌তে পাই, কোনও ইউরোপীয় দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন যে, মানব-সভ্যতার তিনটি স্তর আছে। প্রথম আসে শ্রুতির যুগ, তার পর দর্শনের, তার পর বিজ্ঞানের। এ কথা যদি সত্য হয় ত, আমরা বাঙ্গালীরা আর যেখানেই থাকি—মধ্যযুগে নেই; আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা হয় সভ্যতার প্রথম অবস্থা, নয় শেষ অবস্থা। আমাদের এ যুগ যে দর্শনের যুগ নয়, তার প্রমাণ,—আমরা চোখে কিছুই দেখি নে, কিন্তু হয় সবই জানি, নয় সবই শুনি। এ অবস্থায় প্রকৃতি যে আমাদের প্রতি অভিমান করে' তাঁর বাসন্তী-মূর্ত্তি লুকিয়ে ফেলবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

৩

আমি এইমাত্র বলেছি যে, এ যুগে আমরা হয় সব জানি, নয় সব শুনি। কিন্তু সত্য-কথা এই যে, আমরা একালে যা কিছু জানি, সে সব শুনেই জানি,—অর্থাৎ দেখে কিম্বা ঠেকে নয়; তার কারণ, আমাদের কোন কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা নেই—আর সবতাতেই ঠেক্‌বার আশঙ্কা আছে।

এই বসন্তের কথাটাও আমাদের শোনা কথা, ও একটা গুজবমাত্র। বসন্তের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যের পাকা খাতার ভিতর পাই, গাছের কচি পাতার ভিতর নয়। আর বইয়ে যে বসন্তের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়—তা কস্মিন্‌কালেও এ ভূ-ভারতে

ছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার বৈধ কারণ আছে।

গীতগোবিন্দে জয়দেব বসন্তের যে রূপবর্ণনা করেছেন, সে রূপ বাঙ্গলার কেউ কখনো দেখে নি। প্রথমতঃ মলয়সমীরণ যদি সোজাপথে সিধে বয়, তা হ'লে বাঙ্গলাদেশের পায়ের নীচে দিয়ে চলে' যাবে, তার গায়ে লাগ্‌বে না। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যায় যে, সে বাতাস উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে, অর্থাৎ পথ ভুলে, বঙ্গভূমির গায়েই এসে ঢলে' পড়ে,—তা হ'লেও লবঙ্গলতাকে তা কখনই পরিশীলিত করতে পারে না। তার কারণ, লবঙ্গ গাছে ফলে, কি লতায় ঝোলে, তা আমাদের কারও জানা নেই। আর হোক না সে লতা, তার এ দেশে দোদুল্যমান হবার কোনই সম্ভাবনা নেই এবং ছিল না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা "কাবেরীতীরে কালাগুরুতরুর" উল্লেখে ঘোরতর আপত্তি করেছেন, কেননা, ও বাক্যটি যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন—প্রকৃত নয়। কাবেরীতীরে যে কালাগুরুতরু কালেভদ্রেও জন্মাতে পারে না—এ কথা জোর করে' আমরা বল্‌তে পারি নে; অপরপক্ষে অজয়ের তীরে লবঙ্গলতার আবির্ভাব এবং প্রাদুর্ভাব যে একেবারেই অসম্ভব—সে কথা বঙ্গভূমির বীরভূমির সঙ্গে যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তিনিই জানেন। ঐ এক উদাহরণ থেকেই অনুমান, এমন কি, প্রমাণ পর্য্যন্ত করা যায় যে, জয়দেবের বসন্তবর্ণনা কাল্পনিক—অর্থাৎ সাদা ভাষায় যাকে বলে অলীক। যার প্রথম কথাই মিথ্যে, তার কোন কথায় বিশ্বাস করা যায় না,—অতএব ধরে' নেওয়া যেতে পারে যে, এই কবিবর্ণিত বসন্ত আগা-গোড়া মনগড়া।

জয়দেব যখন নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করেন নি, তখন তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের বই থেকে বসন্তের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন; এবং কবিপরম্পরায় আমরাও তাই করে' আসছি। সুতরাং এ সন্দেহ স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, বসন্তঋতু একটা কবিপ্রসিদ্ধিমাত্র;—ও বস্তুর বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নেই। রমণীর পদতাড়নার অপেক্ষা না রেখে, অশোক যে ফুল ফোটায়, তার গায়ে যে আলতার রঙ দেখা দেয় এবং ললনাদের মুখমদ্যসিক্ত না হ'লেও বকুলফুলের মুখে যে মদের গন্ধ পাওয়া যায়,—এ কথা আমরা সকলেই জানি। এ দুটি কবিপ্রসিদ্ধির মূলে আছে, মানুষের ঔচিত্য-জ্ঞান। প্রকৃতির যথার্থ কার্য্যকারণের সন্ধান পেলেই বৈজ্ঞানিক কৃতার্থ হন,—কিন্তু কবি কল্পনা করেন তাই, যা হওয়া উচিত ছিল। কবির উক্তি হচ্ছে প্রকৃতির যুক্তির প্রতিবাদ। কবি চান সুন্দর, প্রকৃতি দেন তার বদলে সত্য। একজন ইংরাজ কবি বলেছেন যে, সত্য ও সুন্দর একই বস্তু—কিন্তু সে শুধু বৈজ্ঞানিকদের মুখ বন্ধ করবার জন্য। তাঁর মনের কথা এই যে, যা সত্য, তা অবশ্য সুন্দর নয়, কিন্তু যা সুন্দর, তা অবশ্যই সত্য; অর্থাৎ তার সত্য হওয়া উচিত ছিল। তাই আমার মনে হয় যে, পৃথিবীতে বসন্তঋতু থাকা উচিত—এই ধারণাবশতঃ সেকালের কবিরা কল্পনাবলে উক্ত ঋতুর সৃষ্টি করেছেন। বসন্তের সকল উপাদানই তাঁরা মন-অঙ্কে সংগ্রহ করে' প্রকৃতির গায়ে তা বসিয়ে দিয়েছেন।

৪

আমার এ অনুমানের স্পষ্ট প্রমাণ সংস্কৃত কাব্যে পাওয়া যায়, কেননা, পুরাকালে কবিরা সকলেই স্পষ্টবাদী ছিলেন। সেকালে তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, সকল সত্যই বক্তব্য,—সে সত্য মনেরই হোক, আর দেহেরই হোক। অবশ্য একালের রুচির সঙ্গে সেকালের রুচির কোনও মিল নেই! সেকালে সুরুচির পরিচয় ছিল, কথা ভাল করে' বলায়,—একালে ও গুণের পরিচয় চুপ করে' থাকায়। নীরবতা যে কবির ধর্ম্ম, এ জ্ঞান সেকালে জন্মে নি। সুতরাং দেখা যাক্—তাঁদের কাব্য থেকে বসন্তের জন্ম-কথা উদ্ধার করা যায় কি না?

সংস্কৃত মতে বসন্ত মদন-সখা। মনসিজের দর্শনলাভের জন্য মানুষকে প্রকৃতির দ্বারস্থ হ'তে হয় না। কেননা, মন যার জন্মস্থান, তার সাক্ষাৎ মনেই মেলে।

ও বস্তুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মনের দেশের অপূর্ব্ব রূপান্তর ঘটে,—তখন সে রাজ্যে ফুল ফোটে, পাখী ডাকে, আকাশ-বাতাস বর্ণে-গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে।—মানুষের স্বভাবই এই যে, সে বাইরের বস্তুকে অন্তরে, আর অন্তরের বস্তুকে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই ভিতর-বাইরের সমন্বয় করাটাই হচ্ছে আত্মার ধর্ম্ম। সুতরাং মনসিজের প্রভাবে মানুষের মনে যে রূপরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তারই প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপে বসন্তঋতু কল্পিত হয়েছে,—আসলে ও ঋতুর কোনও অস্তিত্ব নেই। এর একটি অকাট্য প্রমাণ আছে। যে শক্তির বলে, মনোরাজ্যের এমন রূপান্তর ঘটে—সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি। তাই আমরা বসন্তকে প্রকৃতির যৌবনকাল বলি, অথচ এ কথা আমরা কেউ ভাবি নে যে, জন্মাবামাত্র যৌবন কারও

দেহ আশ্রয় করে না; অথচ পয়লা ফাল্গুন যে বসন্তের জন্মতিথি,—এ কথা আমরা সকলেই জানি। অতএব দাঁড়াল এই যে, বসন্ত প্রকৃতির রাজ্যে একটা আরোপিত ঋতু।

আমার এ সব যুক্তি যদিও সুযুক্তি না হয়—তা হ'লেও আমাদের মেনে নিতে হবে যে, বসন্ত মানুষের মনঃকল্পিত; নচেৎ আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, বসন্ত ও মনোজ, উভয়ে সম-ধর্ম্মী হ'লেও উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বলা বাহুল্য, এ কথা মানার অর্থ সংস্কৃতে যাকে বলে দ্বৈতবাদ এবং ইংরাজিতে Parallelism—সেই বাতিল দর্শনকে গ্রাহ্য করা। সে ত অসম্ভব। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে, বসন্তের অস্তিত্বই প্রকৃত এবং তার প্রভাবেই মানুষের মনের যে বিকার উপস্থিত হয়, তারই নাম মনসিজ। এ ত পাকা জড়বাদ, অতএব বিনা বিচারে অগ্রাহ্য।

আমার শেষ কথা এই যে, এ পৃথিবীতে বসন্তের যখন কোনকালে অস্তিত্ব ছিল না, তখন সে অস্তিত্বের কোনকালে লোপ হ'তে পারে না। আমরা ও-বস্ত যদি হারাই, তবে সে আমাদের অমনোযোগের দরুণ। যে জিনিস মানুষের মনগড়া, তা মানুষের মন দিয়েই খাড়া রাখ্‌তে হয়। পূর্ব্ব-কবিরা কায়মনোবাক্যে যে রূপের ঋতু গড়ে' তুলেছেন—সেটিকে হেলায় হারানো বুদ্ধির কাজ নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বস্তুগত্যা প্রকৃতিকে মানুষের দাসী করেছেন, তখন কবিদের কর্ত্তব্য হচ্ছে কল্পনার সাহায্যে তাঁর দেবীত্ব রক্ষা করা; এবং এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'লে তাঁর মূর্ত্তির পূজা করতে হবে,—কেননা, পূজা না পেলে দেবদেবীরা যে অন্তর্দ্ধান হন,—এ সত্য ত ভুবনবিখ্যাত। দেবতা যে মন্ত্রাত্মক। আর এ পূজা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, তার কারণ, বসন্ত যদি অতঃপর আমাদের অন্তরে লাট খেয়ে যায়—তা হ'লে সরস্বতীর সেবকেরা নিশ্চয়ই স্ফীত হয়ে উঠবে, তাতে করে' বঙ্গ-সাহিত্যের জীবনসংশয় ঘটতে পারে। এ স্থলে সাহিত্য-সমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একালে আমরা যাকে সরস্বতীপূজা বলি, আদিতে তা ছিল বসন্তোৎসব।

চৈত্র ১৩২৩।
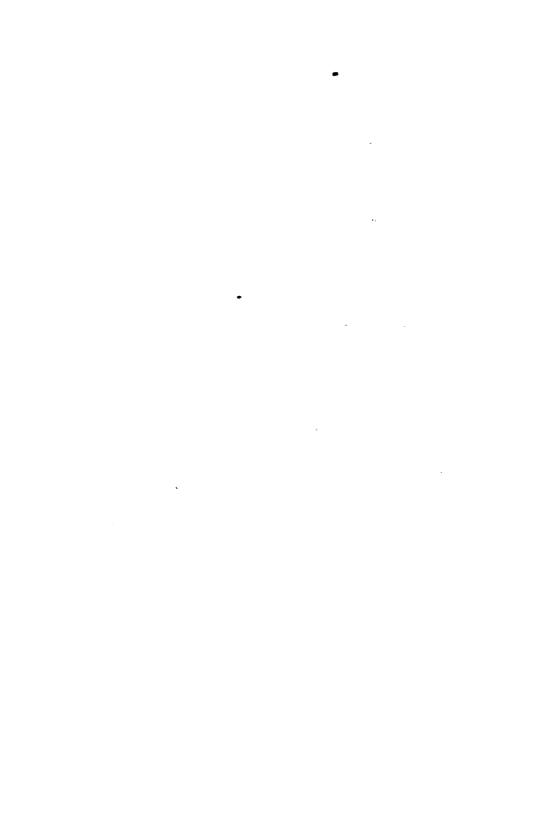
অদৃষ্ট

(গল্প)

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ফরাসী ভাষা থেকে "অদৃষ্ট" নামধেয় যে গল্পটি অনুবাদ করেছেন, তার মোদ্দা কথা এই যে, মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের মন্দ কর্‌তে চাইলেও দৈবের কৃপায় তার ফল ভাল হয়।

এ কিন্তু বিলেতী অদৃষ্ট।

এদেশে মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের ভাল কর্‌তে চাইলেও দৈবের গুণে তার ফল হয় মন্দ। এদেশী অদৃষ্টের একটি নমুনা দিচ্ছি। এ গল্পটি সত্য—অর্থাৎ গল্প যে পরিমাণ সত্য হয়ে থাকে, সেই পরিমাণ সত্য, তার চাইতে একটু বেশিও নয়, কমও নয়।

১

এ ঘটনা ঘটেছিল পালবাবুদের বাড়ীতে। এই কলিকাতা সহরে খেলারাম পালের গলিতে, খেলারাম পালের ভদ্রাসন কে না জানে? অত লম্বা-চোড়া আর অত মাথা উঁচু-করা বাড়ী, যিনি চোখে কম দেখেন, তাঁর চোখও এড়িয়ে যায় না। দূর থেকে দেখ্‌তে সেটিকে সংস্কৃত কলেজ বলে' ভুল হয়। সেই সার সার দোতলা সমান উঁচু করিন্থিয়ান থাম, সেই গড়ন, সেই মাপ, সেই রং, সেই ঢং। তবে কাছে এলে আর সন্দেহ থাকে না যে, এটি সরস্বতীর মন্দির নয়, লক্ষ্মীর আলয়। এর সুমুখে দীঘি নেই, আছে মাঠ, তাও আবার বড় নয়, ছোট; গোল নয়, চৌকোণ। এ ধাঁচের বাড়ী অবশ্য কলিকাতা সহরে বড় রাস্তায় ও গলি-ঘুঁচিতে আরো দশ-বিশটা মেলে, তবে খেলারামের বসতবাটীর সুমুখে যা আছে, তা কলিকাতা সহরের অপর কোনো বনে'দী ঘরের ফটকের সামনে নেই। দুটি প্রকাণ্ড সিংহ—তার সিংহদরজার দু'ধার আগলে বসে' আছে। তার একটিকে যে আর সিংহ বলে' চেনা যায় না, আর পথচলতী লোকে বলে, বিলেতী শেয়াল, তার কারণ, বয়েসের গুণে তাঁর ইটের শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, আর তার চুণবালির জটা খসে পড়েছে। কিন্তু যেটির পৃষ্ঠে সোয়ার হয়ে, নাকে নথ-পরা একটি পানওয়ালী সকাল-সন্ধ্যে, পয়সায় পাঁচটি করে' খিলি বেচে, সেটিকে আজও সিংহ বলে' চেনা যায়।

২

এই সিংহ দুটির দুর্দ্দশা থেকেই অনুমান করা যায় যে, পাল বাবুদেরও ভগ্ন দশা উপস্থিত হয়েছে। বাইরে থেকে যা অনুমান করা যায়, বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাল বাবুদের নাচঘরের জুড়ি নাচঘর কোম্পানীর আমলে কলিকাতায় আর একটিও ছিল না। মেজবাবু অর্থাৎ খেলারামের মধ্যম পুত্র, কলিকাতার সব ব্রাহ্মণ কায়স্থ বড় মানুষদের উপর টেক্কা দিয়ে সে ঘর বিলেতি-দস্তুর সাজিয়েছিলেন। পাশে পাশে টাঙানো আর গায়ে গায়ে ঠেকানো ঝাড়ে ও দেওয়ালগিরিতে সে ঘর চিকমিক করত, চকমক করত। আর এদের গায়ে যখন আলো পড়ত, তখন সব বালখিল্য ইন্দ্রধনু তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ক্রমে ঘরময় খেলা করে' বেড়াত। সে এক বাহার! তার পর সাটিনে ও মখমলে মোড়া কত যে কোচ-কুর্সি সে ঘরে জমায়েত হয়েছিল, তার আর লেখাজোখা নেই। কিন্তু আসলে দেখবার মত জিনিস ছিল সেই নাচঘরের সুমুখের বারান্দা। ইতালি থেকে আমদানী-করা তুষার-ধবল, নবনীতসুকুমার মর্ম্মর-প্রস্তরে গঠিত, প্রমাণ সাইজের স্ত্রীমূর্ত্তি-সকল সেই বারান্দার দু'ধারে সার বেঁধে দিবারাত্র ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত—তার প্রতিটি এক একটি বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাদের মধ্যে কেউ বা স্নান করতে যাচ্ছে, কেউ বা সদ্য নেয়ে উঠেছে, কেউ বা সুমুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে, কেউ বা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ বা দুহাত তুলে মাথার চুল কপালের উপর চুড়ো করে' বাঁধছে, কেউ বা বাঁ হাতখানি ধনুকাকৃতি করে' সামনের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে, দেখতে মনে হ'ত, স্বর্গের বেবাক অপ্সরা শাপভ্রষ্টা হয়ে মেজবাবুর বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন। সামান্য লোকদের

কথা ছেড়ে দিন, এ ভুল মহা মহা পণ্ডিতদেরও হ'ত। তার প্রমাণ—পাল-প্রাসাদের সভাপণ্ডিত স্বয়ং বেদান্তবাগীশ মহাশয় এক দিন বলেছিলেন,—"মেজবাবুর দৌলতে মর্ত্ত্যে থেকেই স্বর্গ চোখে দেখ্‌লুম। এই পাষাণীরা যদি কারো স্পর্শে সব বেঁচে ওঠে, তা হ'লে এ পুরী সত্যসত্যই অমরাপুরী হয়ে ওঠে"—এ কথা শুনে মেজবাবুর জনৈক পেয়ারা মো-সাহেব বলে' ওঠেন, "তা হ'লে বাবুকে এক দিনেই ফতুর হ'তে হ'ত—শাড়ীর দাম দিতে"।' এ উত্তরে চারিদিক থেকে হাসির তুফান উঠল। এমন কি, মনে হ'ল যে, ঐ সব পাষাণমূর্ত্তিদেরও মুখে চোখে যেন ঈষৎ সকৌতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলা বাহুল্য যে, এই কলিকাতা সহরেও উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচীদের নাচে গানে প্রতি সন্ধ্যে এ নাচঘর সরগরম হয়ে উঠত। আর আজকের দিনে তার কি অবস্থা?—বল্‌ছি।

৩

এই নাচঘরের এখন আসবাবের ভিতর আছে একটি জরাজীর্ণ কাঠের অতিকায় লেখবার টেবিল আর খানকতক ভাঙ্গা চৌকি। মেজেতে পাতা রয়েছে একখানি বাহাত্তর বৎসর বয়েসের একদম রঙ-জ্বলা এবং নানাস্থানে ইঁদুরে-কাটা কারপেট! এ ঘরে এখন ম্যানেজার সাহেব দিনে আফিস করেন, আর রাত্তিরে সেখানে নর্ত্তন হয় ইঁদুরের—কীর্ত্তন হয় ছুঁচোর।

এই অবস্থা-বিপর্য্যয়ের কারণ জানতে হ'লে পাল-বংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস শোনা চাই। সে ইতিহাস আমি আপনাদের সময়ান্তরে শোনাব। কেননা, তা যেমন মনোহারী, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এ কথার ভিতর সে কথা ঢোকাতে চাই নে এই জন্য যে, আমি জানি যে, উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের খিঁচুড়ি পাকালে, ও দুয়ের রসই সমান কষ হয়ে উঠে।

ফল কথা এই যে, পাল বাবুদের সম্পত্তি এখনও যথেষ্ট আছে; কিন্তু সরিকী বিবাদে তা উচ্ছন্ন যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ভাঙ্গা ঘর আবার গড়ে' তোলবার ভার আপাতত এখন কমন-ম্যানেজারের হাতে পড়ছে। এই ভদ্রলোকের আসল নাম—শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু লোকসমাজে তিনি চাটুয্যে-সাহেব বলেই পরিচিত। এর কারণ, যদিচ তিনি উকীল, ব্যরিষ্টার নন, তা হ'লেও তিনি ইংরেজি পোষাক পরেন—তাও আবার সাহেবের দোকানে তৈরী। চাটুয্যে-সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের আগাগোড়া পরীক্ষা একটানা ফার্ষ্ট ডিভিসনেই পাশ করে' এসেছেন, কিন্তু আদালতের পরীক্ষা তিনি থার্ড ডিভিসনেও পাশ করতে পারলেন না। এর কারণ, তাঁর Literture-এ taste ছিল, অন্তত এই কথা ত তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করে-ছিলেন। তাঁর স্ত্রী অবশ্য এ কথাটা মোটেই বুঝতে পারলেন না যে, পক্ষিরাজকে ছক্কড়ে জুতলে কেন না সে তা টানতে পারবে। তবে তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন বলে' স্বামীর কথার কোনো প্রতি-বাদ করেন নি, নিজের কপালের দোষ দিয়েই বসে' ছিলেন। যখন সাত বৎসর বিনে রোজগারে কেটে গেল, আর সেই সঙ্গে বয়েসও ত্রিশ পেরুলো, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ হবার আশা ত্যাগ করে' মাসিক তিনশ' টাকা বেতনে পাল বাবুদের জমিদারী সম্পত্তির ম্যানেজারের পদ আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হ'লেন। এও দেশী অদৃষ্টের একটা ছোটখাটো উদাহরণ। বাঙ্গালী উকীল না হয়ে সাহেব কৌচুলি হ'লে তিনি যে Bar-এ ফেল করে' bench-এ যে প্রমোশন পেতেন, সে কথা ত আপনারা সবাই জানেন। যার এক পয়সার প্র্যাকটিস নেই, সে যে একদম তিনশ' টাকা মাইনের কাজ পায়, এ দেশের পক্ষে এই ত একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাঁর কপাল ফিরল কি করে' জানেন?—ছেরেপ মুরব্বির জোরে। তিনি ছিলেন একাধারে বনে'দী ঘরের ছেলে আর বড় মানুষের জামাই—অর্থাৎ তাঁর যেমন সম্পত্তি ছিল না, তেমনি সহায় ছিল।

৪

বলা বাহুল্য, জমিদারী সম্বন্ধে চাটুয্যে-সাহেবের জ্ঞান আইনের চাইতেও কম ছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীতে B. L. পাশ করেন, সুতরাং এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে, আইনের অন্তত পুঁথিগত বিদ্যে তাঁর পেটে নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু কি হাতে-কলমে, কি কাগজে-কলমে তিনি জমিদারী বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান কখনো অর্জ্জন করেন নি। তাই তিনি তাঁর আত্মীয় ও পরমহিতৈষী জনৈক বড় জমিদারের কাছে এ ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে গেলেন। তিনি যে পরামর্শ দিলেন, তা অমূল্য কেননা, তিনি ছিলেন একজন যেমনি হুঁসিয়ার তেমনি জবরদস্ত জমিদার। তার পর জমিদার মহা-শয় ছিলেন অতি স্বল্পভাষী লোক। তাই তাঁ[র] আদ্যোপান্ত উপদেশ এখানে উদ্ধৃত করে' দি[চ্ছি]

পারছি। জমিদারী শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত—আমার বিশ্বাস, অনেকেরই কাজে লাগবে। তিনি বল্লেন,—"দেখ বাবাজী, যে পৈতৃক সম্পত্তির আয় ছিল শালিয়ানা দু'লক্ষ টাকা, আমার হাতে তা এখন চার লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমি যে জমিদারীর উন্নতি করতে জানি, এ কথা আমার শত্রুরাও স্বীকার করে;—আর দেশে আমার শত্রুরও অভাব নেই। জমিদারী করার অর্থ কি জানো—জমিদারীর কারবার জমি নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে। ও হচ্ছে এক রকম ঘোড়ায় চড়া। লোকে যদি বোঝে যে, পিঠে সোয়ার চড়েছে, তা হ'লে তাকে আর ফেলবার চেষ্টা করে না। প্রজা হচ্ছে জমিদারীর পিঠ আর আমলা-ফয়লা তার মুখ। তাই বলছি, প্রজাকে সায়েস্তা রাখতে হবে খালি পায়ের চাপে; কিন্তু চাবুক চালিয়ো না, তা হ'লেই সে পুস্তক ঝাড়বে আর অমনি তুমি ডিগবাজি খাবে। অপর পক্ষে আমলাদের বাগে রেখে রাশ কড়া করে' ধরো, কিন্তু সে রাশ প্রাণপণে টেনো না, তা হ'লেই তারা শির-পা করবে আর অমনি তুমি উল্টো ডিগবাজি খাবে। এক কথায় তোমাকে একটু রাশভারি হ'তে হবে আর একটু কড়া হ'তে হবে। বাবাজী এ ত ওকালতি নয় যে, হাকিমের সুমুখে যত নুইয়ে পড়বে নেতিয়ে পড়বে, আর যত তার মন-যোগানো কথা কইবে, তত তোমার পসার বাড়বে। ওকালতি করার ও জমিদারী করার কায়দা ঠিক উল্টো উল্টো।"

এ কথা শুনে চাটুয্যে সাহেব আশ্বস্ত হলেন, মনে মনে ভাবলেন যে, যখন তিনি ওকালতিতে ফেল করেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই জমিদারীতে পাশ করবেন। কিন্তু তাঁর মনের ভিতর একটু ধোঁকাও রয়ে গেল। তিনি জানতেন যে, তাঁর পক্ষে রাশভারি হওয়া অসম্ভব। তাঁর চেহারা ছিল তার প্রতিকূল। তিনি হলেন একে মাথায় ছোট, তার উপর পাতলা, তার উপর ফর্শা, তার পর তাঁর মুখটি ছিল স্ত্রীজাতির মুখমণ্ডলের ন্যায় কেশহীন, অবশ্য হাল-ফেসান অনুযায়ী—দু'সন্ধ্যা স্বহস্তে ক্ষৌর-কার্য্যের প্রসাদে। ফলে, হঠাৎ দেখতে তাঁকে আঠারো বৎসরের ছোকরা বলে' ভুল হ'ত। রাশ-ভারি হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব জেনে তিনি স্থির করলেন যে, তিনি গম্ভীর হবেন। মধুর অভাবে গুড়ে যেমন দেবার্চ্চনার কাজ চলে' যায়, তিনি ভাবলেন, রাশ-ভারি হ'তে না পেরে গম্ভীর হ'তে পারলেই জমিদারী শাসনের কাজ তেমনি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

তার পর এও তিনি জানতেন যে, মানুষের উপর কড়া হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না। এমন কি, মেয়েমানুষের উপরও তিনি কড়া হতে পারতেন না। তাই তিনি আপিসে নানারকম কড়া নিয়মের প্রচলন করলেন, এই বিশ্বাসে যে, নিয়ম কড়া হলেই কাজেরও কড়াকড় হবে। তিনি আপিসে ঢুকেই হুকুম দিলেন যে, আমলাদের সব ঠিক এগারটায় আপিসে উপস্থিত হ'তে হবে, নইলে তাদের মাইনে কাটা যাবে। এ নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথমে সেরেস্তায় একটু আমলা-তান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু চাটুয্যে-সাহেব তাতে এক চুলও টল্লেন না, আন্দোলন থেমে গেল।

৫

পাল-সেরেস্তার আমলাদের চিরকেলে অভ্যাস ছিল, বেলা বারোটা-সাড়ে-বারোটার সময় পান চিবুতে চিবুতে আপিসে আসা, তার পর এক ছিলিম গুড়ুক টেনে কাজে বসা। মুনিব যেখানে বিধবা আর নাবালক—সেখানে কর্ম্মচারীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু তারা যখন দেখলে যে, ঘড়ির কাঁটার উপর হাজির হ'লেই হুজুর খুসি থাকেন, তখন তারা একটু কষ্টকর হ'লেও বেলা এগারটাতে হাজিরা সই করতে সুরু করে' দিলে। অভ্যেস বদলাতে আর ক'দিন লাগে?

মুস্কিল হ'ল কিন্তু প্রাণবন্ধু দাসের। এ ব্যক্তি ছিল এ কাছারির সবচেয়ে পুরাণো আমলা। পঁয়তাল্লিস বৎসর বয়সের মধ্যে বিশ বৎসরকাল সে এই ষ্টেটে একই পোষ্টে একই মাইনেতে—বরাবর কাজ করে' এসেছে। এতদিন যে তার চাকরী বজায় ছিল, তার কারণ—সে ছিল অতি সৎলোক, চুরি-চামারির দিক দিয়েও সে ঘেঁসত না। আর তার মাইনে যে কখনো বাড়ে নি, তার কারণ, সে ছিল কাজে অতি ঢিলে।

প্রাণবন্ধু কাজ ভালবাসত না, পৃথিবীতে ভালবাসত শুধু দুটি জিনিস;—এক তার স্ত্রী, আর এক তামাক। এই ঐকান্তিক ভালবাসার প্রসাদে তার শরীরে দুটি অসাধারণ গুণ জন্মেছিল। বহুদিনের সাধনার ফলে তার হাতের লেখা হয়েছিল যে রকম চমৎকার, তার সাজা তামাকও হ'ত তেমনি চমৎকার।

আপিসে এসে তার নিত্য নিয়মিত কাজ ছিল—সর্ব্বপ্রথমে তার স্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখা। গোড়ায় "প্রিয়ে, প্রিয়তরে, প্রিয়তমে" এই সম্বোধন

এবং শেষে "তোমারই প্রাণবন্ধু দাস" এই যথার্থ-সূচক স্বাক্ষরের ভিতর, প্রতিদিন ধীরে সুস্থিরে ধরে' ধরে' পুরো চার পৃষ্ঠা চিঠি লিখতে লিখতে তার হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মত হয়ে উঠেছিল। এই জন্য আপিসের যত দলিলপত্র তাকেই লিখতে দেওয়া হ'ত। এই অক্ষরের প্রসাদেই তার চাকরীর পরমায়ু অক্ষয় হয়েছিল

তার পর প্রাণবন্ধু ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক খেতেন—অবশ্য নিজ হাতে সেজে। পরের হাতে সাজা-তামাক খাওয়া তাঁর পক্ষে তেমনি অসম্ভব ছিল—পরের হাতের লেখা-চিঠি তাঁর স্ত্রীকে পাঠান তাঁর পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল। তিনি কল্কেয় প্রথমে বেশ ক'রে ঠিকরে দিয়ে তার উপর তামাক এলো করে' সেজে, তার উপর আলগোছে মাটির তাওয়া বসিয়ে, তার উপর আড় করে' স্তরে স্তরে টিকে সাজিয়ে, তার পর সে টিকার মুখাগ্নি করে' হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করে' ধীরে ধীরে তামাক ধরাতেন। আধঘণ্টা তদ্বিরের কম যে আর ধোঁয়া গোল হয়ে, নিটোল হয়ে, মোলায়েম হয়ে, নলের মুখ দিয়ে অনর্গল বেরোয় না, এ কথা যারা কখনো হুঁকো টেনেছে, তাদের মধ্যে কে না জানে ?

এই চিঠি লেখা আর তামাক সাজার ফুরসতে প্রাণবন্ধু আপিসের কাজ করতেন এবং সে কাজও তিনি করতেন অন্যমনস্কভাবে। বলা বাহুল্য যে, সে ফুরসৎ তাঁর কত কম ছিল। এর চিঠি ওর থামে পুরে দেওয়া তাঁর একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ সত্ত্বেও সমগ্র সেরেস্তা যে তাঁকে ছাড়তে চাইত না, সত্য কথা বলতে গেলে তার আসল কারণ এই যে, প্রাণবন্ধু সেরেস্তায় হুঁকোবরদারীর কাজ করত—আর সবাই জানত যে, অমন হুঁকোবরদার মুচিখোলার নবাব-বাড়ীতেও পাওয়া দুষ্কর। তাঁর করস্পর্শে দা-কাটাও ভেলসা হয়ে, খরসানও অম্বুরি হয়ে উঠত।

প্রাণবন্ধুর উপরে সকলে সন্তুষ্ট থাকলেও তিনি সকলের উপর সমান অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথমত তাঁর ধারণা ছিল যে, তাঁর মাইনে যে বাড়ে না, সে তিনি চোর নন বলে'। অথচ তাঁর বেতনবৃদ্ধির বিশেষ দরকার ছিল। কেননা, তাঁর স্ত্রী ক্রমান্বয়ে নূতন ছেলের মুখ দেখতেন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে বেতনবৃদ্ধির যে কোনই যোগাযোগ নেই, এই মোটা কথাটা প্রাণবন্ধুর মনে আর কিছুতেই বসল না। ফলে তাঁর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে গেল যে, আপিসের কর্তৃপক্ষেরা গুণের আদর মোটেই করেন না। সুতরাং তাঁর পক্ষে, কি কথায়, কি কাজে, কর্তৃপক্ষদের মন জুগিয়ে চলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শেষটা দাঁড়াল এই, প্রাণবন্ধু যা খুসি তাই করত, যা খুসি তাই বলত,—কারো কোনো পরোয়া রাখত না। কর্তৃপক্ষেরাও তার কথায় কাণ দিতেন না; কেন না, তাঁরা ধরে' নিয়েছিলেন যে, প্রাণবন্ধু হচ্ছে ষ্টেটের একজন পেনসানভোগী।

৫

এই নূতন ম্যানেজারের হাতে পড়ে' প্রাণবন্ধু পড়ল মুস্কিলে। সে ভদ্রলোক বেলা এগারটায় আপিসে আর কিছুতেই এসে জুটতে পারলে না। ফলে তাঁকে নিয়ে হুজুর পড়লেন আরও বেশি মুস্কিলে। নিত্য তার মাইনে কাটা গেলে বেচারা যায় মারা—আর না কাটলেও তাঁর নিয়ম যায় মারা। এই উভয়-সঙ্কটে তিনি তাকে কর্ম্ম হ'তে অবসর দেওয়াই স্থির করলেন। এই মনস্থ করে' তিনি তার কৈফিয়ৎ চাইলেন, তার পর তার জবাবদিহি শুনে চাটুয্যে সাহেব অবাক্ হয়ে গেলেন। প্রাণবন্ধু তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে বললে—হুজুর, আটটার আগে ঘুমই ভাঙে না। তার পর চা আর তামাক খেতেই ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। তার পর নাওয়া খাওয়া করে' এক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে কি আর এগারটার মধ্যে আপিসে পৌঁছান যায় ?"

এ জবাব শুনে হুজুর যে অবাক্ হয়ে রইলেন, তার কারণ, তাঁর নিজেরও অভ্যেস ছিল ঐ সাড়ে আটটায় ঘুম থেকে ওঠা। তার পর চা-চুরুট খেতে তাঁরও সাড়ে নটা বেজে যেত। সুতরাং পায়ে হেঁটে আপিসে আসতে হ'লে তিনি যে সেখানে এগারটার ভিতর পৌঁছুতে পারতেন না, এ কথা তিনি মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেন না। সেই অবধি প্রাণবন্ধুর দেরী করে' আপিসে আসাটা চাটুয্যে-সাহেব আর দেখেও দেখতেন না। ম্যানেজারের উপর প্রাণবন্ধুর এই হলো প্রথম জিৎ।

দুদিন না যেতেই, চাটুয্যে-সাহেব আবিষ্কার করলেন যে, প্রাণবন্ধুকে ডেকে কখনও তন্মুহূর্ত্তে পাওয়া যায় না। যখনই ডাকেন, তখনই শোনেন যে, প্রাণবন্ধু তামাক সাজছে। শেষটা বিরক্ত হয়ে এক দিন তাকে ধমক দেবামাত্র প্রাণবন্ধু কাতর স্বরে বললে—

"হুজুর, আমি গরীব মানুষ, তাই আমাকে তামাক খেতে হয়, আর তা নিজেই সেজে খেতে হয়। পয়সা থাকলে সিগারেট খেতুম, তা হ'লে আমাকে কাজ থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উঠতে হ'ত না। বাঁ হাতে অষ্ট প্রহর সিগারেট ধরে' ডান হাতে কলম চালাতুম।"

এবারও হুজুরকে চুপ করে' থাকতে হ'ল; কেননা, হুজুর নিজে অষ্টপ্রহর সিগারেট ফুঁকতেন, তার আর এক দণ্ডও কামাই ছিল না। তিনি মনে ভাবলেন, প্রাণবন্ধু যা খুসি তাই করুক গে, তাকে আর তিনি ঘাঁটাবেন না।

কিন্তু প্রাণবন্ধুকে আবার তিনি ঘাঁটাতে বাধ্য হলেন? একখানি জরুরি দলীল যা এক দিনেই লিখে শেষ করা উচিত ছিল, সেখানা প্রাণবন্ধু যখন দুদিনেও শেষ করতে পারলে না, তখন তিনি দেওয়ানজীর প্রতি এই দোষারোপ করলেন যে, তিনি আমলাদের দিয়ে কাজ তুলে নিতে পারেন না। দেওয়ানজী উত্তর করলেন যে, তিনি সকলের কাছে কাজ আদায় করতে পারেন, কিন্তু পারেন না এক প্রাণবন্ধুর কাছ থেকে। যেহেতু প্রাণবন্ধু আপিসে এসে আপিসের কাজ না করে' নিত্য ঘণ্টাখানেক ধরে' আর কি ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখে।

প্রাণবন্ধুর তলব হ'ল এবং কৈফিয়ৎ চাওয়া হ'ল। হুজুরের উপর দু-দু-বার জিত হওয়ায় তার সাহস বেজায় বেড়ে গিয়েছিল। সে ম্যানেজার সাহেবের মুখের উপর এই জবাব করলে,—"হুজুর, আমার লেখার একটু হাত আছে, তাই লিখে লিখে হাত পাকাবার চেষ্টা করি।"

—"তোমার হাতের লেখা যথেষ্ট পাকা, তা আর বেশি পাকাবার দরকার নেই। আর যদি আরো পাকাতে হয় ত আপিসের লেখা লিখলেই হয়—বাজে লেখা কেন?"

—"হুজুর, হাতের লেখার কথা বলছি নে। আমার প্রাণে একটু কাব্যরস আছে, তাই প্রকাশ করবার জন্য লিখি। আর সে লেখা বাজে নয়। গরীব মানুষের না হ'লে সে লেখা সব পুস্তক আকারে প্রকাশিত হ'ত। আমাকে তাই ঘরের লোকের পড়ার জন্যই লিখতে হয়। যদি আমার পয়সা থাকত, তা হ'লে ত ছাইপাঁশ লিখেও দেশের মাসিক-পত্র ভরিয়ে দিতে পারতুম।"

এর উত্তরে চাটুয্যে-সাহেবের আঁতে ঘা লাগল। তিনি যে আপিসে বসে' মাসিক পত্রিকার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে হরেক রকম বেনামী প্রবন্ধ লিখতেন আর সে লেখাকে সমালোচকেরা যে ছাইপাঁশ বলত, এ কথা আর যার কাছেই থাক, তাঁর কাছে ত আর অবিদিত ছিল না! তিনি আর ধৈর্য্য ধরে' থাকতে পারলেন না, চক্ষু রক্তবর্ণ করে' বলে' উঠলেন—"দেখো, তোমার হওয়া উচিত ছিল—" তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রাণবন্ধু বলে' ফেল্‌ল—"বড় মানুষের জামাই! কিন্তু অদৃষ্ট ত আর সবারই সমান নয়।"

রোষে ক্ষোভে হুজুরের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। তিনি তাকে তর্জ্জনী দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন, প্রাণবন্ধু বিনা বাক্যব্যয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করল—আর এক ছিলিম ভাল ক'রে তামাক সাজতে। প্রাণবন্ধুর কিন্তু হুজুরকে অপমান করবার কোনই অভিপ্রায় ছিল না। সে শুধু নিজে সাফাই হবার জন্য ও-সব কথা বলেছিল। হিসেব করে' কথা কওয়ার অভ্যাস তার কস্মিন্‌কালেও ছিল না, আর পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে একটা নূতন ভাষা শেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

৭

চাটুয্যে-সাহেব দেওয়ানজীকে ডেকে বললেন—"প্রাণবন্ধুকে দিয়ে আর কাজ চলবে না, তার জায়গায় নূতন লোক বহাল করা হোক। নূতন লোক খুঁজে বার করবার জন্যে দেওয়ানজী সাত দিনের সময় নিলেন। এর ভিতর তাঁর একটু গূঢ় মতলব ছিল। তিনি জানতেন, প্রাণবন্ধুর দ্বারা কস্মিন্‌কালেও কাজ চলে নি, অতএব যে চাকরী তার এতদিন বজায় ছিল, আজ তা যাবার এমন কোনো নূতন কারণ ঘটে নি! তা ছাড়া তিনি জানতেন যে, হুজুরের রাগ হপ্তা না পেরুতেই চলে' যাবে, আর প্রাণবন্ধু সেরেস্তার যে কাজ চিরকাল করে' এসেছে, ভবিষ্যতেও তাই করবে—অর্থাৎ তামাক সাজা। ফলে প্রায় হয়েছিলও তাই। যেমন দিন যেতে লাগল, তাঁর রাগও পড়ে' আসতে লাগল, তার পর সপ্তম দিনের সকালবেলা চাটুয্যে-সাহেব রাগের কণাটুকুও মনের কোনো কোণে খুজে পেলেন না। তিনি তাই ঠিক করলেন যে, এবারকার জন্য প্রাণবন্ধুকে মাপ করবেন। তার পর তিনি যখন ধড়া-চুড়ো পরে' আপিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন, "দেখ ত, এ চিঠির অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।" সে চিঠি এই—

"প্রিয়ে প্রিয়তরে প্রিয়তমে,

আজ তোমাকে বড় চিঠি লিখতে পারব না,

কেননা আর একখানি মস্ত চিঠি লিখতে হয়েছে। জানই ত আমাদের ছোকরা হুজুর আমাকে নেক নজরে দেখেন না, কেননা, আমি চোর নই, অতএব খোসামুদেও নই। বরাবর দেখে আসছি যে, পৃথিবীতে গুণের আদর কেউ করে না, সবই খোসা-মোদের বশ। কিন্তু আমাদের এই নূতন ম্যানেজারের তুল্য খোসামোদ-প্রিয় লোক আমি ত আর কখনো দেখি নি। একমাত্র খোসামোদের জোরে যত বেটা চোর তাঁর প্রিয়পাত্র হয়েছে। যাদের হাতে তিনি পাকাকলা হয়েছেন, তাদের মুখে হুজুরের সুখ্যাতি আর ধরে না। অমন রূপ, অমন বুদ্ধি, অমন বিদ্যে, অমন মেজাজ একাধারে আর কোথাও নাকি পাওয়া যায় না। এ সব শুনে তিনিও মহা খুসি। প্রিয়পাত্রেরা কাগজ সুমুখে ধরলেই অমনি তাতে চোখ বুজে সই মেরে বসেন। এঁর হাতে ষ্টেটটা আর কিছু দিন থাকলে নির্ঘাত গোল্লায় যাবে। জমিদারীর ম্যানেজারি করার অর্থ ইনি বোঝেন, গম্ভীর হয়ে কাঠের চৌকিতে কাঠের পুতুলের মত খাড়া হয়ে এগারটা পাঁচটা ঠায় বসে' থাকা। ইনি ভাবেন, ওতে তাঁকে রাশভারি দেখায়, কিন্তু আসলে কি রকম দেখায় জান?—ঠিক একটি সাক্ষিগোপালের মত। ইনি আপিসে ঢুকেই একটি কড়া হুকুম প্রচার করেছেন যে, কর্ম্মচারীদের সব এগারটায় হাজির হ'তে হবে আর পাঁচটায় ছুটি। আমি অবশ্য এ হুকুম মানি নে। কেননা, যারা কাজের হিসেব জানে না, তারাই ঘণ্টার হিসেব করে—সেই পুরুতদের মত যারা মন্ত্র পড়তে জানে না, কিন্তু ঘণ্টা নাড়তে জানে। খোসামুদেরা বলে. 'হুজুরের কাজের কায়দা এক-দম সাহেবি'। ইনি এতেই খুসি, কেননা, এঁর মগজে সে বুদ্ধি নেই, যা থাকলে বুঝতেন যে লেপাফা-দুরস্ত হ'লে যদি কাজের লোক হওয়া যেত, তা হ'লে পোষাক পরলেও সাহেব হওয়া যেত। এঁর বিশ্বাস ইনি সাহেব, কিন্তু আসলে কি জান?—মেম-সাহেব। অন্তত দূর থেকে দেখলে ত তাই মনে হয়। কেন জানো?—এঁর পুরুষের চেহারাই নয়। এঁর রংটা ফ্যাকাসে—সাবান মেখে, আর মুখে দাড়ি-গোঁফের লেশমাত্র নেই, কিন্তু আছে একমাথা চুল, তাও আবার ক'টা। সে যাই হোক, একটু বিপদে পড়ে' এই মেম-সাহেবের মেমসাহেবকে একখানি চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি। আজ দুদিন থেকে কানাঘুষোয় শুনছি যে, হুজুর নাকি আমাকে বরখাস্ত করবেন। তাতে অবশ্য কিছু আসে যায় না, আমার মত গুণী লোকের চাকরীর ভাবনা নেই। তবে কি না, অনেক দিন আছি বলে' জায়গাটার উপর মায়া পড়ে' গেছে। মুনিবকে কিছু বলা বৃথা, কেননা, তিনি মুখ থাকতেও বোবা, চোখ থাকতে কাণা। তাই তাঁকে কিছু না বলে' যিনি এই মুনিবের মুনিব, তাঁর অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর কাছে একখানি দরখাস্ত করেছি। শুনতে পাই, আমাদের সাহেব মেম-সাহেবের কথায় ওঠেন বসেন। এ কথায় বিশ্বাস হয়, এঁর স্ত্রী শুনেছি ভারি সুন্দরী, প্রায় তোমার মত। তার পর এই অপদার্থটা তার স্ত্রীর ভাগ্যেই খায়, শুধু ভাত খায় না. মদও খায়, চুরুটও খায়। ইনি বিদ্যের মধ্যে শিখেছেন ঐ দুটি। সে যাই হোক, এঁর গৃহিণীকে যে চিঠিখানি লিখেছি, সে একটা পড়বার মত জিনিস। আমার দুঃখ রইল এই যে, সেখানি তোমার কাছে পাঠাতে পারলুম না। তার ভিতর সমান অংশে বীররস আর করুণরস পুরে দিয়েছি আর তার ভাষা একদম সীতার বনবাসের। শুনতে পাই, কর্ত্রীঠাকুরাণী খুব ভাল লেখাপড়া জানেন। আমার এই চিঠি পড়েই তিনি বুঝতে পারবেন যে, তাঁর স্বামী ও তোমার স্বামী এ দুজনের মধ্যে কে বেশী গুণী। আশা করছি, কাল তোমাকে দশ টাকা মাইনে বাড়ার সুখবর দিতে পারব।

তোমারই প্রাণবন্ধু দাস।"

চাটুয্যে-সাহেব চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়ে ঈষৎ কাষ্ঠহাসি হেসে স্ত্রীকে বল্লেন—"এ চিঠি তোমার নয়, ভুল খামে পোরা হয়েছে।"

বলা বাহুল্য, পত্রপাঠমাত্র প্রাণবন্ধুর বরখাস্তের হুকুম বেরল। চাটুয্যে-সাহেব সব বরখাস্ত করতে পারেন এবং স্ত্রীর কাছে অপদস্থ হওয়া ছাড়া। কেননা, তিনিও ছিলেন প্রাণবন্ধুর জুড়ি পত্নী-গতপ্রাণ।

এই চিঠিই হ'ল প্রাণবন্ধু দাসের স্ত্রীর যথার্থ অদৃষ্ট-লিপি, আর সে লিপি সংশোধনের কোনো-রূপ উপায় ছিল না, কেননা, তা ছাপার অক্ষরে লেখা।

অগ্রহায়ণ, ১৩২৬।

সম্পাদক ও বন্ধু

(গল্প)

—দেখো সুরনাথ, তোমার কাগজের এ সংখ্যাটি তেমন সুবিধে হয় নি।

—কেন বল দেখি ?

—নিজেই ভেবে দেখো, তা' হ'লেই বুঝতে পারবে।

যখন সম্পাদকী ক'রছ, তখন কোন্ লেখাটা ভাল, আর কোনটা ভাল নয়—তা' নিশ্চয় বুঝতে পারো।

—অবশ্য লেখা বেছে নিতে জান্‌লে, সম্পাদকী করি কোন্ সাহসে ? এ সংখ্যায় কি আছে বলছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের "কালিদাস, মুণ্ড না জটিল", পি, সি, রায়ের "খদ্দর-রসায়ন", বিনয় সরকারের "নয়া টঙ্কা", সুনীতি চাটুয্যের "হারাপ্পার ভাষাতত্ত্ব", রাখাল বাড়ুয্যের "বঙ্গদেশের প্রাক্-ভৌগোলিক ইতিহাস", বীরবলের "অন্নচিন্তা", শরৎ চাটুয্যের "বেদের মেয়ে", প্রমথ চৌধুরীর "উত্তর দক্ষিণ", ধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "সঙ্গীতের X-Ray," অতুলচন্দ্র গুপ্তের "ইস্‌লামের রসপিপাসা"—এ-সব লেখার কোনটিরই কি মূল্য নেই !

—আমি ও-সব দর্শন-বিজ্ঞান, হিষ্ট্রি-জিওগ্রাফী, ধর্ম্ম ও আর্ট প্রভৃতি বিষয়ের পণ্ডিতি প্রবন্ধের কথা বলছি নে। আর "বেদের-মেয়ের" সঙ্গে ত আমি ভালবাসায় প'ড়ে গিয়েছি। আর বীরবলের "অন্ন-চিন্তা" প'ড়ে আমার চোখে জল এসেছিল।

—তবে কোন্‌টিতে তোমার আপত্তি ?

—এবার কাগজে যে কবিতাটি বেরিয়েছে, সেটি কি ?

—"পিয়া ও পাপিয়ার" কথা ব'লছ ? ও কবিতার ত্রিপদী কি চতুষ্পদী হয়ে গিয়েছে ? ওতে কবিতার মাল-মসলা কি নেই ?

—সবই আছে, নেই শুধু মস্তিষ্ক।

—মস্তিষ্ক না থাক্, হৃদয় ত আছে ?

—হৃদয়ের মানে যদি হয় "ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো" তা' হ'লে অবশ্য ও-ছাইয়ের সে আধার আছে। ও-কবিতার পিয়া পাপিয়ার কথোপকথন কার সাধ্য বোঝে। বিশেষতঃ যখন ওর ভিতর পিয়াও নেই, পাপিয়াও নেই।

—ও-দুটির কোনটির থাক্‌বার ত কোনও কথা নেই। কবির আজও বিয়ে হয়নি—তা তা'র প্রিয়া আস্‌বে কোথ্‌থেকে ? আর ছেলেটি অতি সচ্চরিত্র—তাই কোনও অবিবাহিতা পিয়া তার কল্পনার ভিতরও নেই। আর সে জ্ঞান হয়ে অবধি বাস ক'রছে হ্যারিসন্ রোডে,—দিবারাত্র শুনে আসছে শুধু ট্রামের ঘড়ঘড়ানি,—পাপিয়ার ডাক সে জন্মে শোনে নি। ও পাড়ার কৃষ্ণদাস পালের ও দ্বারবঙ্গের মহারাজার প্রস্তরমূর্ত্তি ত আর পাপিয়ার তান ছাড়ে না।

—দেখো, এ-সব রসিকতা ছেড়ে দাও। যেমন কবিতার নাম তেম্‌নি কবির নাম। উক্ত মূর্ত্তিযুগলও এ-দুটি নাম একসঙ্গে শুন্‌লে হেসে উঠ্‌ত, যদিচ হাস্যরসিক ব'লে তাদের কোনও খ্যাতি নেই।

—কবির নাম ত অতুলানন্দ। এ-নাম শুনে তোমার এত হাসি পাচ্ছে কেন ?

—এই ভেবে যে ও-রকম কবিতা সেই লিখ্‌তে পারে যার অন্তরে আনন্দ অতুল। যার অন্তরে আনন্দের একটা মাত্রা আছে, সে আর ছাপার অক্ষরে ও ভাবে পিউ পিউ ক'রতে পারে না।—

—ও নামে তোমার আপত্তি ত শুধু ঐ 'অ' উপসর্গে।

—হাঁ ভাই।

—দেখো ছোক্‌রার বয়েস এখন আঠারো বছর।—ওর অন্নপ্রাশন হয়, নন্-কো-অপারেশনের বহু পূর্ব্বে, তখন যদি ওর বাপ মা ঐ উপসর্গটি ছেঁটে দিয়ে ওর নাম রাখ্‌তেন "তুলানন্দ"—তা হ'লে দেশ-শুদ্ধ লোকও হেসে উঠ্‌ত। এমন কি, যমুনালাল বাজাজও হাসি সম্বরণ করতে পারতেন না।

—তোমার এ-কথা আমি মানি। কিন্তু আমি জান্‌তে চাই, এ-কবিতা তুমি ছাপ্‌লে কেন ? তুমি ত —জান, ও রচনা হচ্ছে সেই জাতের, যা' না লিখ্‌লে কারও কোন ক্ষতি ছিল না।

—অতুলানন্দ যে রবীন্দ্রনাথ নয়, সে জ্ঞান আমার আছে। সুতরাং ও-কবিতাটি না ছাপ্‌লে কোনও ক্ষতি ছিল না।

—তবে একপাতা কালি নষ্ট ক'র্‌লে কেন? কবিতার মত ছাপার কালি ত সস্তা নয়।

—কেন ছেপেছি, তা' সত্যি বল্‌ব?

—সত্যি কথা ব'ল্‌তে ভয় পাচ্ছ কেন?

—পাছে সে-কথা শুনে তুমি হেসে ওঠ।

—কথা যদি হাস্যকর হয়, অবশ্য হাস্‌ব।

—ব্যাপারটা এক হিসেবে হাস্যকর।

—অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন? ব্যাপার কি?

—অতুলের কবিতা না ছাপ্‌লে তা'র মা দুঃখিত হবে বলে'।

—আমি ত জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের সহৃদয় পরীক্ষকেরা যে ছেলে গোল্লা পেয়েছে, বাপ-মা'র খাতিরে তা'র কাগজে শূন্যের আগে একটা ৯ বসিয়ে দেন। সাহিত্যেও কি মার্ক দেবার সেই পদ্ধতি?

—না। সেইজন্যেই ত বল্‌তে ইতস্তত ক'র্‌ছি।

—এ ব্যাপারের ভিতর গোপনীয় কিছু আছে নাকি?

—কিছুই না; তবে যা' নিত্য ঘটে না, সে-ঘটনাকে মানুষে সহজভাবে নিতে পারে না। এই কারণেই সামাজিক লোকে এমন অনেক জিনিসের সাক্ষাৎ নিজের ও অপরের মনের ভিতর পায়, যে জিনিসের নাম তা'রা মুখে আন্‌তে চায় না, পাছে লোকে তা' শুনে হাসে। আমরা কেউ চাইনে যে, আর পাঁচজনে আমাদের মন্দ লোক মনে করুক, আর সেই সঙ্গে আমরা এও চাইনে যে, আর পাঁচজনে আমাদের অদ্ভুত লোক মনে করুক। প্রত্যেকে যে সকলের মত, আমরা সকলে তাই প্রমাণ ক'রতেই ব্যস্ত।

—যা নিত্য ঘটে না, আর ঘটলেও সকলের চোখে পড়ে না, সেই ঘটনার নামই ত অপূর্ব্ব, অদ্ভুত ইত্যাদি। অপূর্ব্ব মানে মিথ্যে নয়, কিন্তু সেই সত্য যা' আমাদের পূর্ব্বজ্ঞানের সঙ্গে খাপ খায় না। ফলে আমরা প্রথমেই মনে করি যে, তা' ঘটে নি, কেননা, তা' ঘটা উচিত হয় নি। আমাদের ঔচিত্যজ্ঞানই আমাদের সত্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। ধরো, তুমি যদি বলো যে, তুমি ভূত দেখেছ, তা' হ'লে আমি তোমার কথা অবিশ্বাস ক'র্‌ব, আর যদি তা' না করি ত মনে ক'র্‌ব, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

—তা' ত ঠিক। যে যা বলে, তাই বিশ্বাস কর্‌বার জন্য নিজের উপর অগাধ অবিশ্বাস চাই। আর নিজেকে পরের কথার খেলায় পুতুল মনে ক'র্‌তে পারে শুধু জড়-পদার্থ, অবশ্য জড়-পদার্থের যদি মন ব'লে কোনও জিনিস থাকে।

—তুমি যে-রকম ভণিতা কর্‌ছ, তার থেকে আন্দাজ করেছি, "পিয়া ও পাপিয়ার" আবির্ভাবের পিছনে একটা মস্ত romance আছে।

—Romance এক বিন্দুও নেই। যদি থাক্‌ত, তা' হ'লে তা বল্‌তে ইতস্ততঃ ক'রব কেন? নিজেকে romance-এর নায়ক মনে কর্‌তে কার না ভাল লাগে? বিশেষত তা'র, যা'র প্রকৃতিতে romanticism-এর লেশমাত্রও নেই। ও-প্রকৃতির লোক যখন একটা romantic গল্প গ'ড়ে তোলে, তখন অসংখ্য লোক তা' প'ড়ে মুগ্ধ হয়—কারণ, বেশির ভাগ লোকের গায়ে romanticism-এর গন্ধ পর্য্যন্ত নেই। মানুষের জীবনে যা' নেই, কল্পনায় সে তাই পেতে চায়। আর তা'র সেই ক্ষিধের খোরাক জোগায় রোমান্টিক সাহিত্য। সে-গল্পের ভিতর মনের আগুন নেই, চোখের জল নেই, বাসনার উনপঞ্চাশ বায়ু নেই, আর যার অন্তে খুন নেই, জখম নেই, আত্মহত্যা নেই, তা কি কখনো রোমান্টিক্ হয়! "পিয়া ও পাপিয়ার" পিছনে যা' আছে, সে হচ্ছে Psychology-র একটি ঈষৎ বাঁকা রেখা। আর সে-বাঁক্ এত সামান্য, যে সকলের তা' চোখে পড়ে না, বিশেষতঃ ও-রেখার গায়ে যখন কোনও ডগ্‌ডগে রঙ নেই। এই জন্যই ত ব্যাপারটি তোমাকে ব'ল্‌তে আমার সঙ্কোচ হ'চ্ছে। এ-ব্যাপারের ভিতর যদি কোনও নারীর হরণ কিম্বা [illegible]ণ থাক্‌ত, তা' হ'লে ত সে বীরত্বের কাহিনী [illegible]তামাকে ফুর্ত্তি ক'রে ব'ল্‌তুম।

—তোমার মুখ থেকে যে কখনো রোমান্টিক্ গল্প বেরুবে, বিশেষতঃ তোমার নিজের সম্বন্ধে, এ দুরাশা কখনো করি নি। তোমাকে ত কলেজে[র] ফার্ষ্ট ইয়ার থেকে জানি। তুমি যে সেন্টিমেন্টে[র] কতটা ধার ধারো, তা ত আমার জান্‌তে বাকী নেই তুমি মুখ খুল্‌লেই যে মনের চুল চিরতে আরম্ভ ক'রবে এতদিনে কি তাও বুঝি নি! মানুষের মন জিনিস[-]টিকে তুমি এক জিনিস ব'লে কখনই মানো নি। তোমা[র] বিশ্বাস, ও এক হচ্ছে বহুর সমষ্টি। তোমার ধারণা যে, মনের ঐক্য মানে তা'র গড়নের ঐক্য। মনে[র] ভিতরকার সব রেখা মিলে তা'কে একটা ধরবা ছোঁবার মত আকার দিয়েছে! আর এ-সব রেখা সরল রেখা। তুমিও যে মানসিক বঙ্কিম রেখার সাক্ষাৎ পেয়েছ, এ অবশ্য তোমার পক্ষে একটা নতু[ন]

আবিষ্কার। এ-আবিষ্কারকাহিনী শোন্‌বার জন্য আমার কৌতূহল হচ্ছে, অবশ্য সে কৌতূহল scientific কৌতূহল মনে ক'রো না, তোমার মনের গোপন কথা শোন্‌বার জন্য আমি উৎসুক।

—ব্যাপারটা তোমাকে সংক্ষেপে ব'লছি। শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে যে, এর ভিতর আমার নিজের মনের কোনো কথাই নেই—সরলও নয়, কুটিলও নয়। এখন শোন।

ব্যাপারটা অতি সামান্য। আমি যখন কলেজ থেকে M. A. পাস ক'রে বেরই, তখন অতুলের মা'র সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছিল। প্রস্তাবটি অবশ্য কন্যাপক্ষ থেকেই এসেছিল। আমার আত্মীয়রা তা'তে সম্মত হয়েছিলেন। তাঁদের আপত্তির কোনও কারণ ছিল না, কারণ, ও-পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের বহুকাল থেকে চেনা-শোনা ছিল। ও-পক্ষের কুলশীলের কোনও খুঁৎ ছিল না, উপরন্তু মেয়েটি দেখ্‌তে পরমা সুন্দরী না হ'লেও সচরাচর বাঙালী মেয়ে যে-রকম হয়ে থাকে, তার চেয়ে নিরেস নয় এবং সরেস, কারণ তার স্বাস্থ্য ছিল, যা সকলের থাকে না। আমার গুরুজনরা এ-প্রস্তাবে আমার মতের অপেক্ষা না রেখেই তাঁ'দের মত দিয়েছিলেন। তাঁরা যে আমার মত জানতে চাননি, তা'র একটি কারণ—তাঁরা জানতেন যে, মেয়েটি আমার পূর্ব্ব-পরিচিত। "ওর চেয়ে ভাল মেয়ে পাবে কোথায়?" এই ছিল তাঁদের মুখের ও মনের কথা। আমার মত জান্‌তে চাইলে তাঁরা একটু মুস্কিলে প'ড়্‌তেন। কারণ, আমি তখন কোন বিয়ের প্রস্তাবে সহজে রাজী হ'তুম না, সুতরাং ও প্রস্তাবেও নয়। ছড়কো মেয়ে যেমন স্বামী দেখ্‌লেই পালাই-পালাই করে, আমার মন সেকালে তেমনি স্ত্রী-নামক জীবকে কল্পনার চোখে দেখ্‌লেও পালাই-পালাই ক'রত। তা' ছাড়া সেকালে আমার বিবাহ করা আর জেলে যাওয়া দুই এক মনে হ'ত। ও-কথা মনে ক'র্‌তেও আমি ভয় পেতুম। তুমি মনে ভাবছ যে, আমার এ-কথা শুধু কথার কথা; একটা সাহিত্যিক খেয়াল মাত্র। আমি যে ঠিক আর পাঁচজনের মত নই, তাই প্রমাণ করবার জন্য এ-সব মনের কথা বানিয়ে ব'লছি; সাহিত্যিকদের পূর্ব্ব-স্মৃতির মত এ পূর্ব্বস্মৃতিও কল্পনা-প্রসূত। কেননা, আমিও গুরুগৃহ থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের কিছুকাল পরেই গৃহস্থ হ'য়েছি। কিন্তু একটু ভেবে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবে যে, মানুষের মৃত্যুভয় আছে ব'লে মানুষে মৃত্যু এড়াতে পারে না পারে শুধু কষ্টে-স্মৃষ্টে মৃত্যুর দিন একটু পিছিয়ে দিতে। আর মজা এই যে, যার মৃত্যুভয় অতিরিক্ত, সে যে ও-ভয় থেকে মুক্তি পাবার জন্য আত্মহত্যা করে, এর প্রমাণও দুর্ল্লভ নয়। অজানা জিনিসের ভয়, জান্‌লে দেখা যায় ভুয়ো।

সে যাই হোক, এ-বিয়ে ভেঙ্গে গেল। আমিও বাঁচলুম। কেন ভেঙ্গে গেল, শুন্‌বে? মেয়ের আত্মীয়রা খোঁজ-খবর ক'রে জানতে পেলেন যে, আমি নিঃস্ব অর্থাৎ আমাদের পরিবারের বার'চটক্ দেখে লোকে যে মনে করে যে, সে-চটক রূপোর জলুস, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। কথাটা ঠিক। আমার বাপ-খুড়োরা কেউ পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত ধনের উত্তরাধিকারের প্রসাদে বাবুগিরি করেন নি, আর তাঁরা বাবুগিরি ক'রতেন ব'লেই ছেলেদের জন্যও ধন সঞ্চয় ক'র্‌তে পারেন নি। আমাদের ছিল যত্র আয় তত্র ব্যয়ের পরিবার। কন্যাপক্ষের মতে এ-রকম পরিবারে মেয়ে দেওয়া আর তা'কে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়া দুই সমান।

আমাদের আর্থিক অবস্থার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে লতিকার আত্মীয়-স্বজন আমার চরিত্রের নানা রকম ত্রুটিরও আবিষ্কার ক'র্‌লেন। আমি নাকি গানবাজনার মজ্‌লিসে আড্ডা দিই, গাইয়ে বাজিয়ে প্রভৃতি চরিত্রহীন লোকদের সোহবৎ করি; পান খাই, তামাক খাই, নস্যি নিই, এমন কি, Blue Ribbon Society-র নাম লেখানো মেম্বর নই। এক কথায় আমিও চরিত্রহীন।

আমার নামে লতিকার পরিবার এই সব অপবাদ রটাচ্ছে শুনে আমার গুরুজনেরাও মহা চটে গেলেন। কারণ, তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, আমাকে ভালমন্দ বল্‌বার অধিকার শুধু তাঁদেরই আছে, অপর কারও নেই, বিশেষতঃ আমার ভাবী শ্বশুরকুলের ত মোটেই নেই। ছোটকাকা ওদের স্পষ্টই বললেন যে, "শ্যাম্পেন ত আর গরুর জন্য তৈরী হয় নি, হয়েছে মানুষের জন্য, আর আমাদের ছেলেরা সব মানুষ, গরু নয়"। ভাঙা প্রস্তাব জোড়া লাগ্‌বের যদি কোনও সম্ভাবনা থাক্‌ত ত ছোটকাকার এক উক্তিতেই তা চুরমার হয়ে গেল। আমি আগেই ব'লেছি যে, এ-বিয়ে ভাঙাতে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সেই সঙ্গে সব পক্ষই মনে করলেন যে, আপদ শান্তি। তবে শুনতে পেলুম যে, একমাত্র লতিকাই এতে প্রসন্ন হয় নি। কোন মেয়েই তার মুখের গ্রাস কেউ কেড়ে নিলে খুসী হয় না। উপরন্তু আমার নিন্দাবাদটা তার কাণে মোটেই সত্যি কথার মত শোনায় নি। যখন বিয়ের প্রস্তাব এগুচ্ছিল, তখন বাড়ীতে আমার অনেক গুণগান সে

শুনেছে। দুদিন আগে যে দেবতা ছিল—দুদিন পরে সে কি ক'রে অপদেবতা হ'ল, তা' সে কিছুতেই বুঝতে পারল না। কারণ, তখন তা'র বয়েস মাত্র ষোলো—আর সংসারের তা'র কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার সঙ্গে বিয়ে হ'ল না ব'লে সে দুঃখিত হয় নি, কিন্তু আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছে মনে ক'রে সে বিরক্ত হয়েছিল।

লতিকার আত্মীয়রা আমার চরিত্রহীনতার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি সচ্চরিত্র যুবককে আবিষ্কার করলেন। আমার সঙ্গে বিয়ে ভাঙবার এক মাস পরেই সরোজরঞ্জনের সঙ্গে লতিকার বিয়ে হয়ে গেল। এতে আমি মহা খুসী হলুম। সরোজকে আমি অনেক দিন থাকতে জানতুম। আমার চাইতে সে ছিল সব বিষয়েই বেশি সৎপাত্র। সে ছিল অতি বলিষ্ঠ, অতি সুপুরুষ, আর এগজামিনে সে বরাবর আমার উপরেই হ'ত। সরোজের মত ভদ্র আর ভাল ছেলে আমাদের দলের মধ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না। উপরন্তু তার বাপ রেখে গিয়েছিলেন যথেষ্ট পয়সা। আমার যদি কোন ভগ্নী থাকত, তা' হ'লে সরোজকে আমার ভগ্নীপতি করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতুম। বিধাতা তা'কে আদর্শ জামাই ক'রে গড়েছিলেন।

আমি যা' মনে ভেবেছিলুম, হ'লোও তাই। সরোজ তা'র স্ত্রীকে অতি সুখে রেখেছিল। আদর-যত্ন অন্নবস্ত্রের অভাব লতিকা একদিনের জন্যও বোধ করেনি। এক কথায় আদর্শ স্বামীর শরীরে যে-সব গুণ থাকা দরকার, সরোজের শরীরে সে-সব গুণই ছিল। দাম্পত্যজীবন যত দূর মসৃণ ও যত দূর নিষ্কণ্টক হ'তে পারে, এ-দম্পতির তা' হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিবাহের দশ বৎসর পরেই লতিকা বিধবা হ'ল। সরোজ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে সরকারী চাকরী করতো। অল্পদিনের মধ্যেই চাকরীতে সে খুব উন্নতি করেছিল। ইংরেজী সে নিখুঁতভাবে লিখতে পারত, তার হাতের ইংরেজীর ভিতর একটিও বানান ভুল থাকত না, একটিও আর্ষ প্রয়োগ থাকত না। এক হিসেবে তার ইংরেজী কলমই ছিল তার দ্রুত উন্নতির মূলে। যদি সে বেঁচে থাকত, তা' হ'লে এতদিনে সে বড় কর্তাদের দলে ঢুকে যেত! বুদ্ধি-বিদ্যার সঙ্গে যা'র দেহে অসাধারণ পরিশ্রম-শক্তি থাকে, সে যাতে হাত দেবে, তাতেই কৃতকার্য্য হ'তে বাধ্য। কিন্তু সরোজ একদিন হঠাৎ প্লেগে মারা গেল। লতিকা একটি আট বছরের ছেলে নিয়ে দেশে ফিরে এল।

এর পর থেকেই তার অন্তরে যত স্নেহ ছিল, সব গিয়ে প'ড়ল তার ঐ একমাত্র সন্তানের উপর। ঐ ছেলে হ'ল তার ধ্যান ও জ্ঞান। ঐ ছেলেটিকে মানুষ ক'রে তোলাই হ'ল তার জীবনের ব্রত।

এ-পর্য্যন্ত যা' বললুম, তার ভিতর কিছুই নূতনত্ব নেই। এ-দেশে এবং আমার বিশ্বাস, অপর দেশেও বহু মায়ের ও-অবস্থায় একই মনোভাব হয়ে থাকে। তবে লতিকা তা'র ছেলেকে শুধু মানুষ করে' তুলতে চায় না, চায় অতিমানুষ করতে। আর এ অতি-মানুষের আদর্শ কে জানো? শ্রীসুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে আমি। এ কথা শুনে হেসো না। সে তা'র ছেলেকে পান-তামাক খেতে শেখাতে চায় না, সেই শিক্ষা দিতে চায়—যা'তে সে আমার মত সাহিত্যিক হয়ে উঠতে পারে। লতিকাকে তা'র স্বামী কিছু লেখা-পড়া শিখিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে তা'কে বুঝিয়েছিল যে, "সুরনাথ যা লিখেছে, তার চাইতে সে যা লেখে নি, তার মূল্য ঢের বেশি," অর্থাৎ আমি যদি আলসে না হতুম ত দশ ভলুম হিষ্ট্রি লিখতে পারতুম, আর না হয় ত পাঁচ ভলুম দর্শন। আমার ভিতর না কি যে-শক্তি ছিল, তা'র আমি সদ্ব্যবহার করি নি। এই কারণে সে মনে করে, আমিই হচ্ছি ওস্তাদ সাহিত্যিক। ফলে তা'র ছেলের সাহিত্যিক শিক্ষার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত হয়েছে। আর এই ছেলেটিরই নাম অতুলানন্দ। আমি জানি, সে কখনো সাহিত্যিক হবে না, অন্ততঃ আমার জাতের বাজে সাহিত্যিক হবে না। কারণ ছেলেটি হচ্ছে হুবহু সরোজের দ্বিতীয় সংস্করণ। সেই নাক, সেই চোখ, সেই মন, সেই প্রাণ। এ ছোকরা কর্ম্মক্ষেত্রে বড় লোক হ'তে পারে, কিন্তু কা[illegible]-জগতে এর বিশেষ কোন স্থান নেই। সরোজের মত এরও মন বাঁধা ও সোজা পথ ছাড়া গলি ঘুঁজিতে চলতে চায় না। এর চরিত্রে ও মনে বেতালা বলে' কোনও জিনিস নেই। আমার ভয় হয় এই যে, এর মনের ছন্দকে আমি শেষটা মুক্ত-ছন্দ না ক'রে দিই। কারণ, তা হ'লে অতুল আর সে-মুক্তির তাল সামলাতে পারবে না। হাঁটা এক কথা আর বাঁশবাজী করা আলাদা। কিন্তু অতুলকে এক ধাক্কায়, সাহিত্য-জগৎ থেকে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ, তা' করতে গেলে লতিকার মস্ত একটা Illusion ভেঙে দিতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরেও অশান্তির সৃষ্টি হবে। আমার স্ত্রী হচ্ছেন লতিকার বাল্য-বন্ধু ও প্রিয়সখী। অতুলকে সরস্বতী ছেড়ে লক্ষ্মীর সেবা করতে বললে আমাকে দুবেলা এই কথা শুনতে হবে

যে—পরের জন্যে কিছু করা আমার ধাতে নেই। তাই নানাদিক ভেবে চিন্তে আমি তাকে কবিতা-রচনায় লাগিয়ে দিলুম। জানতুম, ও বাঁধা ছন্দে, বাঁধি গতে যা-হয় একটা কিছু খাড়া ক'রে তুলবে। এই হচ্ছে "পিয়া ও পাপিয়ার" জন্ম-কথা। এ-কবিতা ছাপার অক্ষরে ওঠ্‌বার ফলে লতিকা ওকে পাঁচ-শ' টাকা দিয়ে এক সেট সেক্‌স্‌পিয়ার কিনে দিয়েছে। মনে ভেবো না যে, অতুলের মায়ের খাতিরে আমি তা'র মাথা খাচ্ছি। ও-ছেলের মাথা কেউ খেতে পারবে না। অতুলের ভিতর কবিত্ব না থাক, মনুষ্যত্ব আছে, আর সে-মনুষ্যত্বের পরিচয় ও জীবনের নানা ক্ষেত্রে দেবে। ও যখন জীবনে নিজের পথ খুঁজে পাবে, তখন কবিতা লেখ্‌বার বাজে সখ ওর মিটে যাবে। আর তখনও যদি ওর কলম চালাবার ঝোঁক থাকে ত আমি যা লিখিনি, কেননা, লিখতে পারি নি, ও তাই লিখ্‌বে, অর্থাৎ হয় দশ ভলুম ইতিহাস, নয় পাঁচ ভলুম দর্শন। পদ্য লেখার মেহন্নতে ও-র গদ্যের হাত তৈরী হবে।

ও-র অন্তরে যে কবিত্ব নেই, তা'র কারণ, ও-র বাপের অন্তরেও তা' ছিল না, ওর মা'র অন্তরেও তা নেই—অবশ্য কবিত্ব মানে যদি sentimentalism হয়।

এখন যে-কথা থেকে সুরু করেছিলুম, সেই কথায় ফিরে যাওয়া যাক্। আমার প্রতি লতিকার এই অদ্ভুত অবস্থার মূলে কি আছে? এ মনোভাবের রূপই বা কি, নামই বা কি? একে ঠিক ভক্তিও বলা যায় না, প্রীতিও বলা যায় না। সুতরাং এ হচ্ছে ভক্তি ও প্রীতিরূপ মনের দুটি সুপরিচিত মনোভাবের মাঝামাঝি Psychology-র একটি বাঁকা রেখা।

আর এ যদি ভক্তিমূলক প্রীতি অথবা প্রীতিমূলক ভক্তি হয়, তা' হ'লেও সে ভক্তি-প্রীতি কোনও রক্ত-মাংসে গড়া ব্যক্তির প্রতি নয়, অর্থাৎ ও-মনোভাব আমার প্রতি নয়, কিন্তু লতিকার মগ্ন-চৈতন্যে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে যে কাল্পনিক সুরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গড়ে' উঠেছে, তা'রই প্রতি, অর্থাৎ একটা ছায়ার প্রতি, যে ছায়ার এ পৃথিবীতে কোনও কায়া নেই। আমি শুধু তা'র উপলক্ষ মাত্র। আমার অনেক সময়ে মনে হয় যে, তা'র মনের আমার প্রতি এই অমূলক ভক্তির মূলে আছে আমার প্রতি তা'র আত্মীয়স্বজনের সেকালের সেই অযথা অভক্তি। এ হচ্ছে সেই অপবাদের প্রতিবাদ মাত্র। এ প্রতিবাদ তা'র মনে তা'র অজ্ঞাতসারে আস্তে আস্তে গ'ড়ে উঠেছে। দেখ্‌ছ এর ভিতর কোনও রোমান্স নেই, কেননা, এর ভিতর যা আছে, সে মনোভাব অস্পষ্ট—অতুলের মধ্যস্থতাই একমাত্র স্পষ্ট জিনিস।

—রোমান্স নেই সত্য, কিন্তু এই একই ব্যাপারের ভিতর ট্র্যাজেডি থাকতে পারে।

—কি রকম?

—আমি এই-রকমই আর একটি ব্যাপার জানি যা, শেষটা ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছিল। আজ থাক, সে গল্প আর একদিন বল্‌ব। কত ক্ষুদ্র ঘটনা মানুষের মনে যে কত বড় অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে, তা সে গল্প শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পারবে।

ভাদ্র ১৩৩৪।

কথা-সাহিত্য

আজ বছর চার পাঁচ থেকে পূজোর সময় গল্প লেখবার ফরমায়েস আমি নিয়মিত পাই। প্রতিবারই আমি এ অনুরোধ কি ক'রে রক্ষা করব, ভেবে পাই নে। আমি প্রবন্ধলেখক, গল্পলেখক নই। আমি অবশ্য পূর্ব্বে দু চারিটি গল্পও লিখেছি—সে কারণ যদি আমি গল্পলেখক হয়ে উঠি, তা হ'লে আমি কবি ব'লেও গণ্য—কেননা, আমি পদ্যও লিখেছি। কিন্তু কি গল্প, কি পদ্য—আমি যে অবলীলাক্রমে লিখিনে, তার প্রমাণ, আমার ও-জাতীয় লেখার পরিমাণ অতি সামান্য। সে যাই হোক্, এডিটার মহোদয়দের বোঝা উচিত যে, প্রবন্ধলেখকদের গল্প লিখতে আদেশ করা, বক্তাদের গান গাইবার আদেশ দেওয়ার তুল্য। এর ফলে অনেক লেখক, যাঁরা সুপাঠ্য প্রবন্ধ লিখতে পারতেন, তাঁরা আজ অপাঠ্য গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছেন।

এডিটাররা যে কেন গল্প চান—তা আমি সম্পূর্ণ জানি। পাঠকরা, বিশেষতঃ পাঠিকারা গল্প চান, কাজেই এডিটাররাও লেখকদের কাছে তাই চাইতেই বাধ্য। গল্পে রুচি বাঙ্গালী পাঠকদের একচেটে নয়, ও রুচি বিশ্বপাঠকসামান্য। এক জন ফরাসী সমালোচক লিখেছেন যে, তিনি বৎসরে কম-সে-কম ছ'শখানি নতুন নভেল পড়তে বাধ্য হন, তার সমালোচনা করবার জন্য। অর্থাৎ দিনে দুখানি নভেল গলাধঃকরণ করতে হয়। ভদ্রলোক—এত নভেল পড়বার সময় কোত্থেকে পান, বুঝতে পারি নে। কারণ, Duhamel শুধু সমালোচক নন, তিনি ফরাসী দেশের এক জন প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখক, উপরন্তু তাঁর ব্যবসা হচ্ছে ডাক্তারি। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এ যুগের পাঠকদের গল্প পড়বার লালসা কত বেশি। এ এপিডেমিক থেকে মুক্ত শুধু নিরক্ষর লোক—যেমন বেরি-বেরি থেকে মুক্ত শুধু নিরন্ন লোক।

কিন্তু একটু চোখ চেয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি সকল যুগেই মানুষের সর্ব্বপ্রধান মানসিক আহার হচ্ছে গল্প। পৃথিবীর অন্যান্য ভূ-ভাগের কথা ছেড়ে দিয়ে একমাত্র ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায়, সে অতীত গল্পপ্রাণ। এ দেশে পুরাকালে যত গল্প বলা হয়েছে ও লেখা হয়েছে, অন্য কুত্রাপি তার তুলনা নেই। আমরা ধর্ম্মপ্রাণ জাতি ব'লে বিশ্বে পরিচিত, কিন্তু যুগ যুগ ধ'রে আমাদের ধর্ম্মের বাহন হয়েছে, মুখ্যতঃ গল্প। রামায়ণ, মহাভারত বাদ দিলে হিন্দুধর্ম্মের পোনেরো আনা বাদ প'ড়ে যায়, আর জাতক বাদ দিলে বৌদ্ধধর্ম্ম দর্শনের কচকচি মাত্র হয়ে ওঠে রামায়ণ, মহাভারত, জাতক ছাড়াও এ দেশে অসংখ্য গল্প আছে, যা সেকালে সাহিত্য ব'লেই গণ্য হ'ত। এ দেশের যত কাব্য-নাটকের মূলে আছে গল্প। তা ছাড়া আখ্যায়িকা ও কথা নামে দুটি বিপুল সাহিত্য সেকালে ছিল এবং এ কালেও তার কতক অংশের সাক্ষাৎ মেলে। আখ্যায়িকাই বলো আর কথাই বলো, ও দুই হচ্ছে একই বস্তু—অন্ততঃ সেকালের আলঙ্কারিকরা অনেক তর্ক-বিতর্ক ক'রে শেষটা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে,—

> তৎ কথাখ্যায়িকা হ্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা।
> অত্রৈবান্তর্ভবিষ্যন্তি শেষাশ্চাখ্যানজাতয়ঃ॥
> (কাব্যাদর্শ—প্রথম পরিচ্ছেদ, ২৮ শ্লোক)।

অর্থাৎ ও দুই এক জাতি, শুধু নাম আলাদা। ইংরাজী লজিকের ভাষায় যাকে বলে genus এক species আলাদা। এই speciesও বহুবিধ ছিল। তার মধ্যে পাঁচটির তাঁরা নাম উল্লেখ করেছেন।

> "আখ্যায়িকা কথা খণ্ডকথা পরিকথা তথা।
> কথানিকেতি মন্যন্তে গদ্যকাব্যঞ্চ পঞ্চধা।"

এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, "কথা"ও চার রকম ছিল, যথা—"কথা", "খণ্ডকথা", "পরিকথা", "কথানিকা"। আর এই কথা-সাহিত্য সর্ব্বভাষাতেই রচিত হ'ত, সংস্কৃত ভাষাতেও। দণ্ডী বলেছেন যে,—

> "কথা হি সর্ব্বভাষাভিঃ সংস্কৃতেন চ বধ্যতে।"

এর থেকে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ভারতবর্ষের লৌকিক অলৌকিক সকল সাহিত্যের প্রাণ হচ্ছে—কথা-সাহিত্য।

কথা-সাহিত্য এ দেশে বিলেত থেকে আমদানী করা নূতন সাহিত্য নয়। বরং সত্য কথা এই যে, পুরাকালেও সাহিত্য ভারতবর্ষে রচিত হয়ে, তার পর দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। এক কালে

পঞ্চতন্ত্র ও জাতকের প্রচলন য়ুরোপের লোকসমাজে যে অতি বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। উপরন্তু বহু পণ্ডিতের মতে আরব্য উপন্যাসের জন্মভূমিও হচ্ছে ভারতবর্ষ।

আজ যে আমরা সকলেই গল্প শুনতে চাই, তার কারণ, এ প্রবৃত্তি আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি। এ ত গেল শ্রোতা অথবা পাঠকের কথা।

এখন মুস্কিল হয়েছে লেখকদের। সমাজ যত গল্প চায়, তত গল্প আমরা জোগাই কোত্থেকে? কথা-বস্তু আমরা সংগ্রহ করব কোন্ জগৎ থেকে, তাই হয়েছে আমাদের ভাবনার বিষয়। আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বাচার্য্যরা যেখান থেকে তা সংগ্রহ করেছেন, আমাদেরও সেখান থেকে তা সংগ্রহ করতে হবে,—অর্থাৎ বই থেকে।

গল্পের উপাদান হয় জীবনের বই, না হয় ত কাগজের বই থেকে আমদানী করতে হয়, এ দুই ছাড়া এমন কোন তৃতীয় বই নেই, যার থেকে আমরা গল্পের মাল-মসলা সংগ্রহ করতে পারি।

জীবন-গ্রন্থ থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ করা এক হিসেবে অতি সহজ। কেননা, এ গ্রন্থ সকলের সুমুখেই পড়ে' রয়েছে। এ গ্রন্থ পড়বার জন্য কারও পক্ষে কোনও রূপ ব্যাকরণ কি অভিধান মুখস্থ করবার প্রয়োজন নেই, কোনও রূপ শাস্ত্রমার্গে ক্লেশ করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু আর এক হিসেবে, এ বই পড়া অতি কঠিন। আমাদের অধিকাংশ লোকের এ পুস্তকের শুধু মলাটের সঙ্গে পরিচয় আছে। সে মলাট আমরা খুলতে ভয় পাই—কেননা, আমরা জানিনে যে, জীবনের সামাজিক আবরণ উদ্ঘাটিত করলে তার ভিতর থেকে সাপ ব্যাং কি বেরিয়ে পড়বে।

অপর পক্ষে কাগজের বই থেকে কথা-বস্তু সংগ্রহ করা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং এক হিসেবে মামুলি। বড় বড় লেখকদেরই উদাহরণ দেওয়া যাক্। তাঁরা অনেকেই ও-বস্তু বই থেকেই সংগ্রহ করেছেন। কালিদাস 'শকুন্তলার' কথাবস্তু নিয়েছেন—মহাভারত থেকে, ভবভূতি 'উত্তররাম-চরিতের' কথাবস্তু নিয়েছেন—রামায়ণ থেকে। অপর পক্ষে কালিদাস 'মালবিকাগ্নিমিত্রের' কথাবস্তু কতক সংগ্রহ করেছিলেন ইতিহাস থেকে আর কতক বানিয়েছিলেন নিজে। আর ভবভূতির 'মালতী-মাধবের' কথা সম্ভবতঃ আগাগোড়া ভবভূতির মনগড়া।

'শকুন্তলার' সঙ্গে 'মালবিকাগ্নিমিত্রে'র আর উত্তররাম-চরিতের' সঙ্গে 'মালতী-মাধবের' প্রভেদ যে কি, তা সকলেই জানেন। উপরি-উক্ত নাটকসমূহের তারতম্যের কারণ নির্ণয় করতে হ'লে বলতে হয় যে, লেখকরা পাকা হাতে কথাবস্তু সংগ্রহ করেন বই থেকে, আর কাঁচা হাতে জীবন থেকে। ভারতবর্ষ ছেড়ে বিলেতে গেলেও এই একই সত্যের পরিচয় পাই। Shakespeareএর সব বড় নাটকের কথাবস্তু তাঁর মনগড়া নয়—তা তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী গল্পলেখকদের কথামালা থেকে সংগৃহীত।

আসল কথা, সাহিত্য-জগতে চুরি ব'লে কোনও জিনিস নেই। রামের কথা শ্যাম আত্মসাৎ করতে পারলেই, তা শ্যামের কথা হয়ে উঠে। এই আত্মসাৎ ক্রিয়াটাই প্রতিভাসাপেক্ষ। যে পরের জিনিস নিজের মনের উত্তাপে গলিয়ে নিতে পারে না, সাহিত্য-রাজ্যে সেই চোরদায়ে ধরা পড়ে।

আর এক কথা, কাগজের বই থেকে গল্পের উপাদান সংগ্রহ করা যদি চুরি হয়, তা হ'লে জীবনের বই থেকে তা সংগ্রহ করাও চুরি। সত্য কথা এই যে, মানুষের সুমুখে দুটি জগৎ প'ড়ে রয়েছে—তার মধ্যে একটি হচ্ছে প্রকৃতির হাতে গড়া, অপরটি মানুষের হাতে গড়া। এই উভয় জগৎ থেকেই মনের খোরাক সংগ্রহ করবার আমাদের সমান অধিকার আছে।

তাই যখন দেখতে পাই যে, সমালোচকরা গল্পলেখকদের প্রতি এই দোষারোপ করেন যে, তাঁরা তাঁদের কথাবস্তু বিদেশী সাহিত্য থেকে চুরি করেন, তখন অবাক্ হয়ে যাই। এ অপবাদ সত্য কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

কারণ, কোন য়ুরোপীয় লেখকের কোন গল্প বাঙ্গলা লেখকরা হস্তান্তর করেছেন, সে সন্ধান সমালোচকরা আমাদের দেন না। কিন্তু এ কথা যদি সত্যই হয়, তাতে কিন্তু কিছু আসে যায় না। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, সাহিত্য-জগতে চুরি ব'লে কোনও পাপ নেই। আর আমরা যদি য়ুরোপীয় সাহিত্যের দ্রব্য না ব'লে গ্রহণ করি, তা হ'লে সে কার্য্য নৈতিক হিসেব থেকে হেয় ব'লে গণ্য হয় না। সেকালে ভারতবর্ষ যদি দেদার কথাবস্তু বিদেশে রপ্তানী ক'রে থাকে ত একালে বিদেশ থেকে দেদার আমদানী করবার অধিকার আমাদের আছে। এ হচ্ছে আমাদের পিতৃঋণ পরকে দিয়ে শোধ করানো।

এ ক্ষেত্রে আসল বিচার্য্য হচ্ছে, য়ুরোপীয় কথাবস্তু আমরা যথার্থ আত্মসাৎ করতে পারি কি না? পঞ্চতন্ত্রের কথামালা যে য়ুরোপের অধিবাসীরা বেমালুম আত্মসাৎ করতে পেরেছিল, তার কারণ—সে সব কথা হচ্ছে বাঘ-ভালুক, শেয়াল-কুকুর ইত্যাদির কথা। আর ও সব জীব পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একই

ধরণের ; অন্ততঃ সব দেশেই তাদের ভাব ও ভাষা একই ছাঁচে ঢালা। আর আরব্য উপন্যাসের —কথাকাহিনীর কোনও স্বদেশ নেই।—ও পুস্তকের বর্ণিত ব্যাপার সব ভারতবর্ষেও যেমন অলৌকিক, আরব দেশেও তেমনই, য়ুরোপেও তাদৃশ।

কিন্তু এ কালের কথাবস্তু সবই লৌকিক, আর তার পাত্র-পাত্রী সব মানুষ। এক দেশের লৌকিক আচার-ব্যবহার আর এক দেশের লৌকিক আচার-ব্যবহারের সঙ্গে মেলে না। তা ছাড়া য়ুরোপের স্ত্রী পুরুষ—শুধু চর্ম্মে নয়, মর্ম্মেও এ দেশের স্ত্রী-পুরুষ থেকে অনেক তফাৎ। সুতরাং য়ুরোপের লোকদের বাঙ্গালীতে রূপান্তরিত করা তেমনই কঠিন—বাঙ্গালীকে ইংরাজ করা যেমন কঠিন। ও কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করবার মত হাত-সাফাই সকলের নয়।

এখন আমার প্রস্তাব এই যে, "এসো, আমরা সকলে সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের খনির ভিতর প্রবেশ করি, তা হ'লেই সেখান থেকে এমন সব রত্ন উদ্ধার করতে পারব, যা বঙ্গসরস্বতীর গায়ে অনায়াসে পরাতেও পারব এবং তার ফলে বঙ্গসাহিত্যের ঐশ্বর্য্য অপর্য্যাপ্ত রকম বেড়ে যাবে।"

এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করতে অনেকে ইতস্ততঃ করবেন। অনেকে বলবেন যে, সংস্কৃত ভাষা তাঁরা জানেন না। তাতে কিছু আসে যায় না। সত্য কথা বলতে গেলে ইংরাজীও আমরা জানি নে, সুতরাং ইংরাজীর আশ্রয় নিতে যদি আমরা রাজী থাকি, তা হ'লে সংস্কৃতের আশ্রয় নিতে নারাজ হবার কোনই কারণ নেই। এ কথা শুনে যাঁরা চমকে উঠবেন, তাঁদের কাছে নিবেদন করি যে, যে রকম ইংরাজী তাঁরা জানেন, সে রকম সংস্কৃত তাঁরা সবাই জানেন, বাঙ্গালী লেখকমাত্রেই ত সাধুভাষা জানেন আর সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের ভাষা প্রায় ঐ গোছের। এমন কি, অনুস্বার-বিসর্গ দেখে যাঁরা ভড়কান না, তাঁরা দু'দিনেই বুঝতে পারবেন যে, সে ভাষা সাধুভাষার চাইতে সহজবোধ্য।

কেউ কেউ হয় ত এই আপত্তি করবেন যে, সেকেলে গল্পে আমাদের মন উঠবে না। কেন না, তাতে একেলে গল্পের মত psychology নেই। এর উত্তরে বক্তব্য যে, একালের বহু ইংরাজী গল্পে গল্প নেই, আছে শুধু psychology। বিলেতের একটি বড় নভেলিষ্টের উদাহরণ নেওয়া যাক্। H. D. Wells এর নভেলে কথাবস্তু ব'লে কোনও জিনিস কি আছে? তাঁর নভেলের পাত্রপাত্রীরা কি বড় বড় বক্তৃতা ঝোলাবার আলনা মাত্র নয়? এখন এ কথা জোর ক'রে বলা যায় যে, নভেলই লেখো আর ছোট গল্পই লেখো, ভাষান্তরে আখ্যায়িকাই লেখো আর খণ্ডকথাই লেখো, ও দুয়েরই প্রাণ হচ্ছে "কথা" ওরফে গল্প। কথা ছুট কথা-সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান পলিটিক্স ইকনমিকস্ যা খুসি তাই হ'তে পারে, কিন্তু তা গল্পও নয়, সাহিত্যও নয়। শিক্ষালাভ করতে আর কেউ থিয়েটারে যায় না—যায় স্কুলে। সংস্কৃত গল্পলেখকদের এ জ্ঞান ছিল যে, তাঁরা স্কুলমাষ্টার নন। সকল বিলেতী লেখকের তা নেই। সে যাই হোক্, সংস্কৃত গল্পে যে psychology নেই—এ আশঙ্কা অমূলক। নাটককার দর্শকমণ্ডলীকে পুতুলনাচ দেখান না— ছায়াবাজিও দেখান না ; রক্তমাংসের দেহধারী নর-নারী নিয়েই তাঁর কারবার। নাটকের পাত্র-পাত্রীরা অবশ্য ভিত্তি-গাত্রে সংলগ্ন চিত্রপুত্তলিকার মত তটস্থ হয়ে থাকেন না। তাঁরা নড়েন চড়েন, কথা কন, হাসেন, কাঁদেন এবং মাঝে মাঝে হাত-পা ছোড়েন। বলা বাহুল্য যে, এ সব ক্রিয়ার জন্মভূমি হচ্ছে মন নামক দেশ।

গল্পের নায়ক-নায়িকারাও একেবারে নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বাক্ নন। সুতরাং গল্প-সাহিত্যের ভিতর থেকেও আমরা মানব-মন ও মানব-চরিত্রের অসংখ্য বৈচিত্র্যের পরিচয় পাই। সংস্কৃত কথা-সাহিত্য এ ধর্ম্মে বঞ্চিত নয়।

আমাদের দেশের বহু নাটকের কথাবস্তু যে কথা-সাহিত্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে, সে সত্য তাঁর কাছেই সুবিদিত—যাঁর রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে পরিচয় আছে। আর পণ্ডিতদের মুখে শুনেছি যে, সংস্কৃত ভাষার বড় বড় পদ্য-কাব্যের মূলও ঐ কথা সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যায়।

সুতরাং নব্য গল্পলেখকদের ইংরাজী [illegible] সংস্কৃত কথা-সাহিত্যের আঁচল ধরবার পরামর্শ দিয়ে আমি তাঁদের বিপথে নিয়ে যাবার কুপরামর্শ দিচ্ছি নে।

এ কাজ করায় আমাদের মৌলিকতাও নষ্ট হবে না। পরের জিনিস আপন ক'রে নেবার ভিতর একটা মস্ত মৌলিকতা আছে। প্রকৃত গুণী ব্যতীত অপর কারও দ্বারা তা সুসাধ্য নয়। একটু আধটু বদলে জিনিস যে সম্পূর্ণ নতুন হয়ে যায়, তার প্রমাণ দেখতে চান ত অতি বড় সুন্দরী রমণীর নাসাবংশ এক ইঞ্চি বাড়িয়ে দেখুন, সে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে কি না? সত্য কথা এই যে,

"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।"

বাঙ্গলার গল্পলেখকরা যদি আমার পরামর্শ প্রসন্ন-মনে গ্রাহ্য করেন ত আসছে বছর পুজোর সময় তাঁরা দেশ গল্পে ছেয়ে দিতে পারবেন। ইতি

শারদীয়া পঞ্চমী, ১৩৩

পূজার বলি

উকীল অবশ্য আমরা সবাই হই—পয়সা রোজগার করবার জন্য। কিন্তু পয়সা সকলের ভাগ্যে জোটে না, তবুও যে আমরা অনেকেই ও ব্যবসার মায়া কাটাতে পারি নে, তার কারণ, ও ব্যবসার টান শুধু টাকার টান নয়। আমাদের ভিতর যাঁদের মন পলিটিক্সের উপর প'ড়ে আছে, তাঁরা জানেন যে, বার লাইব্রেরীর তুল্য পলিটিক্সের স্কুল ভারতবর্ষে আর কুত্রাপি ন ভূত ন ভবিষ্যতি। ও স্কুলে ঢুকলে আমরা যে জুনিয়ার পলিটিক্সের হাড়হদ্দর সন্ধান পাই, শুধু তাই নয়; সেই সঙ্গে আমাদের পলিটিক্যাল মেজাজও নিত্য তর্ক-বিতর্ক বাগ্‌-বিতণ্ডার ফলে সপ্তমে চ'ড়ে থাকে। এ স্কুলের আর এক মহাগুণ এই যে, এখানে কোনও ছাত্র নেই, সবাই শিক্ষক—এ কালের ভাষায় যাকে বলে—জায়গাটা হচ্ছে পুরো ডিমোক্রাটিক। মিটিং ত এখানে নিত্য হয়, উপরন্তু Freedom of speech এ ক্ষেত্রে অবাধ। তার পর যাঁদের মন পলিটিক্যাল নয়—সাহিত্যিক, তাঁরাও উকীলের বার-লাইব্রেরীতে ঢুকলেই দেখ্‌তে পাবেন যে, এতাদৃশ গল্পের আড্ডা দেশে অন্যত্র খুঁজে পাওয়া ভার। উকীল-মহলে একদিনে যে সব গল্প শোনা যায়, তাতে অন্ততঃ বারোখানা মাসিকপত্রের বারোমাস পেট ভরানো যায়।

পৃথিবীর মানুষের দুটিমাত্র ক্রিয়াশক্তি আছে;—এক বল, আর এক ছল। মানুষ যে কত অবস্থায় কত ভাবে কত প্রকার বল-প্রয়োগ করে, তার সন্ধান পাওয়া যায় সেই সব উকীলের কাছ থেকে—যাঁরা ফৌজদারী আদালতে প্রাক্‌টিস্‌ করেন, আর non-violent লোকরা যে কত অবস্থায়, কত ভাবে, কত প্রকার ছল-প্রয়োগ করেন, তার সন্ধান পাওয়া যায় সেই সব উকীলের কাছ থেকে,—যাঁরা দেওয়ানী আদালতে প্র্যাক্‌টিস্‌ করেন।

আমি জনৈক ফৌজদারী উকীলের মুখে একটি গল্প শুনেছি, সেটি আপনারা শুনলেও বলবেন যে, হাঁ, এটি একটি গল্প বটে। আমার জনৈক উকীল বন্ধু উত্তরবঙ্গের কোনও জিলাকোর্টে একটি খুনী মামলায় আসামীকে defend করেন। কিন্তু তাকে তিনি খালাস করতে পারেন নি। জুরী আসামীকে একমত হয়ে দোষী সাব্যস্ত করেন, আর জজ-সাহেব তার উপর ফাঁসীর হুকুম দিলেন। হাইকোর্টে ফাঁসীর বদলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ।

আমার উকীল বন্ধুটির দেশে Criminal lawyer ব'লে খ্যাতি আছে। এর থেকেই অনুমান করতে পারেন যে, জীবনে তিনি বহু অপরাধীকে খালাস করেছেন, আর বহু নিরপরাধকে জেলে পাঠিয়েছেন। খুনীমামলার আসামীর প্রাণরক্ষা না করতে পারলে প্রায় সব উকীলই ঈষৎ কাতর হয়ে পড়েন, বোধ হয়, তাঁরা মনে করেন যে, বেচারার অপঘাতমৃত্যুর জন্য তাঁরাও কতক পরিমাণে দায়ী। এ ক্ষেত্রে আমার বন্ধু গলার জোরে আসামীর গলা বাঁচিয়েছিলেন, তবুও তার দ্বীপান্তরগমনে তাঁর পুত্রশোক উপস্থিত হয়েছিল। এই ঘটনার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি এ মামলার কথা উঠলেই রাগে, ক্ষোভে অভিভূত হয়ে পড়তেন, তখন তাঁর বড় বড় চোখ দুটি রক্তবর্ণ হয়ে উঠত আর তার ভিতর থেকে বড় বড় ফোঁটায় জল পড়ত। তাঁর দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে, আসামী সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আর জজ-সাহেব যদি টিপিনের পরে নয়, পূর্ব্বে জুরীকে ঘটনাটি বুঝিয়ে দিতেন, তা হ'লে জুরী একবাক্যে আসামীকে not guilty বলত। জজসাহেব নাকি টিপিনের সময় অতিরিক্ত হুইস্কি পান করেছিলেন এবং তার ফলে সাক্ষ্য-প্রমাণ সব ঘুলিয়ে ফেলেছিলেন।

মামলা হারলেই সে হারের জন্য উকীলমাত্রই জজের বিচারের দোষ ধরেন—যেমন পরীক্ষায় ফেল হ'লে পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষকের দোষ ধরেন। সেই জন্য আমি আমার বন্ধুর কথায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখ্‌তে পারি নি। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আসামীর প্রতি অনুরাগই তাঁর ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। কারণ, সে ছিল প্রথমতঃ ব্রাহ্মণের ছেলে, তার পর জমীদারের ছেলে, তার উপর সুন্দর ছেলে, উপরন্তু কলেজের ভাল ছেলে। এ রকম ছেলে যে কাউকে খুন-জখম করতে পারে, এ কথা আমার বন্ধু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি—তাই তিনি সমস্ত অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করতেন যে, সে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

ঘটনাটি আমরা পাঁচ জন একরকম ভুলেই গিয়েছিলুম। কারণ, সংসারের নিয়মই এই যে, পৃথিবীর পুরানো ঘটনা সব ঢাকা পড়ে "নব নব ঘটনার জালে", আর আদালতে নিত্য নব ঘটনার কথা শোনা যায়। উক্ত ঘটনার বছর পাঁচেক পরে আমার বন্ধুটি এক দিন বার-লাইব্রেরীতে এসে আমার হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন যে, এখানি মন দিয়ে পড়ো, কিন্তু এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলো না। সে দিন আমার বন্ধুর মুখের চেহারা দেখে বুঝতে পারলুম না যে, তাঁর মনের ভিতর কি ভাব বিরাজ করছে;—আনন্দ না মর্ম্মান্তিক দুঃখ? শুধু এইটুকু লক্ষ্য করলুম যে, একটা ভয়ের চেহারা তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে। চিঠির দিকে তাকিয়ে প্রথমে নজরে পড়ল যে, তার উপরে কোনও ডাকঘরের ছাপ নেই। তাই মনে হয়েছিল যে, এখানি কোনও স্ত্রীলোকের চিঠি—যে চিঠি সে তাকে দেবার সুযোগ অথবা সাহস পায় নি। এ রকম সন্দেহ হবার প্রধান কারণ এই যে, আমার বন্ধু আমাকে এ পত্রের বিষয়ে নীরব থাকতে অনুরোধ করেছিলেন। তার পর যখন লক্ষ্য করলুম, শিরোনামা অতি সুন্দর, পরিষ্কার পাকা ও ইংরাজী অক্ষরে লেখা,—সে বিষয়ে আমার মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না। আমি লাইব্রেরীর একটি নিভৃত কোণে একখানি চেয়ারে ব'সে সেখানি এইভাবে পড়তে সুরু করলুম—যেন সেখানি কোনও briefএর অংশ। ফলে কেউ আর আমার ঘাড়ের উপর ঝুঁকে সেটি দেখবার চেষ্টা করলে না। উকীল-সমাজের একটা নীতি অথবা রীতি আছে, যা সকলেই মান্য করে। সকলেই পরব্রিফকে পরস্ত্রীর মত ব্যবহার করে অর্থাৎ কেহই প্রকাশ্যে তার দিকে নজর দেয় না।

সে চিঠিখানি নেহাৎ বড় নয়, তাই সেখানি এত দিন পরে প্রকাশ করছি। প'ড়ে দেখলেই ব্যাপার কি বুঝতে পারবেন।

"আন্দামান।

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

দেশ থেকে যখন চিরকালের জন্য বিদায় নিয়ে আসি, তখন নানারকম দুঃখে আমার মন অভিভূত হয়ে পড়েছিল, তার ভিতর একটি প্রধান দুঃখ ছিল এই যে, আসবার আগে আপনার পায়ের ধুলো নিয়ে আসতে পারি নি। আপনি আমার প্রাণরক্ষার জন্য যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, তা সত্য সত্যই অপূর্ব্ব। আমি জানতুম যে, উকীল-ব্যারিষ্টাররা মামলা-লড়ে—পয়সার জন্য এবং তারা তাদের কর্ত্তব্যটুকু সমাধা করেই খালাস, মামলার ফলাফল তাদের মনকে তেমন স্পর্শ করে না। এ ক্ষেত্রে পরিচয় পেলুম যে, মানুষ কেবলমাত্র তার কর্ত্তব্যটুকু সেরেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না। অনেক মামলা উকীলদের মনকেও পেয়ে বসে। আপনি আমাকে খালাস করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, উপরন্তু আমার বিপদ আপনি নিজের বিপদ্ হিসেবেই গণ্য করেছিলেন। আমার সাজা হওয়ার ফলে আপনি যে মর্ম্মান্তিক কষ্ট বোধ করেছিলেন, তা থেকে আমি বুঝলুম যে, আপনি আমার আপন ভাইয়ের মত আমার বিপদে ব্যথা বোধ করেছিলেন। এর ফলে আপনার স্মৃতি আমার মনে চিরকালের জন্য গাঁথা রয়ে গিয়েছে।

আর একটি কথা, আসল ঘটনা কি ঘটেছিল, তা আপনার কাছে আমরা গোপন করেছিলুম। আজকে সব কথা খুলে বলছি। সে কথা শুনলেই বুঝতে পারবেন যে, ঘটনা যা ঘটেছিল, তা নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও প্রকাশ করতে পারতুম না। আমার বরাবরই ইচ্ছে ছিল যে, সুযোগ পেলেই আপনাকে এ ঘটনার সত্য ইতিহাস জানাব। একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের এখানকার মেয়াদ ফুরিয়েছে। তিনি দু'দিন পরে দেশে ফিরে যাবেন। তাঁর হাতেই এ চিঠি পাঠাচ্ছি। তিনি এ চিঠি আপনার হস্তে দেবেন। আপনি জানেন যে, আমি যখন খুনী মামলার আসামী হই, তখন আমি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি, এ, পড়তুম। শুধু পূজোর ছুটীতে বাড়ী আসি। আমি [illegible]মীর দিন রাত আটটায় বাড়ী পৌঁছুই। বাড়ী [illegible]য়েই প্রথমে বাবার সঙ্গে দেখা করি, তার পর বাড়ীর ভিতর মা'র সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। বন্ধুও আমার সঙ্গে মা'র কাছে গেল। বন্ধু কে, জানেন? সেই ছোকরাটি—যে আমার মামলার আগাগোড়া তদ্বির করছিল, আর যে দিবারাত্র আপনার কাছে থাকত, আপনাকে আমাদের defence বুঝিতে দিত। বন্ধু আমার আত্মীয় নয়, কারণ, আমরা ব্রাহ্মণ আর সে ছিল কায়স্থ। কিন্তু এক হিসেবে সে আমার মায়ের পেটের ভায়ের মতই ছিল। বন্ধুর ঠাকুরদাদা আমার ঠাকুরদাদার দেওয়ান ছিলেন এবং তাঁর দত্ত জোতজমার প্রসাদে ওদের পরিবার—গাঁয়ের একটি ভদ্র গেরস্ত পরিবার হয়ে উঠেছিল। ও পরিবার আমাদের বিশেষ অনুগত ছিল। উপরন্ত বন্ধু ছিল আমার সমবয়সী ও স্কুলে সহপাঠী। যে যখন ম্যাট্রিক পড়ত, তখন তার বাপ মারা যান

সে তাই স্কুল ছেড়ে দিয়ে সংসারের ভার ঘাড়ে নিলে। সেই অবধি সে গ্রামেই বাস করত এবং আমার বাবা ও মা যখন তার ঘাড়ে যে কাজের ভার চাপাতেন, তখন সে কাজ যেমন করেই হোক, উদ্ধার ক'রে দিত। এই সব কারণে সে যথার্থই ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিল। সুতরাং আমাদের বাড়ীতে তার গতিবিধি ছিল অবাধ এবং তার সুমুখে সকলেই নির্ভয়ে সকল কথাই বলতেন। বাড়ীর ভিতর গিয়ে শুনি যে, মা তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। বঙ্কু ও আমি তাঁর শোবার ঘরে ঢুকতেই তিনি বিছানায় উঠে বস্‌লেন। আমি তাঁকে প্রণাম করবার পর তিনি আমাকে ও বঙ্কুকে পাশের একখানি খাটে বসতে বললেন। আমরা বসবামাত্র মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ?

—ভাল।

—কলকাতায় কেমন ছিলে?

—ভালই ছিলুম।

—তবে কলকাতা ছেড়ে এখানে এলে কি জন্যে?

—পূজোর সময় বাড়ী আসব না?

—কার বাড়ীতে এসেছ?

—কেন, আমাদের বাড়ীতে।

—তোমাদের ত কোনও বাড়ী নেই।

—মা, তুমি কি বলছ, বুঝতে পাচ্ছিনে।

—এ বাড়ী অবশ্য তোমার চৌদ্দপুরুষের; কিন্তু তোমার নয়। অমন ক'রে চেয়ে রইলে কেন? জিজ্ঞাসা করি, জমীদারী কার, তোমাদের না অন্যের?

—আমাদের ব'লেই ত চিরকাল শুনে আসছি।

—তবে আমি বলি, শোন। তোমাদের এখন ফোঁটা দেবার মাটিটুকুও নেই।

—আগে ছিল. এখন গেল কি ক'রে?

—জমীদারী পাঁচ আনীর কাছে বন্ধক ছিল জানো?

—তা জানি।

—এখন পাঁচ আনী দশ আনীরও মালিক হয়েছে। তোমাদের অংশ এখন পাঁচ আনীর কাছে আর বন্ধক নেই, এখন তা দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গিয়েছে, আর তা কিনেছে পাঁচ আনী।

—বল কি? সত্যি?

—সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীখানিও গিয়েছে। পাঁচ আনী এখন তোমাদের ভিটে-মাটী উচ্ছন্ন করেছে। যাক্, তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে সে এবার পূজো করবে।

—তা হ'লে আমাদের পূজো বন্ধ থাকবে?

—অবশ্য। এ অধিকার এখন পাঁচ আনীর, সে অধিকার সে ছাড়বে না। যে ঠাকুর আমরা এনেছি, সেই ঠাকুরই সে নিজের পুরুত দিয়ে পূজো করাবে, ধুমধামও হবে যথেষ্ট, আর আমাদের কাঙ্গালী বিদেয় করবে।

—এর কোনও উপায় নাই মা?

—থাকবে না কেন, তোমাদের দ্বারা তা হবে না। আমার পেটে হয়েছে শুধু শেয়াল-কুকুর—যদি মানুষের গর্ভধারিণী হতুম, তা হ'লে আর তোমার চৌদ্দপুরুষের পূজো বন্ধ হ'ত না।

—কি উপায়?

—উপায় সোজা, শত্রুনিপাত করা।

মা'র মুখে এ প্রস্তাব শুনে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হলো। তাঁর কথা শুনে আমি মাথা নীচু ক'রে বারবাড়ীতে চ'লে এলুম। বঙ্কুও আস্‌ছি ব'লে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। দুর্ভাবনায় দুশ্চিন্তায় আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলুম, তাই আমার ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবতে লাগলুম। মনটা এতই অস্থির হয়েছিল যে, তখন কি ভাবছিলুম, তা বলতে পারি নে। এই ভাবে ঘণ্টাখানেক গেল। তার পর বঙ্কু হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'ল। সে এসেই বল্লে যে, চল, মা'র কাছে যাই, তাঁকে একটা খবর দিয়ে আসি। বঙ্কুর মুখের চেহারা দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলুম, তার এত গম্ভীর চেহারা আমি জীবনে কখনও দেখি নি; কিন্তু তার কণ্ঠস্বরের ভিতর এমনই একটা দৃঢ় আদেশের সুর ছিল যে, আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার সঙ্গে আবার বাড়ীর ভিতর গেলুম। মা তখনও নিজের ঘরে শুয়ে ছিলেন। বঙ্কু তাঁর ঘরে ঢুকেই বল্‌লে, "মা, একট্য সু-খবর আছে, তোমার শত্রু নিপাত হয়েছে।" এ কথা শুনে মা ধড়ফড়িয়ে উঠে ব'সে হাঁ ক'রে বঙ্কুর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। বঙ্কু আবার বল্লে—"মা, কথা মিথ্যে নয়। আমিই তাকে নিজ হাতে নিপাত করেছি। বলি বাধে নি, এক কোপেই সাবাড় করেছি", এই ব'লেই সে বুকের ভিতর থেকে একখানা দা বার ক'রে দেখালে, সেখানি তাজা রক্তমাখা, আর সে রক্ত এতই তাজা যে, তা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল।

তাই দেখে মা মূর্চ্ছা গেলেন, আর আমি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আলাদা মানুষ হয়ে গেলুম। আমার

মনের ভিতর যেন একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্প হয়ে গেল। মনের পুরানো ভাব, পুরানো আশা-ভয় সব চুরমার হয়ে গেল। ভালমন্দর জ্ঞান মুহূর্তে লোপ পেল, আমার মনে হ'ল যে, আমি একটা মহাশ্মশানের ভিতর দাঁড়িয়ে আছি, তখন মনে হ'ল, পৃথিবীতে মৃত্যুই সত্য আর জীবনটা মিছে।

আসল ঘটনা যা ঘটেছিল, তা আপনাকে খুলেই লিখলুম। দেখছেন, এ ঘটনা আমি সে কালে কিছুতেই প্রকাশ কর্‌তে পারতুম না, প্রাণ গেলেও নয়। আজ যে আপনার কাছে প্রকাশ কর্‌ছি, তার কারণ, মা এখন ইহলোকে নেই, বন্ধু ত শুনেছি সংসার ত্যাগ করেছে।

আপনি ঠিকই ধরেছিলেন, খুন আমি করি নি, তবে আমি যে শাস্তি ভোগ করছি, তার কারণ, আসল ঘটনাটা যাতে প্রকাশ না পায়, তার জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি এবং সত্য গোপন করতে হ'লে যে পরিমাণ মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, তা নিতে কুণ্ঠিত হই নি। এ সব কথা আপনাকে না বল্‌লে আমার মনের একটা ভার নামত না, তাই আপনার কাছে অকপটে তা প্রকাশ কর্‌লুম—নিজের মনের সোয়াস্তির জন্য। আমি ভাল আছি অর্থাৎ এখানে এ অবস্থায় মানুষের পক্ষে যতদূর স্বস্তির—মনের আরামে থাকা সম্ভব, ততদূর আছি। ইতি—

প্রণতঃ শ্রী—

এ চিঠি প'ড়ে আমিও অবাক্ হয়ে গেলুম। শুধু মনে হ'তে লাগল যে, রাগের মুখের একটি কথা ও ঝোঁকের মাথার একটি কাজ মানুষের জীবনে কি প্রলয় ঘটাতে পারে!

শারদীয়া, ১৩৪

গল্প লেখা

—গালে হাত দিয়ে ব'সে কি ভাবছ?

—একটা গল্প লিখতে হবে, কিন্তু মাথায় কোনও গল্প আস্‌ছে না, তাই ব'সে ব'সে ভাবছি।

—এর জন্য আর এত ভাবনা কি? গল্প মনে না আসে, লিখো না।

—গল্প লেখার অধিকার আমার আছে কি না জানিনে, কিন্তু না লেখবার অধিকার আমার নেই!

—কথাটা ঠিক বুঝলুম না।

—আমি লিখে খাই, তাই inspiration-এর জন্য অপেক্ষা করতে পারিনে। ক্ষিধে জিনিসটে নিত্য আর inspiration অনিত্য।

—লিখে যে কত খাও, তা' আমি জানি। তা হ'লে একটা পড়া-গল্প লিখে দেও না।

—লোকে যে সে চুরি ধরতে পারবে।

—ইংরেজী থেকে চুরিকরা গল্প বেমালুম চালানো যায়।

—যেমন ইংরেজকে ধুতি-চাদর পরালে তা'কে বাঙ্গালী ব'লে বেমালুম চালিয়ে দেওয়া যায়।

—দেখ, এ উপমা খাটে না। ইংরেজ ও বাঙ্গালীর বাইরের চেহারায় যেমন স্পষ্ট প্রভেদ আছে, মনের চেহারায় তেমন স্পষ্ট প্রভেদ নেই।

—অর্থাৎ ইংরেজও বাঙ্গালীর মত আগে জন্মায়, পরে মরে—আর জন্ম-মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়টা ছট্‌ফট্ করে।

—আর এই ছট্‌ফটানিকেই ত আমরা জীবন বলি।

—তা ঠিক, কিন্তু এই জীবন জিনিসটিকে গল্পে পোরা যায় না—অন্ততঃ ছোট গল্পে ত নয়ই। জীবনের ছোট-বড় ঘটনা নিয়েই গল্প হয়। আর সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে যা' নিত্য ঘটে, এ দেশে তা' নিত্য ঘটে না।

—এইখানেই তোমার ভুল। যা' নিত্য ঘটে, তা'র কথা কেউ শুনতে চায় না; ঘরে যা' নিত্য খাই; তাই খাবার লোভে আর কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়?—যা' নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।

—এই তোমার বিশ্বাস?

—এ বিশ্বাসের মূলে সত্য আছে। ঝড়-বৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য রাত দুপুরে একটা পড়ো-মন্দিরে আশ্রয় নিলুম—আর অমনি হাতে পেলুম একটি রমণী, আর সে যে সে রমণী নয়! একেবারে তিলোত্তমা! এরকম ঘটনা বাঙ্গালীর জীবনে নিত্য ঘটে না, তাই আমরা এ গল্প একবার পড়ি, দু'বার পড়ি, তিনবার পড়ি—আর পড়েই যা'ব যত দিন না কেউ এর চাইতেও বেশী অসম্ভব আর একটা গল্প লিখবে।

—তা হ'লে তোমার মতে গল্পমাত্রেই রূপকথা?

—অবশ্য।

—ও দু'য়ের ভিতর কোনও প্রভেদ নেই?

—একটা মস্ত প্রভেদ আছে। রূপকথার অসম্ভবকে আমরা ষোল আনা অসম্ভব বলেই জানি, আর নভেল-নাটকের অসম্ভবকে আমরা সম্ভব ব'লে মানি।

—তা হ'লে বলি, ইংরেজী গল্পের বাঙ্গলা করলে তা' হবে রূপকথা।

—অর্থাৎ বিলেতের লোক যা' লেখে, তাই অলৌকিক।

—অসম্ভব ও অলৌকিক এক কথা নয়। যা' হ'তে পারে না, কিন্তু হয়, তাই হচ্ছে অলৌকিক। আর যা' হ'তে পারে না ব'লে হয় না, তাই হচ্ছে অসম্ভব।

—আমি ত বাঙ্গলা গল্পের একটা উদাহরণ দিয়েছি! তুমি এখন ইংরেজী গল্পের একটা উদাহরণ দেও।

—আচ্ছা দিচ্ছি। তুমি দিয়েছ একটি বড় গল্পের উদাহরণ; আমি দিচ্ছি একটি ছোট লেখকের ছোট গল্পের উদাহরণ।

—অর্থাৎ যা'কে কেউ লেখক ব'লে স্বীকার করে না, তার লেখার নমুনা দেবে?—একেই বলে প্রত্যুদাহরণ।

—ভালমন্দের প্রমাণ, জিনিসের ও মানুষের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। লোকে বলে, মাণিকের খানিকও ভাল।

—এই বিলেতী অজ্ঞাতকুলশীল লেখকের হাত থেকে মাণিক বেরয়?

—মাছের পেট থেকেও যে হীরের আংটী বেরয়, এ কথা কালিদাস জানতেন।

—এর উপর অবশ্য কথা নেই। এখন তোমার রত্ন বার করো।

—লণ্ডনে একটি যুবক ছিল, সে নেহাত গরীব। কোথাও চাকরী না পেয়ে সে গল্প লিখতে ব'সে গেল। তা'র inspiration এল হৃদয় থেকে নয়—পেট থেকে। যখন তা'র প্রথম গল্পের বই প্রকাশিত হ'ল, তখন সমস্ত সমালোচকরা বললে যে, এই নতুন লেখক আর কিছু না জানুক, স্ত্রী-চরিত্র জানে। সমালোচকদের মতে ভদ্রমহিলাদের সম্বন্ধে তা'র যে অন্তর্দৃষ্টি আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নিজের বইয়ের সমালোচনার পর সমালোচনা প'ড়ে লেখকটিরও মনে এই ধারণা ব'সে গেল যে, তাঁর চোখে এমন ভগবদ্দত্ত Xrays আছে, যা'র আলো স্ত্রীজাতির অন্তরের অন্তর পর্য্যন্ত সোজা পৌঁছয়। তার পর তিনি নভেলের পর নভেলে স্ত্রীহৃদয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত করতে লাগলেন। ক্রমে তাঁর নাম হয়ে গেল যে, তিনি স্ত্রীহৃদয়ের একজন অদ্বিতীয় expert আর ঐ ধরণের সমালোচনা পড়তে পড়তে পাঠিকাদেরও বিশ্বাস জন্মে গেল যে, লেখক তাঁদের হৃদয়ের কথা সবই জানেন; তাঁর দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ যে, ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চন, ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গীর মধ্যেও তিনি রমণীর প্রচ্ছন্ন হৃদয় দেখতে পান। মেয়েরা যদি শোনে যে, কেউ হাত দেখতে জানে, তা'কে যেমন তারা হাত দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারে না—তেমনই বিলেতের সব বড় ঘরের মেয়েরা ঐ ভদ্রলোককে নিজেদের কেশের বেশের বিচিত্র রেখা ও রঙ সব দেখাবার লোভ সংবরণ করতে পারলে না। ফলে তিনি নিত্য ডিনারের নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। কোন সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকের সঙ্গে তাঁর কস্মিন্‌কালেও কোনও কারবার ছিল না, হৃদয়ের দেনাপাওনার হিসেব তাঁর মনের খাতায় একদিনও অঙ্কপাত করে নি। তাই ভদ্রসমাজে তিনি মেয়েদের সঙ্গে দুটি কথাও কইতে পারতেন না, ভয়ে ও সঙ্কোচে তাদের কাছ থেকে দূরে স'রে থাকতেন। ইংরেজ ভদ্রলোকরা ডিনারে ব'সে যত না খায়, তার চাইতে ঢের বেশী কথা কয়। কিন্তু আমাদের নভেলিষ্টটি কথা কইতেন না—শুধু নীরবে খেয়ে যেতেন। এর কারণ, তিনি ওরকম চর্ব্ব্য-চোষ্য, লেহ্য-পেয় জীবনে কখনও চোখেও দেখেন নি। এর জন্য তাঁর স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞতার খ্যাতি পাঠিকাদের কাছে কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ'ল না। তারা ধ'রে নিলে যে, তাঁর অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি আছে বলেই বাহ্যজ্ঞান মোটেই নেই। আর তাঁর নীরবতার কারণ তাঁর দৃষ্টির একাগ্রতা। ক্রমে সমগ্র ইংরেজ-সমাজে তিনি একজন বড় লেখক ব'লে গণ্য হলেন, কিন্তু তা'তেও তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি হ'তে চাইলেন এ যুগের সব চাইতে বড় লেখক। তাই তিনি এমন কয়েকখানি নভেল লেখবার সঙ্কল্প করলেন, যা সেক্সপিয়ারের নাটকের পাশে স্থান পাবে।

এ যুগে এমন বই লণ্ডনে ব'সে লেখা যায় না; কেন না, লণ্ডনের আকাশ-বাতাস কলের ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ। তাই তিনি পাত্তাড়ি গুটিয়ে প্যারিসে গেলেন; কেননা, প্যারিসের আকাশ-বাতাস মনোজগতের ইলেকট্রিসিটিতে ভরপুর। এ যুগের য়ুরোপের সব বড় লেখক প্যারিসে বাস করে, আর তা'রা সকলেই স্বীকার করে যে, তাদের যে সব বই Nobel prize পেয়েছে, সে সব প্যারিসে লেখা। প্যারিসে কলম ধরলে ইংরেজের হাত থেকে চমৎকার ইংরেজী বেরয়, জার্ম্মাণের হাত থেকে সুবোধ জার্ম্মাণ, রাসিয়ানের হাত থেকে খাঁটি রাসিয়ান, ইত্যাদি। ইত্যাদি।

প্যারিসের সমগ্র আকাশ অবশ্য এই মানসিক ইলেকট্রিসিটিতে পরিপূর্ণ নয়। মেঘ যেমন এখানে ওখানে থাকে, আর তার মাঝে মাঝে থাকে ফাঁক, প্যারিসেও তেমনই মনের আড্ডা এখানে ওখানে ছড়ানো আছে। কিন্তু প্যারিসের হোটেলে গিয়ে বাস করার অর্থ মনোজগতের বাইরে থাকা।

তাই লেখকটি তাঁর masterpiece লেখবার জন্য প্যারিসের একটি আর্টিষ্টের আড্ডায় গিয়ে বাসা বাঁধলেন। সেখানে যত স্ত্রী-পুরুষ ছিল, সবাই আর্টিষ্ট—অর্থাৎ সবারই ঝোঁক ছিল আর্টিষ্ট হবার দিকে।

এই হবু-আর্টিষ্টদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছিল স্ত্রীলোক। এরা জাতে ইংরেজ হলেও মনে হয়ে উঠেছিল ফরাসী।

এদের মধ্যে একটি তরুণীর প্রতি নভেলিষ্টের চোখ পড়ল। তিনি আর পাঁচজনের চাইতে বেশি সুন্দর ছিলেন না, কিন্তু তা'দের তুলনায় ছিলেন ঢের বেশি জীবন্ত। তিনি সবার চাইতে বকতেন বেশি, চলতেন বেশি, হাসতেন বেশি। তা'র উপর তিনি স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিচারে সকলের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করতেন, কোনরূপ রমণীসুলভ ন্যাকামি তাঁ'র স্বচ্ছন্দ ব্যবহারকে আড়ষ্ট করত না। পুরুষজাতির নয়ন-মন আকৃষ্ট করবার তাঁ'র কোনরূপ চেষ্টা ছিল না, ফলে তা'দের নয়ন-মন তাঁ'র প্রতি বেশি আকৃষ্ট হ'ত।

দু'চার দিনের মধ্যেই এই নবাগত লেখকটির তিনি যুগপৎ বন্ধু ও মুরুব্বি হয়ে দাঁড়ালেন। লেখকটি যে ঘাগ্‌রা দেখলেই ভয়ে, সঙ্কোচে ও সম্ভ্রমে জড়সড় হয়ে পড়তেন, সে কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সুতরাং এঁদের ভিতর যে বন্ধুত্ব হ'ল, সে শুধু মেয়েটির গুণে।

নভেলিষ্টের মনে এই বন্ধুত্ব বিনাবাক্যে ভালবাসায় পরিণত হ'ল। নভেলিষ্টের বুক এতদিন খালি ছিল, তাই প্রথম যে রমণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ল, তিনিই অবলীলাক্রমে তা' অধিকার করে' নিলেন। এ সত্য অবশ্য লেখকের কাছে অবিদিত থাক্‌ল না, মেয়েটির কাছেও নয়। লেখকটি মেয়েটিকে বিবাহ করবার জন্য মনে মনে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু ভরসা করে' সে কথা মুখে প্রকাশ করতে পারলেন না। এই স্ত্রীহৃদয়ের বিশেষজ্ঞ এই স্ত্রীলোকটির হৃদয়ের কথা কিছুমাত্রও অনুমান করতে পারলেন না। শেষটা বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটবার কাল ঘনিয়ে এল। মেয়েটি একদিন বিষণ্ণ ভাবে নভেলিষ্টকে বল্‌লে যে, সে দেশে ফিরে যাবে—টাকার অভাবে। আর ইংলণ্ডের এক মরা পাড়াগাঁয় তাকে গিয়ে school mistress হ'তে হবে—পেটের দায়ে। তা'র সকল উচ্চ আশার সমাধি হবে ঐ সৃষ্টিছাড়া স্কুল-ঘরে, আর সকল আর্টিষ্টিক শক্তি সার্থক হবে মুদিবাকালির মেয়েদের grammar শেখানতে। এ কথার অর্থ অবশ্য নভেলিষ্টের হৃদয়ঙ্গম হ'ল না। দু'দিন পরেই মেয়েটি প্যারিসের ধূলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে হাসি-মুখে ইংলণ্ডে চলে' গেল। কিছুদিন পরে সে ভদ্রলোক মেয়েটির কাছ থেকে একখানি চিঠি পেলেন। তা'তে সে তা'র স্কুলের কারাকাহিনীর বর্ণনা এমন স্ফূর্ত্তি করে' লিখেছিল যে, সে চিঠি পড়ে' নভেলিষ্ট মনে মনে স্বীকার করলেন, মেয়েটি ইচ্ছে কর্‌লে খুব ভাল লেখক হ'তে পারে। নভেলিষ্ট সে পত্রের উত্তর খুব নভেলী ছাঁদে লিখলেন। কিন্তু যে কথা শোনবার প্রতীক্ষায় মেয়েটি বসে' ছিল, সে কথা আর লিখলেন না। এ উত্তরের কোন প্রত্যুত্তর এল না। এ দিকে প্রত্যুত্তরের আশায় বৃথা অপেক্ষা করে' করে' ভদ্রলোক প্রায় পাগল হয়ে উঠল। শেষটা একদিন সে মনস্থির করলে যে, যা' থাকে কুলকপালে, দেশে ফিরে গিয়েই ঐ মেয়েটিকে বিয়ের প্রস্তাব করবে। সেই দিনই সে প্যারিস ছেড়ে লণ্ডনে চলে' গেল। তা'র পরদিন সে মেয়েটি যেখানে থাকে, সেই গাঁয়ে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। গাড়ী থেকে নেমেই সে দেখলে যে, মেয়েটি পোষ্ট আপিসের সুমুখে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি বল্‌লে, "তুমি এখানে ?"

"তোমাকে একটি কথা বল্‌তে এসেছি।"

"কি কথা ?"

"আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"সে ত অনেক দিন থেকেই জানি। আর কোনও কথা আছে ?"

"আমি তোমাকে বিয়ে কর্‌তে চাই।"

"এ কথা আগে বল্‌লে না কেন ?

"এ প্রশ্ন কর্‌ছ কেন ?

"আমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে।"

"কার সঙ্গে ?"

"এখানকার একটি উকীলের সঙ্গে।

এ কথা শুনে নভেলিষ্ট হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর মেয়েটি পিঠ ফিরিয়ে চলে' গেল।

—বস্, গল্প ঐখানেই শেষ হ'ল ?

—অবশ্য! এর পরও গল্প আর কি করে' টেনে বাড়ানো যেত ?

—অতি সহজে। লেখক ইচ্ছে কর্‌লেই বল্‌তে পারতেন যে, ভদ্রলোক প্রথমতঃ থতমত খেয়ে একটু দাঁড়িয়ে রইলেন, পরে ভেউ ভেউ করে' কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে 'ত্বমসি মম জীবনং ত্বমসি মম ভূষণং' বলে' চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে মেয়েটির পিছনে ছুট্‌তে লাগলেন, আর সেও খিল খিল করে' হাসতে হাসতে ছুটে পালাতে লাগল। রাস্তায় ভিড় জ'মে গেল। তার পর এসে জুটল সেই solicitor স্বামী, আর সঙ্গে এল পুলিস। তার পর যবনিকাপতন।

—তা হ'লে ও ট্রাজেডি ত কমেডি হয়ে উঠত।

—তা'তে ক্ষতি কি ? জীবনের যত ট্রাজেডি তোমাদের গল্পলেখকদের হাতে পড়ে' সবই ত comic হয়ে ওঠে। যে তা' বোঝে না, সেই তা' পড়ে' কাঁদে; আর যে বোঝে, তা'র কান্না পায়।

—রসিকতা রাখো। এ ইংরেজী গল্প কি বাঙ্গলায় ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায় ?

—এরকম ঘটনা বাঙ্গালী-জীবনে অবশ্য ঘটে না।

—বিলেতী জীবনেই যে নিত্য ঘটে, তা নয়—তবে ঘটতে পারে। কিন্তু আমাদের জীবনে ?

—এ গল্পের আসল ঘটনা যা', তা' সব জাতের মধ্যেই ঘটতে পারে।

—আসল ঘটনাটি কি ?

—ভালবাসব, কিন্তু বিয়ে কর্‌ব না, সাহসের অভাবে—এই হচ্ছে এ গল্পের মূল ট্রাজেডি।

—বিয়ে ও ভালবাসার এই ছাড়াছাড়ি এ দেশে কখনও দেখেছ? না শুনেছ?

—শোনবার কোনও প্রয়োজন নেই, দেখেছি দেদার।

—আমি কখনও দেখিনি, তাই তোমার মুখে শুনতে চাই।

—তুমি গল্পলেখক হয়ে এ সত্য কখনও দেখনি, কল্পনার চোখেও নয়?

—না।

—তোমার দিব্যদৃষ্টি আছে।

—খুব সম্ভবতঃ তাই। কিন্তু তোমার খোলা চোখে?

—এমন পুরুষ ঢের দেখেছি, যা'রা বিয়ে করতে পারে, কিন্তু ভালবাসতে পারে না।

—আমি ভেবেছিলুম, তুমি বলতে চাচ্ছ যে—

—তুমি কি ভেবেছিলে জানি। কিন্তু বিয়ে ও ভালবাসার অমিল এ দেশেও যে হয়, সে কথা ত এখন স্বীকার করছ?

—যাক্ ও সব কথা। ও গল্প যে বাঙ্গলায় ভাঙ্গিয়ে নেওয়া যায় না, এ কথা ত মানো?

—মোটেই না। টাকা ভাঙ্গালে রূপো পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় তামা। অর্থাৎ জিনিস একই থাকে, শুধু তা'র ধাতু বদলে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তা'র রঙ। যে ধাতু আর রঙ বদলে নিতে জানে, তা'র হাতে ইংরেজী গল্প ঠিক বাঙ্গলা হবে। ভাল কথা, তোমার ঐ ইংরেজী গল্পটার নাম কি?

—The man who understood woman.

—এ গল্পের নায়ক প্রতি বাঙ্গালী হ'তে পারবে। কারণ, তোমরা প্রত্যেকে হচ্ছ the man who understood woman.

—এই ঘণ্টাখানেক ধ'রে বকর্ বকর্ করে' আমাকে একটা গল্প লিখতে দিলে না।

—আমাদের এই কথোপকথন লিখে পাঠিয়ে দেও, সেইটেই হবে—

—গল্প না প্রবন্ধ?

—একাধারে ও দুই-ই।

—আর তা' পড়বে কে, পড়ে' খুসীই বা হবে কে?

—তা'রা, যা'রা জীবনের মর্ম্ম বই পড়ে' শেখে না, দায়ে পড়ে' শেখে—অর্থাৎ মেয়েরা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৩২

নীল-লোহিত

আমাকে যখন লোক গল্প লিখতে অনুরোধ করে, তখন আমি মনে মনে এই ব'লে দুঃখ করি যে, ভগবান্ কেন আমাকে নীল-লোহিতের প্রতিভা দেন নি। সে প্রতিভা যদি আমার শরীরে থাকৃত, তা হ'লে আমি বাঙ্গলার সকল মাসিক পত্রের সকল সম্পাদক মহাশয়দের অনুরোধ একসঙ্গে অক্লেশে রক্ষা করৃতে পারৃতুম।

গল্প বলৃতে নীল-লোহিতের তুল্য গুণী আমি অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখি নি।

অনেক সময়ে মনে ভাবি যে, তাঁর মুখে যে সব গল্প শুনেছি, তারই গুটিকয়েক লিখে গল্প লেখার দায় হ'তে খালাস হই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে সব গল্প লেখবার জন্যও লেখকের নীল-লোহিতের অনুরূপ গুণিপণা থাকা চাই। তাঁর বলৃবার ভঙ্গীটি বাদ দিয়ে তাঁর গল্প লিপিবদ্ধ করৃলে সে গল্পের আত্মা থাকৃবে বটে, কিন্তু তার দেহ থাকৃবে না। তিনি যে গল্প বলৃতেন, তাই আমাদের চোখের সুমুখে শরীরী হয়ে উঠত এবং সাঙ্গোপাঙ্গ মূর্ত্তি ধারণ করৃত। এমন খুঁটিয়ে বর্ণনা করবার শক্তি আর কারও আছে কি না, জানিনে। কিন্তু আমার যে নেই, তা নিঃসন্দেহ। এ বর্ণনার ওস্তাদি ছিল এই যে, তার ভিতর অসংখ্য ছোট-খাটো জিনিস ঢুকে পড়ত। অথচ তার একটিও অপ্রাসঙ্গিক নয়, অসঙ্গত নয়, অনাবশ্যক নয়। সুনিপুণ চিত্রকরের তুলির প্রতি আঁচড় যেমন চিত্রকে রেখার পর রেখায় ফুটিয়ে তোলে, নীল-লোহিতও কথার পর কথায় তাঁর গল্প তেমনি ফুটিয়ে তুলৃতেন। তাঁর মুখের প্রতি কথাটি ছিল, ঐ চিত্র-শিল্পীর হাতেরই তুলির আঁচড়।

তার পর কথা তিনি শুধু মুখে বলৃতেন না। গল্প তাঁর হাত পা বুক গলা সব একত্র হয়ে একসঙ্গে বলৃত। এক কথায় তিনি শুধু গল্প বলৃতেন না, সেই সঙ্গে সেই গল্পের অভিনয়ও করৃতেন। যে তাঁকে গল্প বলৃতে না শুনেছে, তাকে তাঁর অভিনয়ের ভিতর যে কি অপূর্ব্ব প্রাণ ছিল, তেজ ছিল, রস ছিল, তা কথায় বোঝানো অসম্ভব। তিনি যখন কোনো ধ্বনির বর্ণনা করৃতেন, তখন তাঁর কানের দিকে দৃষ্টিপাত করৃলে মনে হ'ত যে, তিনি যেন সে শব্দ সত্য সত্যই স্বকর্ণে শুনৃতে পাচ্ছেন। তাজি ঘোড়াকে ছারতকে ছাড়লে সে চলৃতে চলৃতে যখন গরম হয়ে ওঠে, তখন তার নাকের ডগা যেমন ফুলে উঠে ও সেই সঙ্গে একটু একটু কাঁপতে থাকে; নীল-লোহিতও গল্প বলৃতে বলৃতে গরম হয়ে উঠলে, তাঁর নাকের ডগাও তেমনি বিস্ফারিত ও বেপথুমান হ'ত। আর তাঁর চোখ? এমন অপূর্ব্ব মুখর চোখ আমি আর কোনও লোকের কপালে আর কখনো দেখিনি। গল্প বলৃবার সময় তাঁর দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ থাকৃত, যেন সেখানে একটি ছবি ঝোলান আছে, আর নীল-লোহিত সেই ছবি দেখে দেখে তার বর্ণনা ক'রে যাচ্ছেন। সে চোখের তারা ক্রমান্বয়ে ডান থেকে বাঁয়ে আর বাঁ থেকে ডাইনে যাতায়াত করৃত; যাতে ক'রে ঐ আকাশপটের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত তার সমগ্র রূপটা এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর চোখের আড়াল না হয়, এই উদ্দেশ্যে। তার পর তাঁর মনে যখন তীব্র, কোমল, প্রসন্ন, বিষণ্ণ, সতেজ, নিস্তেজ ভাব উদয় হ'ত, তাঁর চক্ষুর্দ্বয়ও সেই ভাবের অনুরূপ, কখনো বিস্ফারিত, কখনো সঙ্কুচিত, কখনো ত্রস্ত, কখনো প্রকৃতিস্থ, কখনো উদ্দীপ্ত, কখনো স্তিমিত হয়ে পড়ত। আর কথা তাঁর মুখ দিয়ে এমনি অনর্গল বেরত যে, আমাদের মনে হ'ত যে, নীল-লোহিত মানুষ নয়, একটা জ্যান্ত গ্রামোফন। আর তাতে ভগবান্ নিজ হাতে দম দিয়ে দিয়েছেন।

বন্ধুবান্ধবরা সবাই বলৃতেন যে, নীল-লোহিতের তুল্য মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। যদিচ আমার ধারণা ছিল অনুরূপ, তবুও এ অপবাদের আমি কখনো মুখ খুলে প্রতিবাদ করৃতে পারি নি। কেন না, এ কথা কারও অস্বীকার করৃবার যো ছিল না যে, বন্ধুবর ভুলেও কখনো সত্য কথা বলৃতেন না। কথা সত্য না হ'লেই যে তা মিথ্যা হ'তে হবে, এই হচ্ছে সাধারণতঃ মানুষের ধারণা, আর এ ধারণা যে ভুল, তা প্রমাণ করৃতে হ'লে, মনোবিজ্ঞানের তর্ক তুলতে হয়, আর সে তর্ক আমার বন্ধুরা শুনৃতে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না।

লোক নীল-লোহিতকে কেন মিথ্যাবাদী বলৃত জানেন? তাঁর প্রতি গল্পের hero ছিলেন স্বয়ং নীল-লোহিত, আর নীল-লোহিতের জীবনে যত

অসংখ্য অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটেছিল, তার একটিও লাখের মধ্যে একের জীবনেও একবারও ঘটে না।

তাঁর গল্পারম্ভের ইতিহাস এই। যদি কেউ বলত যে, সে বাঘ মেরেছে, তা হ'লে নীল-লোহিত তৎক্ষণাৎ বলতেন যে, তিনি সিংহ মেরেছেন এবং সেই সিংহ-শীকারের আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করতেন। একদিন কথা হচ্ছিল যে, হাতী ধরা বড় শক্ত কাজ। নীল-লোহিত অমনি বললেন যে, তিনি একবার মহারাজ কিরাতনাথের সঙ্গে গারো পাহাড়ে খেদা করতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়েই "দায়দারদের" সঙ্গে তিনিও একটি পোষমানা "কুনকি"র পিঠে চ'ড়ে বসলেন। তাঁর দুঃসাহস দেখে মহারাজ কিরাতনাথ হতভম্ব হয়ে গেলেন, কেন না, "দায়দাররা" জীবনের ছাড়পত্র লিখে, তবে বুনো-হাতী-ভোলানে ঐ মাদী হাতীর পিঠে আসোয়ার হয়। তার পর ঐ কুনকি জঙ্গলে ঢুকতেই সেখান থেকে বেরিয়ে এল এক প্রকাণ্ড দাঁতলা,—মেঘের মত তার রঙ আর পাহাড়ের মত তার ধড়, আর তার দাঁত দুটো এত বড় যে, তার উপর একখানা খাটিয়া বিছিয়ে মানুষ অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে। ঐ দাঁতলাটা—একেবারে মত্ত হয়েছিল, তাই সে জঙ্গলের ভিতর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছগুলো শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে উপড়ে ফেলে নিজের চলবার পথ পরিষ্কার ক'রে আসছিল। তার পর কুনকিটিকে দেখে সে প্রথমে মেঘগর্জ্জন ক'রে উঠলো। তার পর সেই হস্তিরমণীর কানে কানে ফুসফুস ক'রে কত কি বলতে লাগল। তার পর হস্তিযুগলের ভিতর সুরু হ'ল, "অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাব।" ইতিমধ্যে "দায়দাররা" "কুনকির" পিঠ থেকে গড়িয়ে প'ড়ে তার পিছনের পা ধ'রে ঝুলছিল, আর নীল-লোহিত তার লেজ ধ'রে। এ অবস্থায় "দায়দারদের" অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল যে, মাটীতে নেমে চটপট্ শোণের দড়ি দিয়ে ঐ দাঁতলাটার পাগুলো বেঁধে ছেঁদে দেওয়া। কিন্তু তারা বললে, "এ হাতী পাগলা হাতী, ওর গায়ে হাত দেওয়া আমাদের সাধ্য নয়,—যদি রশি দিয়ে পা বেঁধেও ফেলি, তার পর যখন ওর পিঠে চ'ড়ে বসব, তখন সে দড়ি ছিঁড়ে জঙ্গলের ভিতর এমনি ছুটবে যে, গাছের ধাক্কা লেগে আমাদের মাথা চুর হয়ে যাবে।" এ কথা শুনে নীল-লোহিত "দায়দারদের" damned coward ব'লে, এক ঝুলে কুনকির লেজ ছেড়ে দাঁতলার লেজ ধ'রে সেই লেজ বেয়ে উঠে দাঁতলার কাঁধে গিয়ে চ'ড়ে বসলেন। মানুষের গায়ে মাছি বসলে তার যেমন অসোয়াস্তি হয়, দাঁতলাটারও তাই হ'ল, আর সে তখনি তার শুঁড় ওঁচালে ঐ নররূপী মাছিটাকে টিপে মেরে ফেলবার জন্য। এ বিপদ্ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য নীল-লোহিত কি করেছিলেন জানেন? তিনি তিলমাত্র দ্বিধা না ক'রে উপুড় হয়ে প'ড়ে, দাঁতলাটার কানে মুখ দিয়ে নিধুবাবুর একটা ভৈরবীর টপ্পা গাইতে সুরু করলেন, সেই মদমত্ত হস্তী অমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চক্ষু নিমীলিত ক'রে গান শুনতে লাগল। ঐ প্রণয়-সঙ্গীত শুনে, হাতী বেচারা এমনি তন্ময়—এমনি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিল যে, ইত্যবসরে "দায়দাররা" যে তার চারটি পা মোটা মোটা শোণের দড়ি দিয়ে আটেঘাটে বেঁধে ফেলেছে, সে তা টেরও পেলে না। ফলে দাঁতলার নড়বার চড়বার শক্তি আর রইল না। সে হাতী এখন মহারাজ কিরাতনাথের হাতীশালায় বাঁধা আছে।

মহারাজ কিরাতনাথ কে? এ প্রশ্ন করলে নীল-লোহিত ভারি চটে যেতেন। তিনি বলতেন, ও রকম ক'রে বাধা দিলে তিনি গল্প বলতে পারবেন না। আর যেহেতু তাঁর গল্প আমরা সবাই শুনতে চাইতুম, সেই জন্যে পাছে তিনি গল্প বলা বন্ধ ক'রে দেন, এই ভয়ে ঐ সব বাজে প্রশ্ন করা আমরা বন্ধ ক'রে দিলুম। কারণ, সকলে ধ'রে নিলে যে—নীল-লোহিতের গল্প সর্ব্বৈব মিছে, ও গল্প শোনবার জিনিস, কিন্তু বিশ্বাস করবার জিনিস নয়। কেন না, এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত, যে—নীললোহিত সতেরবার ঘোড়া থেকে পড়েছিলেন, আর তার একবার দারজিলিংয়ে ঘোড়াশুদ্ধ দু হাজার ফিট নীচে খদে, অথচ তাঁর গায়ে কখনো একটি আঁচড়ও যায়নি, যদিচ পড়বার সময় তিনি স-ঘোটক শূন্যে দুবার ডিগবাজি খেয়েছিলেন। নীললোহিত তিনবার জলে ডুবেছিলেন, যেখানে তিস্তা এসে ব্রহ্মপুত্রে মিশছে, সেখানে একবার চড়ায় লেগে জাহাজের তলা ফেঁসে যায়—সকলে ডুবে মারা যায়, একমাত্র নীললোহিত পাঁচ মাইল জল সাঁতরে—শেষটা রৌউমারিতে গিয়ে উঠেছিলেন। আর একবার মেঘনায় জাহাজ ঝড়ে সোজা ডুবে যায়, সেবারও তিনি তিন দিন তিন রাত ঐ জাহাজের মাস্তলের ডগায় পদ্মাসনে ব'সে ধ্যানস্থ ছিলেন; পরে অন্য জাহাজ এসে তাঁকে তুলে নিলে। আর শেষবার মাতলার মোহনায় জাহাজ উল্টে যায়, তিনি ঐ জাহাজের নীচেই চাপা পড়েছিলেন, কিন্তু ডুব-সাঁতার কাটতে কাটতে তিনি ঐ জাহাজের হাল ধ'রে ফেললেন, আর ঐ হাল বেয়ে তিনি ঐ জাহাজের উল্টো পিঠে গিয়ে চ'ড়ে বসলেন। ঐ

উল্টোনো-জাহাজ ভাস্‌তে ভাস্‌তে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। তার পর একখানা জার্ম্মাণ মনোয়ারি জাহাজ তাঁকে তুলে নেয়, আর সেই জাহাজেই Kaiserএর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। কাইজার নাকি বলেছিলেন যে, নীললোহিত যদি তাঁর সঙ্গে জার্ম্মাণীতে যান, তা হ'লে তিনি তাঁকে sub-marineএর সর্ব্বপ্রধান কাপ্তেন ক'রে দেবেন। যে মাইনে কাইজার তাঁকে দিতে চেয়েছিলেন, তাতে তাঁর পোষায় না ব'লে তিনি সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন। এ সব নীললোহিতের কথা-বস্তুর নমুনাস্বরূপ উল্লেখ কর্‌লুম, কিন্তু তাঁর কথারসের বিন্দুমাত্র পরিচয় দিতে পার্‌লুম না। তুফানের বর্ণনা, সমুদ্রের বর্ণনা তাঁর মুখে না শুন্‌লে, গুণীর হাতে পড়লে জলের ভিতর থেকে যে কি আশ্চর্য্য রৌদ্ররস বেরয়; তা কেউ আন্দাজ কর্‌তে পার্‌বেন না।

নীললোহিতকে দিয়ে গল্প লেখাবার চেষ্টা করে-ছিলুম। কেন না, গল্প তিনি আর বলেন না। তিনি আমার অনুরোধে একটি গল্প লিখেওছিলেন। কিন্তু সেটি প'ড়ে দেখলুম, তা একেবারে অচল। সে গল্প প্রথম থেকে শেষ লাইন তক্ প'ড়ে দেখি যে, তার ভিতর আছে শুধু সত্য, একেবারে আঁককষা সত্য, কিন্তু গল্প মোটেই নেই। সুতরাং বুঝলুম যে, তাঁর দ্বারা আমাদের সাহিত্যের কোনরূপ শ্রীবৃদ্ধি হবার সম্ভব নেই। তিনি কেন যে গল্প লেখা ছেড়ে দিলেন, তার ইতিহাস এখন শুনুন।

বাঙলায় যখন স্বদেশী ডাকাতি হ'তে সুরু হ'ল, তখন পাঁচ জন একত্র হলেই ঐ ডাকাতির বিষয়ই আলোচনা হ'ত। খবরের কাগজে ঐ রকম একটা ডাকাতির রিপোর্ট প'ড়ে, অনেকের কল্পনা অনেক রকমে খেলত। কথায় কথায় সে রিপোর্ট ফেঁপে উঠত—ফুলে উঠত। কেউ বল্‌তেন, ছেলেরা এক-টানা বিশ ক্রোশ দৌড়ে পালিয়েছে, কেউ বল্‌ত, তারা তেতলার ছাদ থেকে লাফ মেরে প'ড়ে পিট্‌টান দিয়েছে। একদিন আমাদের আড্ডায় এই সব আলোচনা হচ্ছে, এমন সময় নীললোহিত বল্লেন যে, "আমি একবার এক ডাকাতি করি, তার বৃত্তান্ত শুনুন।" তাঁর সে বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত লিখতে গেলে একখানি প্রকাণ্ড উপন্যাস হয়, সুতরাং ডাকাতি ক'রে তাঁর পালানোর ইতিহাসটি সংক্ষেপে বল্‌ছি। নীললোহিত উত্তর-বঙ্গে এক সা-মহাজনের বাড়ী ডাকাতি কর্‌তে যান। রাত দশটায় তিনি সে বাড়ীতে গিয়ে ওঠেন। এক ঘণ্টার ভিতর সেখানে গ্রামের প্রায় হাজার চাষা এসে বাড়ী ঘেরাও কর্‌লে, —ডাকাত ধরবার জন্য। নীললোহিত যখন দেখলেন যে, পালাবার আর উপায় নেই, তখন তিনি চট্ ক'রে তাঁর পল্টনি সাজ খুলে ফেলে, একটি বিধবার পরণের একখানি সাদা-শাড়ী টেনে নিয়ে সেইখানি মালকোচ্চা মেরে প'রে, পা টিপে টিপে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। লোকে তাঁকে বাড়ীর চাকর ভেবে আর বাধা দিলে না। একটু পরেই লোকে টের পেলে যে, ডাকাতের সর্দ্দার পালিয়েছে, অমনি দেদার লোক তাঁর পিছনে ছুটতে লাগল, মাইল দশেক দৌড়ে যাবার পর তিনি দেখলেন যে, রাস্তার দু' পাশের গ্রামের লোকরাও তাঁকে তাড়া কর্‌ছে। শেষটা তিনি ধরা পড়েন পড়েন, এমন সময় তাঁর নজরে পড়ল যে, একটা বর্ম্মা-টাট্টু একটা ছোলার ক্ষেতে চর্‌ছে। তার পিছনের পা দুটো দড়ি দিয়ে ছাঁদা। নীললোহিত প্রাণপণে ছুটে গিয়ে তার পায়ের দড়ি খুলে, তার মুখের ভিতর সেই দড়ি পুরে দিয়ে, তাতে এক পেঁচ লাগিয়ে সেটিকে লাগাম বানালেন। তার পর সেই ঘোড়ায় চ'ড়ে দে ছুট! রাত বারোটা থেকে রাত দুটো পর্য্যন্ত সে টাট্টু বিচিত্র চালে চল্‌তে লাগল, কখনো কদমে, কখনো দুল্‌কিতে, কখনো চার পা তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে। জীবনে এই একটিবার তিনি ঘোড়া থেকে পড়েন নি। তার পর সে টাট্টু হঠাৎ থেমে গেল। নীললোহিত দেখলেন, সুমুখে একটা প্রকাণ্ড বিল অন্তত তিন মাইল চৌড়া। অমনি ঘোড়া থেকে নেমে নীল-লোহিত সেই বিলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পাছে কেউ দেখতে পায়, এই ভয়ে, প্রথম মাইল তিনি ডুব-সাঁতার কেটে পার হলেন, দ্বিতীয় মাইল এমনি সাঁতার, আর তৃতীয় মাইল চিৎ-সাঁতার দিয়ে, এই জন্য যে, পাড় থেকে কেউ দেখলে ভাববে যে, একটা মড়া ভেসে যাচ্ছে। নীললোহিত যখন ওপারে গিয়ে পৌছিলেন, তখন ভোর হয় হয়। ক্লান্তিতে তখন তাঁর পা আর চল্‌ছে না। সুতরাং বিলের ধারে একটি ছোট খড়ো-ঘর দেখবামাত্র তিনি যা থাকে কুল-কপালে ব'লে সেই ঘরের দুয়োরে গিয়ে ধাক্কা মার্‌লেন। তৎক্ষণাৎ দুয়োর খুলে গেল, আর ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি পরমা-সুন্দরী যুবতী। তার পরণে সাদা-শাড়ী, গলায় কণ্ঠী আর নাকে রসকলি। নীললোহিত চিন্‌তে পার্‌লেন যে, স্ত্রীলোকটি হচ্ছে একটি বোষ্টমী, আর সে থাকে একা। নীললোহিত সেই রমণীকে তাঁর বিপদের কথা জানালেন। শুনে তার চোখে জল এল, আর সে তিলমাত্র দ্বিধা না ক'রে নীললোহিতের

ভালবাসায় প'ড়ে গেল। আর সেই সুন্দরীর পরামর্শে নীললোহিত পরণের ধুতি শাড়ী ক'রে পরলেন। আর সেই যুবতী নিজ-হাতে তাঁর গলায় কণ্ঠী পরালে, আর তাঁর নাকে রসকলি-ভঞ্জন ক'রে দিলে। গুম্ফ-শ্মশ্রু-হীন নীললোহিতের মুখাকৃতি ছিল একেবারে মেয়ের মত। সুতরাং তাঁর এ ছদ্মবেশ আর কেউ ধর্‌তে পারলে না। তার পরে তারা দু-সখীতে দুটি খঞ্জনি নিয়ে, "জয় রাধে" ব'লে বেরিয়ে পড়ল। তার পর পায়ে হেঁটে ভিক্ষে কর্‌তে কর্‌তে বৃন্দাবন গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তার পর কিছুদিন মেয়ে সেজে বৃন্দাবনে গা-ঢাকা দিয়ে থাক্‌বার পর—পুলিসের গোলমাল যখন থেমে গেল, তখন তিনি আবার দেশে ফিরে এলেন। আর তাঁর সেই পথে বিবর্জ্জিতা বোষ্টমী, মনের দুঃখে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাগনাপাড়ায় চ'লে গেল—কোনও দাড়িওয়ালা বোষ্টমের সঙ্গে কণ্ঠীবদল কর্‌তে।

নীললোহিতের এই রোমান্টিক ডাকাতির গল্প মুখে মুখে এত প্রচার হয়ে পড়ল যে, শেষটা পুলিসের কানে গিয়ে পৌছিল। ফলে নীললোহিত ডাকাতির চার্জ্জে গ্রেপ্তার হলেন। এ আসামীকে নিয়ে পুলিস পড়ল মহা ফাঁফরে, নীললোহিতের মুখের কথা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতির আর কোনই প্রমাণ ছিল না। পুলিস তদন্ত ক'রে দেখলে যে, যে গ্রামে নীললোহিত ডাকাতি করেছেন, উত্তরবঙ্গে সে নামের কোন গ্রামই নেই। যে সা-মহাজনের বাড়ীতে তিনি ডাকাতি করেছেন,—উত্তর-বঙ্গে সে নামের কোনও সা-মহাজন নেই। যে দিনে তিনি ডাকাতি করেছেন,—সে দিন বাঙলা দেশে কোথাও কোন ডাকাতি হয় নি। তার পর এও প্রমাণ হ'ল যে, নীললোহিত জীবনে কখনো কল্‌কাতা সহরের বাইরে যান নি, এমন কি, হাবড়াতেও নয়। বিধবার একমাত্র সন্তান ব'লে নীললোহিতের মা নীললোহিতকে গঙ্গা পার হ'তে দেন নি, পাছে ছেলে ডুবে মরে, এই ভয়ে। অপর পক্ষে নীললোহিতের বিপক্ষে অনেক সন্দেহের কারণ ছিল। প্রথমতঃ তাঁর নাম। যার নাম এখন বেয়াড়া, তার চরিত্রও নিশ্চয় বেয়াড়া। তার পর, লোহিত রক্তের রঙ—অতএব, ও-নামের লোকের খুন-জখমের প্রতি টান থাকা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ তিনি একে কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান—তার উপর তাঁর ঘরে খাবার আছে—অথচ তিনি বিয়ে করেন নি, যদিচ তাঁর বয়েস তেইশ হবে। তৃতীয়তঃ—তিনি বি এ পাশ করেছেন অথচ কোনও কাজ করেন না। চতুর্থতঃ—তিনি রাত একটা দুটোর আগে কখনো বাড়ী ফেরেন না,—যদিচ তাঁর চরিত্রে কোনও দোষ নেই। মদ ত দূরে থাক, পুলিস-তদন্তে জানা গেল যে, তিনি পান-তামাক পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না; আর নিজের মা-মাসী ছাড়া তিনি জীবনে আর কোনও স্ত্রীলোকের ছায়া মাড়ান নি।

এ অবস্থায় তিনি নিশ্চয়ই interned হতেন, যদি না আমরা পাঁচ জনে গিয়ে বড় সাহেব-দের ব'লে-কয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতুম। আমরা সকলে যখন একবাক্যে সাক্ষী দিলুম যে, নীললোহিতের তুল্য মিথ্যাবাদী পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই—আর সেই সঙ্গে তাঁর গল্পের দু'-একটি নমুনা তাঁদের শোনালুম, তখন তাঁরা নীল-লোহিতকে অব্যাহতি দিলেন এই ব'লে,—যে, "যাও, আর মিথ্যে কথা বলো না।" যদিচ কাইজারের সঙ্গে নীললোহিতের বন্ধুত্বের গল্প শুনে তাঁদের মনে একটু খট্‌কা লেগেছিল। এর পর থেকে নীললোহিত আর মিথ্যা গল্প করেন না। ফলে গল্পও করেন না। কেন না, তাঁর জীবনে এমন কোনও সত্য ঘটনা ঘটে নি, ঐ এক গ্রেপ্তার হওয়া ছাড়া—যার বিষয় কিছু বল্‌বার আছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিভা একেবারে অন্তর্হিত হয়েছে।

আসল কথা কি জানেন, তিনি মিথ্যে কথা বল্‌তেন না, কেন না, ও সব কথা বলায় তাঁর কোন-রূপ স্বার্থ ছিল না। ধন-মান-পদ-মর্য্যাদা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তিনি বাস কর্‌তেন কল্পনার জগতে। তাই নীললোহিত যা বল্‌তেন —সে সবই হচ্ছে কল্পলোকের সত্য কথা। তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ সবই ছিল ঐ কল্পনা রাজ্যে অবাধে বিচরণ করায়। সুতরাং সেই কল্পলোক থেকে টেনে তাঁকে যখন মাটীর পৃথিবীতে নামান হ'ল, তখন যে তাঁর শুধু প্রতিভা নষ্ট হ'ল, তাই নয়; তাঁর জীবনও মাটী হ'ল;—দিনের পর দিন তাঁর অবনতি হ'তে লাগল।

গল্প বলা বন্ধ করবার পর, তিনি প্রথম বিবাহ কর্‌লেন, তার পর চাকরী নিলেন। তার পর তাঁর বছর বছর ছেলে-মেয়ে হ'তে লাগল। তার পর তিনি বেজায় মোটা হয়ে পড়লেন, তাঁর সেই মুখর চোখ, মাংসের ভিতর ডুবে গেল। এখন তিনি পুরোপুরি কেরাণীর জীবন যাপন কর্‌ছেন—যেমন হাজার হাজার লোক ক'রে থাকে। লোকে বলে যে, তিনি সত্যবাদী হয়েছেন—কিন্তু আমার মতে তিনি মিথ্যার পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছেন। তাঁর

স্বধর্ম্ম হারিয়ে, যে জীবন তাঁর আত্মজীবন নয়, অতএব তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ মিথ্যা জীবন— সেই জীবনে তিনি আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা এই ভেবেই খুসি যে, তিনি এত দিনে—মানুষ হয়েছেন, কিন্তু ঘটনা কি হয়েছে জানেন? নীললোহিতের ভিতর যে মানুষ ছিল, তার মৃত্যু হয়েছে,—যা টি কে রয়েছে, তা হচ্ছে সংসারের ঘানি ঘোরাবার একটা রক্তমাংসের যন্ত্র-মাত্র।

আশ্বিন, ১৩২৯

নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা

১

পূজোর নম্বর 'বসুমতীর' জন্য একটি গল্প লিখে দিতে, বহুদিন থেকে প্রতিশ্রুত আছি। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় এত দিন লেখায় হাত দিতে পারি নি।

আজ ঘুম থেকে উঠেই সংকল্প করলুম যে, যা থাকে কুলকপালে, একটা গল্প সূর্য্য ডোববার আগেই লিখে শেষ করব।

তা'র পর কলম হাতে নিয়ে দেখি যে, আমার মাথার ভিতর এখন আর কিছুই নেই—এক কংগ্রেস ছাড়া। আর কংগ্রেসের গল্প আমি পারি শুধু পড়তে, লিখতে না। কেন না, দিল্লীতে আমি যাই নি।

এ অবস্থায় নিজের মাথা থেকে গল্প বা'র করা অসম্ভব দেখে, একটা অপরের জানা না হোক, আমার শোনা গল্প লেখাই স্থির করলুম।

এ গল্পটি আমি নীললোহিতের মুখে শুনেছিলুম। নীললোহিত লোকটি যে কে, তা অবশ্য আপনি জানেন। গত বৎসর এই সময়ে তাঁ'র সবিশেষ পরিচয় 'মাসিক বসুমতী'তে দিয়েছি। আর আপনার কাগজের পাঠক-সম্প্রদায়েরও অনেকেরই বোধ হয়, নীললোহিতের কথা স্মরণ আছে।

আমার জনৈক ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বন্ধু একদিন আমার কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে, বর্ত্তমান "বেদ" জাল আর এ জাল ব্রাহ্মণরা করেছে। তাঁ'র বক্তব্য ছিল এই যে, মূল বেদ যখন প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন হয়েছিল, তখন অবশ্য তা'র বেবাক অক্ষর জলে ধুয়ে গেছল। এ অকাট্য যুক্তি শুনে আমি হাসি সংবরণ করতে পারি নি। ফলে বন্ধুবর একেবারে উগ্র-ক্ষত্রিয় হয়ে উঠে আমাকে সরোষে বল্লেন যে, তাঁ'র কথা আমি বুঝতে পারব না, যেহেতু, আমরা—ব্রাহ্মণরা বাস করি ব্রহ্মার সৃষ্ট জগতে, আর তাঁ'রা বাস করেন, বিশ্বামিত্রের জগতে। কথাটা শুনে আমি প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তা'র পর ভেবে দেখেছি যে, কথাটা সত্য। আমাদের সকলের দেহ শুধু একই মাটীর পৃথিবীতে অবস্থান করে, কিন্তু প্রত্যেকের মন আলাদা আলাদা বিশ্বে বাস করে।—আমি বাস করি মর্ত্ত্যলোকে আর নীললোহিত বাস করতেন কল্পলোকে। সাদা কথায় আমি বাস করি বৃটিশ রাজ্যে, নীললোহিত বাস করতেন—কল্পনারাজ্যে। সুতরাং আমার মুখে নীললোহিতের গল্প শুনে শ্রোতাদের দুধের সাধ (স্বাদ?) ঘোলে মেটাতে হবে। তখন সবে সুরাট কংগ্রেস ভেঙ্গেছে। কলকাতায় আর কোন কথা নেই। পাঁচ জন একত্র হলেই—সে কংগ্রেস কেন ভাঙ্গল, কি ক'রে ভাঙ্গল, যে জুতোটা উড়ে এসে প্রেসিডেন্টের পায়ে লুটিয়ে পড়ল, সেটা বিলেতি "পম্প" কি পাঞ্জাবী নাগরা, "মারহাট্টি" চটি কি মাদ্রাজী "চাপনি" এই সব নিয়ে তখন আমাদের মধ্যে ঘোর গবেষণা ও মহা বাদানুবাদ চলছে।

এক দিন আমরা সকলে আড্ডায় ব'সে, উক্ত যুগপ্রবর্ত্তক জুতোটির জাতি-নির্ণয় করতে ব্যস্ত আছি, এমন সময় নীললোহিত হঠাৎ ব'লে উঠলেন যে, তিনি স্বয়ং সশরীরে সুরাটে উপস্থিত ছিলেন এবং ভিতরকার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি যে জানে, প্রাণ গেলেও সে রহস্য সে ফাঁস করবে না। এ কথা শুনে এক জন eye-witness-এর কথা শোনবার জন্য আমরা সকলে ব্যগ্র হয়ে উঠলুম, যদিচ আমরা সবাই জানতুম যে, সে কথার সঙ্গে সত্যের কোনও সম্পর্ক থাকবে না।—নীললোহিত বল্লেন—"তোমরা যদি তর্ক থামাও ত গল্প বলি।" অমনি আমরা সবাই মৌনব্রত

অবলম্বন করলুম। তিনি তাঁর সুরাট অভিযানের বর্ণনা সুরু করলেন। তাঁ'র কথার অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি করতে হ'লে গল্প একটা নভেল হয়ে উঠবে। সুতরাং যত সংক্ষেপে পারি, তাঁ'র মোদ্দা কথা আপনাদের শোনাচ্ছি অর্থাৎ মাছ বাদ দিয়ে তা'র কাঁটা শুধু আপনাদের কাছে ধ'রে দিচ্ছি।

২

নীললোহিত সুরাট গেছলেন B. N. R. দিয়ে একটি প্যাসেঞ্জার গাড়ীতে, অর্থাৎ একেবারে একলা, তাই তাঁ'র সঙ্গে অপর কোন বাঙ্গালী ডেলিগেটের সাক্ষাৎ হয় নি। গাড়ী ঢিকুতে ঢিকুতে ছ'দিনের দিন সন্ধ্যেবেলায় সুরাট গিয়ে পৌঁছল। নীললোহিত সুরাট ষ্টেশনে নেমে একখানি টঙ্গা ভাড়া ক'রে Congress-Campএর দিকে রওনা হলেন। গুজরাটে টঙ্গা অবশ্য একরকম গরুর গাড়ী, কিন্তু গুজরাটের গরু বাঙ্গলার ঘোড়ার চাইতে ঢের মজবুত ও তেজী। তা'রা ঠিক তাজি-ঘোড়ার মত কদমে চলে, আর তাদের গলার ঘণ্টা গীর্জ্জের ঘণ্টার মত—সা-র-গ-ম সাধে আর বাইজীর পায়ের ঘুঙ্গুরের মত তালে বাজে। গাড়ীতে ছ'দিন নীললোহিতকে এক রকম অনশনেই কাটাতে হয়েছিল। সকালবেলায়—এক গেলাস কাঁচা দুধ ও রাত্তিরে এক মুঠো কাঁচা ছোলার বেশি তাঁ'র ভাগ্যে আর কিছু আহার জোটেনি। ষ্টেশনে ষ্টেশনে অবশ্য "লাড্ডু" পাওয়া যায়, কিন্তু সে লাড্ডু আকারে ভাঁটার মত আর সে চিজ দাঁতে ভাঙ্গবার যো নেই, গিলে খেতে হয়, আর তা গেলবার জন্য গলার নলী হওয়া চাই ড্রেন-পাইপের মত মোটা। আর "পুরি?" তা'র একখানা ছুড়ে মারলে নাকি প্রেসিডেন্টকে আর দেশে ফিরতে হ'ত না। পৃথিবীতে নাকি এমন জুতো নেই—যা'র সুখতলা আকারে ও কাঠিন্যে তা'র কাছেও ঘেঁসতে পারে। এক একখানি "পুরি" যেন এক একখানা থড়ম। সুতরাং—নীললোহিত অনশনে যদিচ মৃতপ্রায় হয়ে ছিলেন, তবুও সুরাটের বড় রাস্তার দৃশ্য দেখে, তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা একদম ভুলে গেলেন। যতদূর যাও, পথের দু'পাশে সব জানালাতে যেন সব পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গুর্জ্জরে অবরোধপ্রথা নেই—আর গুর্জ্জররমণীদের তুল্য সুন্দরী সুরপুরীতেও মেলা ভার। এ দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁর মোহ উপস্থিত হ'ল, যেন প্রতি জানালায় একটি ক'রে Juliet দাঁড়িয়ে আছে, আর তিনি হচ্ছেন স্বয়ং Romeo, কিন্তু টঙ্গা এমনি ছুটে চলেছে যে, তিনি কারও কাছে kill the envious moon, এ কটি কথা বল্‌বারও সাবকাশ পেলেন না। তা'র পরে এক সময়ে তাঁ'র মনে হ'ল যে, টঙ্গা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে—আর তাঁ'র দক্ষিণ ও বাম দুপাশ দিয়েই অসংখ্য সুন্দরীর শোভাযাত্রা চলেছে। নীললোহিত যে পৃথিমধ্যে কারও ভালবাসায় প'ড়ে যান নি, তার একমাত্র কারণ, এই নাগরীর হাটে কাকে ছেড়ে কার ভালবাসায় তিনি পড়বেন? বিবাহ অবশ্য—একসঙ্গে দু'শ তিন'শ করা যায়, কিন্তু ভালবাসায় পড়তে হয় মাত্র এক জনের সঙ্গে—অন্তত এক সময়ে ত তাই।—এ দিকে পেট খালি; ও দিকে হৃদয় পূর্ণ, এই অবস্থায় নীললোহিত কংগ্রেস-ক্যাম্পে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেখানে উপস্থিত হবামাত্র তাঁ'র রূপের নেশা ছুটে গেল। তিনি প্রথমে গিয়েই টিকিট কিনলেন, তাতেই তাঁ'র পকেট প্রায় খালি হয়ে এল। তা'র পর শোনেন যে, কংগ্রেস ক্যাম্পে আর জায়গা নেই, যা'র কাছেই যান, তিনিই বল্‌লেন, "ন স্থানং তিলধারণে।" ছ'দিন পেটে ভাত নেই, ছ'রাত্তির চোখে ঘুম নেই, তা'র উপর আবার যদি সুরাটের পথে পথে সমস্ত রাত ঘুরে বেড়াতে হয়—তা হ'লেই ত নির্ঘাত মৃত্যু। নীললোহিত একেবারে জলে পড়লেন, আর ভেবে কোনও কূলকিনারা কর্‌তে পার্‌লেন না। তাঁর এই দুরবস্থা দেখে টঙ্গাওয়ালা দয়াপরবশ হ'য়ে তাঁকে Extremist ক্যাম্পে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে। নীললোহিতের নাড়ীতে আবার রক্ত ফিরে এল। টঙ্গা যে পথ দিয়ে এসেছিল, আবার সেই পথ দিয়েই ফিরে চল্‌লো। এবার কিন্তু কোনও বাড়ীর কোনও গবাক্ষ আর তাঁ'র নয়ন আকর্ষণ করতে পার্‌লে না—যদিচ প্রতি গবাক্ষেই এক একটি সন্ধ্যাতারা ফুটেছিল। তিনি অকারণে সমস্ত সুরাট-সুন্দরীদের উপর মহা চ'টে গেলেন, যেন তা'রাই তাঁ'র কংগ্রেসের প্রবেশদ্বার আটকে দাঁড়িয়েছে। শেষটা রাত আটটায় তিনি কংগ্রেসের মহারাষ্ট্র-শিবিরে গিয়ে পৌঁছলেন এবং পৌঁছেই পকেটে যে কটি টাকা অবশিষ্ট ছিল, সেই কটি টঙ্গাওয়ালাকে দিয়ে বিদেয় কর্‌লেন। মহারাষ্ট্র-শিবিরে লোকের ভিড় দেখে সেখানে রাত কাটাতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। সে যেন একটা Black

hole, এক একটা ছোট্ট ঘরে পঞ্চাশ ষাট জন ক'রে জোয়ান। "শুতে না পাই, অন্ততঃ খেতে পাব," এই আশায় তিনি সেখানে থাকাই স্থির করলেন। কিন্তু খাবার আয়োজন দেখে তাঁ'র চক্ষুস্থির। চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন, শুধু লঙ্কা—লঙ্কা আর লঙ্কা। সে লঙ্কা কেউ কুটছে, কেউ বাঁটছে, কেউ পিষছে, কেউ ছেঁচছে। তা'র গন্ধতেই তাঁ'র মুখ জ্বালা করতে লাগল। তিনি ঢোক গিলে মনে মনে বল্লেন, "এখন উপায় কি, নুণ দিয়েই ভাত খাব।" কিন্তু ভাত সে দিন তাঁ'র আর কপালে লেখা ছিল না। সে ক্যাম্পেও তাঁ'র স্থান হ'ল না। সকলে ধ'রে নিলে যে, তিনি এক জন Spy। তাঁ'র যে এ কূল ও কূল দুকূল গেল, তা'র প্রথম কারণ—তিনি অজ্ঞাতকুলশীল, আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাঁ'র সঙ্গে ব্যাগ-বিছানা কিছুই ছিল না। তিনি ঘর থেকে একছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন সুরাটে লোকের কাছে এই প্রমাণ করবার জন্য যে, তিনি হচ্ছেন এক জন স্বদেশপ্রেমের মাতোয়ারা সন্ন্যাসী।

নীললোহিত মহারাষ্ট্র-শিবির থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে। আর তাঁ'র অবস্থা তখন এই যে, পেটে ভাত নেই, পকেটে পয়সা নেই, সুরাটে একটি পরিচিত লোক নেই সভ্য-সমাজের মধ্যে তিনি পড়লেন দ্বিতীয় Robionson Crusoeর অবস্থায়। ঘোর বিপদের মধ্যে না পড়লে নীললোহিতের বলবুদ্ধি খুলত না। সহজ অবস্থায় নীললোহিত ছিলেন আর পাঁচ জনের মত; কিন্তু বিপদে পড়লেই তিনি হয়ে উঠতেন একটি Superman, সংস্কৃতে যাকে বলে অতিমানুষ। তাই পথে বেরিয়েই তাঁ'র শরীর-মনে কে জানে, কোত্থেকে অলৌকিক শক্তি ও সাহস এসে জুটল। তিনি তাঁর মনকে বোঝালেন যে, তিনি hunger-strike করছেন সভাসমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে। অমনি তাঁ'র ক্ষুধা-তৃষ্ণা মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উড়ে গেল। তিনি সঙ্কল্প করলেন যে, এ বিপদ থেকে তিনি আত্মবলে উদ্ধার লাভ করবেন। কি ক'রে যে তা করবেন, সে বিষয়ে অবশ্য তাঁ'র মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু তাঁ'র ছিল আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে জাতিবর্ণ নির্ব্বিচারে সকল কংগ্রেসওয়ালার উপর তাঁ'র সমান অভক্তি জন্মাল, কারণ, তা'রা যা করতে যায়, তা দল বেঁধে ও পরস্পরের হাত ধরাধরি ক'রে। একলা কিছু করবার সাহস ও শক্তি তাদের কারও শরীরে নেই। নীললোহিত তাই "একলা চলবে" ব'লে সেই অমানিশার অন্ধকারের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এবার তিনি রাজপথ ছেড়ে সুরাটের গলিঘুঁচিতে ঢুকে পড়লেন। সে সব গলিতে যেন অন্ধকারের বান ডেকেছে। রাস্তার দু'পাশের বাড়ীগুলোর দুয়োর, জানালা সব জেলের ফটকের মত কষে বন্ধ। চারপাশে সব নির্জ্জন, সব নীরব, নিঝুম। যেন সমগ্র সুরাট সহরটা রাত্তিরে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দু'একটা বাড়ীর গবাক্ষ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যেখানেই আলো, সেইখানেই কান্নার সুর। সুরাটে তখন খুব প্লেগ হচ্ছিল। নীললোহিত ছাড়া অপর কেউ এই শ্মশানপুরীর মধ্যে ঢুকলে ভয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ত। কিন্তু তিনি ঘণ্টা দুই এই অন্ধকারের ভিতর সাঁতরাতে সাঁতরাতে শেষটা কূলে গিয়ে ঠেকলেন। হঠাৎ তিনি একটা বাড়ীর সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন, যা'র দোতালার ঘরে দেদার ঝাড়-লণ্ঠন জ্বলছে, আর যা'র ভিতর দিয়ে নিঃসৃত হচ্চে শ্রীকণ্ঠের অতি সুমধুর সঙ্গীত। নীললোহিত তিলমাত্র দ্বিধা না ক'রে নিজের মাথার পাগড়ীটি খুলে সেই বাড়ীর বারান্দার কাঠের রেলিংয়ে লাগিয়ে দিয়ে সেই পাগড়ী বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। তাঁ'র পায়ের শব্দ শুনে ঘর থেকে একটি অপ্সরোপম রমণী বেরিয়ে এলেন। তা'র পর দু'জনে পরস্পর মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে রইলেন। এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক নীললোহিত জীবনে কিংবা কল্পনাতে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখেন নি। নীললোহিতের মনে হ'ল যে, রমণীটি সুরাটের সকল সুন্দরীর সংক্ষিপ্তসার। তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গ একেবারে হীরে মাণিকে ঝক্ ঝক্ করছিল। নীললোহিতের চোখ সে রূপের তেজে ঝল্‌সে যাবার উপক্রম হ'ল, তিনি মাটীর দিকে চোখ নামালেন। প্রথম কথা কইলেন স্ত্রীলোকটি। তিনি হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কে?"

নীললোহিত উত্তর করলেন, "বাঙ্গালী।"

"সুরাটে কেন এসেছ?"

"কংগ্রেস ডেলিগেট হয়ে।"

"কংগ্রেস ক্যাম্পে না গিয়ে এখানে কেন এলে?"

"পথ ভুলে।"

"টঙ্গায় চড়লে টঙ্গাওয়ালা ত তোমাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেত।"

"আমার ব্যাগ, বিছানা সব ষ্টেশনে হারিয়ে গিয়েছে। টাকাকড়ি সব ব্যাগের ভিতরে ছিল। তাই

টঙ্গা ভাড়া করবার পয়সা কাছে না থাকায় হেঁটে বেরিয়েছিলুম। তা'র পর তিন চার ঘণ্টা ঘোরবার পর এখানে এসে পৌছেছি।"

"এ বাড়ীতে ঢুকলে কিসের জন্য ?"

"আলো দেখে ও সঙ্গীত শুনে।"

"পরের বাড়ীতে না বলা-কওয়া প্রবেশ করতে তোমার দ্বিধা হ'ল না ?"

"যে জলে ডোবে, সে বাঁচবার জন্য হাতের গোড়ায় যা পায়, তাই চেপে ধরে। আমি উপবাসে মৃতপ্রায়। তাই যদি কিছু খেতে পাই, তাই দেখবার জন্য এখানে প্রবেশ করেছি—বাড়ী কার, তা ভাববার আমার সময় ছিল না। ঝাড়-লণ্ঠন দেখে বুঝ্‌লুম—এ বাড়ীতে অন্নকষ্ট নেই, আর গান শুনে বুঝলুম, এ বাড়ীতে প্লেগ নেই।"

নীললোহিতের কথা শুনে স্ত্রীলোকটির মনে করুণার উদয় হ'ল। তিনি তাঁ'কে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন। আর দাসীদের ডেকে বল্লেন, নীললোহিতের জন্য খাবার আনতে। তাই শুনে নীললোহিতের ধড়ে আবার প্রাণ এল। তিনি এক নজরে ঘরটি দেখে নিলেন। নীচে কাশ্মীরী গালিচা পাতা আর ঘর-পোরা বাদ্যযন্ত্র। তিনি গৃহকর্ত্রীকে তাঁ'র পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে উত্তর দিলেন,—

"তোমরা যা হ'তে চাচ্ছ, আমি তাই।"

"অর্থাৎ ?"

"আমি স্বাধীন।"

এর পর বড় বড় রূপোর থালায় ক'রে দাসীরা দেদার ফল-মিষ্টি নিয়ে এসে হাজির করলে। নীললোহিত আহারে ব'সে গেলেন। সে আহারের বর্ণনা করতে হ'লে দু'খানি বড় বড় ক্যাট্‌লগ তৈরী করতে হয়। একখানি ফলের, আরখানি মিষ্টান্নের। সংক্ষেপে ভারতবর্ষের সকল ঋতুর ফল আর সকল প্রদেশের মিষ্টান্ন নীললোহিতের সুমুখে স্তূপীকৃত ক'রে রাখা হ'ল। তিনিও তাঁ'র এক সপ্তাহের ক্ষুধা মেটাতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি সে দিন আহারে স্বয়ং কুম্ভকর্ণকেও হারিয়ে দিতে পারতেন। তাঁ'র আহার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় ফটকে কে অতি আস্তে ঘা দিলে। গৃহকর্ত্রী একটি দাসীকে নীচে গিয়ে দুয়োর খুলে দিতে আদেশ করলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে একটি ভদ্রলোক এসে সেখানে উপস্থিত। নীললোহিত দেখেই বুঝতে পারলেন যে, তিনি বম্বে অঞ্চলের এক জন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। তিনি যে অগাধ ধনী, তা তাঁ'র উদরেই প্রকাশ। ভদ্রলোক নীললোহিতকে দেখেই আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়ালেন। তা'র পর সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর অনেকক্ষণ ধ'রে গুজরাটিতে কি কথাবার্ত্তা হ'ল। তা'র পর সেই ভদ্রলোকটি নীললোহিতকে সম্বোধন ক'রে অতি অভদ্র হিন্দীতে বললেন যে, আহারান্তে তাঁকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, নচেৎ তিনি তাঁকে পুলিসের হাতে সঁপে দেবেন। এ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি বললেন যে, তা কখনই হ'তে পারে না। সমস্ত রাত পথে পথে ঘুরে বেড়ালে বাঙ্গালী ছোকরাটি প্লেগে মারা যাবে। আর ছোকরাটি যে চোর-ডাকাত নয়, তার প্রমাণ তার চেহারা—"এইসা খোপ্‌সুরত" ছোকরা চোর-ডাকাত কখনই হ'তে পারে না। এ কথা শুনে, ভদ্রলোকটি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। আবার দু'জনে বাগ্‌বিতণ্ডা সুরু হ'ল। শেষটা উভয়ের মধ্যে এই আপোষ হ'ল যে, রাত্তিরে নীললোহিতকে চাকরদের সঙ্গে থাকতে হবে, কিন্তু সকালে উঠেই তাঁকে এ বাড়ী থেকে চ'লে যেতে হবে। ঘুমে নীললোহিতের চোখ বুজে আস্‌ছিল, তাই তিনি দ্বিরুক্তি না ক'রে নীচে গিয়ে চাকরদের ঘরে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করলেন যে, ঐ বোম্বেটের অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি দেশে ফিরবেন না।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে নীললোহিত চোখ তাকিয়ে দেখেন যে, বেলা দশটা বেজে গিয়েছে। তিনি সবে মুখ-হাত ধুয়ে, সবে গালে হাত দিয়ে বসেছেন, এমন সময় উপর থেকে হুকুম এল যে,—"বাইজী বোলাতা।" উপরে গিয়ে দেখেন যে, স্ত্রীলোকটি নূতন মূর্ত্তি ধারণ করেছেন। সাজসজ্জা সব বাঙ্গালী রমণীর ন্যায়। শরীরে জহরতের সম্পর্ক নেই, গহনা আগাগোড়া সোনার, আর তাঁর পরণে ঢাকাই শাড়ী, গায়ে একখানি বুঁটোদার ঢাকাই চাদর। তিনি নীললোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে, তিনি এখন কোথায় যেতে চান। নীললোহিত উত্তর করলেন, কংগ্রেসক্যাম্পে। স্ত্রীলোকটি বললেন, সে হতেই পারে না। গত রাত্তিরের আগন্তুক ভদ্রলোকটি যদি তাঁ'র সাক্ষাৎ পান, তা হ'লে তাঁর বিপদ ঘটবে, হয় গুণ্ডা, নয় পাহারাওয়ালার হাতে তাঁকে বিড়ম্বিত হ'তে হবে। অতএব পত্রপাঠ দেশে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকটি তাঁর জন্য ব্যাগ, বিছানা, দেশে ফেরবার রেল-ভাড়ার টাকা ইত্যাদি সব ঠিক রেখেছেন।

কিন্তু কংগ্রেস যাওয়ায় বিপদ আছে, এ কথা

শুনে নীললোহিত জেদ ধ'রে বসলেন যে, তিনি কংগ্রেসে যাবেনই যাবেন। সেই সুন্দরী তাঁ'কে অনেক কাকুতি-মিনতি করলে; কিন্তু নীললোহিত কিছুতেই তাঁর গোঁ ছাড়লেন না! "ভয় পেয়েছি," এ কথা স্ত্রীলোকের কাছে স্বীকার, পুরুষমানুষ সহজে করে না। আর উক্ত স্ত্রীলোকটি ছিলেন যেমন সুন্দরী, নীললোহিতও ছিল তেমনি বীরপুরুষ। অনেক বকাবকির পর শেষটা স্থির হ'ল যে,—উক্ত স্ত্রীলোকটি নীললোহিতকে স্বয়ং সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসে যাবেন—নিজের দাসী সাজিয়ে। তিনি বললেন যে, তিনি সঙ্গে থাকলে কেউ নীললোহিতের কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না। মধ্যাহ্নভোজনের পর নীললোহিতকে পাঞ্জাবী রমণীর বেশ ধারণ করতে হ'ল। পরণে চুড়িদার পাজামা. পায়ে নাগরা, গায়ে কুর্ত্তা ও মাথা-মুখ-ঢাকা ওড়না। এ সব সাজসজ্জা গৃহ-কর্ত্রীর একটি পাঞ্জাবী দাসীর কাছ থেকেই পাওয়া গেল। আর সে সব কাপড় নীললোহিতের গায়ে ঠিক ব'সে গেল, কেন না, পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক ও বাঙ্গালী পুরুষ মাপে প্রায় এক। তা'র পর দু'জনে একটি আধ-বন্ধ ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে কংগ্রেসে গিয়ে মেয়েদের গ্যালারিতে বসলেন। কংগ্রেসের কাজ সুরু হ'ল, এমন সময় হঠাৎ নীললোহিত দেখতে পেলেন যে, উক্ত ভদ্রলোক কংগ্রেসের হোমরা-চোমরাদের মধ্যে ব'সে আছেন! এ দেখে তিনি আর তাঁর রাগ সামলাতে পারলেন না, ডান পায়ের নাগরা খুলে তাঁকে ছুড়ে মারলেন। সেই নাগরাটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে প্রেসিডেন্টের পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। মহা হৈচৈ প'ড়ে গেল—কংগ্রেস ভেঙ্গে গেল। নীললোহিতের কাণ্ড দেখে স্ত্রীলোকটি মুহূর্ত্তের জন্য হতভম্ব হয়ে রইলেন। তা'র পরই নিজেকে সামলে নিয়ে নীললোহিতের হাত ধরে' তিনি কংগ্রেসের তাঁবুর বাইরে এসে গাড়ীতে চ'ড়ে বাড়ী ফিরলেন। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার নীললোহিতকে বাঙ্গালী সাজিয়ে ব্যাগ-বিছানা সমেত সেই গাড়ীতেই তাঁকে ষ্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন। ষ্টেশনে নীললোহিত ব্যাগ খুলে দেখেন, তা'র ভিতর পাঁচশ টাকার নোট আর সেই স্ত্রীলোকটির একখানি ছবি রয়েছে। সেই টাকা দিয়ে টিকিট কিনে তিনি দেশে ফিরলেন। সুরাট-কংগ্রেসের যুগপ্রবর্ত্তক জুতো যে নীললোহিতের পাদুকা, এ কথা শুনে আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

নীললোহিতের মুখে এই অপূর্ব্ব কাহিনী শুনে আমরা সকলে পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম—কেন না, তার এ গল্প সম্বন্ধে কি বলব, কেউ তা ঠাওরাতে পারলুম না। খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকবার পর রামযাদব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি সেই সুরাট-সুন্দরীর পাঁচ শত টাকা বেমালুম হজম ক'রে ফেললেন? নীললোহিত উত্তর করলেন—"না। আমি কাশীতে গিয়ে সেই পাঁচশ' টাকা দিয়ে অন্নপূর্ণার পুজো দিয়ে এসেছি।" আবার সকলে চুপ করলেন। তা'র পর মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, "সে ছবিখানা তোমার কাছে আছে?" নীললোহিত উত্তর করলেন—"হাঁ, আছে।" দ্বিতীয় প্রশ্ন হ'ল—"সেখানি দেখাতে পার?" উত্তর—"দেখতে ইচ্ছে হয়, কিনে দেখতে পারো।" প্রশ্ন—"সে ছবি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়?" উত্তর—"দেদার।" প্রশ্ন—"কি রকম?" উত্তর—"নুরজাহানের ছবি দেখলেই সেই সুরাট সুন্দরীকে দেখতে পাবে। এ দুটি স্ত্রীলোকই এক ছাঁচে ঢালাই।"

এর পর কিছু বলা বৃথা দেখে আমরা সভাভঙ্গ ক'রে চ'লে গেলুম।

আশ্বিন, ১৩৩০

সহযাত্রী

১

সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় রেলের গাড়ীতে। ঘণ্টা তিনেক মাত্র তিনি আমার সহযাত্রী ছিলেন। কিন্তু এই তিন ঘণ্টা আমার জীবনে এমন অপূর্ব্ব তিন ঘণ্টা যে, তার স্মৃতি আমার মনে আজও জ্বল্-জ্বল্ করছে। এক এক সময়ে মনে হয় যে, সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আমার একটা কল্পনা মাত্র। আসলে তাঁর সঙ্গে আমার কখনো সাক্ষাৎ হয়নি, কখনো কোনও কথাবার্ত্তা হয়নি। সমস্ত ব্যাপারটি এতই অদ্ভুত যে, সেটিকে সত্য ঘটনা ব'লে বিশ্বাস করবার পক্ষে আমার মনের ভিতরেই বাধা আছে। লোকে বলে, স্বপ্ন কখনো কখনো সত্য হয়; সম্ভবতঃ এ ক্ষেত্রে সত্য আমার কাছে স্বপ্ন হয়ে উঠেছে। এখন ঘটনা কি হয়েছিল, বলছি।

বছর পাঁচ ছয় আগে আমি একদিন রাত ১০ টায় ঝাঝা থেকে একখানি জরুরী টেলিগ্রাম পাই যে, সেখানে আমার জনৈক আত্মীয়ের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, আর যদি আমি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই, তা হ'লে সেই রাত্রেই আমার রওনা হওয়া প্রয়োজন। আমি আর তিলমাত্র বিলম্ব না ক'রে একখানি ঠিকা গাড়ীতে হাবড়ার দিকে ছুটলুম। সেখানে গিয়ে শুনলুম যে, মিনিট পাঁচেক পরেই একখানি গাড়ী ছাড়বে—যা'তে আমি ঝাঝা যেতে পারি। গাড়ীখানি অবশ্য slow passenger এবং ছাড়ে অসময়ে, তবুও দেখি, ট্রেণ একেবারে ভর্ত্তি, কোথায়ও ভাল ক'রে বসবার স্থান নেই, শোবার স্থান ত দূরের কথা। খালি ছিল শুধু একটি ফার্ষ্ট ক্লাস compartment। তাই আমি একখানি ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কিনে সেই গাড়ীতেই চ'ড়ে বসলুম। প্রথমে সে গাড়ীতে আমি একাই ছিলুম, মধ্যে কোন্ ষ্টেশনে মনে নেই, একটি বৃদ্ধ ইংরাজ ভদ্রলোক আমার কামরায় এসে ঢুকলেন। তিনি এসেই আমার সঙ্গে আলাপ সুরু করলেন। এ-কথা ও-কথা বলবার পর তিনি হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, বৌবাজারের কসাই-কালী ভদ্রকালী না দক্ষিণাকালী। আমি বল্লুম "জানিনে।" তিনি একটি বাঙ্গালী হিন্দুসন্তানের মুখে এতাদৃশ অজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। পরে বল্লেন যে, তিনি এ দেশে পূর্ব্বে engineer ছিলেন, এখন বিলেতে ব'সে তন্ত্রশাস্ত্র চর্চ্চা করছেন, মাত্র সম্প্রতি বাঙ্গলায় ফিরে এসেছেন, নানারূপ কালীমূর্ত্তি দর্শন করবার জন্য। তার পর সমস্ত রাত ধ'রে আমার কাছে কালী-মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। সে রাত্তিরে মন আমার নিতান্ত উদ্বিগ্ন ছিল, সুতরাং তাঁর একটি কথাও আমার কানে ঢুকলেও মনে ঢোকেনি; নৈলে তাঁর কথা শুনে আমি কালীর বিষয়ে এমন এক-খানি treatise লিখতে পারতুম—যার প্রসাদে আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে doctor উপাধি পেতুম। আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য ক'রে তিনি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং আমি সব কথা খুলে বল্লুম। শুনে তিনি চোখ বুজে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বল্লেন—"তোমার আত্মীয় ভাল হয়ে গেছে।

শেষ রাত্তিরে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরে চোখ খুলে দেখি, ট্রেণ আসানসোল ষ্টেশনে হাজির এবং আমার সহযাত্রীটি অদৃশ্য হয়েছেন। কামরাটি খালি দেখে ভাবলুম যে, এই বৃদ্ধ ইংরাজ ভদ্রলোকের বিষয় আমি ত স্বপ্ন দেখিনি? রাত্তিরের ব্যাপার সত্য কি স্বপ্ন, তা ঠিক বুঝতে না পেরে আমি গাড়ী থেকে নেমে Refreshment Room এ প্রবেশ করলুম, এক পেয়ালা চায়ের সাহায্যে চোখ থেকে ঘুমের ঘোর ছাড়াবার জন্য।

২

মিনিট দশেক পরে গাড়ীতে ফিরে এসে দেখি, সেখানে দুটি নূতন আরোহী ব'সে আছেন। এক জন পল্টনি সাহেব, আর একজন সাধু। সাহেবটির চেহারা ও বেশভূষা দেখে বুঝলুম, তিনি হয় এক জন Colonel, নয় Major; আভিজাত্যের ছাপ তাঁর সর্ব্বাঙ্গে ছিল। আমি গাড়ীতে ঢুকতেই তিনি শশব্যস্তে উঠে প'ড়ে আমার বসবার জন্য জায়গা ক'রে দিলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে

ব'সে পড়্লুম; কিন্তু আমার চোখ প'ড়ে রইল ঐ সাধুটিরই উপর। প্রথমেই নজরে পড়ল, তিনি একটি মহাপুরুষ না হন, একটি প্রকাণ্ড পুরুষ। তাঁর তুলনায় কর্ণেল সাহেবটি ছিলেন একটি ছোকরা মাত্র। স্বামীজী যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া। চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে, তাঁর বুকের বেড় অন্ততঃ ৪৮ ইঞ্চি হবে। অথচ তিনি স্থূল নন। এ শরীর যে কুস্তিগির পালোয়ানের, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ রইল না। কুস্তিগির হ'লেও তাঁর চেহারাতে কিছুমাত্র চোয়াড়ে ভাব ছিল না। তাঁর বর্ণ ছিল গৌর, অর্থাৎ তামাতে রূপোর খাদ দিলে এই উভয় ধাতু মিলে যে রঙের সৃষ্টি করে, সেই গোছের রঙ। তাঁর চোখের তারা দুটি ছিল ফিরোজার মত নীল ও নিরেট। এ-রকম নিষ্ঠুর চোখ আমি মানুষের মুখে ইতিপূর্ব্বে দেখিনি। তাঁর গায়ে ছিল গেরুয়া রংয়ের রেশমের আলখাল্লা, মাথায় প্রকাণ্ড গেরুয়া পাগড়ী ও পায়ে পেশোয়ারী চাপ্‌লি। তাঁকে দেখে আমি একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম, কারণ, পাঠান যে সাধু হয়, তা আমি জানতুম না; আর আমি ধ'রে নিয়েছিলুম যে, এ ব্যক্তি পাঠান না হয়ে যায় না। এঁর মুখে-চোখে একটা নির্ভীক বেপরোয়া ভাব ছিল—যা এ দেশের কি গৃহস্থ, কি সন্ন্যাসী, কারও মুখে সচরাচর দেখা যায় না।

আমি হাঁ ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছি দেখে, স্বামীজী আমাকে বাঙ্গালায় বল্লেন—

"মশায় কি মনে কর্‌ছেন যে, আমি ভুল ক'রে এ গাড়ীতে উঠেছি,—থার্ড ক্লাস ভেবে ফার্ষ্ট ক্লাসে ঢুকেছি? অত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য আমি নই,—এই দেখুন আমার টিকিট।"

কথাটা শুনে আমি একটু অপ্রস্তুতভাবে বল্লুম —"না, তা কেন মনে করব? আজকাল অনেক সাধু সন্ন্যাসীই ত দেখতে পাই ফার্ষ্ট ক্লাসেই যাতায়াত করেন। এমন কি, কেউ কেউ একা একটি saloon অধিকার ক'রে ব'সে থাকেন।"

এর উত্তর হ'ল একটি অট্টহাস্য। তার পর তিনি বল্লেন—"সে মশায় পরের পয়সায়। আমার মশায় এমন ভক্ত নেই—যাদের বিশ্বাস, আমাকে ফার্ষ্ট ক্লাসে বসিয়ে দিলেই তারা স্বর্গে seat পাবে। গেরুয়া পরলেই যে পরের কাছে হাত পাত্‌তে হবে, বিধির এমন কোনো বিধান নেই।"

—তা অবশ্য।

—কে কি কাপড় পরে, তার থেকে যদি কে কি রকম লোক, তা চেনা যেত, তা হ'লে ত আপনাকেও সাহেব ব'লে মান্‌তে হ'ত!

আমার পরনে ছিল ইংরাজী কাপড়, সুতরাং সন্ন্যাসী-ঠাকুরের এ বিদ্রূপ আমাকে নীরবে সহ্য করতে হ'ল।

এর পরেই তিনি ধ্যানস্তিমিত-লোচনে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। অন্যমনস্কভাবে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাক্‌বার পর, তিনি একদৃষ্টে কর্ণেল সাহেবকে নিরীক্ষণ করতে লাগ্‌লেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ল কর্ণেল সাহেবের কামান-প্রমাণ বন্দুকটির উপর। তিনি তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলেন —"May I have a look af your weapon, sir?"

কর্ণেল সাহেব উত্তর করলেন,—"Certainly—here it is।" এই ব'লে তিনি বন্দুকটি স্বামীজীর হাতে তুলে দিলেন। স্বামীজী "thank you" ব'লে সেটি স্বকরতলগত করলেন। তার পর সেটি নেড়ে নেড়ে বল্লেন—"It's a Winchester repeater."

—That's right.

—Splendid weapon—but no use for us Shikaris,

—No, it's not a sporting gun.

—Would you care to have a look at my gun? I'm sure you will like it.

এই ব'লে তিনি বেঞ্চের নীচে থেকে একটি বন্দুকের বাক্স টেনে নিয়ে, একটি রাইফেল বার ক'রে, "Let me take out the balls" ব'লে, তার ভিতর থেকে দু'টি টোটা নিষ্কাশিত ক'রে, সাহেবের হাতে তুলে দিলেন। সাহেব সে বন্দুকটি দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন, এবং দু-তিনবার মৃদুস্বরে বল্লেন—"It's a beauty," তার পরে জিজ্ঞাসা করলেন,—"Did you get it in Calcutta?"

—No, I brought it out from England.

—It must have cost you a pot of money.

—Two hundred and fifty pounds."

এর পর সাহেবে-স্বামীতে যে কথোপকথন হ'ল —তা আমার অবোধ্য। মনে আছে শুধু দু-চারটি ইংরাজী কথা—যথা Twelve-bore, 465, Holland & Holland প্রভৃতি। আন্দাজ করলুম, এ

সব হচ্ছে বন্দুক নামক বস্তুর নাম, ধাম, রূপ, গুণ ইত্যাদি। তার পর সীতারামপুর ষ্টেশনে সাহেব নেমে গেলেন এবং যাবার সময় স্বামীজীর করমর্দ্দন ক'রে বল্‌লেন, "Well, goodbye, glad to have m t you"—স্বামীজীও উত্তর করলেন, "Au revoir."

আমি এতক্ষণ অবাক্ হয়ে স্বামীজীর কথাবার্ত্তা শুনলুম এবং তার থেকে এই সারসংগ্রহ করলুম যে, তিনি বাঙ্গালী, ইংরাজীশিক্ষিত, ধনী ও শীকারী। এরকম লোকের সাক্ষাৎ জীবনে একবার ছাড়া দু'বার পথেঘাটে মেলে না।

এর পর স্বামীজী যে ব্যবহার করলেন, তা আমার আরও অদ্ভুত লাগল। সন্ন্যাসী হ'লেও দেখলুম, তিনি আসন-সিদ্ধ যোগী নন। এমন ছট্‌ফটে লোক এ বয়সের লোকের ভিতর দেখা যায় না। পাঁচ মিনিট অন্তর তিনি এখান থেকে উঠে ওখানে বস্‌তে লাগলেন, বিড়-বিড় ক'রে কি বক্‌তে লাগলেন এবং মধ্যে মধ্যে গাড়ীর ভিতরেই পায়চারী করতে লাগলেন। শুধু পাশ দিয়ে আর একখানি গাড়ী চ'লে গেলে তিনি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হুম্‌ড়ি খেয়ে পাশের গাড়ীর যাত্রীদের অতি মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে লাগ্‌লেন। আমরা তেড়ে চলেছি পশ্চিমমুখে, আর অপর গাড়ীগুলি তেড়ে চলেছে পূর্ব্বমুখে; পথমধ্যে উভয়ের মিলন হচ্ছে সেকেণ্ড খানিকের জন্য। এ অবস্থায় এক গাড়ীর লোক অপর গাড়ীর লোকদের কি লক্ষ্য করতে পারে, বুঝতে পারলুম না। বুঝলুম এইমাত্র যে, নিজের গাড়ীর লোকের চাইতে অপর গাড়ীর লোক সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ঢের বেশি। কারণ, সীতারামপুরের পরে তিনি অনেকক্ষণ আমার সঙ্গে কথা কওয়া দূরে থাক, আমার প্রতি দৃক্‌পাতও করেন নি। তাঁর এ ব্যবহার দেখে আমি যে আশ্চর্য্য হয়েছি, তা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। কারণ, তিনি হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লেন, "আপনি বোধ হয় জানতে চান যে, আমি পাশের চলন্ত ট্রেণে কি খুঁজছি? আচ্ছা, আমি সংক্ষেপে বলছি, মন দিয়ে শুনুন।"

৩

আমার নাম সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর, জাতি ব্রাহ্মণ, পেশা জমীদারী। আমার বাবার ছিল মস্ত জমীদারী; উত্তরাধিকারিস্বত্বে আমি এখন তার মালিক। বাবা যখন মারা যান, আমি তখন নেহাত নাবালক। কাজেই Court of Wards সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিলে, আর আমার শিক্ষক হলেন একজন ইংরাজ ভদ্রলোক। তিনি এককালে ছিলেন কাপ্তেন। আমি কখনো স্কুল-কলেজে পড়িনি। আমি যা-কিছু শিখেছি, সে সবই তাঁর কাছে। তিনি আমাকে কি শিখিয়েছেন জানেন? —ঘোড়ায় চড়তে, বন্দুক ছুড়তে, ইংরাজীতে কথা কইতে। এ তিন বিষয়ে বাঙ্গলার জমীদারের ছেলের মধ্যে আমি বোধ হয়, বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার ইংরাজী কথা ত আপনি শুনেছেন? আর আমি যে কি রকম সওয়ার, তা জানে বাঙ্গলার পয়লা নম্বরের ঘোড়ারা। আর আমি একটা গণ্ডারকে পাঁচশ' ফিট দূর থেকে এক গুলীতে ধরাশায়ী করতে পারি। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ।—আমার দ্বিতীয় শিক্ষক ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তিনি আমাকে শিখিয়েছেন সংস্কৃতভাষা, ধর্ম্মকর্ম্ম, পূজাপাঠ, আর তন্ত্রমন্ত্র। জমীদারের ছেলের ধর্ম্মজ্ঞান থাকা নাকি নিতান্ত দরকার। তাই আমি একসঙ্গে ঘোর হিন্দু ও ঘোর সাহেব—একাধারে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়।

তবে এ বেশ কেন? আমি গেরুয়া পরেছি কাঞ্চনের অভাবে নয়, কামিনীর অভাবে। কথাটা শুনে বোধ হয় আপনি ভাবছেন যে, বড়মানুষের ছেলের আবার কামিনীর অভাব! আমি কিন্তু মশায় আর পাঁচজনের মত নই। টাকা থাকলেই যে বদ্‌খেয়ালী হ'তে হবে, এমন কোনো কথা নেই। জীবনে এক ফোঁটা মদও খাইনি, একটান তামাকও টানিনি, আর অদ্যাবধি নিজের স্ত্রী ছাড়া অপর কোনো স্ত্রীলোককে স্পর্শ করিনি। আমি পর পর তিনটি বিবাহ করি, তিনটিই গত হয়েছে।

আমার প্রথম বিবাহ নাবালক অবস্থাতেই হয়, একটি সমান ঘরের জমীদারের মেয়ের সঙ্গে। সে স্ত্রীটি ছিল—যেমন বড় জমীদারের মেয়ে হয়ে থাকে। তার ছিল কুল, শীল, ভদ্রতা; ছিল না শুধু রূপ আর বুদ্ধি। ছেলেবেলা থেকে দুধ খেয়ে খেয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একটি নীলগাই। কিন্তু সে গাই কখনো বিয়োয় নি, এই যা রক্ষে।

দ্বিতীয়টি আমি নিজে দেখে বিয়ে করি। গেরস্তের মেয়ে। সে ছিল যেমন সুন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী—যাকে কথায় বলে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। জমীদারীর কাজকর্ম্ম সব তার হাতে ছেড়ে দিয়ে,

আমি শুধু শীকার করেই বেড়াতুম। অমন মেয়ে বোধ হয় বাঙ্গলাদেশে লাখে একটি পাওয়া যায় না। রূপে তাকে অনেকে হয় ত টেক্কা দিতে পারে, কিন্তু গুণে নয়!

তার মৃত্যুর পর আমি আবার বিয়ে করি—স্ত্রীবিয়োগের এক মাসের মধ্যেই। এই তৃতীয় পক্ষই আমাকে এই বেশ ধরিয়েছে। এর থেকে মনে ভাববেন না যে, সে দেব্যা হয়ে আমার সম্পত্তি ভোগ-দখল করছে, আর আমি রাস্তায় রাস্তায় 'এক সের আটা আওর আধা সের ঘিউ মিলা দে ভগবান' ব'লে সকাল-সন্ধ্যে চীৎকার ক'রে বেড়াচ্ছি। ছেলেবেলায় একটি গান শুনেছিলুম—

মরি হায় হায়, শুনে হাসি পায়,
কাল শশী যাবেন কাশী
ভস্মরাশি মেখে গায়।

শর্ম্মাও কৌপীন-কমণ্ডলু ধারণ ক'রে কাশী যাবার ছেলে নন। আমার তৃতীয় পক্ষ দেশছাড়া হয়েছেন ব'লে আমিও দেশছাড়া হয়েছি। কথাটা একটু হেঁয়ালীর মত শোনাচ্ছে, না?—ব্যাপার কি হয়েছে, আপনাকে বলছি। তা আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, সে আপনার খুসি। I don't care a rap for other people's opinion,

আমাদের বাড়ীর ভিতরের বাগানে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে—মেয়েদের স্নানের জন্য। আমার তৃতীয়া স্ত্রী বিবাহের মাসকয়েক পরে একদিন সন্ধ্যে-বেলা সেখানে গা ধুতে যান ও সেই পুকুরে ডুবে মারা যান। আমি অবশ্য তখন বাড়ী ছিলুম না, আসামে খেদা করতে গিয়েছিলুম। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর খবর আমার কাছে পৌছতে প্রায় সাত দিন লাগে, আর আমি বাড়ী ফিরে এসে দেখি যে, আমার স্ত্রী চ'লে গিয়েছেন—তবে লোকান্তরে কি দেশান্তরে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে পারলুম না। এ সন্দেহের কারণ বলছি।

সে ছিল নিতান্ত গরীবের মেয়ে, কিন্তু অপরূপ সুন্দরী। স্বর্গের অপ্সরা ভুলে মর্ত্ত্যে এসে পড়েছিল। পয়সার অভাবে বাপ বহুকাল মেয়েটির বিয়ে দিতে পারেনি। আমি যখন এ বিবাহের প্রস্তাব করি, তখন তার বয়েস আঠারো। তার বাপ প্রথমে এ প্রস্তাবে সম্মত হয়নি শুনে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। ঘুঁটে-কুড়ুনীর মেয়ে রাজরাণী হবে, এতেও আপত্তি! এরকম মুখছোপ খাওয়া আমার বংশের অভ্যাস নেই। আমি সেই হতভাগা ব্রাহ্মণকে ব'লে পাঠালুম যে, যদি সে তার মেয়েকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিতে রাজি না হয় ত মেয়েটিকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে আসব, আর তার ঘর দোর হাতী দিয়ে ভাঙ্গিয়ে জলে ফেলে দেব। তখন সে ভয়ে মেয়ে তুলে নিয়ে এসে আমার হাতে কন্যাসম্প্রদান করলে। দুদিন না যেতেই কানাঘুষোয় শুনলুম যে, এ বিবাহে বাপের কোনো আপত্তি ছিল না—আপত্তি ছিল মেয়ের। আমারই এক ছোকরা আমলার সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, এবং তাকে ছাড়া আর কাউকেও বিবাহ করবে না, এই পণ সে ধ'রে বসেছিল। ছোকরাটি ছিল তার গাঁয়ের লোক, দেখতে সুপুরুষ, আর গাইতে বাজাতে ওস্তাদ। উপরন্তু তাকে সচ্চরিত্র ব'লে জানতুম। বলা বাহুল্য, এ গুজব শোনবামাত্র আমি ছোকরাটিকে আমার বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিলুম। তার কিছুদিন পরেই আমার স্ত্রী জলে ডুবে মারা গেলেন। সুতরাং আমার মনে এ সন্দেহ রয়েই গেল যে, সে মরে নি,—পালিয়েছে। সে যে কি প্রকৃতির মেয়ে ছিল, তা আমি বলতে পারিনে, কারণ, বিবাহের পর তার সঙ্গে আমার ভাল ক'রে আলাপ-পরিচয় হয় নি। সে ছিল বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তাই তাকে ছুঁতে ভয় করতুম। বিদ্যুৎকে পোষ মানাবার বিদ্যে আমি জানতুম না। বহুমূল্য রত্ন বাক্সেই বন্ধ ছিল, হঠাৎ এক দিন [illegible]ন হ'ল। এই ঘটনা ঘটবার পর থেকেই আমার মন একেবারে বিগড়ে গেল। ওঃ, কি রূপ তার! তবে তার বিয়োগে যত না হ'ল দুঃখ, তার চাইতে বেশি হ'ল রাগ। সে বোঝেনি যে, স্বর্গের অপ্সরাও মর্ত্ত্যে এসে কেউটের লেজে পা দিতে পারে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"সংসারে বীতরাগ হয়েই বুঝি আপনি কাষায়-বসন ধারণ করেছেন?"

তিনি উত্তর করিলেন :—

সংসারে বীতরাগ হয়েছি ব'লে আত্মহত্যা করবার ত কোন কারণ নেই। পৃথিবীতে দেদার বাঘ-ভালুক গুলী খাবার আশায় ব'সে রয়েছে, তাদের বঞ্চিত ক'রে নিজে গুলী খেয়ে বসব কেন? তা ছাড়া, আমার তৃতীয় পক্ষ গত হবার পর ত আমি অনায়াসে চতুর্থ পক্ষ করতে পারতুম। আমার আত্মীয়স্বজন দেশময় আমার উপযুক্ত মেয়ের খোঁজ করছিলেন; আমি নিঃসন্তান, আমাদের বংশরক্ষা ত হওয়া চাই। কিন্তু এই সময়ে এমন একটি ঘটনা ঘটল—যাতে ক'রে চতুর্থ পক্ষ আর এ যাত্রা করা হ'ল না।

আমি বাড়ী থেকে কলকাতায় যাচ্ছিলুম।

রাণাঘাট ষ্টেশনে একটি ট্রেণ দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের গাড়ী পাশে এসে লাগতেই সে গাড়ীখানি ছেড়ে দিলে। দেখি, সে গাড়ীর একটি থার্ড ক্লাসের কম্পার্টমেণ্টে আমার সেই গুণধর আমলাটি ব'সে রয়েছে, আর তার পাশে একটি অপূর্ব্বসুন্দরী যুবতী। সে যুবতীটি যে আমার তৃতীয়পক্ষ, তা বুঝতে আমার আর দেরী হ'ল না—যদিও তার মুখটি ভাল ক'রে দেখতে পাইনি। তবে instinct ব'লেও ত একটা জিনিস আছে। সেই দিন থেকে আমি শুধু ট্রেণে ট্রেণে ঘুরে বেড়াই—একদিন না একদিন তাদের ধরবই,এ লুকোচুরি খেলার একদিন সাঙ্গ হবেই। গেরুয়া ধারণের উদ্দেশ্য—যাতে ক'রে তারা আমাকে চিনতে না পারে। আর সঙ্গে যে এই বন্দুক নিয়ে বেড়াই, তার কারণ জানেন? এবার যেদিন ও দুজনের সাক্ষাৎ পাব, সেদিন এর দুটি গুলী দুজনের বুকের ভিতর ব'সে যাবে। আমার স্ত্রী হরণ ক'রে নিয়ে যাবে, আর অক্ষতশরীরে হেসে-খেলে বেড়াবে, এমন লোক এ দুনিয়ায় আজও জন্মায় নি। —তার পর—অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ—তার ক্রোড়ে আশ্রয় নেব।

এই কথা বলতে না বলতে ট্রেণ দেওঘর ষ্টেশনে এসে পৌছল। পাশ দিয়ে একখানি ট্রেণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেল। সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বল্লেন, "এই যে, এই ট্রেণে তারা যাচ্ছে।" এই ব'লেই তিনি বন্দুক হাতে ক'রে তড়াক্ ক'রে প্লাটফর্মে লাফিয়ে পড়লেন। তার পর বন্দুকের ঘোড়া দুটি টানলেন। দুবার শুধু ক্লিক্ ক্লিক্ আওয়াজ হ'ল। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, তার ভিতর টোটা নেই। তখন তিনি আল্-খাল্লার বুকের পকেট থেকে দুটি টোটা বার ক'রে বন্দুকে পুরলেন,—ইতিমধ্যে সে ট্রেণখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমাদের গাড়ীও ছেড়ে দিলে। সিতিকণ্ঠ বন্দুক হাতে দেওঘরের ষ্টেশনের প্লাট্ফরমেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

তার পর সিতিকণ্ঠকে জীবনে আর কখনো দেখিনি, নিজের গাড়ীতেও নয়, পাশের গাড়ীতেও নয়। আমি শুধু ভাবি, সিতিকণ্ঠ সিংহঠাকুর এখন কোথায়? হিমালয়ে না বিলেতে, জেলে না পাগলা-গারদে?

আশ্বিন, ১৩৩৬

ভাব্‌বার কথা

(গল্প)

(কথারম্ভ)

শ্রীকণ্ঠ বাবু সে দিন তাঁর বৈঠখানায় একা ব'সে গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে তাঁর বহুকালের অন্তরঙ্গ বন্ধু আনন্দগোপাল বাবু হঠাৎ সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীকণ্ঠ বাবু ঘরের ভিতর জুতোর শব্দ শুনে চম্‌কে উঠে সুমুখে আনন্দগোপাল বাবুকে দেখে হাসিমুখে তাঁকে সম্বোধন ক'রে বললেন—

—কে আনন্দগোপাল? এ কলকেতায় কবে এলে? আমি ভেবেছিলুম কে না কে। এস, বসো—খবর কি?

—ভাল। তোমার খবর কি?

—ভাল।

—আমি ভেবেছিলুম, তেমন ভাল নয়।

—কিসের জন্য?

—তোমার মুখ দেখে। গালে হাত দিয়ে কি ভাব্‌ছিলে?

—কিছুই ভাব্‌ছিলুম না—সুধ্ অবাক্ হয়ে বসেছিলুম।

—কিসে অবাক্ হ'লে?

—আমার ছেলেটার কথাবার্ত্তা শুনে, তার ভবিষ্যৎ ভেবে।

—কোন ছেলেটির?

—যে ছেলেটা এবার B.L. পাশ করেছে।

—সে ত তোমার রত্ন ছেলে। দেহ-মনে ঠিক ফুলের মত ফুটে উঠেছে। মনে আছে আমরা যখন কলেজে পড়তুম, তখন একটা ল্যাটিন বুলি শিখি Mens sana in Corporo sano। সেকালে আমাদের ধারণা ছিল, একাধারে অন্তত এ দেশে ও-দুই গুণের সাক্ষাৎ পাওয়া অসম্ভব। কলেজে তোমার ছিল Mens sana আর আমার Corporo sano—তাই ত আমাদের দুজনের এত বন্ধুত্ব হ'ল। তখন মনে হ'ত, আমার দেহে যদি তোমার মন থাকৃত, তা হ'লে পৃথিবীর কোন নায়িকাই আমাকে দেখে স্থির থাক্‌তে পারৃত না। এমন কি, স্বয়ং ক্লিওপেট্রাও যদি আমাকে রাস্তায় দেখতে পেত, তা হ'লে সেও তার প্রাসাদশিখর থেকে নক্ষত্রের মত খ'সে এসে আমার বুকে সংলগ্ন হয়ে Star of India-র মত জল-জ্বল করৃত। কিন্তু আমার সেই যৌবন-স্বপ্ন সাকার হয়েছে তোমার মধ্যম কুমার প্রফুল্লপ্রসূনে। তুমি যা সৃষ্টি করেছ, তা একখানি মহাকাব্য, তোমার এ কুমার—নব কুমার-সম্ভব। আমি মনে করতুম, এ যুগে ও-রকম সৃষ্টি অসম্ভব।

—দেখো আনন্দ, তোমার এ সব রসিকতা আজ ভাল লাগছে না!

—আমি যে সব কথা বল্‌ছি, তার ভাষা ঈষৎ রসিকতা ঘেঁসা হলেও, আসলে সত্য কথা। প্রফুল্ল যে, এক পদাঘাতে বিলিতি চামড়ার ফুটবল বিলিতি সাহেবদের মাথার উপর দিয়ে পাখীর মত উড়িয়ে দেয়, এ কথা কে না জানে? তার পর ইউনিভার-সিটির ভিতর যতগুলি বেড়া আছে, সবগুলোই সে টপ্ টপ্ ক'রে ডিঙ্গিয়ে গেল। এগ্‌জামি-নেসনের এতাদৃশ hurdle jump বাঙলার ক'টি ফুটবল-খেলিয়ে করতে পারে? শুধু তাই নয়, সে কবিতাও লেখে চমৎকার। সেদিন কল্লোল, কি কালিকলম, কি বেণু, কি বীণা, এইরকম একটা কাগজে প্রফুল্লর লেখা "আকাঙ্ক্ষা-প্রসূন" ব'লে একটি কবিতা পড়লুম।

—তুমি ও-সব ছাইপাঁশও পড়ো নাকি?

—পড়তে বাধ্য হই। থাকি পাড়াগাঁয়ে,—করি জমীদারী, হাতে কাজ নেই, আছে সময়। সেই সময় কাটাবার জন্য ছেলেরা যত বই কেনে, কিন্তু পড়ে না, সে সবই আমি পড়ি; নচেৎ টাকাগুলো যে মাঠে মারা যায়। দেখ, এই সূত্রে আমি একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। এ যুগে ইংরাজীতে যারা বই লেখে, তারা একজনও ইংরেজ নয়; সব নরওয়ে, সুইডেন, ফিন্‌ল্যাণ্ড ও আইস্‌ল্যাণ্ডের লোক, আর সবাই জাতে বদ্যি, তাদের সবারই উপাধি সেন। যথা—ইবসেন, হামসেন, বিয়র্‌সেন ইত্যাদি। সে যাই হোক্, তোমার ছেলের সে কবিতা প'ড়ে আমারও মনে আকাঙ্ক্ষার ফুল

ফুটে উঠ্‌ল। এ ফুলের স্পষ্ট কোনও রূপ নেই, আছে শুধু বর্ণ আর গন্ধ। আর সে গন্ধ এম্‌নি নতুন যে, তা বুকের নাকে ঢুক্‌লে নেশা হয়। সে গন্ধ Choloroform-এর দাদা। ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসির ছড়ার চাইতে তা নিদ্রাকর্ষক। ও কবিতা দু-চার ছত্র পড়্‌তে না পড়্‌তে যে ঘুমিয়ে না পড়ে, সে মানুষ নয়, দেবতা। আর "সবুজ পত্রে" প্রফুল্লর লেখা একটা ছোট গল্পও পড়েছি। এ গল্প আগাগোড়া আর্ট। সে ত গল্প নয়, নায়ক-নায়িকার হৃৎপিণ্ড নিয়ে অপূর্ব্ব ping-pong খেলা। সে হৃৎপিণ্ড ছুটি এক মুহূর্ত্তের জন্যও পৃথিবী স্পর্শ করে নি, বরাবর শূন্যেই ঝুলে ছিল—সূর্য্য-চন্দ্র যেমন আকাশে ঝুলে থাকে, পরস্পরের প্রেমের টানে। শেষটা এ প্রেমের খেলার ফল হ'ল draw।

—দেখো আনন্দ, তোমার বয়েস হয়েছে, কিন্তু বাজে বক্‌বার অভ্যেস আজও গেল না। বরং তোমার যত বয়েস বাড়্‌ছে, তত বেশী বাচাল হচ্ছ।

—তোমার ছেলের প্রশংসা শুনলে তুমি খুসী হবে মনে করেই এত কথা বল্‌লুম। কোন বাপ যে ছেলের গুণ-গান শুনে এলে যেতে পারে, এ জ্ঞান আমার ছিল না। আমার ছেলে যখন হারমোনিয়মে প্যাঁ পোঁ সুরু করে, তখন যদি কেউ বলে "কেয়া মীড়", তা হ'লে ত আমি হাতে স্বর্গ পাই, এই ভেবে যে, আমি তানসেনের বাবা।

—তুমি যাকে প্রশংসা বলছ, তার বাঙলা নাম হচ্ছে ঠাট্টা। আর এ ঠাট্টার মানে হচ্ছে, প্রফুল্ল যে কি চিজ হয়েছে, তা আমি বুঝি আর না বুঝি, তুমি ঠিক বুঝেছ। তোমার এ সব রসিকতা আমার গায়ে বেশী ক'রে বিঁধ্‌ছে এই জন্যে যে, আমি সত্যিই ভেবে পাচ্ছিনে যে, প্রফুল্ল fool না genius!

—এ বড় কঠিন সমস্যা। Genius-এর সঙ্গে fool-এর একটা মস্ত মিল আছে; উভয়েই born not made। এ উভয়ের প্রভেদ ধরা বড় শক্ত। তাই সাহিত্য-সমালোচকেরা নিত্য genius-কে fool ব'লে ভুল করে, আর foolকে genius ব'লে।

—Genius-এর সঙ্গে insanity-র সম্বন্ধ কি, সে মহা সমস্যা নিয়ে মাথা বকাচ্ছিলুম না।

—তবে কিসের ভাবনা ভাবছিলে? দেখো, লোকে যাকে বলে ভাবনা, সেটা হচ্ছে আসলে ভাষার অভাব। Freud প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে, repressed speech থেকেই মানুষের মনে যে রোগ জন্মায়, তারি নাম চিন্তা। মন খুলে সব কথা ব'লে ফেল—তা হ'লেই ভাবনার হাত থেকে অব্যাহতি পাবে।

—আমি ভাবছিলুম, আমার পুত্ররত্ন যা বল্লেন, তা শুধু তাঁরই মুখের কথা, না এ যুগের যুবকমাত্রেরই মনের কথা?

—প্রফুল্ল কি বল্‌লে শোনা যাক্; তা হ'লেই বুঝ্‌তে পার্‌ব, তা Vox dei, কি Vox populi।

—ব্যাপার কি হয়েছে বল্‌ছি, শোনো। আজ সকালে গীতা পড়ছিলুম; একটা জায়গায় খট্‌কা লাগল, তাই প্রফুল্লকে ডেকে পাঠালুম, শ্লোকটার ঠিক মানে বুঝিয়ে দিতে।

—গীতার অনেক কথায় মনে খট্‌কা লাগে, কিন্তু সে সব কথার তত্ত্ব অপরের মুখে শুনে বোঝবার জো নেই; অপরের কাজ দেখে হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে হয়। যেমন আমি গীতার একটা বচনের হদিস পেয়েছি রায় ধর্ম্মদাস ঘোষ বাহাদুরের জীবন পর্য্যালোচনা ক'রে।

—ও ভদ্রলোকটি কে?

—তিনি, যিনি পাটের ভিতর-বাজারে ফট্‌কা খেলে ধনকুবের হয়েছেন।

তিনি কি একজন গীতাপন্থী।

—যা বলছি, তা শুনলেই বুঝতে পার্‌বে।

"কর্ম্মণ্যেব অধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এ বচনটা আমার বরাবরই রসিকতা ব'লে মনে হ'ত। কুলিগিরি কর্‌ব, কিন্তু মজুরি পাব না, আমাদের ইংরাজী-শিক্ষিত মন এ কথায় সায় দেয় না। বরং আমরা চাই, মজুরি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেব, কিন্তু বস্‌তে পেলে দাঁড়াব না, শুতে পেলে বস্‌ব না। কিন্তু ঘোষ বাহাদুর এই হিসেবে চলেছেন যে, অহর্নিশি দৌড়াদৌড়ি ক'রে পয়সা কামাব অথচ তার এক পয়সাও খরচ কর্‌ব না। অর্থাৎ টাকা কর্‌বার তাঁর অধিকার আছে—মা ফলেষু কদাচন।

—তোমার রসিকতা দেখ্‌ছি আজ বে-পরোয়া হয়ে উঠেছে।

—রসিকতা আমি করছি না তুমি করছ? তুমি ফিলজফিতে M. A. আর প্রফুল্ল Botanyতে। গীতা তুমি বুঝতে পারো না, আর প্রফুল্ল শুধু বুঝবে না—উপরন্তু বোঝাবে। লোকে যে বলে—"মোগল পাঠান হেরে গেল ফার্সি পড়ে তাঁতি"—সে কথাটা রসিকতা, না আর কিছু?

—দেখো, আমরা যে কালে কলেজে পড়তুম,

সে-কালে গীতার রেয়াজ ছিল না। আমরা বিলেতি দর্শন পড়েই মানুষ হয়েছি, তাই গীতার অনেক কথায় খট্‌কা লাগে।—আর গীতা আজকাল সবাই পড়ছে; সাহেবরা পড়ছে, বাঙালী সাহেবরা পড়ছে, মেয়েরা পড়ছে, মাড়োয়ারীরা পড়ছে। ও দর্শন এখন হাওয়ায় ভাসছে। এর থেকে অনুমান করেছিলুম যে, আমার ছেলে ও দর্শনের ভিতর আমার চাইতে বেশী প্রবেশ করেছে—বিশেষত সে যখন গীতার বিষয় মিটিংয়ে বক্তৃতা করে।

—কি বল্‌লে! প্রফুল্ল বাবাজি কি আবার ধর্ম্মপ্রচার সুরু করেছে না কি? আমি ত জানি, সে M. A. B. L, তার উপর সে sportsman, কবি, গল্পলেখক, পলিটিসিয়ান। উপরন্তু সে যে আবার বুদ্ধদেব ও যীশুখৃষ্টের ব্যবসা ধরেছে, তা ত জানতুম না। আজকালকার ছেলেরা কি চৌকোস আর তাদের কি wide Culture! এরা প্রতিজনে একাধারে খেলায় ইংরেজ, পড়ায় জর্ম্মান, বুদ্ধিতে ফরাসী, প্রেমে ইটালিয়ান, পলিটিক্‌সে রাসিয়ান। ইংরেজরা আমাদের স্বরাজ দিলে, তা নেবে কে?—এই ভাবনায় আমার রাত্রিতে ঘুম হ'ত না। এখন সে দুশ্চিন্তা গেল। আজ থেকে ঘুমিয়ে বাঁচব।

(কথা মধ্য)

—দেখ, স্বরাজ আমার নিদ্রার ব্যাঘাত করে না, বরং আমি ঘুমিয়ে পড়লেই স্বরাজ আমার কাছে আসে, অর্থাৎ স্বরাজের আমি স্বপ্ন দেখি। কিন্তু প্রফুল্লর কথা ভেবে বোধ হয় আমার insomnia হবে। সে তোমার চাইতেও অদ্ভুত কথা বলে।

—এটা অবশ্য ভয়ের কথা।

—তুমি বলো অদ্ভুত বাজে কথা, প্রফুল্ল বলে অদ্ভুত কাজের কথা।

—তার কথা তবে শোন্‌বার মতন।

—তুমি ত কারও কথা শুন্‌বে না, শুধু নিজে বক্‌বে।

—তুমি তোমাদের পরস্পরের কথোপকথন রিপোর্ট করো, আমি ত নীরবে শুনে যাব; যেমন নীরবে আমি খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ি।

—আমি যখন তাকে শ্লোকটার অর্থ আমাকে বুঝিয়ে দিতে বল্‌লেম, তখন সে অম্লানবদনে বল্‌লে, "আমি গীতার এক বর্ণও পড়িনি।" আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তা হ'লে তুমি সেদিন মিটিংয়ে গীতা সম্বন্ধে অমন চমৎকার বক্তৃতা করলে কি ক'রে—যার রিপোর্ট আমি কাগজে পড়লুম?" প্রফুল্ল উত্তর কর্‌লে—"গীতার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি আছে ব'লে?" "যার বিন্দুবিসর্গ জান না, তার উপর তোমার অগাধ ভক্তি?" সে উত্তর কর্‌লে "ভক্তি জিনিসটা অজানার প্রতিই হয়।"

—কি রকম?

—আপনি দেশের যত লোককে বড় লোক ব'লে ভক্তি করেন, আপনি কি তাঁদের সবাইকে জানেন? আমি জানি, আপনি তাঁদের কখনও চোখে দেখেন নি।

—হাঁ, তা ঠিক—কিন্তু আমি তাঁদের বিষয় খবরের কাগজে পড়েছি, লোকের মুখে শুনেছি।

—আমিও গীতার বিষয় কাগজে পড়েছি ও লোকের মুখে শুনেছি।

—তা হ'লে তোমার বক্তৃতা শুনে ও কাগজে তার রিপোর্ট প'ড়ে আর পাঁচ-জন অজ্ঞ লোকের গীতার উপরে ভক্তি বাড়বে?

—অবশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই ত বক্তৃতা করা।

—লোকের মনে ভক্তির এ রকম মূলহীন ফুল ফোটাবার সার্থকতা কি?

—ও হচ্ছে nation-building-এর একটি পরীক্ষোত্তীর্ণ উপায়।

—কি হিসেবে?

General Bernhardi বলেছেন যে, জর্ম্মানীর গত যুদ্ধের মূলে ছিল জর্ম্মান ন্যাসনালাজিম, আর সে ন্যাসনালাজিমের মূলে আছে Kant আর Goethe। আপনি কি বলতে চান Kant ও Goethe-র লেখার সঙ্গে বার্‌নহার্ডির বিশেষ পরিচয় ছিল?

—না। তিনি যখন বলেছেন যে, গত যুদ্ধের জন্য দায়ী Kant এবং Goethe, তখন যে তাঁর ও দুটি ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনরূপ পরিচয় নেই, তা নিঃসন্দেহ।

—তা হ'লেও তিনি Kant-এর দর্শনের ও Goethe র কবিতার সার মর্ম্ম বুঝেছিলেন। Kant-এর সার কথা হচ্ছে [illegible] m, আর গেটেরও তাই—গীতারও তাই।

—মানছি যে agnosticism-ই হচ্ছে nation-building-এর ভিৎ। কিন্তু গীতার ধর্ম্ম যে agnosticism, এ কথা তোমাকে কে বলে?

—এ যুগে যারা গীতা গুলে খেয়েছে, সেই সব expert-রা এ বিষয়ে একমত যে, গীতার প্রথম

অংশে আছে utilitarianism, আর শেষ অংশে agnosticism, আর তার মধ্যভাগ প্রক্ষিপ্ত।

—তোমার expert বন্ধুরা যে গীতা গুলে খেয়েছেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে একাধারে Mill এবং Spencer, এ একটা নূতন আবিষ্কার বটে। তোমার expert গুরুরা আর একটি সত্য আবিষ্কার করতে ভুলে গিয়েছেন, সেটি হচ্ছে যাঁর নাম বুদ্ধদেব, তাঁর নামই Bertrand Russell। যাক্ ও সব কথা। এখন দেখ্ছি তোমাদের কালিদাসকেও প্রচার করতে হবে।

—অবশ্য। আমি আস্‌ছে হপ্তায় কালিদাস সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করব।

—কোথায়?

—Youngman's Hindu Association-এ।

—অনুমান কর্‌ছি, গীতার সঙ্গে তোমার পরিচয় যদ্রূপ, শকুন্তলার সঙ্গেও তোমার পরিচয় তদ্রূপ।

—আগেই ত বলেছি যে, সংস্কৃত-সাহিত্য আমরা জানিনে বলেই তার প্রতি আমাদের ভক্তি আছে, জান্‌লে তার প্রতি আমাদের অভক্তি হ'ত।

—নিশ্চয়ই তাই হ'ত। কারণ, তখন বুঝ্‌তে পারতে যে, Mill ও Spencer শ্রীকৃষ্ণের অবতার নন—ন চ পূর্ণ ন চাংশক, এবং Kipling কালিদাসের প্রপৌত্র নন। এখন আমি জানতে চাই যে, পূর্ব্বপুরুষের নামের দোহাই দিয়ে নতুন নেশান্ আর কি ক'রে গড়্‌বে; ও উপায়ে পুরোনোই আর টিঁকিয়ে রাখা দুষ্কর।

—অর্থাৎ আমাদের নূতন সাহিত্য গড়্‌তে হবে। এ জ্ঞান আমাদের সম্পূর্ণ আছে। আমরা নূতন সাহিত্যই গড়্‌ছি।

—কি সাহিত্য তোমরা গড়্‌ছ?

—কাব্য-সাহিত্য।

—বুঝেছি, তোমরা আগে নব Goethe হয়ে পরে নব Kant হবে। পারম্পর্য্যের ধারাই এই, আগে কালিদাস, পরে শঙ্কর। তবে আমার ভয় হয় এই যে, জ্ঞানের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে বড় কবি কি হ'তে পারবে?

—দেখ, জ্ঞান মানে ত যা অতীতে হয়ে গিয়েছে, তারই জ্ঞান। অতীতের দিকে পিঠ না ফেরালে আমরা ভবিষ্যৎ গড়্‌তে পারব না।

—আচ্ছা, ধ'রে নেওয়া যাক্ যে, কাব্যের সঙ্গে সরস্বতীর মুখ দেখাদেখি নেই, কিন্তু তোমরা ত পলিটিক্‌স জিনিসটাকে ঠেলে তুল্‌তে চাও। আর তুমি কি বল্‌তে চাও যে, জ্ঞানশূন্য না হ'লে পলিটিসিয়ান হওয়া যায় না?

—কোন্ জ্ঞান পলিটিক্‌সের কাজে লাগে?

—কিঞ্চিৎ হিষ্টরির আর কিঞ্চিৎ ইকনমিক্‌সের, অর্থাৎ ইংরেজরা যাকে বলে Facts-এর।

—আমরা যখন নতুন হিষ্টরি ও নতুন ইকনমিক্‌স গড়্‌তে চাচ্ছি, তখন পুরোনো হিষ্টরি ও পুরোনো ইকনমিক্‌সের জ্ঞান আমাদের উন্নতির পথে শুধু বাধাস্বরূপ। আর Facts-এর জ্ঞান যে Idealism-এর প্রধান শত্রু, তা' ত আপনি মানেন? আমরা এ ক্ষেত্রে কর্‌তে চাই শুধু Idealism-এর চর্চ্চা—

—Idealism জিনিসটে যে মস্ত জিনিস, তা আমিও স্বীকার করি, কিন্তু শুধু ততক্ষণ—যতক্ষণ তা কথামাত্র থাকে। তবে কাজে খাটাতে গেলেই তার মানে ধরা পড়ে।

—আচ্ছা, একটা কাজের কথাই বলা যাক্। রামকে কাউন্‌সিলে পাঠাতে হবে কিম্বা শ্যামকে, হিষ্টরির জ্ঞান তার কি সাহায্য করবে? যার মনে Idealism আছে সেই শুধু রামের বদলে শ্যামের জন্য খাটতে প্রস্তুত।

—এই ভোট যোগাড় করার ব্যাপারটার নাম Idealism?

—অবশ্য। এ কাজ কর্‌বার জন্য আহার-নিদ্রা বাদ দিয়ে দৌড়াদৌড়ি ক'রে শরীর ভাঙ্‌তে হয়, Vote for শ্যাম ব'লে চীৎকার ক'রে গলা ভাঙ্‌তে হয়। আর যে কাজ কর্‌বার জন্য চাই মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন, তারই নাম ত Idealism।

—ধর্ম্ম, কাব্য, পলিটিক্‌স্ সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান যে সমান, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমার আইনের জ্ঞানও কি সমান?

—আপনি কি জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন, বুঝ্‌তে পারছি না!

—আমি জান্‌তে চাই, আইন কিছু জানো—কি জানো না?

—আইনের কতকগুলো কথা জানি, তার বেশী কিছু জানি নে।

—তবে B. L. পাশ কর্‌লে কি ক'রে?

—নোট মুখস্থ ক'রে বই পড়্‌লে ফেল হতুম।

—আইন কিছু না জেনে university-র পরীক্ষা ত পাশ কর্‌লে, কিন্তু ঐ বিদ্যে নিয়ে আদালতের পরীক্ষা পাশ করবে কি ক'রে?

—আদালতে পরীক্ষা করবে কে ?

—জজ সাহেবরা।

—আপনি বল্‌তে চান, যারা জজ হয়, তারা নবাই আইন জানে ? একালে যার পেটে বিদ্যে আছে, সে ত আর জজ হ'তে পারে না। সুতরাং একেলে জজের কাছে প্র্যাকটিস্ করতে বিদ্যের দরকার নেই। পলিটিক্‌স্ ঠিক থাক্‌লেই প্র্যাকটিস্ ঠিক হবে।

—কি রকম ?

—জজিয়তি লাভ কর্‌বার জন্য চাই নরম পলিটি-ক্‌স্, আর প্র্যাকটিস কর্‌বার জন্য গরম।

—আর, যার পলিটিক্‌স্ নরমও নয়, গরমও নয়, তার কি হবে ?

—তার ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ।

(কথা শেষ)

শ্রীকণ্ঠ বাবু অতঃপর বল্‌লেন যে, এই সব সদালাপের পর আমি প্রফুল্লকে বল্‌লুম "এখন এসো"। এ কথা শুনে আনন্দগোপাল হেসে বল্‌লেন, তার পরেই বুঝি তুমি দমে গেলে ? আমি হ'লে ত উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তুম।

—কেন ?

—তোমার ছেলে genius।

—কিসে বুঝলে··· ?

—তার মতামত শুনে।

—এ-সব মতামতের ভিতর কি পেলে ?

—প্রথমত নূতনত্ব, দ্বিতীয়ত বিশ্বাস।

—বিশ্বাস ? কিসের উপর ?

—নিজের উপর।

—নিজের উপর অগাধ এবং অটল বিশ্বাস ত প্রতি Fool-এরই আছে।

—কিন্তু সে বিশ্বাস শুধু একের এবং সে এক হচ্ছে স্বয়ং Fool ; কিন্তু যার আত্মবিশ্বাসের নীচে জনগণ ঢেরা সই দেয়, সেই ত Super-man।

—তবে তুমি ভাবো যে প্রফুল্লর মতামত শুধু একা তার নয়, যুবকমাত্রেরই।

—বহুর মনে যা অস্পষ্টভাবে থাকে, তাই যার মনে স্পষ্ট আকার ধারণ করে, সেই ত যুগধর্ম্মের অবতার। জ্ঞান ভক্তির বিরোধী, এ ত পুরোনো কথা। আর, তা যে কর্ম্মেরও প্রতিবন্ধক, এই হচ্ছে নবযুগবাণী। এ বাণীর জোর প্রচারক হবে তোমার মধ্যম-কুমার।

শ্রাবণ, ১৩৩৭।

—কি কর্ম্ম এরা কর্‌তে চায় ?

—একসঙ্গে সরস্বতী ও ইলেক্‌সানের বেগার খাট্‌তে।

—তাতে দেশের কি লাভ ?

—কোনও লোকসান নেই।

—মূর্খতার চর্চ্চায় কোনও লোকসান নেই ?

—যেমন তোমার আমার মত পাণ্ডিত্যের চর্চ্চায় দেশের কোন উপকার হয়নি, এদের তার অ-চর্চ্চায় কোন অপকার হবে না।

—তা হ'লে দেশের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত ?

—দেখো, তোমার আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনও কথা বল্‌বার অধিকার নেই। তুমি আমি যথাসাধ্য যথাশক্তি জ্ঞানের চর্চ্চা করেছি, অর্থাৎ বই পড়েছি। আর প্রফুল্ল ত বলেই দিয়েছে যে, জ্ঞান মানে হচ্ছে অতীতের জ্ঞান। অতএব আমাদের মুখে শোভা পায় শুধু অতীতের কথা।

—তুমি দেখছি, প্রফুল্লর একজন শিষ্য হয়ে উঠলে।

—তার কারণ, আমি modern.

—এর অর্থ ?

—আমি অতীতেরও ধার ধারি নে, ভবিষ্যতেরও তোয়াক্কা রাখি নে। মনোজগতে দিন আনি দিন খাই—অর্থাৎ যা পাই পেটে পূরি ; আমার পেটে সব যায়,—প্রফুল্লরও কথা, গীতারও কথা।

—তুমি দেখছি একজন মুক্ত পুরুষ। শাস্ত্রে বলে, যে ব্যক্তি পরলোকে স্বর্গ চায় না, সেই মুক্ত। তুমি দেখছি ইহলোকেও স্বর্গরাজ্য চাও না। অতএব পুরো মুক্ত।

—দেখ শ্রীকণ্ঠ, ভবিষ্যতের আলোচনা করতে করতে কলকেটা নিজের ধোঁয়া নিজে ফুঁকেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হ'ল। অতএব ভবিষ্যতের কথা এখন মুলতবি থাক্। বর্ত্তমানে আর এক ছিলেম তামাক ডাক।

এ কথা শুনে শ্রীকণ্ঠ বাবু ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চাক-রকে শীগ্‌গির তামাক দিতে বল্‌লেন। চাকরও ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে শিগ্‌গির কল্‌কে বদলাতে গিয়ে সেটা উল্টে ফেললে, অমনি ফরাসে আগুন ধ'রে গেল। ধুম যে না-বলা-কওয়া অগ্নিতে পরিণত হবে' এ কথা কেউ ভাবে নি। তাই দুই বন্ধুতে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে গাত্রোত্থান কর্‌লেন আর তাঁদের আলোচনা বন্ধ হ'ল।

দু-ইয়ারকি

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত

ভূমিকা

আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সাময়িক প্রসঙ্গ, এ প্রবন্ধ ক'টি তাই নিয়ে লেখা। সুতরাং প্রবন্ধ ক'টির ভিতর স্পষ্টত বিশেষ কোনও যোগাযোগ নেই। তবুও এ ক'টি একত্র ক'রে ছাপাবার কারণ, সব ক'টির ভিতর একটি আন্তরিক মিল আছে।

গত চার বৎসরের ভিতর এ দেশে যে সব রাজনৈতিক সমস্যা উঠেছে, সেগুলির মর্ম্ম আমি একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করেছি; কাজেই যে-দেশে মানুষের বর্ত্তমান রাজনৈতিক মনোভাবের জন্ম, সে-দেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় নিতে আমি বাধ্য হয়েছি। আমার বিশ্বাস সাময়িক ব্যাপারকে কেবলমাত্র সাময়িকভাবে দেখলে তার স্বরূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। অনেক জিনিস যা আমরা মনে করি, অতি নূতন, কখনো কখনো দেখা যায় যে, তা অতি পুরাতন। মতামতেরও একটা ইতিহাস আছে, মানুষের মনোভাবও আচম্বিতে জন্মায় না এবং সে ইতিহাসের জ্ঞানলাভ করলে আমাদের মতামত ভেঙ্গে পড়ে না, বরং তার ভিত আরও পাকা হয়। কারণ, ভবিষ্যতের দূরদৃষ্টি অতীতের দূরদৃষ্টির উপর নির্ভর করে। তা ছাড়া যে রাজনীতিকে আমরা স্বদেশী বলি, মূলে তা ষোল আনা বিদেশী। সুতরাং বিলেতি রাজনীতির মতিগতির সন্ধান নিতে হ'লে বিলেতি ইতিহাস ও বিলেতি সাহিত্যের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

এ প্রবন্ধ ক'টি যতদূর পারি সহজ ক'রে সরল ক'রে লেখবার অভিপ্রায় আমার ছিল, কিন্তু ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, শিক্ষিত-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের নিকট এ প্রবন্ধগুলি সহজবোধ্য হবে না। আমার লেখা যে সর্ব্বজনবোধ্য হয়নি, তার জন্য যতটা দোষী আমি, তার চাইতে বেশি দোষী আলোচ্য বিষয়।

'রায়তের কথা' যে কেন লিখি, তার কৈফিয়ৎ এই,—রিফরম Act-এর প্রসাদে এদেশের শাসন-যন্ত্রের গঠনের যে পরিবর্ত্তন হ'ল, তা সকলের সমান মনোমত নয়। সুতরাং ও-যন্ত্রটা নিয়ে কি করা যাবে, সে বিষয়ে নানারূপ প্রস্তাব শোনা যাচ্ছে। কেউ বল্‌ছেন, ওটাকে ভেঙ্গে ফেলব, কেউ বলছেন ওটাকে অচল ক'রে ফেলব, কেউ বলছেন, ওটাকে বেদম চালাব—ছোট ছেলেরা কলের খেলানার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে, এই শাসন-যন্ত্রটার প্রতি সেরূপ ব্যবহার করা যে অসম্ভব, এমন কথা আমি বলি নে। তবে আমার বিশ্বাস, ওটিকে ইচ্ছে করলে আমরা একটু-আধটু কাজেও লাগাতে পারি। কি কাজে যে লাগাতে পারি, তার প্রথম দফার বিষয় রায়তের কথায় আলোচনা করেছি। যদি শিক্ষিত-সম্প্রদায় এ যন্ত্রটাকে নিজের চরকা না মনে করেন, তা হ'লে দেখতে পাবেন যে, রায়তের কথা অন্যায়ও নয়, অসাময়িকও নয়। ইতি

২৯ জুলাই, ১৯২০ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

দ্ব-ইয়ারকি

শ্রীমতী……দেবী
করকমলেষু—

আমি কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে' আসছি যে, খবরের কাগজ তুমি নিত্য পড় আর সেই সঙ্গে নিত্য ভ্রূকুঞ্চিত কর। তোমার এহেন অপ্রসন্ন হবার কারণ আমি তোমাকে কখনো জিজ্ঞাসা করিনি, কারণ, জানি যে, কাগজ পড়াটা তুমি একটা দৈনিক কর্ত্তব্যের হিসেবে দেখো। আর দৈনিক কর্ত্তব্যমাত্রেই বিরক্তিকর, যথা—আমাদের আপিসে যাওয়া।

কিন্তু কাল তোমার মুখে শুনলুম যে, তোমার ব্যাজার হবার এদানিক একটু বিশেষ কারণ ঘটেছে।—তুমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছ যে, খবরের কাগজ নিত্য এক কথা লেখে, তাও আবার প্রায় একই ভাষায়; শুধু তাই নয়, কাগজওয়ালাদের যত বকাবকি যত রোখারুখি কিছুদিন ধরে', সব নাকি হচ্ছে একটা কথা নিয়ে এবং সে কথাটা হচ্ছে diarchy; অথচ ও-কথার মানে জানা দূরে থাক্, নামও তুমি ইতিপূর্ব্বে শোন নি, যদিচ ইংরেজী ভাষার সঙ্গে তোমার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। ও-কথার অর্থ যে জান না, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। দুদিন আগে আমরাও কেউ জানতুম না। কথাটা গ্রীক, কিন্তু জন্মেছে ভারতবর্ষে। Monologue-এর সঙ্গে dialogue-এর যা প্রভেদ, মূলত monarchy-র সঙ্গে diarchy-রও সেই প্রভেদ; অর্থাৎ—একের সঙ্গে দুয়ের যে প্রভেদ, সেই প্রভেদ। এখন বুঝলে ত?

তুমি যদি মনে ভাব বুঝেছ, ত ঠকেছ। ঐ diarchy-র মূল অর্থ ভুল অর্থ। সে অর্থের সঙ্গে তার হাল অর্থের সম্পর্ক এক রকম নেই বললেই হয়। অভিধানের ভিতর থেকে ওর মর্ম্ম উদ্ধার করতে পারবে না। ওর অর্থের খোঁজ নিতে হবে একসঙ্গে হিষ্টরি এবং জিওগ্রাফির কাছে। ইউরোপের হিষ্টরি আর ভারতবর্ষের জিওগ্রাফি এই দুয়ের মিলনের ফলে এই diarchy জন্মলাভ করেছে। ঐ কথাটার জন্মবৃত্তান্ত তোমাকে শুনিয়ে দিচ্ছি, তা হ'লে তুমি ওর রূপ ও গুণ, দুয়েরি পরিচয় পাবে।

২

এ দেশে কিছুকাল থেকে একটা পলিটিক্যাল-মামলা উঠেছে, যার নাম হচ্ছে Democracy *vs.* Bureaucracy. এ ক্ষেত্রে বাদী হচ্ছে স্বদেশী শিক্ষিত সম্প্রদায় আর প্রতিবাদী হচ্ছেন বিদেশী শাসক-সম্প্রদায়। উভয় পক্ষের ভিতর অনেক তর্কাতর্কি চটাচটি এমন কি সময়ে সময়ে গুঁতোগুঁতি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে, শেষটা এ মামলার বর্ত্তমানে যেটা সর্ব্বপ্রধান ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারি নাম হচ্ছে diarchy. বিলাতের পার্লেমেণ্ট মহাসভায় এখন এই মামলার শুনোনি হচ্ছে, তাতে দু-পক্ষই কসে' সওয়াল-জবাব করছেন। উভয় পক্ষই যে এক কথা একশ'বার বলছেন, তার কারণ, আমরা যাকে ওকালতি বলি—সে হচ্ছে এক কথা একশ' রকমে বলবার বিদ্যে।

এই মামলাটার আসল হাল বুঝতে হ'লে ইউরোপের ইতিহাসের অন্তত মোটামুটি জ্ঞান থাকাটা আবশ্যক। তাই আমি সে ইতিহাসের সারমর্ম্ম যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তোমাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করব। কিন্তু আগে থাকতে বলে' রাখছি যে, দু'কথায় তা হবে না।

ইউরোপীয়দের মতে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রথম কথাও যা, আর তার শেষ কথাও তাই; সে কথা হচ্ছে democracy,—ও-শব্দ যে গ্রীক্, তার থেকেই অনুমান করা যায় যে, ঐ হচ্ছে ইউরোপের সভ্যতার গোড়ার কথা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে অনুমানের কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা এর প্রমাণ আছে। গ্রীসের ইতিহাস আছে, সেই ইতিহাসেই আমরা দেখতে পাই যে, গ্রীসের শাসনতন্ত্র সাধারণত লোকমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সে শাসনতন্ত্রের নাম হচ্ছে democracy. Demos শব্দের মানে তুমি অবশ্য জানো, কেননা, এ দেশে democracy-র সঙ্গে

আমাদের সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও দু’-চারজন demagogue-এর সঙ্গে ত আছেই। তার পর রোমক সভ্যতাও ঐ democracy-র উপরই দাঁড়িয়েছিল। রোম যেদিন থেকে তার republic খুইয়ে সম্রাটের অধীন হ’ল, সেদিন থেকেই তার অধঃপতনের সূত্রপাত হয়। রোমক-সাম্রাজ্যের ইতিহাস যে তার decline এবং fall-এর ইতিহাস—এ সত্যের সাক্ষাৎ ত আমরা Gibbon-এর বইয়ের মলাটেই পাই।

৩

“ডিমোক্রাসী” ইউরোপের ইতিহাসের প্রথম কথা আর শেষ কথা হ’লেও এর মধ্যের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। ইউরোপের মধ্যযুগ একালে ইউরোপীয়দের মতে উক্ত মহাদেশের সভ্যতার নয়—অসভ্যতার যুগ। রোমক সাম্রাজ্য যতই জরাজীর্ণ হোক্ না কেন,—আরো বহুকাল টিঁকে থাকত, বাইরে থেকে বর্ব্বররা এসে যদি না তা সমূলে ধ্বংস করত। গ্রীকো-রোমান সভ্যতা ত বড় জিনিস, এই বর্ব্বরেরা কোন রকম সভ্যতারই ধার ধারত না, সুতরাং তারা ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতা একবায়ে ভেঙ্গে চুরমার করে’ দিলে এবং রোম সাম্রাজ্যকে টুকরো টুকরো করে’ নিয়ে নিজেরা ভোগ-দখল করতে লাগল। ফলে যে নূতন তন্ত্র সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করে’ বসল, তার নাম হচ্ছে Feudalism, এই Feudalism ব্যাপারটা যে কি, তা একটা ঘরাও দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এ-কথা নিশ্চয়ই শুনেছ যে, এক সময়ে বাঙলা দেশে বারোজন ভূঁইঞা ছিলেন। এই দ্বাদশ ভূম্যধিকারী যে এ দেশের শুধু জমিদার ছিলেন, তাই নয়—তাঁরা এক একজন ছিলেন এক একটি ক্ষুদ্র রাজা। আমরা জমিদারদের চিঠি লিখতে হ’লে আজও শিরোনামায় লিখি “প্রবল-প্রতাপেষু”। মধ্যযুগে ইউরোপ ঐ শ্রেণীর এক ডজন নয়, শতশত ভূম্যধিকারীর অধীন হয়ে পড়েছিল। ইউরোপের এ যুগের ইতিহাস হচ্ছে এদেরই পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের জমি নিয়ে কাড়াকাড়ি ও লড়ালড়ির ইতিহাস। এই কাড়াকাড়ি ও লড়ালড়ির ফলে, ইউরোপ শেষটা কতগুলি বড় বড় রাজ্যে দাঁড়িয়ে গেল। সে রাজ্যগুলি আজ প্রায় সবই বজায় আছে।

ইংলণ্ডের জিওগ্রাফিও যেমন ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন, ইংলণ্ডের হিষ্টরিও তেমনি বিভিন্ন। প্রথমত দ্বীপ হবার দরুণ ইউরোপের কোনো দেশের সঙ্গে তার কস্মিন্‌কালেও সীমানাঘটিত বিবাদ ঘটে নি। আর মধ্যযুগের যত ভূম্যধিকারী রাজাদের পরস্পরের যত মারামারি হ’ত, তা ঐ চৌহদ্দি নিয়ে। প্রকৃতি যেমন ইংলণ্ডকে একদেশ করে’ গড়ে’ দিলেন, William the Conquerorও তেমনি একদিনে এ দেশকে এক রাজ্য করে’ তুললেন। সামন্ত রাজাদের সঙ্গে যুগযুগ ধরে’ কাটাকাটি করে’ ইংলণ্ডের রাজাকে একরাট হ’তে হয় নি। এই কারণে ইংলণ্ডের ইতিহাসের ধারাও একটু স্বতন্ত্র। রাজায়-সামন্তে জমি নিয়ে লড়ালড়ি নয়, রাজায়-প্রজায় রাজশক্তি নিয়ে কাড়াকাড়ির ইতিহাসই হচ্ছে ইংলণ্ডের আসল ইতিহাস।

মধ্যযুগের অবসানে যখন আমরা বর্ত্তমান যুগের মুখে এসে পৌঁছই, তখন দেখতে পাই যে ইউরোপ, কতকগুলি ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত এবং প্রতিদেশের মাথার উপর বসে’ আছেন এক একজন সর্ব্বেসর্ব্বা রাজা,—যিনি হচ্ছেন সর্ব্বলোকের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সর্ব্বরাজশক্তির একমাত্র আধার। এ রাজশক্তি সংযত করবার ক্ষমতাও কারো ছিল না, কেননা, এ শক্তি সেকালের মতে ছিল—ভগবদ্দত্ত, সুতরাং তার উপর হস্তক্ষেপ করবার অধিকার মানুষের ছিল না। ইতিমধ্যে ইউরোপের সকল জাতিই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেছিল এবং সেই ধর্ম্মের প্রসাদে তারা বিশ্বরাজ্যে যে একেশ্বরের সন্ধান পেয়েছিল, প্রতি রাজা নিজ নিজ রাজ্যে তদনুরূপ একেশ্বরের পদ লাভ করেছিলেন, অর্থাৎ—তাঁরা প্রতিজন হয়ে উঠলেন স্বরাজ্যের অদ্বিতীয় হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। Monarchy অবশ্য প্রাচীন গ্রীসেও ছিল, কিন্তু ইউরোপের এই নব monarchy-র তুলনায় সে হচ্ছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বস্তু। তার পিছনে না ছিল এতাদৃশ ধর্ম্মবল, না ছিল এতাদৃশ বাহুবল।

৪

যে ডিমোক্রাসী মধ্যযুগে একদম ছাই চাপা পড়ে’ গিয়েছিল, বর্ত্তমানে তা আবার ইউরোপে সদর্পে জ্বলে’ উঠেছে। এ যুগের ইউরোপীয়রা এ ছাড়া যে অপর কোনো শাসনতন্ত্র সভ্যজগতে গ্রাহ্য হ’তে পারে, এ কথা মুখে আনলেও কানে তোলে না। এ বিষয়ে পরস্পরে যে মতভেদ আছে, সে শুধু তার বাহ্য আকার নিয়ে। শাসনযন্ত্রটা কি ভাবে গড়লে ডিমোক্রাসী সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এই নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে, এমন কি, জাতিতে জাতিতে মতান্তর হয়। এক

কথায় ডিমোক্রাসীর ধর্ম্ম সবাই মানেন, যা কিছু সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে, সে শুধু তার Church নিয়ে। Church-এর মাথায় জনৈক ধর্ম্মরাজ, কিম্বা পঞ্চায়েৎ থাকা শ্রেয়; এ নিয়ে তর্কের আর শেষ নেই। এ তর্কের শেষ কস্মিন্‌কালে যে হবে, তারও আশা করা যায় না, কেননা, মানুষের রুচিও ভিন্ন আর তর্ক করবার প্রবৃত্তিও অদম্য।

সে যাই হোক, ইউরোপের এই নব ডিমোক্রাসী ও তার প্রাচীন ডিমোক্রাসী এক বস্তু নয়, এদের পরস্পরের আত্মাও বিভিন্ন; এ দুয়ের ভিতর যে আশমান জমিন ফারাক্, এমন কথা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

ইউরোপের পণ্ডিতদের মতে সে দেশের সভ্যতা হচ্ছে Antico-Modern, অর্থাৎ—ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগের পাতা ক'টা প্রক্ষিপ্ত, আর সেই প্রক্ষিপ্ত অংশটুকু ছেঁটে ফেললেই তার অতীত তার বর্ত্তমানের সঙ্গে বেমালুম জুড়ে যায়, আর তখন দেখা যায় যে, ইউরোপ আসলে গ্রীকো-রোমান সভ্যতারই জের আজও টেনে আসছে।

এ মতটা অবশ্য সত্য নয়। দু'হাজার পাতার ইতিহাসের মধ্যে থেকে যদি হাজার পাতা ছিঁড়ে ফেলা যায়, তা হ'লে তার যে অঙ্গহানি হয়, এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। বর্ত্তমান ইউরোপের সঙ্গে প্রাচীন ইউরোপের যোগ আছে শুধু বইয়ের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ—সে যোগ হচ্ছে বিদ্যাবুদ্ধির যোগ; কিন্তু তার নাড়ীর যোগ আছে শুধু মধ্যযুগের সঙ্গে।

জের, ইউরোপ আজও মধ্যযুগেরই টান্‌ছে। বকেয়ার মায়া কেউ বা বেশি কাটিয়েছে, কেউ বা কম, সে দেশে এ যুগে জাতিতে জাতিতে মনের তফাৎ এই মাত্র। ইউরোপে মধ্যযুগে মানুষের যে আত্মা গড়ে' উঠেছে, সেই আত্মা হচ্ছে এই নব ডিমোক্রাসীর আত্মা। আর ঐ মধ্যযুগে ও-দেশে যে রাষ্ট্র গড়ে' উঠেছে, সেই রাষ্ট্রই এই নব ডিমোক্রাসীর দেহ।

এই নব মানবধর্ম্মের বীজ-মন্ত্র যে liberty, equality এবং fraternity—এ কথা ত এ দেশের স্কুলবয়রাও জানে। Liberty শব্দ যে অর্থে আমরা বুঝি, সে অর্থে প্রাচীন ইউরোপ বুঝত না, liberty শব্দের এ-কেলে অর্থ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সে কালে State-এর বহির্ভূত ব্যক্তিত্বের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। তার পর দাস-প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত এই প্রাচীন সভ্যতার ধর্ম্মই ছিল অধিকারিভেদ, আর এ অধিকারিভেদ ছিল জাতিভেদেরই একটি অঙ্গ। যারা জাতিতে গ্রীক কিম্বা রোমান নয়, তারা সকল রাজনৈতিক অধিকারে সমান বঞ্চিত ছিল। রোম শেষটা অবশ্য রোমক-সাম্রাজ্যের অধিবাসীমাত্রকেই রোমের নাগরিক হিসেবেই গণ্য করতে সুরু করেছিল, কিন্তু সে হয়েছিল তখন, যখন সে সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা উপস্থিত; এবং তার কারণ সে অবস্থায় রোমান নামক একটা বিশেষ জাতির কোনো অস্তিত্বই ছিল না। রোম সমগ্র ইউরোপকে গ্রাস করেছিল, তার ফলে সমগ্র ইউরোপের অধিবাসীরাও রোমানদের গ্রাস করে ফেলে। সুতরাং equality বলতে এ কালের লোক যা বোঝে, সে-কালের লোক তা বুঝত না, এসিয়ার ধর্ম্ম যদি ইউরোপের মনে বসে' না যেত, তা হ'লে liberty, equality প্রভৃতি শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থের সন্ধান ইউরোপ পেত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তবে যে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, সে হচ্ছে এই যে, ইউরোপ যুগ যুগ ধরে' খৃষ্টধর্ম্মের বশীভূত না হ'লে তার মুখ দিয়ে Fraternity শব্দ কখনই বার হ'ত না। নব ডিমোক্রাসীর মুখে এ কথাগুলি শুধু শাসনতন্ত্রের মূল সূত্র নয়, পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভের সাধনমন্ত্র। গ্রীকো-রোমান সাহিত্যের প্রভাবে, ইউরোপের এই উদ্বুদ্ধ আত্মজ্ঞান, আত্মশক্তিজ্ঞানে রূপান্তরিত হ'ল। ইউরোপ আত্মবলে স্বর্গরাজ্য জয় করবার দুরাশা ত্যাগ করে' বাহুবলে পৃথিবী জয় করতে উদ্যত হ'ল। মধ্যযুগের ব্রহ্মবিদ্যার আসন নবযুগের পদার্থবিজ্ঞান অধিকার করে' বসলে।

৫

ডিমোক্রাসীর আত্মাকে অব্যাহতি দিয়ে এখন তার দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক্।

প্রাচীন ইউরোপের ডিমোক্রাসী সব এক একটি ছোট সহরকে অবলম্বন করে' তার গণ্ডীর মধ্যেই কায়েম ছিল, এবং সে সকল সহরের আদ্‌বাসিন্দারা নিজেদের সব এক বংশের লোক মনে করত। তারা সকলে পরস্পর পরস্পরের জ্ঞাতি না হোক, অন্তত যে স্বগোত্র, সে বিষয়ে তাদের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সে কালের ডিমোক্রাসী ছিল এক রকম কুলাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং সহরের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে সকল নাগরিকদের মতই নেওয়া হ'ত। নাগরিকমাত্রেরই ভোট ছিল, কিন্তু

অ-নাগরিকের এ বিষয়ে কথা কইবার কোন অধিকারই ছিল না। নাগরিকরা মাথাগুণতিতে অতি স্বল্পসংখ্যক ছিল বলে' সকলে একত্র হয়ে তাদের পুরী-রাজ্যের ছোট বড় রাজকার্য্য সব চালাতে পারত। অর্থাৎ—সে-কালের ডিমোক্রাসী ছিল এক রকম পারিবারিক পঞ্চায়েৎ।

এ-কালের রাজ্য কিন্তু একটা সহরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, এক একটা প্রকাণ্ড দেশ জুড়ে' তা বসে' আছে। আর এই সব দেশে এক কুলের ত দূরে থাক্, একজাতিয় লোকও বাস করে না। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে একদেশীমাত্রেই পলিটিক্যাল হিসাবে একজাতি। এক কথায় এ যুগে স্বদেশীতে আর স্বজাতিতে কোনই তফাৎ নেই। সে-কালের রাজারা ছিলেন নৃপতি আর এ-কালের রাজারা হচ্ছেন ভূপতি। এ পরিবর্ত্তন ঘটেছে মধ্যযুগে। মনে রেখো, মধ্যযুগের সামন্তরাজারা ছিলেন সব ভূম্যধিকারী, সাদা কথায় জমিদার। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে দেখতে পাই, ইউরোপের প্রতি রাজা তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভূত সমগ্র দেশটাকে নিজের জমিদারী মনে করতেন; এরই ইংরাজী নাম হচ্ছে territorial sovereignty, আর রাজত্বের এই নূতন আইডিয়া থেকে এ-কালের ডিমোক্রাসীতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিচারে প্রজামাত্রকেই ভোট দেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ বিষয়ে অধিকারভেদ এ-কালে কে কত খাজনা দেয়, তার উপর নির্ভর করে, কে কোন্ দেবতা মানে, তার উপর করে না। এ-কালের রাজশক্তি আকাশ থেকে নেমে মাটির উপর দাঁড়িয়েছে। ফলে এ-কালে এত অসংখ্য লোকের ভোট আছে যে, সকলে একত্র হয়ে, দেশের রাজকার্য্য চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়েছে। সুতরাং এ-কালে দেশের লোক তাদের শুধু জনকতক প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে। সেই প্রতিনিধি-সভাই রাজকার্য্য চালায়। এরি নাম representative গভর্ণমেন্ট। ইউরোপের সেকেলে আর এ-কেলে ডিমোক্রাসীর প্রভেদটা এত লম্বা করে' বর্ণনা করবার উদ্দেশ্য, এই কথাটা পরিষ্কার করা যে, নব ডিমোক্রাসীর গোড়াপত্তন যেমন এ দেশের অতীতেও হয় নি, তেমনি সে দেশের অতীতেও হয় নি। এ বস্তু আমাদেরও অন্বয়াগতসম্পত্তি নয়, তাদেরও নয়। প্রাচীন আথেন্সও রোমের মত স্বরাট সহর, প্রাচীন ভারতবর্ষেও একটি আধটি নয়, একশ' দুশ' ছিল। নব ডিমোক্রাসীর সূত্রপাত সবপ্রথম ইংলণ্ডেই হয়, একমাত্র ইংরাজ জাতিরই এ বিষয়ে একটা পাঁচ ছশ' বছরের tradition আছে, কিন্তু সে tradition আজ দেড়শ' বছর আগে ইউরোপ মহাদেশের কোনো জাতেরই ছিল না। এই কারণে ফরাসীবিপ্লবের নেতারা যখন Constitution গড়তে বসেন, তখন Arthur Young নামক জনৈক ইংরেজ বলেন, এ হচ্ছে পাগলামি, কেননা, ফরাসী জাতের ভিতর এ বিষয়ে পাঁচশ' বছর বয়সের কোনো tradition ছিল না। এর উত্তরে ফরাসীরা বলেন, "তবে কি আমাদের আর পাঁচশ' বছর হাত গুটিয়ে ঘরে বসে' থাকতে হবে?" Arthur Young-এর সেই পুরানো কথা আজ সহস্র ইংরাজকণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছে। আমাদের জবাবও ফরাসীদের সেই পুরানো জবাব। খাঁটি ইংরাজের মনোভাব এই যে, পৃথিবীর অপর সকল জাতি যদি তাদের মঙ্গল চায়, তা হ'লে তাদের পক্ষে ইংরাজ জাতির হিষ্টরির পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এ কথা বলাও যা, আর এ কথা বলাও তাই যে, পৃথিবীর অপর সকল দেশ যদি তাদের মঙ্গল চায়, তা হ'লে তাদের দেশের জিওগ্রাফিকেও ইংলণ্ডের জিওগ্রাফির অনুরূপ করতে হবে। ইংলণ্ডের জিওগ্রাফিই যে ইংলণ্ডের হিষ্টরি গড়েছে, এ ত ইংলণ্ডের পণ্ডিতদেরই মত।

৬

এই নব ডিমোক্রাসীর জন্মদাতা যে ফরাসী-বিপ্লব, এ কথা ত সর্ব্ববাদিসম্মত।

এ স্থলে তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার যে, ইংলণ্ডের ইতিহাস এর স্রষ্টা নয় কেন? যে পার্লিয়ামেন্টারি গভর্ণমেন্ট ডিমোক্রাসীর দেহ, তা ত ফরাসী-বিপ্লবের বহুপূর্ব্বে ইংলণ্ডে গড়ে' উঠেছিল?

এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। ডিমোক্রাসীর দেহ ইংলণ্ডে গড়ে' উঠেছিল বটে, কিন্তু সে দেশের লোক তার আত্মার সঠিক সন্ধান পায় নি। ফলে ইংলণ্ডবাসীরা এ বিষয়ে সব দেহাত্মবাদী হয়ে উঠেছিল, অর্থাৎ—তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে, উক্ত দেহের অতিরিক্ত কোনো আত্মা নেই। গভর্ণমেন্ট ভাবের জিনিস নয়, কাজের জিনিস। আর যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা তারা গড়ে' তুলেছে, সে ব্যবস্থার সার্থকতা শুধু ইংলণ্ডেই আছে, অপর কোথায়ও নেই। এক কথায় লোকায়ত্ত শাসন-প্রণালী ইংরাজজাতির একায়ত্ত।

অপর পক্ষে ফ্রান্স স্বদেশে ডিমোক্রাসীর যন্ত্র গড়বার পূর্ব্বেই তার মন্ত্রের সৃষ্টি করলে, যে-মন্ত্র আজ

পৃথিবীশুদ্ধ লোক আওড়াচ্ছে। ফ্রান্সের কথা এই যে, মানুষমাত্রেরই কতকগুলো জন্মসুলভ অধিকার আছে এবং সেই সব অধিকার বজায় রাখাই হচ্ছে গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য। নব ডিমোক্রাসীর মূল সূত্রগুলি এই—

1. Men are born and remain free and equal in their rights,

2. The rights are liberty, ownership of property, security, and resistance to opperession. Liberty consists in being able to do anything which is not injurious to others.

3, The principle of all sovereignty rests in the nation.

4, Law is the expression of the general will. All citizens have the right to co-operate personally or through their representatives in its formation. The law should be the same for all.

এই কথাগুলি পৃথিবীশুদ্ধ লোকের মনে বসে' গেল, বিশেষত তাদের মনে, যারা উক্ত সকল অধিকারে বঞ্চিত। এ সব কথায় বিশ্বমানবের মন যে একসঙ্গে সাড়া দিলে ও সায় দিলে, তার কারণ, ফরাসী জাতি এ সব অধিকার শুধু নিজেদের জন্য নয়, জাতি, দেশ, বর্ণ ও ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে মানুষমাত্রেরই জন্য দাবী করেছিল। এক কথায় ফ্রান্স পৃথিবীতে এক নতুন ধর্ম্মমত প্রচার করলে। এ ধর্ম্মের মুক্তি পারত্রিক নয়,—ঐহিক, সমগ্র ইউরোপের জনগণ এই মুক্তিলাভের জন্য লালায়িত এবং সেই সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। অপর সকল ধর্ম্মের মত এই ধর্ম্মের dogma-গুলির উপরে লজিকের ছুরি অবশ্য চালানো যায় এবং সে ছুরি চালাতে ইউরোপের পণ্ডিতমণ্ডলী, বিশেষত জর্ম্মানরা মোটেই কসুর করেন নি। এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যত বই লেখা হয়েছে, তা একত্র করলে বোধ হয়, একটা নতুন আলেকজান্ড্রিয়ার লাইব্রেরী তৈরি করা যায়—যা ভস্মসাৎ করলে মানুষের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না। পণ্ডিতের তর্ক পণ্ডিতে করে' চলেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের এই ধর্ম্মমত অনুসরণ করে' এক নব সভ্যতা গড়ে' চলেছে—যার নাম হচ্ছে ডিমোক্রাসী। লজিকের ছুরি এ dogma-গুলোকে জখম করলেও তার প্রাণবধ করতে পারে নি, তার কারণ, এর একটিও axiom নয়; সব postulate. এ যুগের ফ্রান্সের একটি বড় দার্শনিক, কিছুদিন হ'ল আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষের অন্তরে একরকম অশরীরী শক্তি আছে, যার নাম idea force, যার বলে মানুষে তার সমাজ গড়ে, সভ্যতা গড়ে। Liberty, equality ও fraternity-র তুল্য প্রবল idea force যে এ যুগে আর কিছু নেই, তার প্রমাণ গত দেড়শ' বৎসরের ইউরোপের ইতিহাসের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। এই সব আইডিয়া যখন মানুষের স্বার্থের সঙ্গে একজোট হয়, তখন তার শক্তি যে কি রকম অদম্য হয়ে ওঠে, তার পরিচয় ত গত যুদ্ধেই পাওয়া গেছে।

৭

অশরীরী আত্মা যতক্ষণ না একটা দেহের ভিতর প্রবেশ করতে পারে, ততক্ষণ তার একটা স্থিতিভিতও হয় না, তা পৃথিবীর কোনো কাজেও লাগে না। সুতরাং নব ডিমোক্রাসীর আত্মা ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করে' ইংলণ্ডের তৈরি দেহকে আশ্রয় করলে। এক কথায় ইংলণ্ডের শাসনযন্ত্রের অনুকরণে তারা তাদের দেশের শাসনযন্ত্র গড়লে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে, রাজবিদ্রোহী ফ্রান্স যে constitution তৈরি করলে, তার আদর্শ হ'ল ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টারি গভর্ণমেণ্ট। এ নকল করা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় ছিল না। প্রথমত সে সময় লোকায়ত্ত শাসনতন্ত্র এক ইংলণ্ড ব্যতীত আর কোথাও ছিল না। দ্বিতীয়ত যে সব আইডিয়ার উপর ফ্রান্সে তার নব মানবধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করলে, সে সব আইডিয়ারও সূত্রপাত হয়েছিল ঐ ইংলণ্ডেই। ইংলণ্ড আগে আইডিয়া গড়ে' তার পর সেই আইডিয়া অনুসারে তার গভর্ণমেণ্ট গড়ে নি। কিন্তু সে গভর্ণমেণ্টের অন্তরে যে সব আইডিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করছিল, যে সব পলিটিক্যাল আইডিয়া ইংলণ্ডের মগ্নচৈতন্যের ভিতর লুকিয়ে ছিল, ফ্রান্সের দার্শনিকরা সেইগুলি টেনে বার করে' জাগ্রতচৈতন্যের দেশে তাদের খাড়া করলেন। সত্য কথা বলতে গেলে Hobbes, Lock প্রভৃতি ইংরেজ দার্শনিকরাই এ সব আইডিয়া প্রথমে আবিষ্কার করেন, Montesquieu Rousseau—প্রভৃতি সেইগুলিকে শুধু ফুটিয়ে তোলেন এবং তাদের একটা নতুন দিক্ আর নতুন গতি দেন। ইংলণ্ড যা তার খানদানি জিনিস মনে করত, ফ্রান্স তা বিশ্বমানবের সম্পত্তি বলে' প্রচার করলে। এই যা তফাৎ, কিন্তু এ তফাৎ মস্ত তফাৎ। ইংলণ্ডের হাতে যা কর্ম্মমাত্র ছিল, ফ্রান্সের হাতে পড়ে' তা ধর্ম্ম হয়ে উঠল।

৮

তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করেছ যে, Rights of Man-এর যে চারটি মূলসূত্রের পরিচয় দিয়েছি, তার প্রথম দুটির বিষয়ের সঙ্গে শেষ দুটির বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রথম দুটির সার কথা হচ্ছে, গভর্ণমেণ্ট-মাত্রেরই পক্ষে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, আর শেষ দুটির সার কথা হচ্ছে, সর্ব্বলোকের সমবেত ইচ্ছার উপরই প্রতি দেশের গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। একটি হচ্ছে গবর্ণমেণ্টের গড়নের কথা, আর একটি হচ্ছে গবর্ণমেণ্টের সার্থকতার কথা। যে diarchy-র নাম শুনে শুনে তোমার কান ঝালাপালা হয়ে উঠেছে, তার মানে বুঝতে হ'লে, গভর্ণমেণ্টের গড়নের কথাটাই মোটামুটি বুঝতে হবে, কেননা, মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ডকল্পিত Reform Bill-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ দেশের শাসনযন্ত্রটা নতুন করে' গড়া। গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্যের কথাটা মুলতুবি রাখা যাক্, কেননা, তা হ'লে Reform Bill-এর নয়, Rowlat Act-এর আলোচনা করতে হয়, সে হচ্ছে স্বতন্ত্র বিষয়। নব ডিমোক্রাসীর উক্ত সূত্রগুলির একটির সঙ্গে আর একটির যে যোগ নেই, তা নয়। তবে ইউরোপের লোকের বিশ্বাস যে,শাসনযন্ত্রটা লোকায়ত্ত না হ'লে লোকসমূহের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা অসম্ভব, সুতরাং ডিমোক্রাসীর প্রথম কর্ত্তব্য হচ্ছে ডিমোক্রাটিক গবর্ণমেণ্টের স্থাপন করা। এ মতে Reform Bill পাশ হ'লে আর Rowlat Bill পাশ হ'তে পারে না। সর্ব্বলোকের সম্মতিক্রমে যদি আইন গড়তে হয়, তা হ'লে সর্ব্বলোকের অসম্মতিক্রমে কোনো আইন তৈরি হ'তে পারে না। আর সামাজিক জীব যাকে স্বাধীনতা বলে, তা একমাত্র আইনের উপরই প্রতিষ্ঠিত এবং আইনের দ্বারাই রক্ষিত, অতএব স্বেচ্ছায় আইন গড়বার অধিকার হচ্ছে সমাজের সব অধিকারের মূল।

৯

এইখানে বলে' রাখি যে, Representative Government হচ্ছে ডিমোক্রাসীর প্রথম কথা, আর responsible Government তার শেষ কথা। এই কথা দু'টোর মোটামুটি অর্থ এখন তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করব। ব্যাপারটা বোঝা মোটেই শক্ত নয়, বিশেষত তোমাদের পক্ষে। কারণ, আসলে ও-হচ্ছে সামাজিক ঘরকন্নার কথা। এ ক্ষেত্রে ফ্রান্সের উদাহরণ নেওয়াই সঙ্গত, কেননা, ফ্রান্স তার নব শাসনতন্ত্র কতকগুলো স্পষ্ট principle-এর উপরে একদিনে খাড়া করেছে; সুতরাং সে শাসনতন্ত্রের মূল উপাদানগুলি ধরা সহজ। অপর পক্ষে ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বহুকাল ধরে, ধীরে-সুস্থে হাত-আন্দাজে গড়ে' তোলা হয়েছে। ফ্রান্স তার প্রজাতন্ত্র একদম নতুন করে' গড়েছে, ইংলণ্ডে তার সেকেলে রাজতন্ত্র ক্রমান্বয় এখানে ওখানে মেরামত করে' করে' তার হাল শাসনযন্ত্র লাভ করেছে। অবশ্য এই মেরামতের প্রসাদে তার সেকেলে গভর্ণমেণ্টের খোল এবং নইচে দুই-ই বদল হয়ে গেছে।

তা ছাড়া ফ্রান্সের গভর্ণমেণ্টের লিখিত আইন আছে, ইংলণ্ডের নেই। ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের মূল আইন নয়—আচার; সুতরাং তার ভিতর আগাগোড়া মিল পাবে না। ইংলণ্ডের পলিটিক্যাল ধর্ম্মও হচ্ছে একরকম protestantism, অর্থাৎ—মধ্যযুগের রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুগে যুগে প্রতিবাদ করে', সে শক্তিকে ক্রমাগত ক্ষুণ্ণ করে', ছিন্ন করে', হরণ করে', অহরণ করে' ইংরাজেরা তাদের Constitutional monarchy দাঁড় করিয়েছে। রাজা কি কি করিতে পারেন না, সেই বিষয়েই তারা রাজার কাছে সব লেখাপড়া করে' নিয়েছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য এবং মানুষের সহজ অধিকার সম্বন্ধে তাদের Constitution নীরব। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নব ডিমোক্রাসীর ভিত্তি, ইংলণ্ডের আইনকানুনে তার নাম পর্য্যন্ত নেই। অথচ ও স্বাধীনতা ইংরাজের মত কোনো জাতের নেই। রাজশক্তিকে আইনে বেঁধে এ স্বাধীনতা তারা পরোক্ষভাবে লাভ করেছে।

"No man can be accused, arrested or detained in prison except in cases determined by law, and according to the forms prescribed by law."—

Declaration of Rights of Man-এর এই সূত্র ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি অতি প্রাচীন কথা, এর সাক্ষাৎ Magna Charta-তেই পাবে। ইংলণ্ড তার সকল মন ব্যক্তিগত স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষার উপরেই নিয়োগ করাতে, সে দেশের Constitution ইংরাজেরা অনেকটা অন্যমনস্কভাবে গড়ে' তুলেছিল। ফলে ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্ট, গড়নে কতকটা English Church-এর অনুরূপ, অর্থাৎ—নূতনে পুরাতনে জোড়া-তাড়া দিয়ে তা খাড়া করা হয়েছে। এক কথায় Reason এবং authority,—এই দুটি সম্পূর্ণ বিরোধী শক্তির এক রকম কাজ চালানোগোছ

সমন্বয়ের উপর ইংলণ্ডের মন ও জীবন দুই-ই সমান প্রতিষ্ঠিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফ্রান্স যখন তার নব Constitution গড়তে বসল, তখন তার চোখের সুমুখে ঐ ইংলণ্ডের Constitution ছাড়া ডিমোক্রাসীর আর কোনোরূপ জ্যান্ত নমুনা ছিল না। ফ্রান্স অবশ্য তার নূতন গভর্ণমেণ্ট, একমাত্র Reason এর উপরেই খাড়া করতে চেয়েছিল, তা সত্ত্বেও যে ইংলণ্ডের মডেল গ্রাহ্য করতে তার আপত্তি হ'ল না, তার কারণ, ইতিপূর্ব্বে জনৈক ফরাসী দার্শনিক, ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত reason আবিষ্কার করেছিলেন। Montesquieu-র মতে রাজশক্তি সর্ব্বত্র ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেই আবির্ভূত হয়। এর একটির কাজ হচ্ছে—বিচার (Judicial), আর দ্বিতীয়টির আইন গড়া (Legislative), আর তৃতীয়টির শাসনসংরক্ষণ (Executive).

Montesquieu এই মত প্রচার করেন যে, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রে বিচারের ক্ষমতা রাজার নিয়োজিত জজের হস্তে ন্যস্ত, আইন গড়বার ক্ষমতা সে দেশে আছে শুধু পার্লিয়ামেণ্ট, অর্থাৎ—প্রজাবর্গের প্রতিনিধির হাতে, আর শাসনসংরক্ষণের ক্ষমতা চিরদিনই রাজার হাতে রয়ে গিয়েছে। Montesquieu-র এ মত অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের রাজশক্তির কোন্ অংশ যে কার হাতে ছিল, তা বলা অসম্ভব। কেননা, এ বিষয়ে তখন কোনো একটা লিখিত-পড়িত ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায় নি। আসল কথা এই যে, রাজা ও প্রজার অধিকারের পাকা-পোক্ত সীমানা তখনও ঠিক হয়ে যায় নি, এমন কি, আজও হয় নি। এর ভিতর যে শক্তি যখন প্রবল হ'ত, তখনই সে-শক্তি তার অধিকারের মীমাংসা বাড়িয়ে নিত। সে যাই হোক্, বিদ্রোহী ফ্রান্স Montesquieu-র মত গ্রাহ্য করে' নিয়েই ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে তাহার আদ্-Constitution গড়ে। এ তন্ত্রে শাসনসংক্ষণের ক্ষমতা রাজার হাতেই রয়ে গেল, প্রজার হাতে পড়ল শুধু আইন তৈরি করবার ক্ষমতা। এই প্রতিনিধিসভা আসলে ব্যবস্থাপক সভা হলেও, ইংলণ্ডের নজীর দৃষ্টে প্রজার উপর টেক্স ধার্য্য করবার এবং বাৎসরিক বজেট পাশ করবার ক্ষমতাও এই সভা আত্মসাৎ করে' নিলে। ইংলণ্ডের মতে এ ক্ষমতার অভাবে প্রজার কোনো ক্ষমতাই থাকে না। আমরা মজা করে' টাকাকে রুধির বলি, কিন্তু উপমাটা নেহাৎ বাজে নয়। প্রজার হাতে টাকার থলি এসে পড়ায় রাজন্ত্রের রক্ত চলাচল বন্ধ করে' দেবার ক্ষমতা তাদের হস্তগত হয়। এই নমুনার গভর্ণমেণ্টের নামই হচ্ছে representative Government. সেদিন পর্য্যন্তও জার্ম্মাণীতে এই ধরণের গভর্ণমেণ্টই ছিল।

১৩

যে-দেশে representative Government আছে, এখন দেখা যাক্, সে দেশে রাজার হাতে কি ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে। শাসনসংরক্ষণের একাধিক বিভাগ আছে, যথা—administration, justice, finances, foreign affairs, army, navy, commerce, agriculture, education and public works ইত্যাদি, ইত্যাদি। এর প্রতি বিভাগটি এক একটি রাজমন্ত্রীর হাতে সঁপে দেওয়া হয় এবং সেই রাজমন্ত্রী ক'টিকে নিয়ে যে মন্ত্রীসমিতি গঠিত হয়, তারই নাম হচ্ছে—Executive Council. বলা বাহুল্য যে, সমগ্র দেশের শাসনভার এই মন্ত্রিসমিতির হাতেই পুরোপুরি থাকে। ফলে যে দেশে Legislative-শক্তি থাকে প্রজার প্রতিনিধির হাতে আর Executive ক্ষমতা রাজমন্ত্রীর হাতে, সে-দেশে এ দুয়ের ভিতর বিরোধ অনিবার্য্য। প্রতিনিধিসভা ক্রমান্বয়ে রাজমন্ত্রীদের সকল কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে আর রাজমন্ত্রীরা নিত্য প্রতিনিধিসভার দল ভাঙ্গিয়ে সে সভাকে কাহিল করে' ফেলবার চেষ্টা করে।

ফ্রান্সের উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক ইতিহাস হচ্ছে এই বিরোধের ইতিহাস। সে দেশে যে আশী বৎসরের মধ্যে তিনবার রাষ্ট্র-বিপ্লব হয়েছে এবং ছ'বার গভর্ণমেণ্ট বদল হয়েছে, তার একমাত্র কারণ—Legislative Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর এই চিরদ্বন্দ্ব। এ বিরোধ দূর হ'ল তখনই—যখন Executive রাজার অধীন না হয়ে Legislative Council-এর অধীন হ'ল। এর চলিত উপায় হচ্ছে প্রতিনিধিসভার সভ্যদের মধ্যে থেকে জনকতককে মন্ত্রী নিযুক্ত করা, যাদের উক্ত সভার কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং যাদের বরখাস্ত করার ক্ষমতা উক্ত সভার হাতেই থাকবে। bsolute monarchy-র দিনে—যেমন legislative এবং executive, উভয় ক্ষমতাই একমাত্র রাজার হাতে ছিল, পূর্ণাঙ্গ ডিমোক্রাসীর দিনে, তেমনি ঐ দুই

ক্ষমতাই একমাত্র প্রজার হাতে আসে। এই তন্ত্রের নামই হচ্ছে responsible Government, আর এই হচ্ছে ডিমোক্রাসীর শেষ কথা।

১১

এতক্ষণ যদি পেরে থাকো ত আর একটু ধৈর্য্য ধরে' আমার ব্যাখ্যান শুনলে, আমাদের পলিটিক্যাল মামলার মোদ্দা কথাটা জলের মত বুঝে যাবে। কারণ, এ পত্রে আমি ইউরোপের পলিটিক্সের শুধু ক-খ-র পরিচয় দিচ্ছি। প্রস্তাবনাটি যত লম্বা হয়েছে, উপসংহার তার সিকিও হবে না।

আমাদের গভর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান অবস্থা এই। বিচার করবার, আইন তৈরি করবার ও শাসন-সংরক্ষণ করবার ক্ষমতা সবই আজ Bureaucracy-র হাতে। এ দেশে অবশ্য Legislative Council আছে এবং তাতে জনকতক প্রজার প্রতিনিধিও আছেন, কিন্তু আসলে এ Legislative Council, গভর্ণমেণ্টের Executive Council-এর সদর মহল ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ব্যবস্থাপক সভায় প্রজার মুখপাত্রেরা তর্ক করতে পারে, বক্তৃতা করতে পারে, কিন্তু কোনো আইনের জন্মও দিতে পারে না, কোনো আইনের ভূমিষ্ঠ হওয়াও বন্ধ করতে পারে না, এক কথায় আমাদের প্রতিনিধিদের মুখ আছে, কিন্তু হাত নেই। প্রমাণ—দেশী সভ্যদের সে ক্ষমতা থাকলে Rowlat Bill আর Rowlat Act হ'ত না।

এই যুদ্ধের তাড়নায়, ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি, ডিমোক্রাসীর মূলসূত্রগুলির পুনরাবৃত্তি করতে বাধ্য হয়েছে।

এই সুযোগে Congress এবং Moslem League, দু-জনে দু-হাত মিলিয়ে জোড়করে বিলেতের কাছে Representative Grvernment ভিক্ষা করে। আর প্রায় ঠিক সেই সময়ে ইংরাজরাজ ভারতবর্ষকে চোখের এক নূতন কোণ দিয়ে দেখতে পেলেন, যে-কোণকে দক্ষিণ কোণ আর ইংরাজিতে right angle বলা যেতে পারে এবং সেই কারণে বিলাতের মন্ত্রিসভা এর উত্তরে বলেন যে—

"The policy of His Majesty's Government is……the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible government in India as an integral part of the British Empire. They have decided that substantial steps in this direction should be taken as soon as possible."

আমরা ভিক্ষে চেয়েছিলুম representative Government, বিলেত দিতে চাইলেন তার উপরে ফাউ হিসেবে কিঞ্চিৎ responsible Government. যত গোল বেধেছে ঐ একটা নিয়ে।

ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, মণ্টেগু এবং চেম্‌স্‌ফোর্ড সাহেব উভয়ে মিলে reform bill-এর একটি খসড়া তৈরি করেছেন। যে-শাসনযন্ত্র এঁরা গড়তে চাচ্ছেন, সে এত জটিল যে, তার কলকব্জা সব তোমাকে চিনিয়ে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। এ যন্ত্রের গড়নটা এত জটিল হবার কারণ, তার ব্রেক-এর আধিক্য। মোটর গাড়ীতে সবে দুটি ব্রেক আছে, এক হাত-ব্রেক আর এক পা-ব্রেক। কিন্তু এ যন্ত্রের সর্ব্বাঙ্গে ব্রেক আছে। মনে রেখো', পার্লেমেণ্টের অভিপ্রায় হচ্ছে gradual development, সুতরাং ডিমোক্রাসীর গতি এদেশে যাতে অতি ধীরলম্বিত হয়, সেই উদ্দেশ্যে এ যন্ত্র গড়া হয়েছে। অনেকের মতে, এ যন্ত্রের গতিরোধ করবার যত রকম কায়দা-কানুন বানানো হয়েছে, তাতে ওটা চলবেই না। সে যাই হোক্, এই বিলের সর্ত্ত অনুসারে আমরা যে পুরো Representative Government পাব না, সে বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নেই।

গভর্ণমেণ্ট যেখানে পুরোপুরি representative নয়, সেখানে তা যে কি করে' responsible হ'তে পারে, তা বোঝাই কঠিন। অথচ এ মীমাংসা করাই চাই, নচেৎ পার্লেমেণ্টের কথার খেলাপ হয়। এ মীমাংসা পৃথিবীর অপর কোনো জাত করতে পারত কি না সন্দেহ, ইংরাজ রাজমন্ত্রীরা যে পারছেন, তার কারণ, ইংরাজের রাজনীতি লজিকের তোয়াক্কা রাখে না।

অতঃপর মীমাংসাটা দাঁড়িয়েছে এই যে, আধা representative Government-এর সঙ্গে আধা responsible Government জুড়ে দেও—এ দুটি যমজ ভ্রাতার মত একসঙ্গে বাড়বে এবং কালক্রমে দুই যখন সাবালক হবে, তখন ভারতবর্ষ ক্যানাডা প্রভৃতির মত "an integral part of the British Empire" হয়ে উঠবে।

আপাতত কোথায় এবং কতটুকু responsible Government দেবার প্রস্তাব হচ্ছে

জানো?—বড়লাটের বড় খাসদরবারে নয়—প্রাদেশিক ছোটলাটদের যত সব ছোট ছোট খাসদরবারে। এই ছোটলাটদের দরবারে নানারূপ শাসন বিভাগ আছে, তারই দুটো একটা নিরীহ বিভাগ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপকসভার দুট একটি সরকারের মনোনীত সভ্যকে দেওয়া হবে। যে সব বিভাগের কাজ হচ্ছে রাজ্যশাসন ও সংরক্ষণ করা, সে সব বিভাগ; যথা—শিক্ষা-বিভাগ, স্বাস্থ্য-বিভাগ ইত্যাদি, অর্থাৎ—রাজ্য চালনার ভার থাকল রাজপুরুষদের হাতে, আর প্রজার উন্নতি করবার ভার পড়ল প্রজার প্রতিনিধির হাতে। ভাষান্তরে প্রজাকে শাসন করবার ক্ষমতা রয়ে গেল তাঁদেরই হাতে, এখন তা আছে যাঁদের হাতে এবং প্রজাকে লালন করবার দায় পড়ল তাঁদের ঘাড়ে—যাঁরা কস্মিন্‌কালেও কোনো রাজকার্য্য চালান নি। এরই নাম diarchy.

অতএব দাঁড়াল এই যে, দেশের ঘরকন্না চালাবার সেই বন্দোবস্ত করা হ'ল, যে বন্দোবস্তে আমাদের পারিবারিক ঘরকন্না চালান হয়। পারিবারিক গভর্ণমেণ্টের যেমন কতক বিভাগ থাকে আমাদের হাতে আর কতক বিভাগ তোমাদের হাতে, এই নব শাসনতন্ত্রেরও তেমনি বড় বিভাগগুলো থাকবে ওঁনাদের হাতে আর ছোটগুলো আমাদের হাতে।

পৃথিবীতে আর কোথাও যে এ বন্দোবস্ত নেই, তার কারণ পৃথিবীর আর কোনো জাতের অবস্থাও আমাদের মত নয়। ভারতবাসীরা আবহমানকাল দোটানার মধ্যেই পড়ে' আছে। এ দেশের যে-যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, দেখতে পাবে, একদিকে রয়েছে রাজভাষা আর একদিকে রয়েছে লোকভাষা, একদিকে রয়েছে পোষাক, অর্থাৎ—রাজবেশ আর একদিকে রয়েছে আটপৌরে কাপড়, অর্থাৎ—লোক-বেশ। আর আমরা ভদ্রলোকেরা—একসঙ্গে এ দুই-ই অঙ্গীকার করে' সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে' আসছি; সুতরাং রাষ্ট্রতন্ত্রে এই diarchy আমাদের দেশেরই উপযুক্ত হয়েছে।

যদি বলো, এ ঘরকন্না চলবে কি রকম? তার উত্তর, সে নির্ভর করবে কাকে রাজমন্ত্রী আর কাকে লোকমন্ত্রী করা হয়, তার উপর। যদি স্ত্রী-পুরুষে মনের মিল থাকে, তা হ'লে চলবে নিখিরখিচে, আর তা যদি না থাকে ত দিনরাত খিটিমিটি হবে। এই দুইয়ারকি duet-ও হ'তে পারে duel-ও হ'তে পারে।

এখন কথা হচ্ছে যে, এ বন্দোবস্তে Bureaucracy-র তরফ থেকে এত আপত্তি উঠছে কেন? আপত্তি উঠছে এই ভয়ে যে, প্রজার প্রতিনিধিরা মন্ত্রিসভায় ছুঁচ হয়ে ঢুকবে আর ফাল হয়ে বেরুবে। আর এ পক্ষ যে এই বন্দোবস্ত বজায় রাখবার জন্য এতটা জেদ করছেন, তার কারণ, অপর পক্ষের যেটা আশঙ্কা, এ পক্ষের সেইটেই আশা।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।

দেশের কথা (১)

গত বৎসরের সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক ঘটনা হচ্ছে, মণ্টেগু সাহেবের ভারতবর্ষে পদার্পণ। তাঁর আগমনে, আমাদের পলিটিক্যাল আত্মা যে কি রকম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে আমাদের শিক্ষিত সমাজের অতিমাত্র চঞ্চলতায় ও মুখরতায়। কিন্তু আজ যখন সোরগোল মাতামাতি অনেকটা কমে এসেছে, তখন একটু স্থিরভাবে ভেবে দেখা যাক্, ব্যাপারটা হ'ল কি।

মণ্টেগু সাহেব এসেছিলেন বোধ হয় আমাদের পলিটিক্যাল জ্ঞান এগজামিন করবার জন্যে। তিনি আমাদের কাছে থেকে তাঁর প্রশ্নের লিখিত জবাব আর মুখের জবাব, দুই-ই নিয়েছেন। শুনতে পাই, viva-তে আমাদের অধিকাংশ নেতাই একদম ফেল করেছেন; কিন্তু লিখিত জবাবে সকলেই ফার্ষ্টক্লাস পাস করেছেন। Problem কষতে আমাদের তুল্য আর কে আছে?—তা সে জ্যামিতিরই হোক্ আর রাজনীতিরই হোক্। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে, এ পরীক্ষার জবাবগুলি সব যদি একত্র করে' ছাপানো যায়, তা হ'লে এমন একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হবে—যা পড়ে' আমরা চিরজীবন হাসতে পারব; এক কথায় ও-গ্রন্থ হবে নব ভারতবর্ষের নব "হাস্যার্ণব।"

সে যাই হোক, মণ্টেগু সাহেবের আগমনের একটা মস্ত সুফল ফলেছে। আমরা আমাদের পলিটিক্যাল-দাবীর আরজি প্রস্তুত করতে বাধ্য হবার দরুণ, আমাদের নিতান্ত অস্পষ্ট পলিটিক্যাল-মনোভাবকে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট করতে বাধ্য হয়েছি। এ একটি মহা লাভ। আমরা আজ সকলেই জানি যে, আমাদের পলিটিক্সের নানা দলের কে কি চান। এর ভিতর থেকে একটি খুব মোটা সত্য বেরিয়ে পড়েছে, সে হচ্ছে—স্বরাজ শব্দের অর্থ বাঙলা একভাবে বোঝে, আর বাকি ভারতবর্ষ আর একভাবে বোঝে;—অবশ্য যদি ধরে' নেওয়া যায় যে, অন্য প্রদেশের পলিটিক্যাল নেতারা স্ব স্ব প্রদেশের যথার্থ মুখপাত্র। বাঙালীর সঙ্গে বাকি ভারতবাসীদের এ বিষয়ে মনের অমিল এতটা বেশি যে, এ অমিলের মূল কোথায়, তা একটু তলিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

আমাদের স্বরাজ হচ্ছে ইংরাজি self-government-এর ভাষায় অনুবাদ, অতএব home rule-এরও অনুবাদ, কেননা, ও-দুই একই বস্তু, তফাৎ যা, তা ভাষায়। একটির ভাষা সাধু, আর একটির অসাধু। এ কথা শুনে অবশ্য ও-দুই দলই প্রতিবাদ করে উঠবেন। তাঁরা বলবেন, ও-দুই সমাসের আভিধানিক অর্থ এক হ'লেও, ব্যঞ্জনার প্রভেদ ঢের। কিন্তু এ দুই পক্ষের প্রতি নজর দিলেই দেখা যায় যে, উভয়ের প্রভেদ, ব্যঞ্জনার নয়—ব্যক্তির। তথাপি স্বরাজ অর্থে যে ভারতবর্ষের নানাদেশে, নানাদলে, নানালোকে নানা বস্তু বোঝে, তার দেদার দলিল মণ্টেগু সাহেবের সেরেস্তায় পাওয়া যাবে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, আমাদের প্রতি দলের পকেটে এক একটি নিজস্ব মনগড়া স্বরাজ আছে; অথবা সকলের মুখে ও-পদ থাকলেও, কারো মনে ও-পদার্থ নেই। বোধ হয়, এই কারণে শেষটা গত কংগ্রেসে সকল প্রদেশের সকল নেতা এক হয়ে কংগ্রেস লীগের মুসাবিদা গ্রাহ্য করেছেন। এ কথা ত সবাই জানেন। কিন্তু এ কথা হয় ত সবাই জানেন না যে, এ ব্যাপারে একমাত্র প্রতিবাদী হয়েছিল বাঙলা। কংগ্রেসের গ্রীনরুমে যাঁদের প্রবেশাধিকার আছে, তাঁরাই জানেন যে, সেখানে কোনো বাঙালী, কংগ্রেস-লীগের দুহাতে গড়া-স্বরাজ মাথা পেতে নিতে পারেন নি; কেননা, তা গ্রাহ্য করে' নেবার কোনই বৈধ কারণ নেই। স্বরাজের প্রথম আরজি বড়লাট-সভার উনিশজন দেশীসভ্য দস্তখত করে' ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করেন। সে আরজি অবশ্য একটা খসড়া বই আর কিছুই নয়, কেননা, সে আরজি রাতারাতি তৈরি কর্‌তে হয়েছিল, সবদিক ভেবেচিন্তে একটা পাকা দলিল তৈরি করবার তাঁদের অবসর ছিল না; অন্ততঃ এই ত তাঁদের কৈফিয়ৎ। সেই খসড়াই একটু-আধটু বদলসদল করে' নিয়ে কংগ্রেস-লীগ আত্মসাৎ করেছেন। সুতরাং এ দুয়ের প্রভেদ যা, তা উনিশ-বিশ। অথচ কংগ্রেস এই জিনিসই শিরোধার্য্য করে' নিলেন; শুধু তাই নয়, আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, এমনটি আর হয় নি, হবে না, হ'তে পারে না।

এই সূত্রে শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় রাজনৈতিক দর্শনের একটি নূতন তত্ত্ব আমাদের শিক্ষা দেবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি কংগ্রেসের উচ্চ-মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঝাড়া একঘণ্টা ধরে' আমাদের মনে এই কথা বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন যে, মানুষে যখন তার বাসগৃহ তৈরি করে, তখন সে গৃহ ভিৎ থেকে গেঁথে তুলতে হয়; কিন্তু কোনো জাতি যখন তার বাসগৃহ তৈরি করতে চায়, তখন সে গৃহ ছাদ থেকে গেঁথে নামাতে হয়। আমাদের পলিটিক্যাল-আশা গোড়াতে অত উচ্চ না হ'লেও ক্ষতি নেই। অপর কোনো ক্ষেত্রে অপর কোনো ব্যক্তি এ রকম কথা বললে আমরা তা রসিকতা মনে করতে পারতুম। কিন্তু এ রসিকতা নয়—এ হচ্ছে সেকেলে পলিটিক্সের একটা মোটা কথা; এর অর্থ হচ্ছে শাসনতন্ত্র জাতির পক্ষে নিজে গড়ে, তোলবার জিনিস নয়, কিন্তু উপর থেকে তার মাথায় চাপিয়ে দেবার জিনিস।

রাজনীতির এ আদর্শ বাঙালী গ্রাহ্য করতে পারে না, কেননা, তা তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। বাঙালীর কাছে ন্যাসনালিজমের অর্থ হচ্ছে জাতির স্বধর্ম্মের চর্চ্চা এবং সেই শাসনতন্ত্রই ঈপ্সিত ও বরণীয়, যার অন্তরে একটি বিশেষ জাতির স্বধর্ম্ম পূর্ণবিকশিত হয়ে ওঠবার পূর্ণ অবসর পায়। অতএব প্রতি দেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যই তার ন্যাসনালিজমের অটল ভিত্তি। দেশের মত বলে' কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই, কিন্তু জাতির মতি বলে' একটি জিনিস আছে। এক একটা জাতির মনের এক একটা বিশেষ গতি আছে; এবং সে গতির এক একটা বিশেষ লক্ষ্য আছে। বাঙালী জাতির মতির পরিচয়, রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙলার যত মহাপুরুষদের কথায় ও কাজে পাওয়া যাবে। স্বাধীনতা শব্দের অর্থ আমাদের কাছে কেবলমাত্র রাজনীতিগত নয়; কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি উদার, ঢের বেশি ব্যাপক।

আমরা জীবনে ও মনে সমান মুক্তির প্রয়াসী। তাই আমাদের রাজনীতি আমাদের জীবন-বেদের বহির্ভূত নয়—অন্তর্ভূত এবং একাংশ মাত্র। বাঙালীদের কাছে একটা বিশেষরকম শাসনতন্ত্র জাতীয় জীবনের কৃতার্থতার লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র। কিন্তু কংগ্রেস ও লীগ আপোষ-মীমাংসা করে জোড়াতাড়া দিয়ে যে স্বরাজের আদর্শ খাড়া করলেন, তাতে প্রতি প্রদেশের প্রতি জাতির স্ব-বস্তুটি চাপা পড়ে গেল।

এতে পলিটিক্যাল বুদ্ধিরই যে কি পরিচয় দেওয়া হ'ল, তাও বোঝা কঠিন। এ সত্যও কি সুস্পষ্ট নয় যে, গোটা ভারতবর্ষের যুক্ত-স্বরাজ্য প্রতি প্রদেশের স্বাধীন স্বাতন্ত্র্যের উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এবং অপর কোনো উপায়ে হবে না। অথচ বাঙলার সকল নেতাই ঐ অদ্ভুত রায়ে সায় দিলেন ও সই দিলেন। এর পরেও লোকে বলে, বাঙালীর discipline-এর জ্ঞান নেই! বাঙালীনেতারা অপর প্রদেশের নেতাদের দ্বারা যত সহজে নীত হন, এমন আর কেউ হয় না। বাঙালীর আশার কথা এই যে, তারা জাতি হিসেবে সহজে কারো দ্বারা নীত হয় না।

আমার বিশ্বাস, আমার এ কথায় সকল বাঙালীই সায় দেবেন যে, আমাদের ঘর আমরা নিজ হাতে নীচ থেকেই গেঁথে তুলতে চাই, উপর থেকে গেঁথে নামাতে চাই নে। আশা করি, আমাদের নেতারা এই সত্য মনে রাখবেন যে, যেখানে গোড়ায় মিল নেই, সেখানে গোঁজা মিল দিয়ে কোনো লাভ নেই, শেষটা ভুগতেই হবে। নিজের ideal-ভ্রষ্ট হলেই মানুষের সকল কার্য্য নষ্ট হয়, কেননা ideal-এর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ তার আত্মশক্তি হারায়।

২

আমি আগে এক সময় বলেছি যে, আমাদের স্বরাজ লাভের কথা শুধু ঘরের কথা নয়—বাইরেরও কথা এবং তা যতটা না ঘরের কথা, তার চাইতে ঢের বেশি বাইরের কথা। দেখা যাক্ এ কথাটা সত্য কি না।

যে স্বরাজ-লাভের জন্য শিক্ষিত ভারতবাসী আজ লালায়িত, সে স্বরাজ যে ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ও অঙ্গীভূত হবে—এ কথা ত সর্ব্ববাদি-সম্মত। এ ছাড়া অপর কোনরূপ স্বরাজের আমরা কল্পনাও করতে পারি নে; যদি কেউ পারেন, তা হ'লে তাঁর কল্পনাশক্তি কোনোরূপ জ্ঞানের দ্বারা সংযত বা বুদ্ধির দ্বারা নিয়মিত নয়। যাঁর কাছে স্বরাজ্য ও স্বপ্নরাজ্য একই বস্তু, তাঁর সঙ্গে বাক্যব্যয় করা বৃথা। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, আমাদের ভবিষ্যৎ ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যতের উপরেই নির্ভর করবে এবং সে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলাফলের উপরেই নির্ভর করছে। এক কথায়, পৃথিবী জুড়ে যে মহানাটকের অভিনয় হচ্ছে, আমরা এই তিন চার বছর ধরে' তারই একটি ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্ক অভিনয় করে' আসছি, এবং সেই নাটকের যবনিকা না-পড়া পর্য্যন্ত আমাদের অভিনয়ের সার্থকতা আমরা টের পাব না।

এই মহানাটকের শেষাঙ্ক এই দেশে অভিনীত হবারও শুনছি একটা সম্ভাবনা ঘটেছে। সুতরাং এ যুদ্ধের ভিতরকার কথাটা আবার তোলা যাক্।

গত চল্লিশ বৎসরের জর্ম্মাণীর মতিগতির সঙ্গে যাঁর কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, বিশ্বমানবের উপর প্রভুত্ব লাভ করাই হচ্ছে Imperial Germany-র রাজনীতির উদ্দেশ্য এবং তার রণনীতি হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যসাধনের উপায়। বর্ত্তমান জর্ম্মাণ দর্শন এই রাজনীতির উত্তরসাধক এবং জর্ম্মাণ-বিজ্ঞান এই রণনীতির ক্রীতদাস। এক কথায়, এ যুদ্ধ সকল জাতির ন্যাসনালিজমের বিরুদ্ধে জর্ম্মাণ-ইম্পিরিয়ালিজমের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে যদি জর্ম্মাণী জয়লাভ করে, তা হ'লে পৃথিবী হ'তে ন্যাসনালিজমের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাবে এবং যে স্বরাজের দিকে আমরা দেশশুদ্ধ লোক হাত বাড়িয়েছি এবং যা আশু আমাদের হাতে আসবার সম্ভাবনা আছে, তা গন্ধর্ব্বপুরীর মত এক নিমেষে শূন্যে মিলিয়ে যাবে। এ কথা আমি আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি বলে' আমার মতে আমাদের সকলকে সকল রকম দ্বিধা-সঙ্কোচ ত্যাগ করে' স্বদেশরক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে। একমাত্র কামনার বলে স্বরাজলাভ করা যায় না—তার পিছনে থাকা চাই জাতির মহৎ কর্ম্মফল। আমাদের শাস্ত্রে বলে, স্বর্গরাজ্যের ভোগের মেয়াদ মানুষের পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্যের উপর নির্ভর করে। স্বরাজলাভ আর স্বদেশরক্ষা যে একই বস্তুর এ পিঠ, ও পিঠ, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন; তবে তার কোন্‌টি সদর আর কোন্‌টি মফঃস্বল, এই নিয়ে দেখতে পাচ্ছি মতভেদ আছে। এর কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে, এই নিয়ে আমাদের পলিটিক্যাল দলে এমন একটা তর্ক বেধেছে, যার ফলে,

ভ্রাতৃ বিরোধ, বন্ধু-বিচ্ছেদ, গুরুশিষ্যে মনান্তর প্রভৃতি ঘটবার উপক্রম হয়েছে। বীজ আগে না বৃক্ষ আগে, তৈলাধার পাত্র না পাত্রাধার তৈল, এ সব ন্যায়ের তর্কে যে বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না, এমন কথা আমি বলি নে। এরও সময় আছে, কিন্তু আজকের দিন সে সময় নয়। কাল হয় ত আমাদের জাতীয় শক্তির পরিচয় দিতে হবে এবং সে পরীক্ষার জন্য আজ আমাদের অন্তত মনে প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য।

১লা মে, ১৯১৮।

দেশের কথা (২)

বাঙলার জনৈক নেতার মুখে সেদিন শুনলুম যে, বম্বে ও মাদ্রাজের লোকেরা পলিটিক্যাল হিসেবে, আমাদের চাইতে ঢের বেড়ে গিয়েছে। এ সত্য তিনি দিল্লীতে আবিষ্কার করে' এসেছেন, অতএব বলা বাহুল্য যে, তিনি বামমার্গের একজন মহাজন।

এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে আমরা লজ্জিত হ'তে বাধ্য; কিন্তু এর জন্য আমাদের দুঃখিত হবার কোনই কারণ নেই। ইংরাজের অধীনে সমগ্র ভারতবর্ষ রাষ্ট্রহিসেবে একদেশ হয়ে উঠেছে এবং ইংরাজি শিক্ষার গুণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় ঐক্যজ্ঞান জন্ম লাভ করেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের যে-কোনো প্রদেশ মনে কিম্বা জীবনে এক ধাপ উঁচুতে চড়ে' যাবে, সে প্রদেশ সমগ্র ভারতবর্ষকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে তুলবে এবং প্রতিবেশীর সাহায্যে আমরা বাঙালীরাও জাতি হিসেবে একটু উঁচুতে উঠে যাব! ইংরাজের আইন আমাদের জীবনকে এবং ইংরাজের ভাষা আমাদের মনকে এক সূত্রে এমনি গেঁথেছে যে, একের টানে অপরে চলতে বাধ্য। সুতরাং বম্বে মাদ্রাজে যদি নব জীবনের আত্যন্তিক স্ফূর্ত্তি হয়েই থাকে—তা হ'লে সে জীবনীশক্তি আমাদের মনপ্রাণকেও ধাক্কা দেবে। এ ত সুসংবাদ!

তবে কথাটা একেবারে সত্য বলে' গ্রাহ্য করবার পক্ষে কিঞ্চিৎ বাধা আছে। প্রথমত, পলিটিক্যালি বেড়ে যাবার অর্থটা কি? যদি কেহ বলেন যে, আমাদের তুলনায় অপর দেশের লোকেরা রাজনৈতিক আন্দোলনটা বেশি মাত্রায় ও বেশি জোরে চালাচ্ছে, তা হ'লে তার উত্তর, সে ত প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনটাই যে জাতীয় জীবনের একমাত্র লক্ষণ, তা অবশ্য নয়। বাঙলার বেশির ভাগ লোক আজকাল রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে নারাজ বলে' বাঙলার জাতীয় আত্মা যে ঘুমিয়ে পড়েছে, এরকম অনুমান একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীরাই করতে পারেন। যাঁরা বাঙালীর মনের খবর রাখেন, তাঁদের পক্ষে ও-রকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, সে মনের সন্ধান কোথায় পাওয়া যাবে?—তার সহজ উত্তর, এক পলিটিক্স ছাড়া জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রেই। যে শিক্ষার ফলে আমাদের নব মনোভাব জন্মেছে, সে শিক্ষা বাঙলা থেকে অন্তর্হিত হয় নি; বরং তার প্রসার ও প্রভাব বাঙলা দেশে দিনের পর দিন শুধু বেড়েই চলেছে। সুতরাং বাঙালীর চৈতন্য ইতিমধ্যে জড়ীভূত হয়ে যাবার কোনো কারণ ঘটে নি। তার পর সে চৈতন্যের ক্রমবিকাশ যিনি খুসী তিনি ইচ্ছা করলেই সাহিত্যে, বিজ্ঞানে ও কর্ম্মক্ষেত্রে দেখতে পাবেন। অবশ্য রাজনীতির কর্ত্তাব্যক্তিরা এ সব জিনিসের বড় বেশি খোঁজ রাখেন না, তাঁদের ধারণা যে, রাজনীতিই হচ্ছে জাতীয়জীবন গড়ে' তোলবার একমাত্র উপাদান ও উপায়। লোকের সামাজিক জীবন দেশের রাষ্ট্রতন্ত্রের কতটা অধীন, আর দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র লোকের সামাজিক জীবনের কতটা অধীন এবং এ উভয়ের মধ্যে কার্য্যকারণের কি সম্বন্ধ আছে, সে সব তর্ক এ ক্ষেত্রে তোলা নিষ্প্রয়োজন, কেননা, দেশের কথা বলতে আজকাল অনেকে রাজনীতির কথাই বোঝেন। সে কথার এই সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রাহ্য করে' নিয়েই আমি এ বিষয়ে দু'টি চারটি কথা বলতে উদ্যত হয়েছি।

আজকালকার দিনে মানুষের পক্ষে তার রাজনৈতিক অবস্থা যে উপেক্ষা করা চলে না—এ কথা বলাই বাহুল্য। তার পর রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিবর্ত্তনের পক্ষে রাজনৈতিক আন্দোলন যে একটি প্রকৃষ্ট, অন্তত প্রচলিত উপায়, সে কথাও সকলে স্বীকার করতে বাধ্য। তবে যে, বাঙালী জাতি এ বিষয়ে কতকটা ঔদাসীন্য প্রকাশ করছে, তার কারণ,

মাত্র বক্তৃতার উপর বাঙালীর আস্থা কমে এসেছে। কেন কমে এসেছে, তার কারণ কি আর খুলে বলা দরকার? কে না জানে যে, ইতিমধ্যে বাঙালীর মন পলিটিক্যালি কিঞ্চিৎ পোড় খেয়েছে? সুতরাং সে মন সহজে আর কারও কথায় ভেজে না। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, বহুলোকের মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, আমাদের জাতীয় জীবন গড়ে' তোলবার সমস্যাটা এতই জটিল ও গুরুতর, যে কোনো সহজ উপায়ে তার সমাধান করা যেতে পারে না।

আর এক কথা, আমাদের রাজনৈতিক নেতাদের উপর আমরা অনেকে একান্ত নির্ভর করতে পারি নে। তার একটি কারণ, তাঁদের সকল কথা, সকল ব্যবহার আমাদের সকলের কাছে সমান সু-বোধ নয়। এই ধরুন না, বাঙলার রাজনৈতিক দলে কেন যে একটা দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে, তার কারণ আমরা সকলে খুঁজে পাই নে। আমাদের অনেকেরই বিশ্বাস যে, রিফরম্ নিয়ে সকলের একমত হওয়ার কোনই বাধা ছিল না। বাঙলার নেতারা আজ দেড় বৎসর ধরে' পরস্পরের সঙ্গে যে রকম জ্ঞাতিশত্রুতা সুরু করছেন, তার থেকে তাঁরা নিজেদের মন নিজেরা জানেন কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ হয়; এবং মধ্যে মধ্যে তাঁরা এমন এক একটা ব্যবহার করে' বসেন যে, আমাদের মনে সে সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হয়ে পড়ে।

রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্য একমাত্র কথার সাহায্যেই করতে হয় এবং কথারও যে একটা শক্তি আছে, সে সত্য কিছুতেই অস্বীকার করা চলে না। বাগ্‌যুদ্ধও ত একটা যুদ্ধ বটে এবং এ যুদ্ধে কথাই হচ্ছে মানুষের গুলী-গোলা, এমন কি, স্থল-বিশেষে তা poisonous gas-ও হ'তে পারে! তবে কথার কোনই শক্তি থাকে না, যদি না তার কোনো অর্থ থাকে। রাজনীতিতে আমরা বিলেতি কথা নিয়ে কারবার করি, সম্ভবত সেই কারণে আমাদের দেশী নেতাদের মুখে সে সব কথা অনেক সময়ে নিরর্থক হয়ে পড়ে এবং এই কারণেই তাদের কথার প্রতি আমাদের আস্থা দিন দিন কমে আসছে। যদি liberty এবং equality শব্দের পুরো অর্থ আমাদের নেতা মহাশয়দের সর্ব্বদা স্মরণ থাকত, তা হ'লে তাঁরা বম্বে কংগ্রেসে, আমেরিকা ফ্রান্সের নকল করে' "Rights of man" declare করে' তার দুদিন পরেই সিমলার লাট-দরবারে উপস্থিত হয়ে প্যাটেল বিল সম্বন্ধে, না-হুঁ, না-হুঁ করতেন না। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নাম শুনে যাঁদের বুক ফুলে ওঠে, সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীনতার নাম শুনে তাঁদের মুখ শুকিয়ে যায়, এই স্পষ্ট প্রমাণ যে, liberty প্রভৃতি শব্দ তাঁদের মুখে শুধু কথা মাত্র, ভাষায় যাকে বলে 'বুলি'।

আমাদের নেতাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, যে কথা দ্বারবঙ্গ, গিধড় প্রভৃতি রাজা-মহারাজাদের মুখে শোভা পায়, সে কথা তাঁদের মুখে শোভা পায় না, কেননা, আমরা আশা করি যে, কি বিদ্যায়, কি বুদ্ধিতে, কি জ্ঞানে, কি চরিত্রে তাঁরা উক্ত রাজা-মহারাজাদের দলভুক্ত নন। বম্বে মান্দ্রাজের তুলনায় আমাদের আত্মা যতই ঘুমিয়ে থাক না, এ কথা বোধ হয় জোর করে' বলা যায় যে, বেহারী জমিদারদের চাইতে আমাদের পলিটিক্যাল-আত্মা কিঞ্চিৎ বেশি প্রবুদ্ধ। কিন্তু যখন দেখি যে, দ্বারবঙ্গের মহারাজা ধুয়ো ধরলে আমাদের কোন কোন নেতা অমনি দোহার দিতে সুরু করেন, তখন তাঁদের রাজনীতির বর্ণপরিচয় হয়েছে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

রাজনীতির নেতাদের যে রাজনীতির বর্ণপরিচয় হয় নি, এমন কথা আমরা বল্‌তে চাই নে। তাঁরা যে উল্টো উল্টো কথা বলেন এবং উল্টো উল্টো ব্যবহার করেন, সে হয় ত চাল হিসেবে। কিন্তু আমরা যেহেতু নেতাদের চালের গূঢ় অর্থ বুঝি নে, সে কারণ আমরা তাঁদের কথার সাদা অর্থ বুঝতে চাই এবং যতদিন তা বুঝতে না পারি, ততদিন তাঁদের কথায় নেচে উঠতে পারি নে, যদি কিছু পারি ত হেসে উঠতে। যাঁরা প্যাটেল বিলের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন, তাঁদের এ যুগের রাজনীতির কোনো কথা মুখে আনবার পর্য্যন্ত যে অধিকার নেই, এই সহজ কথাটা যতদূর সম্ভব সহজ কথায় বোঝাতে চেষ্টা করব। কথাটা সহজ এই কারণে যে, বর্ত্তমান রাজনীতির মূল কথাগুলির জন্ম যদিচ ইউরোপে হয়েছে, কিন্তু তা সকল দেশের সকল মানবের প্রাণের কথা, কেননা, যেখানেই মনুষ্যত্বের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা আছে, সেখানেই স্বাধীনতা ও সাম্যের ধর্ম্ম মানুষের মনকে অধিকার করে' বসবে।

২

আজকাল আমাদের রাজনীতির রাজ্যে দু'টি কথা নিত্যই শোনা যায় এবং তা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। সে দু'টি হচ্ছে self-determination এবং democracy. আমাদের হাল পলিটিক্সের

সকল বলা-কওয়া সকল আশা-ভরসা ঐ দু'টি শব্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের নেতারা ঐ দু'টি শব্দের মন্ত্রশক্তিতে এতদূর আস্থাবান্ যে, এবারকার কংগ্রেস Peace Conference-এর জন্য delegate নির্ব্বাচন করেছেন! কংগ্রেস যদি self-determination শব্দের মোহিনী শক্তিতে মোহপ্রাপ্ত না হতেন, তা হ'লে কি এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্যতার পরিচয় দিতেন? সে যাই হোক, আমাদের পলিটিক্যাল বল, বুদ্ধি, ভরসা সকলই যখন ঐ দু'টি শব্দের উপর নির্ভর করছে, তখন কথা দু'টির অর্থ বোঝবার চেষ্টা করা যাক। ভুলে গেলে চলবে না যে, কথা দু'টি শুধু বিলেতি নয়, ওর অর্থও বিলেতি।

প্রথমত ডিমোক্রাসী বলতে কি বোঝায়, তার সন্ধান ডিমোক্রাসীর স্রষ্টা এবং দ্রষ্টাদের কাছে নেওয়া যাক, কেননা, self-determinaton কথাটা ঐ ডিমোক্রাসী হতেই উদ্ভূত। এই ডিমোক্রাসী শব্দের তিনটি সংজ্ঞা আমি নিম্নে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি।

1 "Everybody is to count for one and nobody for more then one"—Bentham.

2. "Democracy is the government of the whole people by the whole people"—Mill.

3. "The progress of all through all"—Mazzini.

মধ্যপথ অবলম্বন করা পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই নিরাপদ; সুতরাং এ ক্ষেত্রেও মিলের ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য করা যাক। ম্যাটসিনির সূত্র গ্রাহ্য করবার পক্ষে বাধা এই যে, তা দর্শনের কোঠায় পড়ে আর বেন্থামের সূত্র গ্রাহ্য করবার পক্ষে বাধা এই যে, তা পাটীগণিতের কোঠায় পড়ে। সংক্ষেপে ম্যাটসিনির সংজ্ঞাকে অনেকটা সঙ্কুচিত এবং বেন্থামের সংজ্ঞাকে অনেকটা প্রসারিত না করলে তা রাজনীতির সূত্র হয়ে দাঁড়ায় না; সুতরাং ধরে' নেওয়া যাক যে, সকলের দ্বারা সকলের শাসনপদ্ধতির নামই ডিমোক্রাসী।

কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন ওঠে। সকলের দ্বারা সকলের শাসনের কি কোনো অর্থ আছে, রাজা প্রজার কি অধিকার ভেদ নেই, রাজ্যশাসন বিষয়ে সকলেই কি সমান অধিকারী? আর যদিই বা তা হয়, তা হ'লে সকলের দ্বারা সকলের শাসন যে সুশাসন হবে, তারই বা কারণ কি?

ডিমোক্রাসীর প্রতিবাদীরা এ প্রশ্ন ইউরোপে একবার নয়, হাজারবার তুলেছেন এবং ডিমোক্রাসীর বিরুদ্ধে এই তর্ক তুলে এক আধখানা নয়, হাজার হাজার বই লিখেছেন।

এ প্রশ্নের উত্তরে ডিমোক্রাসীর স্বপক্ষের যে কি বক্তব্য, সে সম্বন্ধে আমি বর্ত্তমান যুগের একটি বড় ঐতিহাসিকের কথা নিম্নে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি।

"One theory regards the defin te purpose of the government to be the aissurance of liberty to the individual. * * * Such is the theory of the Liberal Radicals"—Seignobos.

অর্থাৎ—ডিমোক্রাসী শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রতন্ত্র, কেননা, এই তন্ত্রের প্রসাদে প্রতি ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পায়। বলা বাহুল্য, ডিমোক্রাসীর ভক্তেরা বিশ্বাস করেন যে,—

"Individuals shonld be allowed to develop without restraint. They will be happier and more active, they will be able to make more progress, society will regulate itself better than under established rules"—Seignobos

অতএব দাঁড়াল এই যে, যিনি individual liberty, অর্থাৎ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মাহাত্ম্যে বিশ্বাস না করেন, ডিমোক্রাসীর নাম উচ্চারণ করবার তাঁর অধিকার নেই। এখানে আর একটি কথা বলে' রাখি, ডিমোক্রাসী এ যুগে ইউরোপে একটি দার্শনিক মত মাত্র নয়, এখন তা সমাজের ধর্ম্ম। ডিমোক্রাসী সে দেশে এখন শুধু বইয়ের ভিতর নেই, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি একটি পূর্ব্বপ্রবন্ধে Seignobos-এর ইতিহাস থেকে ইউরোপের বর্ত্তমান সমাজের ধর্ম্মকর্ম্মের যে বর্ণনা উদ্ধৃত করে' দিই, এখানে তা পুনরুদ্ধৃত করে' দিচ্ছি:—

"বর্ত্তমানে সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ যুগে মানুষের উপর মানুষের কোনো অধিকার নেই। প্রতি লোকেই নিজের ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র অনুসারে নিজের জীবনগঠন করতে পারে। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে সবাই মুক্ত। ধর্ম্ম সম্বন্ধে, চিন্তা সম্বন্ধে, মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে সকলেরই সমান স্বাধীনতা আছে। ইউরোপে মানুষ আজ মানুষের দাস নয়।

অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসীর গোড়ার কথা, আর তার শেষ কথা এবং ঐ স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসীর ভিত্তি ও চূড়া।

স্বাধীনতাই হচ্ছে ডিমোক্রাসীর মূলমন্ত্র; কিন্তু এই স্বাধীনতা শব্দের অর্থ কি? ফ্রান্সের যে declaration-এর নকলে আমাদের নেতারা বম্বেতে নিজেরা এক declaration করেছেন,

সেই দলিলেই liberty শব্দের অর্থ পাওয়া যাবে। সে Declaration of Rights-এর চতুর্থ দফাটি নিম্নে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি—

"Liberty consists in the power to do anything that does not injure others; thus, the exercise of the natural rights of every man has only such limits as to assure to other members of society the enjoyment of the same rights. These limits can only be determined by law."

এ সংজ্ঞার অনেক খুঁত ধরা যায়, কিন্তু liberty-র এ ব্যাখ্যা মোটামুটি সত্য এবং এই সত্যের উপরেই ডিমোক্রাসী প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যাঁরা রাষ্ট্রতন্ত্রে ডিমোক্রাসী চান, তাঁদের পক্ষে প্যাটেল বিলের বিরুদ্ধাচরণ করাটা মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাচীন প্রথার বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে' নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে বিবাহ করবার অধিকার হচ্ছে মানুষের একটি স্বাভাবিক অধিকার এবং এ অধিকার যত দিন আইনের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন সে অধিকারে প্রতি লোক বঞ্চিত। এ ক্ষেত্রে ধর্ম্মনীতি এবং সমাজের দোহাই দেওয়াটা ডিমোক্রাসী বিদ্বেষীদের চিরকেলে স্বভাব। ইউরোপের লোকেরা যখন খৃষ্টীয় শাসন-তন্ত্রের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে বিবাহ করবার অধিকার দাবী করে, তখনো সে দেশের absolutist-রা বরাবর ঐ ধর্ম্মনীতি ও সমাজ রক্ষার দোহাই দিয়ে এসেছে। জর্ম্মাণীর উদাহরণ দেওয়া যাক। জর্ম্মাণীর লিবারল-রা চিরকালই বিবাহ সম্বন্ধে এই স্বাধীনতার দাবী করত, কিন্তু সে দেশের ধর্ম্মযাজকেরা এবং রাজপুরুষেরা চিরদিনই তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। শেষটা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মাণ সম্রাট্ দেশের লোককে এ অধিকার দিতে বাধ্য হন। সে সময়ে কন্সারভেটিভের দল গভর্ণমেণ্টকে এই বলে' আক্রমণ করেন যে, গভর্ণমেণ্ট "প্রুসিয়াকে ইউরোপ করে' তুলছে এবং সেই সঙ্গে ধর্ম্ম এবং সমাজের মূলচ্ছেদ করছে।" প্যাটেল-বিলের বিরুদ্ধেও অভিযোগ এই যে, তার ফলে হিন্দুসমাজ ইউরোপীয় সমাজ হয়ে দাঁড়াবে এবং ধর্ম্ম ও সমাজ উচ্ছন্নে যাবে। এ কথা যাঁরা বলেন, তাঁদের মুখে ডিমোক্রাসীর নাম, জীববিশেষের মুখে রামনামের মতই শোনায়।

শেষে self-determination অর্থ সম্বন্ধে দু' একটি কথা বলতে চাই। যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা democracy-র মূলমন্ত্র, সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই হচ্ছে self-determination-এর গোড়ার কথা। যে স্বাধীনতা পূর্ব্বে সভ্যসমাজের কাছে ব্যক্তিগত হিসাবে গ্রাহ্য হয়েছিল, সেই স্বাধীনতা এখন জাতিগত হিসাবে গ্রাহ্য হচ্ছে। এক একটি জাতিকে এক একটি ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করে' সে জাতির যে নিজের ইচ্ছা, রুচি ও চরিত্র অনুসারে জীবন গঠন করবার অধিকার আছে, এই মতটারই বিলেতি নাম হচ্ছে self-determination, বেন্থামের কথায় বলতে গেলে এ মতে প্রতি জাতিই is to count for one এবং কোনো জাতিই is not to count for more than one এবং Declaration of Rights-এর ভাষায় বলতে গেলে, প্রতি জাতিরই স্বাধীনতা আছে—to do anything which do not injure others, কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি কথা সকলকে স্মরণ রাখতে বলি যে, একটি জাতির কোনো self নেই—ব্যক্তির ধর্ম্ম জাতিতে আরোপ করে' আমরা জাতিকে ব্যক্তি বলি। Self-determination ব্যক্তির পক্ষেই প্রকৃত, জাতির পক্ষে আরোপিত মাত্র। সুতরাং ব্যক্তিগত self-determination-এ যাঁরা বিশ্বাস করেন না, তাঁদের মুখে national self-determination-এর কথা কাকাতুয়ার বুলি ছাড়া আর কিছু নয়। 'ডিমোক্রাসী' 'লিবারালিজম্' প্রভৃতি শব্দ যাঁদের পক্ষে মুখের কথা নয়, কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সামিল, তাঁদের কাছে ও সকল শব্দের অর্থ যে কি, একটি উঁচুদরের ইংরাজ লেখকের কথায় তার পরিচয় দিচ্ছি:—

"Liberalism is the belief that society can safely be founded on this self-directing power of personality, that it is only on this foundation that a true community can be built, and that so established its foundations are so deep and so wide that there is no limit that we can place to the extent of the building. Liberty then becomes not so much a right of the individual as a necessity of society:—L. T. Hobhouse.

যাঁরা সমাজহিতের দোহাই দিয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে পঙ্গু করতে চান,—তাঁদের উপরিউক্ত কথা ক'টি একটু মন দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি।

পৌষ, ১৩২৫।

তেল, নুন, লকড়ি

যেমন আমরা অতীতে বিদেশীয়তা স্বদেশীরকমে অভ্যাস করেছি, তেমনি আমাদের ভবিষ্যতে স্বদেশীয়তা বিদেশী নিয়মে চর্চ্চা করতে হবে। আমরা সাহেব হয়েছিলুম বাঙ্গালীভাবে। সে ব্যাপারটার মধ্যে আমাদের স্বাভাবিক ঢিলেমি এবং এলোমেলোভাবেরই শুধু পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা দল বেঁধে বিধিব্যবস্থাপূর্ব্বক সাহেব হইনি। প্রতিজনেই নিজের খুসী কিম্বা সুবিধা অনুসারে, নিজের চরিত্র এবং ক্ষমতার উপযোগী হঠাৎ-সাহেব হয়ে উঠেছি। ইঙ্গ-বঙ্গসমাজে আমরা সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান। স্বদেশী আচার-ব্যবহার ছাড়বার সময় আমরা পুরুষেরা পহিলা সমিতি করিনি, এখন ফিরে ধরবার ইচ্ছে আমরা মহিলা-সমিতি পর্য্যন্ত গঠন করেছি। এই যথেষ্ট প্রমাণ যে, আমাদের নূতন ভাব কার্য্যে পরিণত করতে হ'লে ভাবনাচিন্তা চাই, কি রাখব, কি ছাড়ব, তার বিচার চাই; পাঁচজনে একত্র হয়ে কি করতে পারব এবং কি করা উচিত, তার একটা মীমাংসা করা চাই; এক কথায়, ইংরেজ যে উপায়ে কৃতকার্য্য হয়েছে, সেই উপায়—একটা পদ্ধতি, অবলম্বন করা চাই। সমাজ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার ভিতর নিয়ম নেই। ঝোঁকের মাথায় রোখের সহিত কাজ করতে গেলে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হওয়াই দরকার। কিন্তু সমাজে থাকতে কিম্বা ফিরতে হ'লে, সকলেরই মানসিক গতি একই কেন্দ্রের অভিমুখী হওয়া চাই, এক নিয়মে অনেককে ধরা দেওয়া চাই। আমাদের বিদেশীয়তার ভিতর হিসাব ছিল না, স্বদেশীয়তার ভিতর হিসাব চাই। যে পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা উৎসুক হয়েছি, তার বিষয় হচ্ছে প্রধানত বাহ্যবস্তু। কিন্তু সেই পরিবর্ত্তন সুসাধ্য করতে হ'লে মনকে অনেকটা খাটাতে হবে। সমাজে থাকতে হ'লে বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ কোন চর্চ্চা করবার দরকার নেই, প্রচলিত নিয়মের নির্ব্বিচারে দাসত্ব স্বীকার করলেই হ'ল; ছাড়তে হ'লেও দরকার নেই—নির্ব্বিচারে নিয়ম লঙ্ঘন করলেই হ'ল। কিন্তু ফিরতে হ'লে, মানুষ হওয়া চাই; কারণ, যে ফেরে, সে নিজের জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা কর্ত্তব্য স্থির করে' নিয়ে স্বেচ্ছায় ফেরে। আমরা বাঙ্গালা-সাহেবই হই আর খাঁটি বাঙ্গালীই হই, আমরা সকলেই এক পথের পথিক হয়েছিলুম; কেউ বা বিপথে বেশি দূর এগিয়েছি, কেউ বা কিছু পিছিয়ে আছি। আমাদের সমাজস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই বর্ণচোরা-বাঙ্গালী-সাহেব। আমাদের হিন্দুসমাজের শৃঙ্খলা অতীতে গঠিত হয়েছিল, আজকালকার দিনে নূতন অবস্থায় কতকাংশে তা সকলেরই পক্ষে শৃঙ্খল মনে হয়। আমরা জনকতক শুধু উচ্ছৃঙ্খল হয়েছি, বাদবাকী সকলে সমাজকে বিশৃঙ্খল করে' ফেলেছেন। সুতরাং সকলে মিলেই স্বদেশীয় আচার-ব্যবহারে ফিরে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছি। সকলেই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, সুতরাং যে-পরিমাণে সাধ্য এবং উচিত, সেই পরিমাণে ফিরব, তার বেশি নয়। জাতীয় জীবনের বিশেষ কোন লক্ষ্য ছিল না বলে' এতদিন আমরা গা ঢেলে দিয়ে স্রোতে ভাসছিলুম, তার ভিতর কোন আয়াস, কোন চেষ্টা ছিল না; এখন গম্যস্থানের একটা ঠিকানা পাওয়া গেছে, সুতরাং সাঁতার কাটতে হবে—শুধু এলো-মেলোভাবে, অতিবেগে হাত-পা ছুঁড়লে চলবে না;—তাতে পাঁচজনে হাসবে, দশজনে "বাহবা কি বাহবা, কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ" বলবে, কিন্তু আমরা লাভের মধ্যে শীঘ্রই এলিয়ে পড়ব এবং নাকানি-চোবানি খাব।

পূর্ব্বেই বলেছি যে, আমরা বাঙ্গালীমাত্রেই ঐ একই বিলেতি ক্ষুরে মাথা মুড়িয়েছি। শুধু কারও মাথায় কাকপক্ষ অবশিষ্ট, কারও মাথায় বা শুধু টিকি; যাঁর যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তিনি সেইটেই স্বদেশীয়তার ধ্বজাস্বরূপ আস্ফালন করেন। এ ব্যাপারে আমাদের ইঙ্গ-বঙ্গদলের মন ভারি করবার কোন কারণ নেই। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের জাতি যদি কোন স্থায়ী সুফল লাভ করে' থাকে ত সে মনে,—আর যা যা ক্ষণস্থায়ী কুফল লাভ করেছে, সে বাহ্য আচার-ব্যবহারে। মোটামুটি ধরতে গেলে এ ব্যাপারের লাভ-লোকসানের হিসেবটা ঐরূপ দাঁড়ায়। সেই আচার-ব্যবহারের বিজাতীয়তা আমাদের মধ্যে যেমন স্পষ্ট এবং জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে, এমন আর অন্য কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে হয় নি। সকলেই অল্প-বিস্তর বিলেতি মধু পান করেছেন, কিন্তু পুরো নেশা শুধু আমাদেরি ধরেছে। বিদেশী বস্তুর বড় বস্তা আমরা মাথায় বহন করছি, অপরে পুঁটলি-পাঁটলা নিয়ে চলেছে। আমরা যদি আমাদের মাথার সে ভার নামাতে পারি, তা হ'লে অপরের পক্ষে তাদের মাথার সে ভার ঝেড়ে ফেলা কঠিন হবে না। এই স্বদেশীয়তার কথা শুধু দেশের কথা

নয়—এ ঘরেরও কথা। বাঙ্গালী যখন নিজের সমাজ ছাড়ে,তখন সেই সঙ্গেনিজের স্বভাব ছাড়ে না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে ; অর্থাৎ সেখানেও অপরের পায়ের চাপ না পেলে তার দিন চলে না। আমাদেরও স্বভাব তাই। নিজের সমাজের চাপ থেকে বেরিয়ে এসে বিদেশী সমাজের পায়ের চাপ আমরা পিঠে তুলে নিই। বাঙ্গালীজাতকে পিটে গড়া হয় নি। আমরা ঢালাই হ'তে ভালবাসি। এক ছাঁচ থেকে বেরলে আমরা অন্য ছাঁচে না পড়লে ঠাণ্ডা হই নে। অনুকরণ আমাদের স্বাভাবিক এবং অনুকরণে যেহেতু শুধু উপকরণ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু কিছুই আত্মসাৎ করা যায় না. সেই কারণে আমরা বিলেতি সভ্যতার উপকরণে আমাদের দৈনিক জীবন নিতান্ত ভারাক্রান্ত করে' তুলেছি। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয় ত অস্থিমজ্জায় অনুভব করেছেন যে, বিলেতি সভ্যতার কুলিগিরির মজুরি পোষায় না। কিন্তু দু'একজন ছাড়া মুখ ফুটে সে কথা বল্‌তে বড় কেউ সাহসী হন নি। দেশীয় সমাজের রীতি-নীতির অধীনতার মধ্যে, কার্য্যের না হোক, চিন্তার স্বাধীনতা আছে। যার মন আছে, তার সামাজিক আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার এবং মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে ; কিন্তু বিলাতের অনুকরণে যে বাঙ্গালী ঘর বাঁধে, তার একুল ওকুল দুকুল যায়। আমাদের মধ্যে যার মন যত ঢিলে, তার সাহেবিয়ানার আঁটা-আঁটি তত বেশি। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণ কোথায়, যে বুঝতে পারে না, সে তার সর্ব্বাঙ্গ হাতড়ে বেড়ায়। আমরা অনেকে একটা খোরপোষের বন্দোবস্ত করতে বিলেত যাই, সুতরাং বিলেতি সভ্যতার যে শুধু খাওয়া-পরার অংশটা আয়ত্ত করতে চেষ্টা করব, এর আর আশ্চর্য্য কি ? কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যে আরামের লোভে আমরা সর্ব্বস্ব খোয়াতে বসি, সেই আরামই আমাদের জোটে না। দেশীয় সমাজের চাল-চলন শৈশব হ'তে অভ্যস্ত বলে' সেদিকে মন দিতে হয় না, ঠিক ঠিক জিনিসটে অবলীলাক্রমে করে' যাই ; কিন্তু বিদেশী চালচলন সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই একটা বয়সে কেঁচে গণ্ডূষ করতে হয়। একটু বয়েস হ'লে একটি বিদেশী ভাষা আয়ত্ত করা যেমন কষ্টসাধ্য, একটি বিদেশী সমাজের হাজারো-এক খুঁটিনাটি, আচার-ব্যবহার আয়ত্ত করাও তেমনি কঠিন। বিলেতি সভ্যতার সুমুখে বাঙ্গালী-সাহেবের আঁচল টানতে টানতে প্রাণ যায়। খানায় পোষাকে যাঁরা সভ্যতা খোঁজেন, তাঁদের খানার, পোষাকের কায়দা-কানুন কন্ঠ কর্ত্তে নাস্তানাবুদ খানেখারাপ হ'তে হয়। যাঁরা মাছিমারা নকল করতে চান, তাঁদের নিত্য দেখতে পাই, অক্ষরের পর অক্ষর ধরে' বিদেশী হালচাল অভ্যেস করতে প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ হচ্ছে। অন্যকে বানান করে, পড়তে শুনলে মায়াও করে, বিরক্তিও ধরে, সাধারণ ইঙ্গ-বঙ্গের প্রতিও আমাদের ঐ মনোভাব। কারও কারও বা বিলেতি সভ্যতার বর্ণপরিচয় হয়েছে, কিন্তু অর্থবোধ হয় নি। এতদ্দেশীয় মুসলমান-মহিলার কোরাণপাঠের মত তাঁদের সভ্যতা-চর্চ্চার পরিশ্রমটা বৃথা যায়।

সংস্কারবশত হিন্দুসমাজের প্রতি যাঁদের প্রাণের টান আছে, অথচ শিক্ষাবশত যাঁরা সংস্কারমাত্রেরই অধীন নন, যাঁদের ধারণা যে, ইউরোপের শিষ্য হওয়া এবং দাস হওয়ার ভিতর আকাশপাতাল প্রভেদ, যাঁরা বিলেতি আচার-ব্যবহার কতকপরিমাণে অবলম্বন করেন,—হয় বুদ্ধির দ্বারা পরীক্ষা করে', নয় জীবনে পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যে,—এক কথায় যাঁরা শ্যাম এবং কুল, দুই-ই রাখবার চেষ্টা করেন, তাঁরা আহেল বিলেতি ইঙ্গ বঙ্গদের মতে কেন্দ্রভ্রষ্ট। বাদবাকি যাঁরা নিজের নিজের ব্যবসা ব্যতীত অপর কোন বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র মনপ্রয়োগ করাটা বুদ্ধিবৃত্তির বাজে-খরচ মনে করেন, তাঁরাই বুদ্ধিমান। কেন্দ্রভ্রষ্ট ?—কোথাকার,কোন্ সমাজের, কোন্ কেন্দ্রভ্রষ্ট ? এ প্রশ্ন করলে সকল বুদ্ধিমান্‌ই নিরুত্তর। পড়ান-কাকাতুয়ার কপ্‌চান বুলির মত যদি তাঁদের কথা নিরর্থক না হয়, যদি তাঁদের বক্তব্যের ভিতর মনের কার্য্য কিছু প্রচ্ছন্ন থাকে ত সে মনোভাব এই—তাঁরা প্রত্যেকেই এক একটি কেন্দ্র, তাঁদের কাছ থেকে যে যতটা তফাৎ, সে ততটা কেন্দ্রচ্যুত, ততটা উন্মার্গগামী। বিলেত-ফেরত পাড়ায় প্রতি গৃহ একটি সৌরজগৎ ; হয় কর্ত্তা নয় গৃহিণী সেই জগতের কেন্দ্র ; পরিবারের আর সকলে গ্রহ উপগ্রহের মত তারই চারি পাশে পাক খায়,—এখানে-সেখানে দু'একটি ধুমকেতুও দেখা দেয়। আমাদের কারও গৃহ, হিন্দুগৃহের একটি পরিবর্ত্তিত, যুগপৎপরিবর্দ্ধিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র ; কারও বা গৃহ বিলেতি গৃহের একটি নিকৃষ্ট ফটোগ্রাফ মাত্র। আমরা কেউ বা বিদেশীয়তার দু'চার সিঁড়ি ভেঙ্গেছি, কেউ বা এক লম্ফে বিলেতি সভ্যতার মন্দিরের চূড়ার উপরিস্থিত ত্রিশূলের উপর গিয়ে চড়ে' বসেছি।

সাহেবিয়ানার প্রচণ্ড নেশায় বঙ্গসন্তানকে যে কতদূর বে-এক্তিয়ার করে' ফেলতে পারে, তার প্রমাণ ধর্ম্মতলার রঙ্গমন্দিরে ধর্ম্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠার্থে করুণ

যাত্রাদলের বিদেশীর পৃষ্ঠপোষকতায় Tableaux Vivants-অভিধেয় বিচিত্র চিত্র অভিনয় নেশা ধরা পড়ে দুই জিনিসে,—অঙ্গবিক্ষেপে এবং বাক্যবিপর্য্যয়ে। এ ব্যাপারে দুই লক্ষণেরই সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। ঐ দৃশ্যকাব্যের পিছনে একটি দর্শন আছে, একটি কবিত্ব আছে; সেই কবিত্বপূর্ণ দর্শন কিম্বা দার্শনিক কবিত্বের প্রকাশ New India সংবাদপত্রে। উক্ত ব্যাপারে স্বপক্ষে New India-র মতামত, India না হোক্, new বটে। জষ্টিস্ অনুকূল মুখার্জ্জির জীবনীর ভাষা যেমন নতুন, এর ভাবও তেমনি নতুন; এবং উভয় রচনাই এক উপায়ে সিদ্ধ হয়েছে। ইংরাজি, ফরাসি, লাটিন, গ্রীক এবং ইটালিয়ান নানা ছোট-বড় বাছা-বাছা বাক্য ও পদের অসঙ্গত সমাবেশে মুখোপাধ্যায় ম'শায়ের জীবনীলেখকের রচনা, ভাষার রাজ্যে যেমন এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি,—জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের ছোট-বড় নানা বাছা-বাছা শব্দ এবং বাক্যের অসঙ্গত সমাবেশে সম্পাদক ম'শায়ের রচনা চিন্তার রাজ্যে তেমনি এক অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। লেখক কিছুই বাদ দেন নি—চিত্রকলাও নয়, নৃত্যকলাও নয়। কলাবিদ্যার কতকটা জ্ঞান অনেকটা চর্চ্চার উপর নির্ভর করে, কিন্তু অসমসাহসী লেখকের পক্ষে ঠিক তার উল্টো। দাম্ভিকতার বলে অজ্ঞতা বিজ্ঞতার সিংহাসনে অধি-রোহণ করতে পারে। কলাবিদ্যার শুধু শেষাংশ দেখাবার চেষ্টা করে অনেকে, তাঁরা যে শুধু তার প্রথমাংশ জানেন, এই প্রমাণ করেন। এ বিশ্ব ভগ-বানের লীলাখেলা হ'তে পারে, কিন্তু সমাজের সৃষ্টি, স্থিতি এবং উন্নতি মানুষের লীলাখেলার ফল নয়। এই প্রবন্ধে উক্ত ব্যাপারের অবতারণা কর্‌বার একটু বিশেষ সার্থকতা আছে। আমাদের নকল সভ্যতা এর ঊর্দ্ধে আর উঠ্‌তে পারে না। আমাদের দোলের ঐ শেষসীমা, পেণ্ডুলম্‌কে ঐখান হ'তেই ফির্‌তে হবে এবং কার্য্যতঃ ফির্‌তে আরম্ভ করেছে। ঘরে বিদেশী অনাচারের ঠেলা এবং বাইরে বিদেশী অত্যাচারের চাপ, এই দু'য়ের ভিতর পড়ে' যাঁরা কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভব করছিলেন, তাঁদের অনেকেরই আজ চৈতন্য হয়েছে। ঐ ঘটনায় আমাদের মধ্যে অনেক অন্য-মনস্ক লোকেরও মনে পড়ে' গেছে যে, আমাদের একটা সমাজ বলে' কোন জিনিস নেই। আমরা ঝরা পাতার দল, হাওয়ায় আমাদের কখন বা একত্র জড় করে, কখনও বা ছড়িয়ে দেয়। গাছের অসংখ্য পাতা, প্রত্যেকে স্বতন্ত্র হ'লেও তাদের সকলের ভিতর নাড়ীর এবং রক্তের বন্ধন আছে—তাদের একের প্রাণের মূলও যেখানে, অপরের প্রাণের মূলও সেখানে—দেশের মাটিতে। কিন্তু আজ আমাদের অনেকেরই চোখ ফুটেছে। আমরা নিজের নিজের সঙ্কীর্ণ সমাজ ত্যাগ করলেও, হিন্দুসমাজ আমাদের ত্যাগ করে নি। আমরা নিজেরা শুধু সেই বৃহৎ সমাজের মধ্যে আর একটি সঙ্কীর্ণ সমাজ গড়্‌তে চেষ্টা করে-ছিলুম,—সৌভাগ্যক্রমে তাতে কৃতকার্য্য হইনি। আজকাল ভারতবাসীর দেহে নূতন প্রাণ এসেছে; হিন্দুসমাজ একটি সুবৃহৎ স্বদেশী সমাজে পরিণত হচ্ছে, জাতের ভাব দূর হয়ে জাতীয় ভাব উপস্থিত হয়েছে, আমরা পরস্পরের পার্থক্য ভুলে গিয়ে স্বদেশীর সঙ্গে বিদেশীর পার্থক্য অনুভব করতে আরম্ভ করেছি। এ অবস্থায় আমাদের স্বদেশীব্রতায় ফেরার অর্থ, আমরা যে বরাবর স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তর্ভূত হয়েই আছি, সেই বিষয়ে স্পষ্টজ্ঞান জন্মান। আমরা যে সমাজে ফির্‌ছি, সে সমাজ পূর্ব্বে ছিল না, আজও পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হয়নি, ভবিষ্যতে তার রূপ যে কি হবে, তাও আমরা আজ ঠিক ধর্‌তে পারিনে। তার স্বরূপ জান্‌বারও কোন আবশ্যক নেই, শুধু এই জানি যে, আমাদের জাতির মূলশক্তি উদ্বোধিত হয়েছে। সেই শক্তি আমাদের সকলেরই প্রাণে জাগরূক হয়ে উঠেছে, যে শক্তির কার্য্য হচ্ছে আমাদের সমগ্র জাতির অপরূপ শ্রী এবং উন্নতিসাধন করা। জড় পদার্থ নিয়ে একটা কিছু গড়তে হ'লে—আগে হতেই একটা plan এবং estimate করতে হয়; কিন্তু প্রাণ নিজের আকৃতি নিজে গড়ে' নেয়, বিকা-শের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপও ক্রমে স্পষ্ট হয়ে আসে। প্রকৃতি যে ফুল ফোটাবে, মানুষ তার সাহায্য কর্‌তে পারে কিম্বা বাধা দিতে পারে, কিন্তু তাতে স্বকপোল-কল্পিত বর্ণ, গন্ধ, আকার এনে দিতে পারে না। কাগজের ফুল রচনায় আমাদের যে স্বাধীনতা আছে, গাছের ফুল ভাল করে' ফোটানোতে সে স্বাধীনতা নেই। আমাদের স্বদেশী সমাজের অক্ষয়-বটে নূতন পাতা দেখা দিয়েছে, আমাদের কর্ত্তব্য এখন তার গোড়ায় প্রচুর সার এবং জল যোগান, আর চারপাশের জঞ্জাল ও জঙ্গল দূর করা। আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকসকল স্বদেশী সমাজ অবলম্বন করেও আমাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করব, কিন্তু সে তার শাখা-প্রশাখা হয়ে—পরগাছা হয়ে নয়। সুতরাং আমরা স্বদেশে যাতে বিদেশী না হই, সে বিষয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের তন-মন-ধন দেশের পায়ে বিকতে হবে,—বিদেশের পায়ে নয়।

আমাদের এই ধারণাটুকু জন্মানো উচিত যে, আমাদের কেউ নিজের শক্তি বিক্ষিপ্ত করে' ফেল্‌বার অধিকারী নন; সকলের শক্তি একত্র করে' সংহত করে', স্বদেশের স্বজাতির উন্নতির কার্য্যে প্রয়োগ কর্‌তে হবে। অল্প হোক্, বিস্তর হোক্, আমাদের প্রত্যেকের আত্মশক্তি যাতে ব্যর্থ না হয়, যাতে তা সামাজিক গতির সহায়ভূত হয়, তার জন্য প্রথমত দিক্ নির্ণয় করা দরকার। তার পর, কোথায় কি উপায়ে নিজশক্তি প্রয়োগ কর্‌তে পারি, তার হিসাব জান্‌তে হবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার বক্তব্য দেখতে পাচ্ছি ক্রমে ফলাও এবং গুরুতর হয়ে আসছে। এই স্থানেই সুতরাং আমাকে মনের রাশ টেনে ধর্‌তে হবে। এ প্রবন্ধে আমার কতকগুলো সাদা-সিধে ছোটখাটো দৈনিক আচার-ব্যবহারের আলোচনা কর্‌বার অভিপ্রায় আছে। কিন্তু হঠাৎ দেখছি, ধান ভান্‌তে বসে' শিবের গীত সুরু করে' দিয়েছি। এখন ভূমিকা ছেড়ে জমিতে নামাই আমার পক্ষে কর্ত্তব্য। আর একটি কথা বলেই আমি প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ কর্‌ব। সে কথাটি হচ্ছে এই —ভারতবর্ষের লুপ্ত সভ্যতা উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়;—আজকের দিনে নিজের দেশে আপনার ভিতর যে নূতন সভ্যতার বীজের সন্ধান পেয়েছি, তাকেই পত্র-পুষ্প-ফল-মণ্ডিত মহাবৃক্ষে পরিণত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। স্বদেশের জ্ঞান লাভ কর্‌তে গিয়ে স্ব-কালের জ্ঞান যেন না হারাই। আমাদের নূতন সভ্যতা যে রূপই ধারণ করুক না কেন, মাটির গুণে তাকে স্বদেশী হতেই হবে। জীবনীশক্তির স্ফূর্ত্তি, পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়েই হয়। বীজ থেকে বৃক্ষ একটা ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের সমষ্টি মাত্র। আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ, ভূত সমাজও হবে না, অদ্ভুত সমাজও হবে না। ইংরেজিয়ানার মোহে আমরা অদ্ভুতত্বের চর্চ্চা কর্‌ছিলুম, কিন্তু ভূতে না পেলে যে অদ্ভুতত্ব বর্জ্জন করা যায় না, এমন নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের জাতির ভিতর প্রাণ আছে। বর্ত্তমান অশান্তি শুধু নূতন জীবনের চাঞ্চল্য, মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্ব্ব বিকারের ছটফটানি নয়। যে সমাজে প্রাণ আছে, সে সমাজে প্রাণের যে প্রধান লক্ষণ,—বাইরের অবস্থার উপযোগী আত্মপরিবর্ত্তন,—সে লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে দেখা যাবে। এ জগৎ গম ধাতু হ'তে উৎপন্ন,—এমন গুণী আমরা কেউ নই যে, জগতের ধাত বদলে দিতে পারি। স্বদেশীভাবের মূল হ'তে অনেক আশার ফুল ফুট্‌বে, কিন্তু ফল ধর্‌বে না। দেশের মাটি ভালবাসি বলে' যে, মাটি নিতে হবে, মাটি কাম্‌ড়ে পড়ে' থাক্‌তে হবে, শেষটা মাটি হ'তে হবে, এ ভুল যেন কেউ না করেন। আমরা আজ যখন জীবনের পথে অগ্রসর হ'তে চলেছি, তখন এইটে মনে রাখ্‌তে হবে যে, দেশের মাটি আমাদের পদক্ষেপের পক্ষে ভগবানদত্ত অটল নির্ভর। অতীতের যে আগুন নিবেছে, যার এখন ভস্মমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাতে অতি ভক্তিভরে বাতাস দিলেও শুধু ছাই উড়িয়ে সমাজের চোখে ফেল্‌বো, কিন্তু আমাদের জাতির প্রাণে যেখানে আজও আগুন আছে, সেখানেই ফুঁ দিতে হবে, পাখা কর্‌তে হবে। যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন,—কোথায় শুধু ছাই, আর কোথায় ছাই-ঢাকা আগুন আছে, কি করে' জান্‌ব? তার উত্তর,—যদি স্পর্শ করে' আগুন না চিন্‌তে পার ত পাঁজি-পুঁথির সাহায্যে তা পারবে না। অতঃপর ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের এগোতে হবে। বড়গোছের একটা লাফ মার্‌বার পূর্ব্বে মানুষ কিঞ্চিৎ পিছু হটে পাল্লা নেয়—আমাদের সমাজ এখন পাল্লা নিচ্ছে। সরীসৃপের মত সমাজও ক্রমাগত দেহকে আকুঞ্চন-প্রসারণ করে' অগ্রসর হয়। কি উপায়ে কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক দেহের আজ আকুঞ্চন করা কর্ত্তব্য, সেই সম্বন্ধে গোটাকতক কথা বল্‌তে উদ্যত হয়েছি।

২

বিবাহিত জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে পাঞ্জাবী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে,—

"ভুল গেয়া রাগরঙ্গ, ভুল গেয়া ইয়কড়ি,
ইয়াদ রহা আজ খালি তেল নুন লকড়ি।"

ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধ আজকাল কতকটা ঐ ভাবের দাঁড়িয়েছে। আমরা শিক্ষিত ভারতবাসীরা এতদিন প্রভুর চিত্ত আকর্ষণ কর্‌বার জন্য কতই না হাবভাব, লীলাখেলার চর্চ্চা করেছি। ওনার মনোমত কেশবিন্যাস, বেশবিন্যাস, বাগ্‌বিন্যাসের চাতুরী অভ্যাস করেছি। আত্মহারা হয়ে ইউরোপের আত্মীয় হ'তে যত্ন ও পরিশ্রমের ত্রুটি করি নি। এত করেও যখন মন পেলুম না, তখন মান-অভিমানের পালা সুরু করলুম। ফল তাতে উল্টো হ'ল,—দাম্পত্য প্রণয়ের দাবি করাতে দাম্পত্য কলহের সৃষ্টি হয়েছে। তাই আজ তেল, নুন, লকড়ির

কথাই আমাদের মনে প্রাধান্য লাভ করেছে। মানবজাতিকে আমরা যে যেই ভাবে দেখি না কেন, মানবজীবনে সকলেই তেল, নুন, লকড়ির গুরুত্ব স্বীকার করতে বাধ্য। দেহকে আত্মার কারাগারই মনে করি, আর আত্মার মন্দিরই মনে করি, এ পৃথিবীতে দেহমনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের ভিত্তির উপর ব্যক্তিগত ও জাতিগত জীবন গড়তে হবে। ইহলোকের সত্যকে মিথ্যা জ্ঞান করলে শুধু পরলোকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বেড়ে যায়। হিন্দুশাস্ত্রের মতে অন্ন প্রাণ। সুতরাং অন্নচিন্তাই প্রাণিমাত্রেরই আদিম চিন্তা। এই অন্নচিন্তা হ'তে উদ্ধার না পেলে অন্য চিন্তা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তেল, নুন, লকড়ির অধীনতাপাশ মোচন না করতে পারলে, মনের এবং আত্মার পুরো স্বাধীনতা পাওয়া যায় না। Material prosperity সভ্যতার চরম লক্ষ্য নয়, কিন্তু একটি বিশিষ্ট উপায়। তেল, নুন, লকড়ির অধীনতা হ'তে মুক্ত হবার একমাত্র উপায়—তেল, নুন, লকড়ির সংস্থান করা। আমাদের আজ হঠাৎ চৈতন্য হয়েছে যে, ভারতবাসীর সে সংস্থান নেই। আমরা শুকিয়ে যাচ্ছি, কেননা, দেশের রস বিদেশে টেনে নিচ্ছে। নিজ দেশের রস নিজ দেহের রক্তে কিরূপে পরিণত করতে পারি, সেই আমাদের প্রধান সমস্যা। আমরা যদি ভুলে গিয়ে না থাকি, তা হ'লে আমাদের "রাগরঙ্গ ইস্কুকড়ি" ভুলে যেতে হবে, আর আমাদের মনে যদি না থাকে, তা হ'লে মনে রাখতে হবে, শুধু "তেল নুন লকড়ি।" রাস্কিন্ সমস্ত জীবন ধরে' ইংলণ্ডকে এই বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, economics এই গ্রীক শব্দের আদিম অর্থ household management, অর্থাৎ গেরস্থালী। প্রতিগৃহে যদি লক্ষ্মী না থাকেন, তা হ'লে সমগ্র জাতি লক্ষ্মীছাড়া হবে। ঘর যদি অগোছাল রাখ, তা হ'লে হাটে-বাজারে যতই কেনা-বেচা কর না কেন, তাতে নিজে কিম্বা জাতি যথার্থ শ্রী এবং সুখলাভে সমর্থ হবে না। এ মতের মধ্যে এইটুকু খাঁটি সত্য নিহিত আছে যে, দশে মিলে জাতীয় সমৃদ্ধিলাভের যে সমবেত চেষ্টা করি, তার সুফল আমরা ঘরে ঘরে স্বেচ্ছাচারিতায় নিষ্ফল করে' দিতে পারি। আমরা যদি সকলে একত্র হয়ে বাইরে একদিকে টানি, আর প্রতিলোক ঘরে এসে তার উল্টো টান টানি—তা হ'লে ঘর-বার দুই নষ্ট হবে। আমি রাস্কিনের শিষ্যস্বরূপে এই কথা প্রচার করতে উদ্যত হয়েছি যে, সু-গৃহিণীর প্রথম এবং প্রধান কাজ গৃহের সম্মার্জ্জনা করা।

৩

আমরা যে গৃহে বাস করি, সে যে কোন্ দেশীয়, বলা কঠিন। বাঙ্গলার বাইরে, কি স্বদেশে কি বিদেশে, কোথায়ও তার জুড়ি দেখতে পাইনে। গৃহ যেমন সমাজের মূল, তেমনি আবার সহরেরও বুনিয়াদ। গৃহ হ'তে পল্লী, পল্লী হ'তে নগর, নগর হ'তে সহর,—ক্রমবিকাশের এই নিয়ম। রোম, প্যারিস্ প্রভৃতি বনেদি সহরের architecture এতেই তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ। ঐ architecture-এর প্রসাদেই নাগরিকগণ বর্ত্তমানে অতীতের সঙ্গে ঘর করে, অতীতের সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, সফলতা ও বিফলতা, গৌরব ও লজ্জা অলক্ষিতে তাদের মন অধিকার করে' নেয়; প্রত্যেকেই নিজের আত্মার ভিতর বৃহত্তর জাতীয় আত্মার অস্তিত্ব অনুভব করে। তাদের পক্ষে স্বজাতীয়তার ও স্বদেশীয়তার কাছে নিজেদের ধরা দেওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক; তা হ'তে মুক্তি পাওয়াই আয়াসসাধ্য। আমাদের ভিতর মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিরা যেমন অহংজ্ঞান খর্ব্ব করে' স্বজাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে' মনে করেন—তেমনি ইউরোপের মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিরাও স্বজাতিজ্ঞান খর্ব্ব করে' মানবজাতির পায়ে আত্মসমর্পণ করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে' মনে করেন। আমাদের সাধনার বিষয় হচ্চে Nationalism, তাদের উচ্চ সাধনার বিষয় হচ্ছে Internationalism। সে যাই হোক, কলিকাতার মত ভুঁইফোঁড় সহরে, শ্রীহীন, অর্থহীন, কিস্তূতকিমাকার ভুঁইফোঁড় গৃহে বাস করে' আমাদের পক্ষে স্বদেশী ভাব রক্ষা করাটা সহজ নয়। চক-মেলানো বাড়ী হালফেসানে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। একটি লম্বা গোছের ঘর, তার এপাশে দুটি, ওপাশে দুটি—এই পাঁচ কামরা নিয়ে আমাদের গৃহ। মধ্যের ঘরটি হচ্ছে বাইরের ঘর, এবং উভয় পার্শ্বের বাহিরিকের ঘর কটি হচ্ছে অন্দর। বাসস্থানের এই উল্টোপাল্টা ভাবের সঙ্গে আমাদের সামাজিক জীবনের বরাবর যোগ রয়ে গেছে। আমাদের গ্রীষ্মের দেশে ঘরে হাওয়াও চাই, ছায়াও চাই,—একসঙ্গে দুই পাওয়া অসম্ভব বলে' এদেশের গৃহ দুভাগে বিভক্ত হওয়া দরকার। এক অংশ বায়ুর পক্ষে যথেষ্ট খোলা, অপর অংশ সূর্য্যের পক্ষে যথেষ্ট রুদ্ধ। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পঞ্চভূত মিলে মানুষের গৃহনির্ম্মাণের হিসাব বাংলে দেয়। প্রকৃতিই এদেশের গৃহ, সদর এবং অন্দরে ভাগ করতে শিখিয়েছিলেন এবং আমাদের

সমাজের গঠনও গৃহের গঠনের অনেকটা অনুসরণ করেছে। এই কারণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই অবরোধ একটি সামাজিক প্রথা। আমার বিশ্বাস, এই কড়া রোদ এবং চড়া আলোর দেশে অসূর্য্যম্পশ্যা হবার লোভেই রমণীজাতি স্বেচ্ছায় অন্তঃপুরবাসিনী হয়েছেন। যেখানে গৃহে স্ত্রী-পুরুষের স্বতন্ত্র রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট নেই—সেখানে সমাজেও স্ত্রী-পুরুষের সাম্য অর্থে ঐক্য—এই ভুল বিশ্বাস জন্মলাভ করে। ইংরেজিয়ানার প্রসাদে আমাদের বাসগৃহের সদর অন্দর ভেঙ্গে যাবার প্রধান ফল এই যে, আমাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েই গৃহে অনেকটা সঙ্কুচিতভাবে বাস করে। আমাদের ড্রয়িংরুম পাড়া-পড়সীর বৈঠকখানা হ'তে পারে না এবং বাড়ীর কোন অংশই মেয়েদের দুর্গ নয়। এ দেশটি যে বিদেশ, সেটা সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখ্‌বার জন্য ইংরাজ দেশীয় সমাজ হ'তে আলগোছ হয়ে থাকেন, নইলে ভয়, পাছে জাতি রক্ষা না হয়। আমরা তাঁদের অনুকরণে বাসা বাঁধলে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্ব-সমাজ হ'তে দূর হয়ে পড়ি। মোটামুটি আমার বক্তব্য কথা এই, মানুষমাত্রেরই দেশের সঙ্গে প্রধান যোগ গৃহ দিয়ে; স্বদেশীয়তার গোড়াপত্তন ঐখানেই, গৃহ্যসূত্র হ'তেই মানবধর্ম্মশাস্ত্রের উৎপত্তি। গৃহের রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীর রূপান্তরও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও আমি কাউকে বাড়ীবদ্‌লানোর পরামর্শ দিয়ে লোকসমাজে নিজেকে বিষয়বুদ্ধিহীন বলে' প্রমাণ করতে রাজি নই। এ বিষয়ে আমার ভবিষ্যতের আশার একমাত্র ভরসা—একটা বড় গোছের ভূমিকম্প।

গৃহে প্রবেশ করেই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে। আমরা দেখ্‌তে পাই যে, বিদেশী বস্তু আমাদের গৃহ আক্রমণ করেছে এবং তার অন্ততম প্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করে' বসে' আছে। সাহেবিয়ানার খাতিরে আমাদের গৃহসজ্জা অসম্ভবরকম জটিল হয়ে পড়েছে। আস্‌বাবের ভিড় ঠেলে ঘরে ঢোকাই মুস্কিল, চলে' ফিরে বেড়াবার স্বাধীনতা ত একবারেই নেই। এই জটিলতার মধ্যে সকলকেই কুটিল গতি অবলম্বন করতে হয়। প্রথমেই মনে হয় যে, এ ঘর বাসের জন্য নয়, ব্যবহারের জন্য নয়,—সাজাবার জন্য, দেখাবার জন্য, গৃহস্বামীর ধন এবং শিক্ষার পরিচয় দেবার একটা প্রদর্শনী মাত্র, —লক্ষ্মী-সরস্বতীর মিলনের অ-প্রশস্ত ক্ষেত্র। আমাদের নূতন ধরণের গৃহসজ্জার বর্ণনা করবার কোনও দরকার নেই, কারণ, তা সকলেরই নিকট সুপরিচিত। চেয়ার, টেবিল, কোচ, টিপয়, পিয়ানো, আয়না, ছিটের পরদা, ব্রাসেল্‌সের কারপেট, চীনের পুতুল, ওলিওগ্রাফের ছবি,—এই আমাদের নূতন সভ্যতার উপকরণ এবং নিদর্শন। গৃহস্থের অবস্থা অনুসারে এই সকল উপকরণ হয় Lazarus এবং Osler, নয় বৌবাজারের বিক্রীওয়ালার দোকান হ'তে সংগ্রহ করা হয়। যিনি ধনী, তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখ্‌তে দোকান বলে' ভুল হয়। আর যিনি লক্ষ্মীর কৃপায় বঞ্চিত, তাঁর গৃহ হঠাৎ দেখতে যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতাল বলে' ভ্রম হয়; আসবাব-পত্র সব যেন লড়াই থেকে ফিরে এসে, হয় মেরামত, নয় দেহত্যাগের জন্য অপেক্ষা করছে। কোন চৌকির হাত নেই, কোন টিপয়ের পা নেই, কোন টেবিলের পক্ষাঘাত হয়েছে; পরদার বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে গেছে, কোচের নাড়িভুঁড়ি নির্গত হয়ে পড়েছে, চীনের পুতুলের ধড় আছে, কিন্তু মুণ্ড নেই, পারিস পালেস্তারার ভিনাসের নাসিকা লুপ্ত; ওলিওগ্রাফ সুন্দরীর মুখে মেচেতা পড়েছে, আয়নার গা দিয়ে পারা ফুটে বেরিয়েছে, পিয়ানো দন্তহীন এবং হারমোনিয়ম শ্বাসরোগগ্রস্ত। এ অবস্থাতেও আমরা এই সকল অব্যবহার্য্য, কদর্য্য আবর্জ্জনা দূর করে' তার পরিবর্ত্তে ফরাস বিছিয়ে বসি না কেন?—কারণ ইংরাজের কাছে আমরা শিখেছি যে, দৈন্য পাপ নয়, কিন্তু স্বদেশীয়তা অসভ্যতা।

আমাদের এই নবসভ্যতার আজবঘরে স্বর্গীয় পিতামহগণ যদি দৈবাৎ এসে উপস্থিত হন, তা হ'লে নিঃসন্দেহ সব দেখে শুনে তাঁদের চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। অবাক্ হয়ে তাঁরা উর্দ্ধনেত্রে চেয়ে থাক্‌বেন, নির্ব্বাক্ হয়ে আমরাও অধোবদনে বসে' থাক্‌ব। উভয় পক্ষে কোন বোঝা-পড়া হওয়া অসম্ভব। অপরিচিত অশন-বসন, আসন-ভূষণের ভিতরে কিরূপে জাতি-রক্ষা হয়, তা তাঁরা বুঝতে পারবেন না; কৈফিয়ৎ চাইলে আমাদের মধ্যে যাঁর কিছু বল্‌বার আছে, তিনি সম্ভবত এই উত্তর দেবেন যে, "জাতি শব্দের অর্থ আপনাদের নিকট সঙ্কীর্ণ ছিল, আমাদের নিকট তা প্রশস্ততর হয়েছে। রক্ষা অর্থে আপনারা বুঝ্‌তেন শুধু স্থিতি, আমরা বুঝি উন্নতি; আপনাদের গুরু ছিল মনু, আমাদের গুরু হার্বার্ট স্পেন্‌সার; আমাদের নূতন চাল আপনাদের হিসাবে জাতিরক্ষার প্রতিকূল, কিন্তু আমাদের হিসাবে অনুকূল"। এ কথা যদি সত্য, যদি বিজ্ঞানসম্মত হয়, তা হ'লে আমার আপত্তির কোন কারণ নেই; কেননা, যে প্রথা অবলম্বন করলে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের, এমন কি,

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আচার-ব্যবহারে চিরবিরোধ থেকে যাবে, আমার পক্ষে সে প্রথার পক্ষপাতী হওয়া অসম্ভব। যে সামাজিক শাসন জাতীয় জীবনের প্রসারতা লাভের বিরোধী, আমি তার সম্পূর্ণ বিরোধী। কিন্তু আমাদের সমাজকে যে ইউরোপের পশ্চাদ্ধাবন করতেই হবে, তার কোন প্রমাণ নেই। গতিমাত্রেরই একটি স্বতন্ত্র প্রস্থান-ভূমি আছে, একটি দিক নির্দ্দিষ্ট আছে, যা তার পূর্ব্বাবস্থার দ্বারা নিয়মিত। উন্নতির অর্থ আকাশে ওড়া নয়। কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করি, সেটা যেমন আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, তেমনি কোন্ সমাজে জন্মগ্রহণ করি, সেও আমাদের ইচ্ছাধীন নয়। পরিবর্ত্তন যেমন কালসাপেক্ষ, পরিবর্দ্ধন তেমনি দেশ ও পাত্রসাপেক্ষ। আমাদের প্রত্যেকেরই দেহ ও মনের মূলে পূর্ব্বপুরুষরা বিরাজ করছেন এবং আমাদের জাতীয় সভ্যতা অর্থাৎ সামাজিকতার মূলে পূর্ব্বপুরুষদের সমাজ বিরাজ করছে। বংশপরম্পরা heredity হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোন উন্নতি অসম্ভব। যে গৃহে পূর্ব্বপুরুষদের স্থান হয় না, সে গৃহে ভোগবিলাসের চরিতার্থতা সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু মানবজীবনের সার্থকতা লাভ হয় না। স্মৃতি যেমন প্রতি মানবের অহংজ্ঞানের মূল,—পূর্ব্বাপরের যোগসূত্র-স্বরূপ স্মৃতির অস্তিত্ব না থাকলে, আত্মোন্নতি দূরে থাকুক, কেহই আত্মার সন্ধানও পেতেন না,—তেমনি অতীতের স্মৃতি জাতীয় অহংজ্ঞানেরও মূল। অতীতের জ্ঞানশূন্য হয়ে কোন জাতি জাতীয় আত্মার সন্ধান পায় না,—জাতীয় আত্মোন্নতি দূরে থাকুক। সামাজিক জীবের পক্ষে অতীতের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় হচ্ছে পিতা-পিতামহ ইত্যাদি এবং ক্ষেত্র হচ্ছে বাস্তু। সেই বাস্তুজ্ঞান-রহিত হ'লে আমাদের বস্তুজ্ঞানশূন্য হওয়া সহজ হয়ে পড়ে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তর্ক তুলে ইঙ্গ-বঙ্গনামক খেটে-খাওয়া-দলের লোককে বিরক্ত করবার কোন সার্থকতা নেই। এঁরা বিজ্ঞানের দোহাই দেন, আলোচনা বন্ধ করবার জন্য—আরম্ভ করবার জন্য নয়। হার্বার্ট স্পেন্সার এঁদের গুরু, কিন্তু শিক্ষাগুরু নন, দীক্ষাগুরু। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে এঁরা কিছুই শিক্ষালাভ করেন নি, শুধু দুটি একটি বীজমন্ত্র গ্রহণ করেছেন,—যথা, সভ্যতা, উন্নতি ইত্যাদি। অন্যান্য তান্ত্রিকদের মত এই তান্ত্রিকদেরও নিকটে বীজমন্ত্র যত দুর্ব্বোধ, সম্ভবত যত অর্থশূন্য, তত তার মাহাত্ম্য। ইউরোপীয় সভ্যতা এঁরা জ্ঞানের দ্বারা পেতে চান না, ভক্তির দ্বারা পেতে চান। দাস্যভাব সখ্যভাবের চর্চ্চাই এঁরা মুক্তির একমাত্র উপায় স্থির করেছেন। আমরা এঁদের যে অবস্থাটাকে দুর্দ্দশা বলে' মনে করি, সেটি শুধু ইউরোপ-ভক্তির দশা মাত্র।

যাঁরা তর্ক করতে প্রস্তুত, তাঁরা তর্কে হার মানতেও প্রস্তুত, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অধিকাংশ ইঙ্গ-বঙ্গের মনোভাব এই যে, নগদ দামে না হয়, ধার করে' দুখানা কোচ-মেজ কিনব,—এর মধ্যে আবার দর্শন-বিজ্ঞান কোথায়? নিজের কি আবশ্যক এবং নিজের কি মনোমত, সেটা ঠিক করতে সমাজতত্ত্ব আলোচনা করবার দরকার নেই। সুতরাং সাহেবিয়ানার স্বপক্ষে এঁরা হয় সুবিধা, না হয় সুরুচির দোহাই দেন। যখন beauty-র দোহাই চলে না, তখন utility-র দোহাই দেন; যখন utility-র দোহাই চলে না, তখন beauty-র দোহাই দেন। যখন এ শ্রেণীর লোকেরা বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের utility-র ব্যাখ্যান সুরু করেন, তখন মনে হয়, এঁরা জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কৃষ্ণপক্ষীয় সন্তান; আর যখন এঁরা বিলাতি ছিট, বিলাতি কারপেটের beauty-র ব্যাখ্যান সুরু করেন, তখন মনে হয়, Oscar Wild-এর মাসতুতো ভাই। উদাহরণস্বরূপ—যদি কেউ এঁদের জিজ্ঞাসা করে যে, জেল কিম্বা পাগলাগারদের অধিবাসী না হয়েও চুলের অবস্থা ওরকম কেন, এঁরা হেসে উত্তর করবেন, "আমরা কবি নই, কাজের লোক"। এঁদের বিশ্বাস, দোঁ-আঁসলা কুকুরের ল্যাজের মত ইঙ্গ-বঙ্গের চুল যত গোড়াঘেঁসে কাটা যায়, তার তেজ তত বৃদ্ধি হয়, তত রোখ বাড়ে এবং এই বিশ্বাস মিলের (Mill) মতানুযায়ী। এঁদের রুচিসম্বন্ধেও এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং ইংরাজি আসবাবের আবশ্যকতা এবং সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দুচার কথা বলা আবশ্যক।

বিদেশীরকমে ঘর সাজানোতে যে আমাদের কি পর্য্যন্ত অর্থের শ্রাদ্ধ হয়, তা ত সকলেই জানেন। অধিকাংশ ইঙ্গ-বঙ্গের পক্ষে ঠাট বজায় রাখতেই প্রাণান্তপরিচ্ছেদ হ'তে হয়। ধার-করা সভ্যতা রক্ষা করতে শুধু ধার বাড়ে। আমাদের এই দারিদ্র্য-পীড়িত দেশে অনাবশ্যক বহুব্যয়সাধ্য আচার-ব্যবহারের অভ্যাস করা আহাম্মকী ত বটেই, সম্ভবত অন্যায়ও; ক্ষমতার বহির্ভূত চাল বাড়ানো, গৃহ হ'তে লক্ষ্মীকে বিদায় করবার প্রশস্ত উপায়। তা ছাড়া বিদেশীর অনুকরণে বিদেশী বস্তুতে যদি গৃহ পূর্ণ

করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে, দেশের ধনে যদি বিদেশীর পকেট পূর্ণ করতে হয়, তা হ'লে হিতাহিতজ্ঞানসম্পন্ন ভদ্রসন্তানের পক্ষে সে অনুকরণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। ইউরোপে সাধারণ লোকের একটা ভুল ধারণা আছে যে, খাওয়া-পরার মাত্রা যত বাড়ান যায়, জাতীয় উন্নতির পথ ততটা পরিষ্কার হয়। যদি আমার এত না হ'লে দিন চলে না, এমন হয়,তা হ'লে তত সংগ্রহ কর্‌বার জন্য পরিশ্রম স্বীকার কর্‌তে হবে ; এবং যে জাতি যত অধিক শ্রম স্বীকার করতে বাধ্য, সে জাতি তত উন্নত, তত সৌভাগ্যবান্। কিন্তু ফলে কি দেখতে পাওয়া যায়? ইউরোপবাসীরা এই বাহুল্যচর্চ্চার দ্বারা জীবন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করে' ফেলেছে বলে' কর্ম্মক্ষেত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এসিয়াবাসীদের নিকট সর্ব্বত্রই হার মান্‌ছে। এই কারণেই দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চীনে, জাপানী, হিন্দুস্থানী শ্রমজীবীদের বিরুদ্ধে নানা গর্হিত বিধিব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এসিয়াবাসীরা খাওয়া-পরাটা দেহধারণের জন্য আবশ্যক মনে করে, মনের সুখের জন্য নয় ; সেইজন্য তারা পরিশ্রমের অনুরূপ পুরস্কার লাভ করলেই সন্তুষ্ট থাকে। এই সন্তোষ আমাদের জাতি-রক্ষার, জাতীয় উন্নতির প্রধান সহায়। আমরা যদি আমাদের পরিশ্রমের ফলের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ লাভ কর্‌তুম,আমরা যদি বঞ্চিত, প্রতারিত না হতুম, তা হ'লে দেশে অন্নের জন্য এত হাহাকার উঠত না। আমাদের এ দোষে কেউ দোষী কর্‌বেন না যে, আমরা যথেষ্ট পরিশ্রম করিনে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করে। আমাদের দেশে আজকাল শিক্ষিত লোকের, বিশেষতঃ ইঙ্গ-বঙ্গসম্প্রদায়ের মনোভাব এই যে, standard of life বাড়ানো সভ্যতার একটি অঙ্গ। এ সর্ব্বনেশে ধারণা তাঁদের মন থেকে যত শীঘ্র দূর হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। উপরোক্ত যুক্তি ছাড়া জীবনযাত্রার উপযোগী ইউরোপীয় সরঞ্জামের স্বপক্ষে আর কোন যুক্তি শুনেছি বলে' ত মনে পড়ে না। তবে অনেকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে' বলে' থাকেন, "আমার খুসি!" আমাদের দেশের রাজা সমাজের অধিনায়ক নন। বিদেশী বিধর্ম্মী রাজা এদেশে কখন সামাজিক দলপতি হ'তে পারেন না—সুতরাং আমাদের সমাজে এখন অরাজকতা প্রবেশ করেছে। যে সমাজে শাস্ত্র আছে, কিন্তু শাসন মানাবার কোনও উপায় নেই, সেখানে শাসন না মেনে,—যে কাজে কোনও বাইরের শাস্তি নেই, সে কার্য্যে যথেচ্ছাচারী হয়ে, এঁরা যে নিজেদের বিশেষরূপে নির্ভীক, স্বাধীনচেতা এবং পুরুষশার্দ্দূল বলে' প্রমাণ করেন, তার আর সন্দেহ কি? অবশ্য এ কথা স্বীকার কর্‌তে হবে যে, এঁদের "খুসি", প্রভুদের খুসির সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বদ্‌লায়। সে ত হবারই কথা। এঁরাও সভ্য, তাঁরাও সভ্য, সুতরাং পরস্পরের মিল,—সে শুধু সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি। যদি কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন যে, চেয়ার, টেবিল, কোচ, মেজ, ইত্যাদি দেহ, আত্মা কিম্বা মনের উন্নতির কিরূপে এবং কতদূর সাহায্য করে, ত হ'লে আমি তাঁর কাছে চিরবাধিত থাকব, কারণ, সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, চৌকি, কোচ অনেকটা আরামের জিনিস এবং আমরা অনেকেই অভ্যস্ত আরামভোগে বঞ্চিত হ'তে নিতান্ত কুণ্ঠিত। আমাদের সকলেরই পৃষ্ঠদণ্ড কিঞ্চিৎ কম-জোর এবং ঈষৎ বক্র, সুতরাং আমরা পৃষ্ঠের একটা আশ্রয়ের জন্য সকলেই আকাঙ্ক্ষী এবং আরাম-চৌকি এখন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। যোগশাস্ত্রে বলে, সকল প্রকার আত্মোন্নতির মূলে সরল পৃষ্ঠদণ্ড বর্ত্তমান। সুতরাং যোগের প্রথম সাধনা হচ্ছে আসন অভ্যাস করা—পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু করা। দাসজাতির দেহভঙ্গী স্ত্রীলোকের মত, সম্মুখদিকে ঈষৎ আনমিত,—অতিপ্রবৃদ্ধ যৌবনভারে নয়, অতি অভ্যস্ত সেলাম এবং নমস্কারচর্চ্চাবশত। আমাদের জাতীয় কুলকুণ্ডলিনী যদি জাগ্রত কর্‌তে হয়, তা হ'লে আমাদের পিঠের দাঁড়া খাড়া কর্‌তে হবে, অনেক অভ্যস্ত আরাম ত্যাগ কর্‌তে হবে। সুতরাং একমাত্র দৈহিক আরামের খাতিরে বিদেশী আসবাবের প্রচার এবং অবলম্বন সমর্থন করা যায় না। সকলেই জানেন যে, জাপান ইউরোপের কাছে যা শিখেছে, আমরা তা শিখি নি ; কিন্তু খুব কম লোকেই জানেন যে, ইউরোপের কাছে আমরা যা শিখেছি, জাপান তা শেখে নি। ফলে ইউরোপের সঙ্গে কারবারে জাপান নিজের শক্তি সঞ্চয় করেছে, ইউরোপের সঙ্গে কারবারে আমরা শুধু শক্তির অপচয় করেছি। এই কারণেই আমাদের জাপানের কাছে এই শিক্ষালাভ করতে হবে যে, ইউরোপীয় সভ্যতার কি আমাদের গ্রহণ করা উচিত এবং কি আমাদের বর্জ্জন করা উচিত। এই বিষয়ে জ্ঞানলাভ করাটাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান দরকার এবং জাপান ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন দেশ আমাদের গুরু হ'তে পারে না, কারণ, জাপান শুধু এ কঠিন সমস্যার মীমাংসা করেছে।—

...ওয়া-পরা-থাকা-শোওয়া সম্বন্ধে জাপান স্বদেশের সনাতন প্রথা ত্যাগ করে নি। বিলেতি আস্‌বাব জাপানের ঘরে স্থান পায় নি। আজও সমগ্র জাপান মাদুরের উপর বীরাসনে আসীন।*

৪

বিলেতি জিনিসের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিচার শেষ করে' এখন তার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা আবশ্যক। আমাদের দেশে যে ছেলের কিছু হবার নয়, তাকে আর্টস্কুলে পাঠানো হয়; এবং ঐ একই কারণে যুক্তি যখন অন্য কোন দাঁড়াবার স্থান না পায়, তখন তা আর্টের নিকট গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনায় "আমি বিশ্বাস করি"—এ কথার উপর যেমন আর কোন কথা চলে না, আর্ট সম্বন্ধে আলোচনায় "আমার চোখে সুন্দর লাগে" এ কথার উপরও তেমনি আর কোন কথা চলে না। সৌন্দর্য্য অনুভূতির বিষয়—জ্ঞানের বিষয় নয়। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে তার প্রমাণ দেওয়া যায় না। অতএব যিনি আর্ট জিনিসটা অপরকে যত কম বোঝাতে পারেন, নিজে তিনি তত বেশী বোঝেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশ্বাস অন্ধ হ'লেও সম্ভবত লোক ধর্ম্মজ্ঞ হ'তে পারে, কিন্তু রূপসম্বন্ধে অন্ধ হয়ে লোকে সৌন্দর্য্যজ্ঞ হ'তে পারে না। কারণ, সৌন্দর্য্য স্ব-প্রকাশ। সৌন্দর্য্যের পরিচয় এবং অস্তিত্ব উভয়ই কেবলমাত্র প্রকাশের উপর নির্ভর করে। সেই পদার্থকে আমরা সুন্দর বলি, যার স্বরূপ পূর্ণব্যক্ত হয়েছে। রূপ হচ্ছে বিশ্বের ভাষা এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টির শেষ কথা। প্রকৃতিও বৃথায় কিছু করেন না, মানুষেও বিনা উদ্দেশ্যে কোনও পদার্থে হাত দেয় না। যা মানবজীবনের পক্ষে আবশ্যকীয়, মানুষে তাই হাতে গড়ে; সেই গঠনকার্য্যের সার্থকতা এবং কৃতার্থতার নামই আর্ট। নিরর্থক দ্রব্য সুন্দর হয় না। আবশ্যকতার বিরহে সৌন্দর্য্য শুকিয়ে মারা যায়। সুতরাং যে জাতির পক্ষে যে সকল জিনিস জীবন-যাত্রার জন্যে আবশ্যকীয় নয়, সে জাতির পক্ষে সে সকল জিনিসের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা কঠিন। আর্ট একটি সৃষ্টিপ্রকরণ, একটি ক্রিয়া মাত্র, সুতরাং আর্টের প্রাণ কর্ত্তার হাতে এবং মনে, ভোক্তার চোখে এবং কানে নয়। আর্টের সন্ধান তার স্রষ্টার কাছে মেলে, দর্শক কিম্বা শ্রোতার কাছে নয়। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করবার ভিতর যেটুকু আনন্দ, প্রাণ ও ক্ষমতা আছে, সেইটুকু অনুভব করার নাম সৌন্দর্য্য ভোগ করা। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে যে আর্টিষ্টের সঙ্গে আমাদের চরিত্রের, ধর্ম্ম এবং জ্ঞানের, রীতি এবং নীতির মিল আছে, আমরা অনেক পরিমাণে যার সুখ দুঃখের ভাগী, যার সঙ্গে আমরা একই বাহ্য প্রকৃতির ভিতর, একই সমাজের অন্তর্ভূত হয়ে বাস করি, তার আর্টই আমাদের পক্ষে যথার্থ আর্ট। বিদেশী এবং বিজাতীয় আর্টের আদর কেবল কাল্পনিক মাত্র। এই কারণেই আমাদের অনেকেরই পক্ষে বিদেশী আর্টের চর্চ্চাটা লাঞ্ছনা মাত্র হয়ে পড়ে। আমরা প্রথমে বিদেশী দোকানদারের দ্বারা প্রবঞ্চিত হই, পরে নিজেদের মনকে প্রবঞ্চিত করি। আমাদের কাছে রূপের পরিচয় রূপিয়া দিয়ে। আমরা ছবি চিনিনে, তবু কিনি নাম দেখে এবং দাম দেখে। ইউরোপে যারা শিব গড়তে বাঁদর গড়ে, তাদেরই হস্ত-রচিত বিগ্রহ আমরা সংগ্রহ করে' সুখী না হই, খুসি থাকি। আর্ট সম্বন্ধে ইউরোপের গোলামচোর হওয়ায়, লজ্জা পাওয়া দূরে যাক্, আমাদের আত্ম-মর্য্যাদা বৃদ্ধি পায়।

আমার মতের বিরুদ্ধে সহজেই এই আপত্তি উত্থাপিত হ'তে পারে যে, আমরা যদি ইউরোপীয় আর্টের মর্য্যাদা না বুঝতে পারি, তা হ'লে ইউরোপীয় সাহিত্যে ও বিজ্ঞানের মর্য্যাদা বোঝা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং ইউরোপীয় সাহিত্য আমাদের ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। এ আপত্তির উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বিভিন্ন দেশের লোকের ভিতর পার্থক্য যতই থাকুক, মানুষ মানুষে প্রবৃত্তির, বাসনার, মনোভাবের মিল যথেষ্ট আছে। সাহিত্যের বিষয় হচ্ছে প্রধানতঃ—মানবপ্রকৃতি; সুতরাং উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য দেশকাল-অতিরিক্ত মানবহৃদয়ের চিরন্তন অথচ চির-নবীন ভাবসকল নিয়ে কারবার করে। এই হেতু সকল দেশের উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যে বিশ্ব-মানবের সমান অধিকার আছে। কিন্তু ইউরোপীয় সাহিত্যে যে অংশটুকু আর্ট, সে অংশ আমরা ঠিক ধরতে পারি

*জাপানের অভ্যুদয়ের কারণ যাঁরা জানতে চান, তাঁদের আমি বক্ষ্যমাণ গ্রন্থগুলি পড়তে অনুরোধ করি:—K. Okakura-র Ideals of the East এবং The Awakening of Japan, Y. Okakura-র Spirit of Japan, Nitobe-র Bushido, Lafcadio Hearn-এর Kokora প্রমুখ গ্রন্থাবলী। যদি কারও এত বই পড়বার সময় এবং সুবিধা না থাকে এবং ফরাসি ভাষা জানা থাকে, তা হ'লে তাঁকে আমি Felicien Challaye-র Au Japan নামক গ্রন্থ পড়তে অনুরোধ করি। লেখক দুটি পকাশ পাতায় আসল কথা অতি পরিষ্কার ক'রে বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করেছেন।

নে। বিদেশী লেখকের লেখনীর পরিচয় আমরা অনেকেই পাই না। সে যাই হোক্, সাহিত্যে এবং আর্টে, কাব্যে এবং কলায় প্রধান পার্থক্য এই যে, কাব্যের উপকরণ অন্তর্জগৎ হ'তে আসে, কলার উপকরণ বাহ্যজগৎ হ'তে আসে। মনোজগতে দেশভেদ নেই। এসিয়া ইউরোপ নেই,—এক কথায়, মনোজগতের ভূগোল নেই। কিন্তু বাহ্য জগতে ঠিক তার উল্টো। এক দেশের ভৌতিক গঠন অপর দেশ হ'তে বিভিন্ন। দেশভেদে বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ-রসের জাতিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। সেই জন্যই কাব্য অপেক্ষা কলার ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। এই উপকরণের বিশেষত্ব হ'তে প্রতি দেশের শিল্পকলার বিশেষত্ব জন্মলাভ করে। আর্ট সম্বন্ধে অতীন্দ্রিয়তা অসম্ভব; সুতরাং এক্ষেত্রে স্বদেশের অধীনতা-পাশ মোচন করবার জো নেই। বিজ্ঞানের বিষয়ও বস্তুজগৎ; কিন্তু বিজ্ঞান বিশ্বজনীন, কেননা, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য—বস্তুজগতের বিশেষত্ব বাদ দিয়ে তার সামান্য ক্রিয়াগুলির সন্ধান নেওয়া। আর্টের সম্পর্ক বস্তুজগতের শুধু বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে। বিজ্ঞানের অভিপ্রায় বিশ্বকে এক করে' আনা, আর্টের কার্য্য নিত্য বৈচিত্র্য সাধন। বিজ্ঞানের লক্ষ্য মূলের দিকে, আর্টের লক্ষ্য ফুলের দিকে। বিজ্ঞানের দেশ নেই, আর্টের আছে। এই সকল কারণে Newton এবং Darwin আমাদের জ্ঞাতি, Shakespeare এবং Milton আমাদের কুটুম্ব, কিন্তু Raphael এবং Beethoven আমাদের পর। এই জন্যই জাপান ইউরোপের বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছে, কিন্তু নিজের আর্ট ছাড়েনি। আমাদের মধ্যে যদি কেহ ইউরোপের উচ্চাঙ্গের আর্টের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করতে পারেন, তিনি অবশ্য ভক্তির পাত্র। পৃথিবীর যে দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি আছে, তার সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করা মানবের মুক্তির একটি প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু যখন প্রায়ই দেখতে পাই যে, যিনি স্বরগ্রামের "গা" থেকে "পা"র প্রভেদ ধরতে পারেন না, তিনিই Beethovenএর প্রধান সমজদার; এবং যিনি রংটা নীল কিম্বা সবুজ বিশেষ ঠাওর করেও বলতে অপারগ, তিনিই Titian-এর চিত্রে মুগ্ধ,—তখন স্বজাতির ভবিষ্যতের বিষয়ে একটু হতাশ হয়ে পড়তে হয়। সে যাই হোক্, উপস্থিত প্রবন্ধে যে-সকল বস্তুর আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছি—যথা ছিটের পরদা, ব্রাসলসের কারপেট, চীনের পুতুল, কাঁচের ফুলদানী,—কি স্বদেশী কি বিদেশী সকলপ্রকার আর্টের অভাবেই তাদের বিশেষত্ব। বিলাতের সচরাচর গৃহ-ব্যবহার্য্য বস্তুগুলি প্রায়ই কদাকার এবং কুৎসিত। এর দুটি কারণ আছে। পূর্ব্বেই বলেছি, বিজ্ঞানের ন্যায় আর্টেরও বিষয় বাহ্যজগৎ। যা ইন্দ্রিয়গোচর নয়, তা বিজ্ঞানের বিষয় হ'তে পারে না, আর্টেরও বিষয় হ'তে পারে না। ইন্দ্রিয় যে উপকরণ সংগ্রহ করে, মন তাই নিয়ে কারিগরি করে। এই বর্ণ-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময় জগতে যে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ে মন সুখলাভ করে, শুধু তাই আর্টের উপকরণ। বস্তুর সেই সুখদায়ক গুণের নাম aesthetical quality, অর্থাৎ "রূপ"; এবং মনের সেই সুখলাভ করবার ক্ষমতার নাম aesthetic faculty, অর্থাৎ "রূপজ্ঞান"। ইংরাজ বিশেষ খোসাপুরু জাত। ভগবান্ ইংরাজকে নিতান্ত স্থূলভাবে গড়েছেন; তার দেহ স্থূল, প্রকৃতি স্থূল, ইন্দ্রিয় তাদৃশ সূক্ষ্ম নয়। বস্তুমাত্রেই ইংরাজের হাতে ধরা পড়ে, কিন্তু রূপমাত্রেই ইংরাজের চোখে কিম্বা কাণে ধরা পড়ে না। সচরাচর শিক্ষিত ইংরাজের চাইতে আমাদের দেশের সচরাচর রঙ্গরেজের চোখ রং সম্বন্ধে অনেক বেশী পরিমার্জ্জিত। এই কারণেই বিলাতের নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাতসকল নয়নের তৃপ্তিকর নয়। এই গোড়ায় গলদ্ থাকবার দরুণ, ইংরাজের হাতগড়া জিনিস প্রায়ই artistic হয় না। ইউরোপের অন্যান্য জাতিসকল এ বিষয়ে ইংরাজের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হলেও, আর একটি কারণে ইউরোপের art-এর আজকাল হীনাবস্থা। ইউরোপে এখন বিজ্ঞানের যুগ। পূর্ব্বেই বলেছি, বিজ্ঞান বিশ্বকে একভাবে দেখে, আর্ট আর এক ভাবে দেখে। বিজ্ঞানের চেষ্টা সোনামুঠোকে ধুলোমুঠো করা, আর্টের চেষ্টা ধুলোমুঠোকে সোনামুঠো করা। বিজ্ঞান আজকাল ইউরোপীয় মানবের মনের উপর অযথা আধিপত্য লাভ করেছে, কেননা, বিজ্ঞান এখন মানুষের হাতে আলাদীনের প্রদীপ। সে প্রদীপের সাহায্যে যে শুধু অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়, তাই নয়—আলোকও লাভ করা যায়। সে আলোকে শুধু প্রকাশ করে বিশ্বের কায়া, বাদবাকী সব ছায়ায় পড়ে' যায়, যথা—মন, প্রাণ ইত্যাদি। সেই বিজ্ঞানের আলোককে, আমরা যদি একমাত্র আলোক বলে' ভ্রম করি, তা হ'লে মানবজীবনের প্রকৃত অর্থ, চরম লক্ষ্য, এবং অচ্যুত আনন্দ হ'তে আমরা বিচ্যুত হয়ে পড়ি। বিশ্বকে শুধু জড়ভাবে দেখলে মনেরও জড়তা এসে পড়ে। কেবলমাত্র পরমাণুর স্পন্দনে হৃদয় স্পন্দিত হয় না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ধর্ম্মের সখী হয়েই কলাবিদ্যা পৃথিবীতে দেখা দেয়। সে সখ্য-বন্ধন ছিন্ন করে' আর্টকে জীবন্ত রাখা কঠিন। বৈজ্ঞানিক জীবতত্ত্বের মতে মানবের আদিম চেষ্টা নিজের এবং

জাতীয় জীবন রক্ষা করা। নিজে বেঁচে থাকা এবং সন্তান উৎপাদন করা, এই দুটি জীব-জগতের মূল নিয়ম। এই দুটি আদিম দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন যদি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠে, তা হ'লে "আবশ্যকতার" অর্থ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ে। যা দেহের জন্য আবশ্যক, তাই যথার্থ আবশ্যকীয় বলে' গণ্য হয়, আর যা মনের জন্য, আত্মার জন্য আবশ্যক, তা আবশ্যকীয় বলে' মনে হয় না। ইউরোপের Utility-র এই সঙ্কীর্ণ অর্থ গ্রাহ্য হবার দরুণ Utility এবং Beauty-র বিচ্ছেদ জন্মেছে। ইউরোপের আবশ্যকীয় জিনিস কদর্য্য, এবং সুন্দর জিনিস অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই কারণে আর্ট এখন ইউরোপে ত্রিশঙ্কুর মত শূন্যে ঝুলছে। আহার-বিহার এখন ইউরোপের প্রধান কাজ হয়ে ওঠার দরুণ, যে আর্টিষ্ট আর্টকে জীবনের ভিতর নিয়ে আসতে চান্, তিনি আর্টকে পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিদ্বয়ের দাসী করে' তোলেন। এই কারণেই ইউরোপে এখন নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তির এত ছড়াছড়ি। শতকরা একজনে যদি ঐরূপ মূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্য খোঁজেন, অবশিষ্ট নিরনব্বই জনে তার নগ্নতা দেখেই খুসি থাকেন। এ অবস্থায় আর্ট যে শুধু ভোগবিলাসের অঙ্গ হয়ে উঠ্‌বে, তার আর আশ্চর্য্য কি? ইউরোপের পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ, তা ইউরোপ স্থির করুবে। কিন্তু এ কথা সকলেই স্বীকার করুতে বাধ্য যে, আমাদের জাতির পক্ষে বিলাসের প্রবৃত্তি আর বাড়ানো ইচ্ছনীয় নয়। ইউরোপের যথার্থ আর্ট আমাদের অধিকাংশ লোকের পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব, কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার ভোগের অংশটা আমরা সহজেই অভ্যাস করুতে পারি। আমার প্রথম কথাও যা, শেষ কথাও তাই। আর্টকে ভোক্তার দিক্ থেকে দেখা, দূরবীনের উল্টো দিক্ থেকে দেখার তুল্য—দ্রষ্টব্য পদার্থ আরও দূরে চলে' যায়। কর্ত্তার দিক্ থেকে দেখাটাই ঠিক দেখা। আমরা নিজে যা রচনা করেছি, তারই মর্ম্ম, তারই মর্য্যাদা আমরা প্রকৃষ্টরূপে বুঝ্‌তে পারি। আমাদের স্বদেশের কীর্ত্তি থেকেই আমাদের স্বজাতির কৃতিত্বের পরিচয় পাই। আমরা জাতীয় আত্মসম্মানের চর্চ্চা করব বলে' চীৎকার করছি, কিন্তু জাতীয় কৃতিত্বের যদি জ্ঞান না থাকে, তবে জাতীয় আত্মসম্মান কিসের উপর দাঁড় করাব, বোঝা কঠিন। আর্ট যে শ্রেণীরই হোক, তার চর্চ্চায় আমাদের স্বজাতীয় কর্তৃত্ব-বুদ্ধি বিকশিত হয়ে উঠবে। এই পরমলাভ। সুলভ এবং সহজপ্রাপ্য বিলাতি জিনিসের পক্ষে আবশ্যকতার দোহাই চল্‌তে পারে, কিন্তু আর্টের দোহাই একেবারেই চলে না। বিলাতি-ছিটগ্রস্ত না হ'লে বিলাতি ছিটভক্ত হওয়া যায় না। আর যিনি আদর করে' দুয়ারে বিলাতি পর্দ্দা ঝোলান, তাঁর পর্দ্দানশীন্ হওয়া উচিত।

৮

সভ্যজাতির পক্ষে দেশের কথা অনেকটা বেশের কথা। পরিচ্ছদের ঐক্য সামাজিক ঐক্যের লক্ষণও বটে, কারণও বটে। আমরা প্রতিবাসীকে প্রতিবেশী বলে'ই জানি। হিন্দুরা সমাজের সঙ্গে সঙ্গে বস্ত্র ত্যাগ করেন। সন্ন্যাসের প্রথম দীক্ষা ডোর-কৌপীন ধারণ। আমাদেরও বিদেশীয়তার প্রথম সংস্কার কোট-পেন্ট্‌লুন ধারণ। বিলেতের বেশ যে ভারতবাসীর পক্ষে সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, সে কথা বলাই বাহুল্য। কথাটা এতই সাদা যে, যিনি তা বুঝ্‌তে পারেন না, তাঁর ঔষধ মধ্যম-নারায়ণ তৈল, যুক্তি নয়। দেহকে কষ্ট দিলেই যদি মনের উৎকর্ষ লাভ করা যেত, তা হ'লেও নয় এই বোতাম-বকলসের অধীনতা এবং বন্ধন একরকম কায়ক্লেশে সহ্য করা যেত। কিন্তু সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করবার মাহাত্ম্য প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ। যিনিই "কলার" ব্যবহার করেছেন, তিনিই কোন না কোন সময়ে রাগে, দুঃখে এবং ক্ষোভে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে—

"ভুবণ বলে' কিন্‌ব না আর
পরের ঘরে গলার ফাঁসি।"

ইউরোপ যে আমাদের বুকে পাষাণ চাপিয়ে দিয়েছে এবং হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি পরিয়েছে, তার নিদর্শনস্বরূপ আমরা কামিজের প্লেট ও কাফ এবং বুটজুতা ধারণ করি। আমাদের স্বদেশী বেশের প্রধান দোষ যে, তা যন্ত্রণাদায়ক নয়। বিলাতি সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশ্বাস যে, অহর্নিশি গলদ্‌ঘর্ম্ম হওয়াতেই সভ্য মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। সহজ বুদ্ধিতে যা দোষ বলে' মনে হয়, বিলাতি সভ্যতার প্রতি অতিভক্তি-পরায়ণ লোকের নিকট সেইটিই গুণ। ইংরাজি পোষাক যে নয়নের সুখকর নয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু ভক্তদের মতে সেই সৌন্দর্য্যের অভাবেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। ঐ প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, ও বেশ পুরুষোচিত বেশ। আমাদের পৌরুষের একান্ত অভাববশত পুরুষ সাজবার ইচ্ছাটা অত্যন্ত বলবতী। কাজেই আমরা ইংরাজের অনুকরণে, অন্য সব রং ত্যাগ করে', কাপড়ে ছাইপাঁশ মাটির রং চাপিয়েছি।

আমাদের ধারণা, সব চাইতে সভ্য এবং সব চাইতে পুরুষালি রং হচ্ছে কালো রং। সুতরাং আমাদের নূতন সভ্যতা শুভ্র বসন ত্যাগ করে' কৃষ্ণচ্ছদ অবলম্বন করেছে। শ্বেতবর্ণ আলোকের রং, সকল বর্ণের সমাবেশে তার উৎপত্তি; আর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকারের রং, সকল বর্ণের অভাবে তার উৎপত্তি। আমরা করযোড়ে ইউরোপের সভ্যতার কাছে প্রার্থনা করেছি যে, "আমাদিগকে আলোক হইতে অন্ধকারে লইয়া যাও"—এবং আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে। আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার খিদমদগারির পুরস্কার-স্বরূপ হ্যাট নামক কিম্ভূতকিমাকার এক চিজ শিরোপা লাভ করেছি, তাই আমরা আনন্দে শিরোধার্য্য করে' নিয়েছি। কিন্তু ইংরাজি পোষাক আমাদের পক্ষে শুধু যে অসুখকর এবং দৃষ্টিকটু, তা নয়। বেশের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ লোকের মনের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। পুরোহিতের বেশ ধারণ করলে মানুষকে হয় ভণ্ড, নয় ধার্ম্মিক হ'তে হয়। সাহেবি কাপড়ের সঙ্গে মনেও সাহেবিয়ানের ছোপ ধরে। হ্যাট-কোট ধারণ করলেই বঙ্গসন্তান ইংরাজি এবং হিন্দি এই দুই ভাষার উপর অধিকার লাভ করবার পূর্ব্বেই অত্যাচার করতে সুরু করেন। গলায় "টাই" বাঁধলেই যে সকলকেই ইউরোপীয় সভ্যতার নিকট গললগ্নীকৃতবাস হ'তে হবে, এ কথা আমি মানিনে। যে মনে দাস, সে উত্তরীয়কেও গলবস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে' থাকে। তবে "টাই" যে মনকে সাহেবিয়ানার অনুকূল করে' নিয়ে আসে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ইউরোপের মোহ কাটাতে হ'লে ইউরোপীয় বসন "বয়কট" করাই শ্রেয়। ইউরোপবাসীর বেশে এবং এসিয়াবাসীর বেশে একটা মূলগত প্রভেদ আছে। ইউরোপের বেশের উদ্দেশ্য দেহকে বাঁধা, আমাদের উদ্দেশ্য দেহকে ঢাকা। আমাদের চেষ্টা দেহকে লুকানো, ওদের চেষ্টা দেহকে ফলানো। আমাদের অভিপ্রায় লজ্জা নিবারণ করা, ওদের অভিপ্রায় শীত নিবারণ করা; তাই আমরা যেখানে ঢিলে দিই, ওরা সেখানে কসে। ইংরাজরা মধ্যে মধ্যে রমণীর বেশকে কবিতার সঙ্গে তুলনা করেন। ইংরাজরমণীর বেশের ভিতর একটা ছন্দ আছে, তার গতি বিলাসিনীদের দেহভঙ্গী অনুসরণ করে; সে ছন্দের ঝোঁক উন্নত অবনত অংশের উপরই পড়ে। লজ্জা আমাদের দেশে নারীর হৃদয় অবলম্বন করে' থাকে, ওদের দেশে চরণে শরণ গ্রহণ করে। আমাদের মহা সৌভাগ্য এই যে, ভারত-রমণী স্বদেশী লজ্জা পরিহার করে' বিদেশী সজ্জা গ্রহণ করেন নি। স্ত্রী-জাতি সর্ব্বত্রই স্থিতিশীল, আমরা পুরুষরা গতিশীল বলেই দুর্গতি বিশেষরূপে আমাদেরই হয়েছে। যদি ইংরাজি বেশ উপযোগিতা, সৌন্দর্য্য ইত্যাদি সকল বিষয়েই স্বদেশী বেশের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'ত, তা হ'লেও বিদেশী বেশ অবলম্বন অনুমোদন করা যেত না। ইংরাজি বেশের আর একটি বিশেষ দোষ এই যে, ও পদার্থে দেহ মণ্ডিত করবামাত্রই অধিকাংশ লোকের মস্তিষ্কের গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতিশয় বুদ্ধিমান লোকেও বেশের পক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে অতিশয় নির্ব্বোধের মত তর্ক করেন। এ বিষয়ে যে সকল যুক্তি সচরাচর শোনা যায়, সে সকল এতই অকিঞ্চিৎকর যে, বিচারযোগ্য নয়। যাঁরা বেশ পরিবর্ত্তন করেন, তাঁরা তর্কের দ্বারা, যুক্তির দ্বারা নিজেরাই সাফাই হ'তে চান,—অপরকে ভজাতে চান না। তাঁদের অভিপ্রায়, ফাঁকি দিয়ে নিজেরা সভ্য হওয়া, স্বজাতিকে সভ্য করা নয়। তাঁদের বিশ্বাস, এ সমাজের, এ জাতির কিছু হবার নয়,—সুতরাং সমাজ ছাড়াই তাঁদের মতে একমাত্র মুক্তির উপায়। এ মনোভাব যে স্বদেশীয়তার কতদূর অনুকূল, তা সকলেই বুঝতে পারেন। কেবলমাত্র সমাজ-ত্যাগে কি করে' মুক্তিলাভ হ'তে পারে? এ প্রশ্ন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তার উত্তর হচ্ছে, এঁরা যে "চিরকালই স্বদেশী সমাজের অন্তস্থ বর্ণ হয়ে থাকবেন," এরূপ এঁদের অভিপ্রায় নয়; এঁদের চরম লক্ষ্য হচ্ছে, ইংরাজি সমাজে লীন হয়ে যাওয়া। এঁদের আশা ছিল যে ক্রমে গঙ্গাযমুনার মত সাদায়-কালোয় এক দিন মিশে যাবে। কিন্তু আজ বোধ হয় এঁদের সকলেই বুঝতে পেরেছেন যে, সে আশা মিছে। আমরা সকলেই এ সত্যটি আবিষ্কার করেছি যে, প্রয়াগে পৌঁছবার পূর্ব্বেই আমাদের কাশীপ্রাপ্তি হবে।

৬

আহার সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবার দরকার নেই। অপরের বেশ যত সহজে অবলম্বন করা যায়, অপরের খাদ্য তত শীঘ্র জীর্ণ করা যায় না। বিদেশীয় সভ্যতা আমাদের পিঠে যত সয়, পেটে তত সয় না। আমাদের 'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' দেশে আহার্য্য দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানী করবার কোনই দরকার নেই। তবে যদি কেহ এমন থাকেন যে, বিদেশী মাছ-তরকারি না

খেলে তাঁর প্রাণ বাঁচে না, তা হ'লে তাঁর প্রাণ বাঁচাবার কোন দরকার নেই; আর যদি বেঁচে থাকাটা নিতান্ত দরকার মনে করেন, তা হ'লে স্বদেশ ত্যাগ করে' বিদেশে বাস করাটাই তাঁর পক্ষে শ্রেয়।

আহার সম্বন্ধে বিধিনিষেধ-সম্বলিত পঞ্জিকাশাস্ত্রকে গঞ্জিকাশাস্ত্র বলে' গণ্য করে' অমান্য করলেই যে তৎপরিবর্ত্তে কেল্‌নারের ক্যাটালগের চর্চ্চা কর্‌তে হবে, এমন কোন কথা নেই। বিদেশীয়তা প্রধানত আহারের পদ্ধতিতেই আমরা অবলম্বন করেছি। বিলাতি বসন পরে' স্বদেশী আসনে বসা এবং স্বদেশী বাসনে খাওয়া চলে না।

ঐ পোষাকের টানেই চেয়ার আসে, সেই সঙ্গে টেবিল আসে এবং সেই সঙ্গে চীনের কিম্বা টিনের বাসন নিয়ে আসে। এর পর আর হাতে খাওয়া চলে না; কারণ, হাতে খেলে হাত-মুখ দুই-ই প্রক্ষালন কর্‌তে হয়, কিন্তু ছুরিকাঁটা ব্যবহার কর্‌লে শুধু আঙ্গুলের ডগা ধুলেও চলে, না ধুলেও চলে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, খানায় পোষাকে "অঙ্গ-অঙ্গীর" সম্বন্ধ বিরাজ করে। আহারের বিষয় উত্থাপন করে' পানের বিষয়ে নীরব থাক্‌লে অনেকে মনে কর্‌তে পারেন যে, প্রবন্ধটি অঙ্গহীন হয়ে রইল; অতএব এ সম্বন্ধেও দু'এক কথা বলা আবশ্যক। পানের বিষয় হচ্ছে হয় ধূম, না হয় তেজ, মরুৎ এবং সলিলের সন্নিপাতে যে পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাই। গাঁজা, গুলী এবং চরসের পরিবর্ত্তে ভদ্রসমাজে যদি তামাকের প্রচলন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে থাকে ত, সে দুঃখের বিষয় নয়। সুরাপান বেদ-বিহিত এবং আয়ুর্ব্বেদ-নিষিদ্ধ। "প্রবৃত্তিরেষা নরাণাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" এ মনুর বচন এবং শাস্ত্রমতে যেখানে স্মৃতিতে এবং শ্রুতিতে বিরোধ দেখা যায়, সে স্থলে শ্রুতি মান্য। রসিকতা ছেড়ে দিলেও, সুরাপানের দোষগুণ বিচার করা এ প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়বে। পানদোষ নীতির কথা, রীতির কথা নয়। সুরাপান একটি ব্যসন, ফ্যাসান্ নয়। পানাসক্ত লোক পানের প্রতিই আসক্ত, ইংরাজিয়ানার প্রতি নয়। মোহ এবং মদ দুটি স্বতন্ত্র রিপু। আমার উদ্দেশ্য ইউরোপের মোহ নষ্ট করা—তার বেশি কিছু নয়। মানবজাতিকে সুশীল সচ্চরিত্র কর্‌বার ভার সমাজ-নীতি এবং ধর্ম্ম-প্রচারকদের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

৭

আমার শেষ বক্তব্য এই, কেহ যেন মনে না করেন যে, কোন সম্প্রদায়বিশেষের নিন্দা করবার জন্যই আমি এ সকল কথার অবতারণা করেছি। যে সকল ইউরোপীয় হাল-চাল আমি এদেশের পক্ষে অনাবশ্যক এবং অবাঞ্ছনীয় মনে করি, সে সকল কম বেশি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রবেশ লাভ করেছে। আমি নিজে উপরি-উক্ত সকল দোষে দোষী। আমার সকল সমালোচনাই আমার নিজের গায়ে লাগে। দৈনিক জীবনে আমরা সকলেই অভ্যস্ত, আচার-ব্যবহারের অধীন। 'ভুল করেছি', এই জ্ঞান জন্মানো মাত্র সেই ভুল তৎক্ষণাৎ সংশোধন করা যায় না। কিন্তু মনের স্বাধীনতা একবার লাভ কর্‌তে পার্‌লে, ব্যবহারের অনুরূপ পরিবর্ত্তন শুধু সময়সাপেক্ষ।

নভেম্বর, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ।

নানা-কথা

"সবুজ পত্রে"র মুখপত্র

ওঁ প্রাণায় স্বাহা

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাঙ্গালী জাতিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন—"একটা নতুন কিছু করো।" সেই পরামর্শ অনুসারেই যে আমরা একখানি নতুন মাসিক পত্র প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছি, এ কথা বললে সম্পূর্ণ সত্য কথা বলা হবে না। এ পৃথিবীটি যথেষ্ট পুরোনো, সুতরাং তাকে নিয়ে নতুন কিছু করা বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ এ দেশে। যদি বহু চেষ্টায় নতুন কিছু করে' তোলা যায়, তা হয় জল-বায়ুর গুণে দুদিনেই পুরোনো হয়ে যায়, নয় ত পুরাতন এসে তাকে গ্রাস করে' ফেলে। এই সব দেখে শুনে, এ দেশে করায় কিম্বা কাজে নতুন কিছু করবার জন্য যে পরিমাণ ভরসা ও সাহস চাই—তা যে আমাদের আছে, তা বলতে পারিনে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, তবে কি উদ্দেশ্য-সাধন করবার জন্য, কি অভাব পূরণ করবার জন্য, এত কাগজ থাকতে আবার একটি নতুন কাগজ বার করছি—তা হ'লেও আমাদের নিরুত্তর থাকতে হবে; কেননা, কথা দিয়ে কথা না রাখতে পারাটা সাহিত্য-সমাজেও ভদ্রতার পরিচায়ক নয়। নিজেকে প্রকাশ করবার পূর্ব্বে নিজের পরিচয় দেওয়াটা,—শুধু পরিচয় দেওয়া নয়, নিজের গুণগ্রাম বর্ণনা করাটা,—যদিও মাসিক পত্রের পক্ষে একটা সর্ব্ব-লোকমান্য "সাহিত্যিক" নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে, তবুও সে নিয়ম ভঙ্গ করতে আমরা বাধ্য। যে কথা বারো মাসে বারো কিস্তিতে রাখতে হবে, তার যে মাঝে মাঝে খেলাপ হবার সম্ভাবনা নেই—এ জাঁক করবার মত দুঃসাহস আমাদের নেই। তা ছাড়া স্বদেশের কিম্বা স্বজাতির কোনও একটি অভাব পূরণ করা, কোনও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধন করা সাহিত্যের কাজও নয়, ধর্ম্মও নয়; সে হচ্ছে কার্য্যক্ষেত্রের কথা। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করাতে মনের ভিতর যে সঙ্কীর্ণতা এসে পড়ে, সাহিত্যের স্ফূর্ত্তির পক্ষে তা অনুকূল নয়। কাজ হচ্ছে দশে মিলে করবার জিনিস। দলবদ্ধ হয়ে আমরা সাহিত্য গড়তে পারি নে, গড়তে পারি শুধু সাহিত্য-সম্মিলন। কারণ, দশের সাহায্যে ও সাহচর্য্যে কোনও কাজ উদ্ধার করতে হ'লে, নিজের স্বাতন্ত্র্যটি অনেকটা চেপে দিতে হয়। যদি আমাদের দশজনের মধ্যে মনের চৌদ্দ-আনা মিল থাকে, তা হ'লে প্রতিজনে বাকি দু-আনা বাদ দিয়ে একত্র হয়ে সকলের পক্ষে সমান বাঞ্ছিত কোনও ফললাভের জন্য চেষ্টা করতে পারি। এক দেশের এক যুগের, এক সমাজের বহু লোকের ভিতর মনের এই চৌদ্দ-আনা মিল থাকলেই সামাজিক কার্য্য সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়, নচেৎ নয়। কিন্তু সাহিত্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের বিকাশ। সুতরাং সাহিত্যের পক্ষে মনের ঐ পড়েপাওয়া-চৌদ্দআনার চাইতে, ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব দু-আনার মূল্য ঢের বেশি। কেননা, ঐ দু-আনা হতেই তার সৃষ্টি এবং স্থিতি, বাকি চৌদ্দ-আনায় তার লয়। যার সমাজের সঙ্গে ষোল-আনা মনের মিল আছে, তার কিছু বক্তব্য নেই। মন পদার্থটি মিলনের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে, আর বিরোধের স্পর্শে জেগে ওঠে এবং মনের এই জাগ্রত ভাব থেকেই সকল কাব্য, সকল দর্শন, সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

এ কথা শুনে অনেকে হয় ত বলবেন যে, যে দেশে এত দিকে এত অভাব, সে দেশে যে লেখা তার একটি অভাবও পূরণ না করতে পারে, সে লেখা সাহিত্য নয়,—সখ। ও ত কল্পনার আকাশে রঙীন কাগজের ঘুড়ি ওড়ানো এবং সে ঘুড়ি যত শীঘ্র কাটা পড়ে' নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, ততই ভাল। অবশ্য ঘুড়ি ওড়াবারও একটা সার্থকতা আছে। ঘুড়ি মানুষকে অন্ততঃ উপরের দিকে চেয়ে দেখতে শেখায়। তবুও এ কথা সত্য যে, মানব-জীবনের সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নেই, তা সাহিত্য নয়, তা শুধু বাক্-ছল। জীবন অবলম্বন করেই সাহিত্য জন্ম ও পুষ্টি লাভ করে, কিন্তু সে জীবন মানুষের দৈনিক জীবন নয়। সাহিত্য হাতে হাতে মানুষের

অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে' দিতে পারে না। কোনও কথায় চিড়ে ভেজে না, কিন্তু কোনও কোনও কথায় মন ভেজে এবং সেই জাতির কথারই সাধারণ সংজ্ঞা হচ্ছে সাহিত্য। শব্দের শক্তি অপরিসীম। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে মশার গুন্‌গুনানি মানুষকে ঘুম পাড়ায়—অবশ্য যদি মশারির ভিতর শোওয়া যায়,—আর দিনের আলোর সঙ্গে কাক-কোকিলের ডাক মানুষকে জাগিয়ে তোলে। প্রাণ পদার্থটির গূঢ়-তত্ত্ব আমরা না জান্‌লেও, তার প্রধান লক্ষণটি এতই ব্যক্ত এবং এতই স্পষ্ট যে, তা সকলেই জানেন। সে হচ্ছে তার জাগ্রত ভাব। অপর দিকে নিদ্রা হচ্ছে মৃত্যুর সহোদরা। কথায় হয় আমাদের জাগিয়ে তোলে, নয় ঘুম পাড়িয়ে দেয়—তাই আমরা কথায় মরি, কথায় বাঁচি। মন্ত্র সাপকে মুগ্ধ করতে পারে কি না জানিনে, কিন্তু মানুষকে যে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ গোটা ভারতবর্ষ। সংস্কৃত শব্দ যে সংস্কারকে বাধা দিতে পারে, তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। মানুষমাত্রেরই মন কতক সুপ্ত আর কতক জাগ্রত। আমাদের মনের যে অংশটুকু জেগে আছে, সেই অংশটুকুকেই আমরা সমগ্র মন বলে' ভুল করি,—নিদ্রিত অংশটুকুর অস্তিত্ব আমরা মানিনে, কেননা, জানিনে। সাহিত্য মানব-জীবনের প্রধান সহায়, কারণ, তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার অধিকার হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে' তোলা। আমাদের বাংলা সাহিত্যের ভোরের পাখীরা যদি আমাদের প্রতিষ্ঠিত সবুজপত্র-মণ্ডিত সাহিত্যের নব শাখার উপর এসে অবতীর্ণ হন, তা হ'লে আমরা বাঙ্গালা-জাতির সব চেয়ে যে বড় অভাব, তা কতকটা দূর কর্‌তে পার্‌ব। সে অভাব হচ্ছে আমাদের মনের ও চরিত্রের অভাব যে কতটা, তারি জ্ঞান। আমরা যে আমাদের সে অভাব সম্যক্ উপলব্ধি কর্‌তে পারিনি, তার প্রমাণ এই যে, আমরা নিত্য লেখায় ও বক্তৃতায় দৈন্যকে ঐশ্বর্য্য বলে,' জড়তাকে সাত্ত্বিকতা বলে,' আলস্যকে ঔদাস্য বলে', শ্মশান-বৈরাগ্যকে ভূমানন্দ বলে', উপবাসকে উৎসব বলে', নিষ্কর্ম্মাকে নিষ্ক্রিয় বলে' প্রমাণ করতে চাই। এর কারণও স্পষ্ট। ছল দুর্ব্বলের বল। যে দুর্ব্বল, সে অপরকে প্রতারিত করে আত্মরক্ষার জন্য, আর নিজেকে প্রতারিত করে আত্মপ্রসাদের জন্য। আত্মপ্রবঞ্চনার মত আত্মঘাতী জিনিস আর নেই। সাহিত্য জাতির খোরপোষের ব্যবস্থা করে' দিতে পারে না —কিন্তু তাকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা কর্‌তে পারে।

আমরা যে দেশের মনকে ঈষৎ জাগিয়ে তুলতে পার্‌ব, এত বড় স্পর্দ্ধার কথা আমি বল্‌তে পারিনে। কেননা, যে সাহিত্যের দ্বারা তা সিদ্ধ হয়, সে সাহিত্য গড়্‌বার জন্য নিজের সদিচ্ছাই যথেষ্ট নয়,—তার মূলে ভগবানের ইচ্ছা থাকা চাই, অর্থাৎ নৈসর্গিকী প্রতিভা থাকা চাই। অথচ ও ঐশ্বর্য্য ভিক্ষা করে' পাবার জিনিস নয়। তবে বাংলার মন যাতে আর বেশি ঘুমিয়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্তাধীন। মানুষকে ঝাঁকিয়ে দেবার ক্ষমতা অল্পবিস্তর সকলের হাতেই আছে—সে ক্ষমতার প্রয়োগটি কেবল আমাদের প্রবৃত্তিসাপেক্ষ এবং আমাদের প্রবৃত্তির সহজ গতিটি যে ঐ নিজেকে এবং অপরকে সজাগ করে' তোল্‌বার দিকে, তাও অস্বীকার কর্‌বার যো নেই। কারণ, ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য যে ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তা'তে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের সাহিত্য, ইউরোপের দর্শন, মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক্, মদিরাই হোক্ আর হলাহলই হোক্, তার ধর্ম্মই হচ্চে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির থাকতে দেওয়া নয়। এই ইংরাজি-শিক্ষার প্রসাদে, এই ইংরাজি-সভ্যতার সংস্পর্শে, আমরা দেশশুদ্ধ লোক যে দিকে হোক্ কোনও একটা দিকে চল্‌বার জন্য এবং অন্যকে চালাবার জন্য আঁকুবাঁকু কর্‌ছি। কেউ পশ্চিমের দিকে এগোতে চান্, কেউ পূর্ব্বের দিকে পিছু হট্‌তে চান্, কেউ আকাশের উপরে দেবতার আত্মার অনুসন্ধান কর্‌ছেন, কেউ মাটির নীচে দেবতার মূর্ত্তির অনুসন্ধান কর্‌ছেন। এক কথায় আমরা উন্নতিশীলই হই, আর অবনতিশীলই হই, আমরা সকলেই গতিশীল,—কেউ স্থিতিশীল নই। ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর কিছু না হোক্, গতিলাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকলপ্রকার জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে—সেই আনন্দ হতেই আমাদের নব-সাহিত্যের সৃষ্টি। সুন্দরের আগমনে হীরামালিনীর ভাঙ্গা মালঞ্চে যেমন ফুল ফুটেছিল, ইউরোপের আগমনে আমাদের দেশে তেমনি সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠেছে। তার ফল কি হবে, সে কথা না বল্‌তে পার্‌লেও, এই ফুলফোটা যে বন্ধ করা উচিত নয়, এই হচ্ছে আমাদের দৃঢ় ধারণা। সুতরাং যিনি পারেন, তাঁকেই আমরা ফুলের চাষ কর্‌বার জন্য উৎসাহ দেব।

ইউরোপের কাছে আমরা একটি অপূর্ব্ব জ্ঞান লাভ করেছি, সে হচ্ছে এই যে, ভাবের বীজ যে দেশ থেকেই আন না কেন, দেশের মাটিতে তার চাষ কর্‌তে হবে। চীনের টবে তোলা মাটিতে সে বীজ বপন করা পণ্ডশ্রম মাত্র। আমাদের এই নবশিক্ষাই ভারতবর্ষের অতিবিস্তৃত অতীতের মধ্যে আমাদের এই নবভাবের চর্চ্চার উপযুক্ত ক্ষেত্র চিনে নিতে শিখিয়েছে। ইংরাজি-শিক্ষার গুণেই আমরা দেশের লুপ্ত অতীতের পুনরুদ্ধার-কল্পে ব্রতী হয়েছি। তাই আমাদের মন একলম্ফে শুধু বঙ্গ-বিহার নয়, সেই সঙ্গে হাজার দেড়েক বৎসর ডিঙ্গিয়ে একেবারে আর্য্যাবর্ত্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এখন আমাদের পূর্ব্বকবি হচ্ছে কালিদাস, কাশীদাস নয়,—দার্শনিক শঙ্কর, গদাধর নয়,—শাস্ত্রকার মনু, রঘুনন্দন নয়,—আলঙ্কারিক দণ্ডী, বিশ্বনাথ নয়। নব্যন্যায়, নব্যদর্শন, নব্যস্মৃতি আমাদের কাছে এখন অতি পুরাতন, আর যা কালের হিসাবে অতি পুরাতন, তাই আবার বর্ত্তমানে নতুন রূপ ধারণ করে' এসেছে। এর কারণ হচ্ছে, ইউরোপের নবীন সাহিত্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যের আকারগত সাদৃশ্য না থাক্‌লেও অন্তরের মিল আছে। সে হচ্ছে প্রাণের মিল,—উভয়ই প্রাণবন্ত। গাছের গোলাপের সঙ্গে কাগজের গোলাপের সাদৃশ্য থাকলেও, জীবিত ও মৃতের ভিতর যে পার্থক্য—উভয়ের মধ্যে সেই পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু স্থলের গোলাপ ও জলের পদ্ম উভয়েই এক-জাতীয়, কেননা, উভয়েই জীবন্ত। সুতরাং আমাদের নবজীবনের নবশিক্ষা, দেশের দিক্ ও বিদেশের দিক্, দুই দিক্ থেকেই আমাদের সহায়। এই নবজীবন যে লেখায় প্রতিফলিত হয়, সেই লেখাই কেবল সাহিত্য,—বাদবাকি লেখা কাজের নয়, বাজে।

এই সাহিত্যের বহির্ভূত লেখা আমাদের কাগজ থেকে বহির্ভূত করবার একটি সহজ উপায় আবিষ্কার করেছি বলে' আমরা এই নূতন পত্র প্রকাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছি। একটা নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙ্গালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে, তাই পরিষ্কার করে' প্রকাশ কর্‌বার জন্য।

এই নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সাহিত্য যে, কেন পুষ্পিত না হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠছে, তার কারণ নির্ণয় করাও কঠিন নয়। কিঞ্চিৎ বাহ্যদৃষ্টি এবং কিঞ্চিৎ অন্তর্দৃষ্টি থাকলেই সে কারণের দুই পিঠই সহজে মানুষের চোখে পড়ে।

সাহিত্য এদেশে অদ্যাবধি ব্যবসা-বাণিজ্যের অঙ্গ হয়ে ওঠেনি; তার জন্য দোষী লেখক কি পাঠক, বলা কঠিন। ফলে আমরা হচ্ছি সব সাহিত্য-সমাজের সখের কবির দল। অ-ব্যবসায়ীর হাতে পৃথিবীর কোন কাজই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে না, এ কথা সর্ব্বলোক-স্বীকৃত। লেখা আমাদের অধিকাংশ লেখকের পক্ষে, কাজও নয়, খেলাও নয়, শুধু অকাজ; কারণ, খেলার ভিতর যে স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা আছে, সে লেখায় তা নেই,—অপর দিকে কাজের ভিতর যে যত্ন ও মন আছে, তাও তা'তে নেই। আমাদের রচনার মধ্যে অন্যমনস্কতার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়; কেননা, যে অবসর আমাদের নেই, সেই অবসরে আমরা সাহিত্য রচনা করি। আমরা অবলীলাক্রমে সাহিত্য গড়্‌তে চাই বলে' আমাদের নৈসর্গিকী প্রতিভার উপর নির্ভর করা ব্যতীত উপায়ান্তর নেই। অথচ এ কথা লেখকমাত্রেরই স্মরণ রাখা উচিত যে, যিনি সরস্বতীর প্রতি অনুগ্রহ করে' লেখেন, সরস্বতী চাই কি তাঁর প্রতি অনুগ্রহ নাও কর্‌তে পারেন। এই একটি কারণ যার জন্যে বঙ্গসাহিত্য পুষ্পিত না হয়ে, পল্লবিত হয়ে উঠছে। ফুলের চাষ কর্‌তে হয়, জঙ্গল আপনি হয়। অতিকায় মাসিক পত্রগুলি সংখ্যাপূরণের জন্য এই আগাছার অঙ্গীকার কর্‌তে বাধ্য এবং সেই কারণে আগাছার বৃদ্ধির প্রশ্রয় দিতেও বাধ্য। এই সব দেখে শুনে, ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে, আমাদের কাগজ ক্ষুদ্র আকার ধারণ করেছে। এই আকারের তারতম্যে, প্রকারেরও কিঞ্চিৎ তারতম্য হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমাদের স্বল্পায়তন পত্রে, অনেক লেখা আমরা অগ্রাহ্য কর্‌তে বাধ্য হব। স্ত্রীপাঠ্য, শিশুপাঠ্য, স্কুলপাঠ্য এবং অপাঠ্য প্রবন্ধসকল, অনাহূত কিম্বা রবাহূত হয়ে আমাদের দ্বারস্থ হলেও আমরা তাদের স্বস্থানে প্রস্থান কর্‌তে বল্‌তে পারব; কারণ, আমাদের ঘরে স্থানাভাব। এক কথায় শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আমাদের প্রকাশ করতে হবে না। এর লাভ যে কি, তিনিই বুঝতে পারবেন, যিনি জানেন যে, যে কথা একশ'বার বলা হয়েছে তারি পুনরাবৃত্তি করাই শিক্ষকের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। যে লেখায় লেখকের মনের ছাপ নেই, তা ছাপালে সাহিত্য হয় না।

তার পর যে জীবনীশক্তির আবির্ভাবের কথা আমি পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি, সে শক্তি আমাদের নিজের ভিতর থেকে উদ্‌বুদ্ধ হয় নি;—তা হয় দূরদেশ হ'তে, নয় দূরকাল হ'তে, অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছে। সে শক্তি এখনও আমাদের সমাজে ও মনে বিক্ষিপ্ত

হয়ে রয়েছে। সে শক্তিকে নিজের আয়ত্তাধীন কর্‌তে না পার্‌লে তার সাহায্যে আমরা সাহিত্যে ফুল কিম্বা জীবনে ফল পাব না। এই নূতন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত কর্‌তে হ'লে প্রথমে তা মনে প্রতিবিম্বিত করা দরকার। অথচ ইউরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে। সেই মনকে স্বচ্ছ কর্‌তে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্ত্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাবসকলকে যদি প্রথমে মনোদর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে' প্রতিবিম্বিত করে' নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্যদর্পণে প্রতিফলিত হবে। আমরা আশা করি, আমাদের এই স্বল্পপরিসর পত্রিকা মনোভাব সংক্ষিপ্ত ও সংহত করবার পক্ষে লেখকদের সাহায্য করবে। সাহিত্য গড়তে কোনও বাইরের নিয়ম চাইনে, চাই শুধু আত্মসংযম। লেখায় সংযত হবার একমাত্র উপায় হচ্চে সীমার ভিতর আবদ্ধ হওয়া। আমাদের কাগজে আমরা তাই সেই সীমা নির্দ্দিষ্ট করে' দেবার চেষ্টা করব।

আমার শেষ কথা এই যে, যে শিক্ষার গুণে দেশে নূতন প্রাণ এসেছে, মনে সাহিত্য গড়বার প্রবৃত্তি জন্মিয়ে দিয়েছে, সেই শিক্ষার দোষেই সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করবার অনুরূপ ক্ষমতা আমরা পাই নি। আমরা বর্ত্তমান ইউরোপ ও অতীত ভারতবর্ষ, এ উভয়ের দোটানায় পড়ে' বাংলা প্রায় ভুলে গেছি। আমরা শিখি ইংরাজি, লিখি বাংলা, মধ্যে থাকে সংস্কৃতের ব্যবধান। ইংরাজি শিক্ষার বীজ অতীত ভারতের ক্ষেত্রে প্রথমে বপন করলেও তার চারা তুলে বাংলার মাটিতে বসাতে হবে, নইলে স্বদেশী সাহিত্যের ফুল ফুটবে না। পশ্চিমের প্রাণবায়ু যে ভাবের বীজ বহন করে' আন্‌ছে, তা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়তে পারছে না বলে' হয় শুকিয়ে যাচ্ছে, নয় পরগাছা হচ্ছে। এই কারণেই "মেঘনাদবধ" কাব্য পরগাছার ফুল। "অর্কিড"-এর মত তার আকারের অপূর্ব্বতা এবং বর্ণের গৌরব থাক্‌লেও তার সৌরভ নেই। খাঁটি স্বদেশী বলে' "অন্নদামঙ্গল" স্বল্পপ্রাণ হ'লেও কাব্য; এবং কোন দেশেরই নয় বলে' "বৃত্র-সংহার" মহাপ্রাণ হলেও মহাকাব্য নয়। ভারতচন্দ্র, ভাষার ও ভাবের একত্বার গুণে, সংযমের গুণে, তাঁর মনের কথা ফুলের মত সাকার করে' তুলেছেন, এবং সে ফুলে, যতই ক্ষীণ হোক্ না কেন, প্রাণও আছে, গন্ধও আছে। দেশের অতীত ও বিদেশের বর্ত্তমান, এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর কর্‌ছে। আশা করি, বাংলার পতিত জমি সেই মিলনক্ষেত্র হবে। সেই পতিত জমি আবাদ কর্‌লেই তা'তে যে সাহিত্যের ফুল ফুটে উঠবে, তাই ক্রমে জীবনের ফলে পরিণত হবে। তার জন্য আবশ্যক আর্ট, কারণ, প্রাণশক্তি একমাত্র আর্টেরই বাধ্য। আমাদের এই ক্ষুদ্র পত্রিকা, আশা করি, এ বিষয়ে লেখকদের সহায়তা করবে। বড়কে ছোটর ভিতর ধরে' রাখাই হচ্ছে আর্টের উদ্দেশ্য। ওস্তাদরা বলে' থাকেন যে, "গৌড়-সারঙ্গ" রাগিণী ছোট, কিন্তু গাওয়া মুস্কিল; "ছোটিসে দরওয়াজাকে অন্দর হাতী নিকাল্‌না যৈসা মুস্কিল, ঐসা মুস্কিল, দরিয়াকো পাকড়কে কুঁজামে ডাল্‌না যৈসা মুস্কিল, ঐসা মুস্কিল।" অবস্থাগুণে যতই মুস্কিল হোক্ না কেন, বাঙালীজাতিকে এই গৌড়-সারঙ্গই গাইতে চেষ্টা করতে হবে। আমাদের বাংলাঘরের খিড়কি-দরজার ভিতর প্রাচীন ভারতবর্ষের হাতী গলাবার চেষ্টা করতে হবে, আমাদের গৌড়-ভাষার মৃৎ-কুম্ভের মধ্যে সাত সমুদ্রকে পাত্রস্থ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌তে হবে। এ সাধনা অবশ্য কঠিন, কিন্তু স্বজাতির মুক্তির জন্য অপর কোনও সহজ সাধনাপদ্ধতি আমাদের জানা নেই।

বৈশাখ, ১৩২১ সন।

নূতন ও পুরাতন

১

আমাদের সমাজে নূতন-পুরাতনের বিরোধটা সম্প্রতি যে বিশেষ টন্‌টনে হয়ে উঠেছে, এরূপ ধারণা আমার নয়। আমার বিশ্বাস, জীবনে আমরা সকলেই এক-পথের পথিক এবং সে পথ হচ্ছে নতুন পথ। আমাদের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ এই যে, কেউ বা পুরাতনের কাছ থেকে বেশি সরে' এসেছি —কেউ বা কম। আমাদের মধ্যে আসল বিরোধ হচ্ছে মত নিয়ে। মনো-জগতে আমরা নানা পন্থী। আমাদের মুখের কথায় ও কাজে যে সব সময়ে মিল থাকে, তাও নয়।

এমন কি, অনেক সময়ে দেখা যায় যে, যাদের সামাজিক ব্যবহারে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তাদের মধ্যেও সামাজিক মতামতে সম্পূর্ণ অনৈক্য থাকে,—অন্তত মুখে। সুতরাং নূতন পুরাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে ত সে সাহিত্যে,—সমাজে নয়।

এ বাদানুবাদ ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, তাই শ্রীযুক্ত

বিপিনচন্দ্র পাল এই পরস্পর-বিরোধী মতদ্বয়ের সামঞ্জস্য করে' দিতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি নূতন ও পুরাতনের মধ্যে একটি মধ্যপথ আবিষ্কার করেছেন, যেটি অবলম্বন করলে নূতন ও পুরাতন হাত-ধরাধরি করে' উন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারবে। যে পথে দাঁড়ালে নূতন ও পুরাতন পরস্পরের পাণি-গ্রহণ করতে বাধ্য হবে এবং উভয়ে মনের মিলে সুখে থাকবে। সে পথের পরিচয় নেওয়াটা অবশ্য নিতান্ত আবশ্যক। যারা এ পথও জানে, ও পথও জানে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, মরে' আছে, তারা হয় ত একটা নিষ্কণ্টক মধ্যপথ পেলে বেঁচে উঠবে।

২

ঘটকালি করতে হ'লে ইনিয়ে-বিনিয়ে-বানিয়ে নানা কথা বলাই হচ্ছে মামুলি দস্তর। সুতরাং নূতনের সঙ্গে পুরাতনের সম্বন্ধ করতে গিয়ে বিপিন বাবুও নানা কথার অবতারণা করতে বাধ্য হয়েছেন। তার অনেক ছোটখাট কথা সত্য, আর কতক বড় বড় কথা নতুন। তবে তাঁর কথার ভিতর যা সত্য, তা নতুন নয়, আর যা নতুন, তা সত্য কি না, তা পরীক্ষা করে' দেখা আবশ্যক।

বিপিন বাবু প্রথমে আমাদের সমাজে নূতন ও ও পুরাতনের বিরোধের কারণ নির্ণয় করে', পরে তার সমন্বয়ের উপায় নির্দ্দেশ করেছেন।

তাঁর মতে আমরা—

"ইংরাজি শিখিয়া ইউরোপের সভ্যতা ও সাধনার বাহিরটা দেখিয়া * * * ঘর ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ছুটিয়াছিলাম।"

এই ছোটাটাই হচ্ছে নূতন এবং পুরাতনের সঙ্গে বিচ্ছেদের এইখানেই সূত্রপাত। আবার আমরা ঘরে ফিরে এসেছি। অতএব এখন মিলনের কাল উপস্থিত হয়েছে। গত শতাব্দীতে দেশশুদ্ধ লোকের মন যে এক লম্ফে সমুদ্রলঙ্ঘন করে' বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল এবং এ শতাব্দীতে সে মন যে আবার উল্টো লাফে দেশে ফিরে' এসেছে, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমাদের মনের দিক্ থেকে দেখতে গেলে, উনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীতে যে বিশেষ কোনও প্রভেদ আছে, তা নয়, যদি থাকে ত সে উনিশ বিশ। আজকালকার দিনে, ইউরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ঢের বেশি লোকের মনে ঢের বেশি পরিমাণে স্থান লাভ করেছে। বরং এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বহু ইউরোপীয় মনোভাব দেশের মনে এত বসে' গেছে যে, সে ভাব দেশী কি বিদেশী, তাও আমরা ঠাওর করতে পারিনে। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, একটি বিশেষজাতীয় মনোভাব, যার ক থেকে ক্ষ পর্য্যন্ত প্রতি অক্ষর বিদেশী, তাকে আমরা বলি "স্বদেশী।"

ইউরোপীয় সভ্যতার বাইরের দিকটা দেখে' অবশ্য জনকতক সেদিকে ছুটেছিলেন, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অতি সামান্য এবং তাঁদের ঘরে ফিরে' না আসাতে দেশের কোনও ক্ষতি নেই, বরং তাঁদের ফেরাতে বিপদ আছে। বিপিন বাবু বলেন—

"এ কথা সত্য নয় যে, একদিন আমরা বেড়া ভাঙ্গিয়া ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছিলাম, আজ বাড়ি খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।"

কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের মধ্যে যারা ইউরোপের সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে অন্ধ হয়ে বেড়া ভেঙ্গে ছুটেছিল, তারাই আবার বাড়ি খেয়ে বাড়ী ফিরেছে। পাঁচনই তাদের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কাজ করেছে। কেননা, ও জাতির অন্ধতা সারাবার শাস্ত্রসঙ্গত বিধান এই—"নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণং ছিত্ত্বা" দেগে দেওয়া।

বিপিন বাবু বলেন—

"কেহ কেহ মনে করেন, একদিন যেমন আমরা স্বদেশের যাহা কিছু তাহাকেই হীনচক্ষে দেখিতাম, আজ বুঝি বিচার-বিবেচনাবিরহিত হইয়াই, স্বদেশের যাহা কিছু তাহাকেই ভাল বলিয়া ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছি।"

বিপিন বাবুর মতে এরূপ মনে করা ভুল। কিন্তু এরূপ শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজে মোটেই বিরল নয়, সে কথা "নারায়ণ" পত্রে ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল স্পষ্টাক্ষরে লিখে দিয়েছেন। তাঁর মতে—

"য়ুরোপের জনসাধারণে যেমন আপনাদের অসাধারণ অভ্যুদয় দেখিয়া ইউরোপের বাহিরে যে প্রকৃত মানুষ বা শ্রেষ্ঠতর সভ্যতা আছে বা ছিল বলিয়া ভাবিতে পারে না, আমাদের এই অভ্যুদয় নাই বলিয়াই যেন আরও বেশি করিয়া কিয়ৎ-পরিমাণে এই প্রত্যক্ষ হীনতার অপমান ও বেদনার উপশম করিবার জন্যই, সেইরূপ আমরাও নিজেদের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার অত্যধিক গৌরব করিয়া, জগতের অপরাপর সভ্যতা ও সাধনাকে হীনতর বলিয়া ভাবিয়া থাকি।"

ডাক্তার শীল বলেন, এরূপ বিচার "স্বজাতি-পক্ষপাতিত্বদোষে দুষ্ট, অতএব সত্যভ্রষ্ট।" আমাদের

পক্ষে এরূপ মনোভাবের প্রশ্রয় দেওয়াতে যে সর্ব্ব-নাশের পথ প্রশস্ত করা হয়, সে বিষয়ে তিলমাত্রও সন্দেহ নেই। কেননা, ইউরোপের জনসাধারণের জাতীয় অহঙ্কার অভ্যুদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত; আমাদের জাতীয় অহঙ্কার জাতীয় হীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত; ইউরোপের অহঙ্কার তার কৃতিত্বের সহায়, আমাদের অহঙ্কার আমাদের অকর্ম্মণ্যতার পৃষ্ঠপোষক। সুতরাং এ শ্রেণীর লোকের দ্বারা নূতন ও পুরাতনের বিরোধের যে সমন্বয় হবে, এরূপ আশা করা বৃথা। যাঁরা মদ ছেড়ে আফিং ধরেন, তাঁরা যদি কোন কিছুর সমন্বয় করতে পারেন ত, সে হচ্ছে এই দুই নেশার। মদ আর আফিং এই দু'টি জুড়িতে চালাতে পারে, সমাজে এমন লোকের অভাব নেই।

আসল কথা, নব-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে হাজারে নশ' নিরনব্বই জন কস্মিন্‌কালে প্রাচীন সমাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি। অদ্যাবধি তাঁরা কেবলমাত্র অশনে, বসনে, ব্যসনে ও ফ্যাসনে সামাজিক নিয়ম অতিক্রম করে' আসছেন; কেননা, এ সকল নিয়ম লঙ্ঘন করবার দরুন তাঁদের কোনরূপ সামাজিক শাস্তিভোগ করতে হয় না। পুরাতন সমাজ-ধর্ম্মের অবিরোধে নূতনকামের সেবা করাতে সমাজ কোনওরূপ বাধা দেয় না, কাজেই শিক্ষিত লোকেরা ঘরে ঘরে নিজের চরকায় বিলেতি তেল দেওয়াটাই তাঁদের জীবনের ব্রত করে' তুলেছেন। এ শ্রেণীর লোকেরা দায়ে পড়ে' সমাজের যে-সকল পুরোনো নিয়ম মেনে চলেন, অপরের গায়ে পড়ে' তারই নতুন ব্যাখ্যা দেন। এঁরা নূতন-পুরাতনে বিরোধ ভঞ্জন করেন নি—যদি কোন-কিছুর সমন্বয় করে' থাকেন ত, সে হচ্ছে সামাজিক সুবিধার সঙ্গে ব্যক্তিগত আরামের সমন্বয়।

পুরাতনের সঙ্গে নূতনের বিরোধের সৃষ্টি সেই দু-দশজনে করেছেন, যাঁরা সমাজের মরচে-ধরা চরকায় কোনওরূপ তৈল প্রদান করবার চেষ্টা করেছেন—সে তেল দেশীই হোক, আর বিদেশীই হোক। এর প্রমাণ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দয়ানন্দ স্বামী, কেশবচন্দ্র সেন ইত্যাদি। এর প্রথম তিন জন সমাজের দেহে যে স্নেহ প্রয়োগ করেছিলেন, সেটি খাঁটি দেশী এবং সংস্কৃত। অথচ এঁরা সমাজদ্রোহী বলে' গণ্য।

সমাজ-সংস্কার, অর্থাৎ পুরাতনকে নূতন করে' তোলবার চেষ্টাতেই এদেশে নূতন-পুরাতনে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

বিপিন বাবুর মুখের কথায় যদি এই বিরোধের সমন্বয় হয়ে যায়, তা হ'লে আমরা সকলেই আশীর্ব্বাদ করব যে, তাঁর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।

৩

দু'টি পরস্পর-বিরোধী পক্ষের মধ্যস্থতা করতে হ'লে নিরপেক্ষ হওয়া দরকার, অথচ একপক্ষ-না-এক পক্ষের প্রতি টান থাকা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। বিপিন বাবুও এই সহজ মানবধর্ম্ম অতিক্রম করতে পারেন নি। তাঁর নানান উল্টোপাল্টা কথার ভিতর থেকে তাঁর নূতনের বিরুদ্ধে নূতন ঝাঁজ ও পুরাতনের প্রতি নূতন ঝোঁক ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ তাঁর একটি কথার উল্লেখ করছি।

সকলেই জানেন যে, পুরাতন, সংস্কারের নাম শুনতে পারে না, কারণ সুপ্তকে জাগ্রত করবার জন্য নূতনকে পুরাতনের গায়ে হাত দিতে হয়—তাও আবার মোলায়েমভাবে নয়,—কড়াভাবে। বিপিন বাবু তাই সংস্কারকের উপর গায়ের ঝাল ঝেড়ে নিজেকে ধরা দিয়েছেন। এর থেকেই বোঝা যায় যে, পালমহাশয়, যারা সমাজকে বদল করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে, আর যারা সমাজকে অটল করতে চায়, তাদের পক্ষে।

বিপিন বাবু বলেন—

"দুনিয়াটা সংস্কারকের সৃষ্টিও নয়, আর সংস্কারকের হাত পাকাইবার জন্য সৃষ্টও হয় নাই।"

দুনিয়াটা যে কি কারণে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আমরা জানি নে, তার কারণ, সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে' ও-কাজ করেন নি। তবে তিনি যে পালমহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে' সৃষ্টি করেছেন, এমনও ত মনে হয় না। কারণ, দুনিয়া আর যে জন্যই সৃষ্ট হোক, বক্তৃতাকারের গলা-সাধবার জন্য হয় নি। সৃষ্টির পূর্ব্বের খবর আমরাও জানি নে, বিপিন বাবুও জানেন না; কিন্তু জগতের সঙ্গে মানুষের কি সম্পর্ক, তা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি। ম্লেচ্ছ-ভাষায় যাকে দুনিয়া বলে, হিন্দু-দর্শনের ভাষায় তার নাম—"ইদং"। ডাক্তার ব্রজেন্দ্র শীল "নারায়ণ" পত্রে সেই ইদং-এর নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়েছেন—

"ইদংকে যে জানে, যে ইদং-এর জ্ঞাতা ও ভোক্তা, আপনার কর্ম্মের দ্বারা যে ইদংকে পরিচালিত ও পরিবর্ত্তিত করিতে পারে বলিয়া যাহাকে এই ইদং-এর সম্পর্কে কর্ত্তাও বলা যায়, সেই মানুষ অহং-পদবাচ্য।"

অর্থাৎ মানুষ দুনিয়ার জ্ঞাতা ও কর্ত্তা। শুধু তাই নয়, মানুষ ইদং-এর কর্ত্তা বলেই তার জ্ঞাতা। মনোবিজ্ঞানের মূল সত্য এই যে, বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের যদি ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার কারবার না থাকত, তা হ'লে তার কোনওরূপ জ্ঞান আমাদের মনে জন্মাত না। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার মূলসম্পর্ক ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে। আমাদের ক্রিয়ার বিষয় না হ'লে, দুনিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়ও হ'ত না—অর্থাৎ তার কোনও অস্তিত্ব থাকত না এবং সে ক্রিয়াফল হচ্ছে ইদং-এর "পরিচালন ও পরিবর্ত্তন", —আজকালকার ভাষায় যাকে বলে সংস্কার। সৃষ্টির গূঢ়তত্ত্ব না জানলেও মানুষে এ কথা জানে যে, তার জীবনের নিত্য কাজ হচ্ছে সৃষ্ট পদার্থের সংস্কার করা। মানুষ যখন লাঙ্গলের সাহায্যে ঘাস তুলে ফেলে ধান বোনে, তখন সে পৃথিবীর সংস্কার করে। মানুষের জীবনে এক কৃষি ব্যতীত অপর কোনও কাজ নেই। এই দুনিয়ার জমিতে সোনা ফলাবার চেষ্টাতেই মানুষ তার মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। ঋষির কাজও কৃষিকাজ, শুধু সে কৃষির ক্ষেত্র ইদং নয়,—অহং। সুতরাং সংস্কারকদের উপর বক্র দৃষ্টিপাত করে' বিপিন বাবু দৃষ্টির পরিচয় দেন নি, পরিচয় দিয়েছেন শুধু বক্রতার।

শাস্ত্রে বলে যে, ক্রিয়াফল চার প্রকার—উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকার ও সংস্কার। কি ধর্ম্ম, কি সমাজ, কি রাজ্য, যার সংস্কারে হাত দেন, তারই বিকার ঘটান, এমন লোকের অভাব যে বাঙলায় নেই, সম্প্রতি তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। একই উপাদান নিয়ে কেউ গড়েন শিব, কেউ বা বাঁদর। এ অবশ্য মহা আক্ষেপের বিষয়; কিন্তু তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, দেশশুদ্ধ লোকের মাটির সুমুখে হাতযোড় করে' বসে' থাকতে হবে।

৪

বিপিন বাবুর মতে নূতনে-পুরাতনে মিলনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে নূতন; কারণ, নূতনই হচ্ছে মূল বিবাদী। সুতরাং নূতনকে বাগ মানাতে হলে, তাকে কিঞ্চিৎ আক্কেল দেওয়া দরকার।

নূতন তার গোঁ ছাড়তে চায় না, কেননা, সে চায় উন্নতি। কিন্তু সে ভুলে যায় যে, জাগতিক নিয়মানুসারে—উন্নতির পথ সিধে নয়, পেঁচালো। উন্নতি যে পদে পদে অবনতিসাপেক্ষ, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে। বিপিন বাবু এই বৈজ্ঞানিক সত্যটির বক্ষ্যমাণ রূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

"তালগাছের মতন মানুষের মন বা মানব-সমাজ একটা সরল রেখার ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উন্নতির পথে চলে না। * * কিন্তু ঐ তালগাছে কোন সতেজ ব্রততী যেমন তাহাকে বেড়িয়ে বেড়িয়ে উপরের দিকে উঠে, সেইরূপই মানুষের মন ও মানবের সমাজ ক্রমোন্নতির পথে চলিয়া থাকে। একটা লম্বা সরল খুঁটির গায়ে নীচ হইতে উপরে পর্য্যন্ত একগাছা দড়ি জড়াইতে হইলে যেমন তাহাকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নিতে হয়, মানুষের মনের ও মানবসমাজের ক্রমবিকাশের পন্থাও কতকটা তারই মতন। এই গতির ঝোঁকটা সর্ব্বদাই উন্নতির দিকে থাকিলেও প্রতি স্তরেই উপরে উঠিবার জন্যই একটু করিয়া নীচেও নামিয়া আসিতে হয়। ইংরাজিতে এরূপ তির্য্যক্-গতির একটা বিশিষ্ট নাম আছে, ইহাকে স্পাইরাল মোষন (spiral motion) বলে। সমাজবিকাশের ক্রমও এইরূপ স্পাইরাল, একান্ত সরল নহে। * * আপনার গতিবেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ ঊর্দ্ধমুখী তির্য্যক্‌গতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।"

বিপিন বাবুর আবিষ্কৃত এই উন্নতি-তত্ত্ব যে নূতন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু সত্য কি না, তাই হচ্ছে বিচার্য্য।

বিপিন বাবু বলেন যে, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, সত্যজ্ঞান নয়,—ভ্রম। এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু রজ্জুতে লতাজ্ঞান যে সত্যজ্ঞান, এরূপ বিশ্বাস করবার কারণ কি? রজ্জু জড়পদার্থ এবং "সতেজ ব্রততী" সজীব পদার্থ। দড়ি বেচারার আপনার "গতিবেগ" বলে' কোনরূপ গুণ, কি দোষ নেই। ও-বস্তুকে ইচ্ছে করলে নীচে থেকে জড়িয়ে উপরে তুলতে পার, উপর থেকে জড়িয়ে নীচে নামাতে পার, লম্বা করে' ফেলতে পার, তাল-পাকিয়ে রাখতে পায়। রজ্জু উন্নতি, অবনতি, তির্য্যক্‌গতি, কি সরল গতি—কোনরূপ ধার ধারে না। বিপিন বাবু এ ক্ষেত্রে রজ্জুর যে ব্যবহার করেছেন, তা জ্ঞানের গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়।

তার পর বিপিন বাবু এ সত্যই বা কোন্ বিজ্ঞান থেকে উদ্ধার করলেন যে, মানুষের মন ও মানব-সমাজ উদ্ভিদজাতীয়? Psychology এবং Sociology যে Botany-র অন্তর্ভূত, এ কথা ত কোনও কেতাবে কোরাণে লেখে না। তর্কের খাতিরে এই অদ্ভুত উদ্ভিদ-তত্ত্ব মেনে নিলেও সকল সন্দেহের নিরাকরণ হয় না। মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, মানুষের মন ও মানব-সমাজ উদ্ভিদ হ'লেও,

ঐ দুই পদার্থ যে লতাজাতীয় এবং বৃক্ষজাতীয় নয়, তারই বা প্রমাণ কোথায়? গাছের মত সোজাভাবে সরল রেখায় মাথা-ঝাড়া দিয়ে ওঠা যে মানবধর্ম্ম নয়, কোন্ যুক্তি, কোন্ প্রমাণের বলে বিপিন বাবু এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, তা আমাদের জানানো উচিত ছিল; কেননা, পালমহাশয়ের আপ্তবাক্ আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে' গ্রাহ্য করতে বাধ্য নই। উক্তি যে যুক্তি নয়, এ জ্ঞান বিপিন বাবুর থাকা উচিত। উত্তরে হয় ত তিনি বলবেন যে, ঊর্দ্ধগতি-মাত্রেই তির্য্যক্‌গতি—এই হচ্ছে জাগতিক নিয়ম। ঊর্দ্ধগতিমাত্রকেই যে স্ক্রুর আকার ধারণ করতে হবে, জড়জগতের এমন কোন বিধিনির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে কি না, জানি নে। যদি থাকে ত মানুষের মতিগতি যে সেই একই নিয়মের অধীন, এ কথা তিনিই বলতে পারেন—যিনি জীবে জড়ভ্রম করেন।

"আপনার গতিবেগের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষা করিয়া এক স্তর হইতে অন্য স্তরে যাইতে হইলেই ঐ ঊর্দ্ধমুখী তির্য্যক্‌গতির পথ অনুসরণ করিতে হয়।"

বিপিন বাবুর এই মত যে সম্পূর্ণ ভুল, তা তাঁর প্রদর্শিত উদাহরণ থেকেই প্রমাণ করা যায়। "তাল-গাছ যে সরলরেখার ন্যায় ঊর্দ্ধদিকে উঠে"—তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, যে নিজের জোরে ওঠে, সে সিধে ভাবেই ওঠে; আর যে পরকে আশ্রয় করে' ওঠে, সেই পেঁচিয়ে ওঠে, যথা—তরুর আশ্রিত লতা।

দশ ছত্র রচনার ভিতর Dynamics, Botany, Sociology, Psychology প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের নানা সূত্রের এহেন জড়াপটকি বাধানো যে সম্ভব, এ জ্ঞান আমার ছিল না। সম্ভবত পালমহাশয় যে "নূতন দৃষ্টি" নিয়ে ঘরে ফিরেছেন, সেই দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে যে, স্বর্গের সিঁড়ি—গোল সিঁড়ি। যদি তাই হয়, তা হ'লে এ কথাও মানতে হবে যে, পাতা-লের সিঁড়িও গোল; কারণ, ওঠা-নামার জাগতিক নিয়ম অবশ্যই এক। সুতরাং ঘুরপাক খাওয়ার অর্থ ওঠাও হ'তে পারে, নামাও হ'তে পারে। এ অবস্থায় উন্নতিশীলের দল যদি কুটিল পথে না চলে' সরল পথে চলতে চান, তা হ'লে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।

৫

বিপিন বাবু যে তাঁর প্রবন্ধের বৈজ্ঞানিক পর্য্যায়ে নানারূপ পরস্পরবিরোধী বাক্য একত্র করতে কুণ্ঠিত হন নি, তার কারণ, তিনি ইউরোপীয় দর্শন হ'তে এমন এক সত্য উদ্ধার করেছেন, যার সাহায্যে সকল বিরোধের সমন্বয় হয়। হেগেলের Thesis, Antithesis এবং Synthesis, এই ত্রিপদের ভিতর যখন ত্রিলোক ধরা পড়ে, তখন তার অন্তর্ভূত সকল লোক যে ধরা পড়বে, তার আর আশ্চর্য্য কি? হেগেলের মতে লজিকের নিয়ম এই যে, "ভাব" (Being) এবং "অভাব" (Non-Being) এই দু'টি পরস্পর-বিরোধী,—এবং এই দু'য়ের সমন্বয়ে যা দাঁড়ায়, তাই হচ্ছে "স্বভাব" (Becoming)। মানুষের মনের সকল ক্রিয়া এই নিয়মের অধীন, সুতরাং সৃষ্টিপ্রকরণও এই একই নিয়মের অধীন, কেননা, এ জগৎ চৈতন্যের লীলা। অর্থাৎ তাঁর লজিক এবং ভগবানের লজিক যে একই বস্তু, সে বিষয়ে হেগেলের মনে কোনরূপ দ্বিধা ছিল না। তার কারণ, হেগেলের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি ভগ-বানের শুধু অবতার নন—স্বয়ং ভগবান্। হেগেলের এই ঘরের খবর তাঁর সপ্রতিভ শিষ্য কবি হেনরি হাইনের (Henri Heine) গুরুমারা-বিদ্যের গুণে ফাঁস হয়ে গেছে। বিপিন বাবুরও বোধ হয় বিশ্বাস যে, হেগেলের কথা হচ্ছে দর্শনের শেষ কথা। সে যাই হোক, হেগেলের এই পশ্চিম-মীমাংসার বলে বিপিন বাবু নূতন ও পুরাতনের সমন্বয় করতে চান। তিনি অবশ্য শুধু সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন—তার প্রয়োগ করতে হবে আমাদের।

৬

হেগেলের মত একে নতুন, তার উপর বিদেশী; সুতরাং পাছে তা গ্রাহ্য করতে আমরা ইতস্তত করি, এই আশঙ্কায় তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হেগেলও যা, বেদান্তও তাই, সাংখ্যও তাই।

সমন্বয় অর্থে বিপিন বাবু কি বোঝেন, তার পরি-চয় তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর মতে—

"সমন্বয়মাত্রেই যে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে যায়, তার বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই দাবী-দাওয়া কিছু কাটিয়া ছাঁটিয়া, একটা মধ্যপথ ধরিয়া তাহার ন্যায্য মীমাংসা করিয়া দেওয়া।"

অর্থাৎ Thesis-কে কিছু ছাড়তে এবং Antithesis-কে কিছু ছাড়তে হবে, তবে Syn-thesis ডিক্রি পাবে। তাঁর দর্শনের এ ব্যাখ্যা শুনে সম্ভবত হেগেলের চক্ষুস্থির হয়ে যেত; কেননা, তাঁর Synthesis কোনরূপ রফাছাড়ের ফল নয়। তাতে Thesis এবং Antithesis দু'টিই পুরামাত্রায় বিদ্য-মান; কেবল দু'য়ে মিলিত হয়ে একটি নূতন মূর্ত্তি

ধারণ করে। Synthesis এর বিশ্লেষণ ক'রেই Thesis এবং Antithesis পাওয়া যায়; এর আধখানা এবং ওর আধখানা জোড়া দিয়ে অর্দ্ধনারীশ্বর গড়া হেগেলের পদ্ধতি নয়।

তার পর মীমাংসা অর্থে যদি রফাছাড়ের নিষ্পত্তি হয়, তা হ'লে বলতেই হবে যে, বিপিন বাবুর মীমাংসার সঙ্গে ব্যাস জৈমিনির মীমাংসার কোনই সম্পর্ক নেই। বেদান্তের মীমাংসা আর যাই হোক, আপোষ-মীমাংসা নয়। বেদান্তদর্শন নিজের দাবীর এক পয়সাও ছাড়ে নি, কোন বিরোধী মতের দাবীর এক পয়সাও মানে নি। উত্তর-মীমাংসাতে অবশ্য সমন্বয়ের কথা আছে, কিন্তু সে সমন্বয়ের অর্থ যে কি, তা শঙ্কর অতি পরিষ্কার ভাষায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন—

"এ সূত্র বেদান্তবাক্যরূপ কুসুম গাঁথিবার সূত্র, অনুমান বা যুক্তি গাঁথিবার নহে! ইহাতে নানা স্থানস্থ বেদান্তবাক্য সকল আহৃত হইয়া মীমাংসিত হইবে।"

এবং শঙ্করের মতে মীমাংসার অর্থ "অবিরোধী তর্কের সহিত বেদান্তবাক্য-সমূহের বিচার"। এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, বেদান্তবাক্য-সমূহ পরস্পর-বিরোধী নয়। হেগেলের পশ্চিম-মীমাংসার সহিত ব্যাসের উত্তর-মীমাংসার কোনও মিল নেই;—না মতে, না পদ্ধতিতে, ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় পরব্রহ্ম, হেগেলের প্রতিপাদ্য বিষয় অপরব্রহ্ম। নিরুক্তের মতে ভাববিকার ছয় প্রকার, যথা—সৃষ্টি, স্থিতি, হ্রাস, বৃদ্ধি, বিপর্য্যয় ও লয়। শঙ্কর হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিপর্য্যয়কে গণনার মধ্যে আনেন নি, কেননা, তাঁর মতে এ তিনটি হচ্ছে স্থিতিকালের ভাববিকার। অপর পক্ষে এই তিনটি ভাবই হচ্ছে হেগেলের অবলম্বন, কেননা তাঁর abosolute হচ্ছে eternal becoming। সুতরাং হেগেলের ব্রহ্ম শুধু অপরব্রহ্ম নন, তিনি ঐতিহাসিক ব্রহ্ম—অর্থাৎ ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্রমবিকাশ হচ্ছে। হেগেলের মতে তাঁর সমসাময়িক ব্রহ্ম প্রুশিয়া-রাজ্যে বিগ্রহবান্ হয়েছিলেন। শঙ্কর যে জ্ঞানের উল্লেখ করেছেন, সে জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া নয়; অপর পক্ষে হেগেলের জ্ঞান, ক্রিয়ারই যুগপৎ কর্ত্তা ও কর্ম্ম।

বেদান্তের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করবার উপায় যুক্তি নয়; অপর পক্ষে হেগেলের মতে যুক্তির উপরেই ব্রহ্মের অস্তিত্ব নির্ভর করে। Thesis এবং Antithesis-এর সুতোয় সুতোয় গেরো দিয়েই এক একটি ব্রহ্মমুহূর্ত্ত পাওয়া যায়। বেদান্তের ব্রহ্ম স্থির বর্ত্তমান, হেগেলের ব্রহ্ম চির-বর্দ্ধমান—অর্থাৎ একটি static, অপরটি dynamic। আসল কথা এই যে, বেদান্ত যদি Thesis হয়, তা হ'লে হেগেল তার Antithesis—এ দুই মতের অভেদ জ্ঞান শুধু অজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব।

৭

বিপিন বাবুর হাতে পড়ে' শুধু বাদরায়ণ নয়, কপিলও হেগেলে লীন হয়ে গেছেন।

বিপিন বাবু আবিষ্কার করেছেন যে, যার নাম thesis, antithesis এবং synthesis, তারই নাম তম, রজ ও সত্ত্ব। কেননা, তাঁর মতে thesis এর বাঙলা হচ্ছে স্থিতি, antithesis-এর বাঙলা বিরোধ এবং synthesis-এর বাঙলা সমন্বয়। এ অনুবাদ অবশ্য গায়ের জোরে করা, কেননা, thesis যদি স্থিতি হয়, তা হ'লে antithesis অ-স্থিতি (গতি) এবং synthesis সংস্থিতি। সে যাই হোক, সাংখ্যের ত্রিগুণের সঙ্গে অবশ্য হেগেলের ত্রিসূত্রের কোনও মিল নেই; কেননা, সাংখ্যের মতে এই ত্রিগুণের সমন্বয়ে জগতের লয় হয়,—সৃষ্টি হয় না। সত্ত্ব রজ তমের মিলন নয়, বিচ্ছেদই হচ্ছে সৃষ্টির কারণ; অপরপক্ষে হেগেলের মতে thesis এবং antithesis-এর মিলনের ফলে জগৎ সৃষ্ট হয়। বিপিন বাবুর ন্যায় পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দর্শনের সমন্বয়-কারের কাছে অবশ্য এ সকল পার্থক্য তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর; অতএব সর্ব্বথা উপেক্ষণীয়।

তম ও রজের মিলনে যে বস্তু জন্মলাভ করে, তা হেগেলের synthesis হ'তে পারে, কিন্তু তা সাংখ্যের সত্ত্ব নয়। এ কথা দুটি একটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষের মন ও মানব-সমাজের উন্নতির পদ্ধতি। বিপিন বাবুর উদ্ভাবিত কপিল-হেগেল-দর্শন অনুসারে ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়ায়—

তামসিক-মন = সুপ্ত রাজসিক-মন = জাগ্রত
সাত্ত্বিক-মন = ঝিমন্ত

তামসিক-সমাজ = মৃত রাজসিক-সমাজ = জীবিত
সাত্ত্বিক-সমাজ = জীবন্মৃত

অর্থাৎ সমন্বয়ের ফলে রজোগুণের উন্নতি নয়, অবনতি হয়। সত্ত্বগুণ যে তমোগুণ এবং রজোগুণের মাঝামাঝি একটি পদার্থ, এ কথা সাংখ্যাচার্য্যেরা অবগত নন, কেননা, তাঁরা হেগেল পড়েন নি।

উক্ত দর্শনের মতে সত্ত্বগুণ রজোগুণের অতিরিক্ত, অন্তর্ভূত নয়। সাত্ত্বিক-ভাব যে বিরোধের ভাব নয়, তার কারণ, রজোগুণ যখন তমোগুণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়, তখনই তা সত্ত্বগুণে পরিণত হয়। হেগেলের মত অবশ্য সাংখ্যমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। সাংখ্যকে উল্টে ফেল্‌লে যা হয়, তারই নাম হেগেল-দর্শন। সাংখ্যমতে সূক্ষ্ম অনুলোমক্রমে স্থূল হয়, হেগেলমতে ঐ একই পদ্ধতিতে স্থূল সূক্ষ্ম হয়। সাংখ্যের প্রকৃতি হেগেলের পুরুষ। সাংখ্যের মতে সৃষ্টিতে প্রকৃতি বিকারগ্রস্ত হন, হেগেলের মতে পুরুষ সাকার হন।

বিপিন বাবু দেশী-বিলাতী-দর্শনের সমন্বয় করে' যে মীমাংসা করেছেন, সে হচ্ছে অপূর্ব্ব মীমাংসা—কেননা, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, ইতিপূর্ব্বে এরূপ অদ্ভুত মীমাংসা আর কেউ করেন নি।

নূতন-পুরাতনের সমন্বয়ের এই যদি নমুনা হয়—তা হ'লে নূতন ও পুরাতন উভয়েই সমন্বয়কারকে বলবে—"ছেড়ে দে বাবা, লড়ে' বাঁচি।"

বিপিন বাবু যাকে সমন্বয় বলেন, বাঙ্গলা ভাষায় তার নাম খিচুড়ি।

সমাজ-দেবতার নিকটে পালমহাশয় যে খিচুড়ি-ভোগ নিবেদন করে' দিয়েছেন, যিনি তার প্রসাদ পাবেন, তাঁর যে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

আসল কথা এই যে, দর্শনবিজ্ঞানের মোট কথার আশ্রয় নেওয়ার অর্থ হচ্ছে কোনও বিশেষ সমস্যার মীমাংসা করা নয়,—তার কাছ থেকে পলায়ন করা। দর্শন কি বিজ্ঞান যে আজ পর্য্যন্ত এমন কোনও সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেন নি, যার সাহায্যে কোনও বিশেষ বিষয়ের বিশেষ মীমাংসা করা যায়—তার কারণ সকল বিশেষ বস্তুর বিশেষত্ব বাদ দিয়েই সর্ব্বসাধারণে গিয়ে পৌঁছান যায়। বিশ্বকে নিঃস্ব করেই দার্শনিকেরা বিশ্বতত্ত্ব লাভ করেন। সোনা ফেলে আঁচলে গিঁট দেওয়াই দার্শনিকদের চিরকেলে অভ্যাস। এ উপায়ে সম্ভবতঃ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হ'তে পারে, কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান লাভ হয় না। সমাজের উন্নতি দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ, সুতরাং দেশ-কালের অতীত কিম্বা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সমান বলবৎ কোনও সত্যের দ্বারা সে উন্নতি সাধন করবার চেষ্টা বৃথা। Physics কিম্বা Metaphysics-এর তত্ত্ব সমাজতত্ত্ব নয়, এবং এ দুই তত্ত্ব যে পৃথক্ জাতীয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিপিন বাবুর আবিষ্কৃত উর্দ্ধগতির দৃষ্টান্ত থেকেই দেখানো যেতে পারে। এমন কোনও জাগতিক নিয়ম নেই যে, মানুষের চেষ্টা ব্যতিরেকেও তার উন্নতি হবে। হ্রাস, বৃদ্ধি ও বিপর্য্যয়, এ তিনই জীবনের ধর্ম্ম—সুতরাং সমাজের উন্নতি ও অবনতি মানুষের দ্বারাই সাধিত হয়। মানবের ইচ্ছাশক্তিই মানবের উন্নতির মূল কারণ। তা ছাড়া মানবের উন্নতি যে ক্রমোন্নতি হ'তে বাধ্য, এমন কোনও নিয়মের পরিচয় ইতিহাসে দেয় না। বরং ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বিপর্য্যয়ের ফলেই মানব অনেক সময়ে মহা উন্নতি লাভ করেছে। যে সব মহাপুরুষকে আমরা ঈশ্বরের অবতার বলে' মনে করি,—যথা বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য প্রভৃতি, এঁরা মানুষের মনকে বিপর্য্যস্ত করেই মানব-সমাজকে উন্নত করেছেন;—এঁরা Spiral motion-এর ধার ধারতেন না, কিম্বা স্থিতি ও গতির মধ্যে দূতীগিরী করে' তাদের মিলন ঘটানও নিজেদের কর্ত্তব্য বলে' মনে করেন নি।

মানুষের মনকে যদি গেরোবাজের মত আকাশে ডিগ্‌বাজি খেতে খেতে উঠতে হ'ত এবং মানব-সমাজকে যদি লোটনের মত মাটিতে লুটতে লুটতে এগোতে হ'ত, তা হ'লে এ দুয়ের বেশিক্ষণ সে কাজ করতে হ'ত না,—দুদণ্ডেই তাদের ঘাড় লট্‌কে পড়ত। সুতরাং কি মন, কি সমাজ, কোনটিকেই পাকচক্রের ভিতর ফেল্‌বার আবশ্যকতা নেই। বিপিন বাবুর বক্তব্য যদি এই হয় যে, পৃথিবীতে অবাধগতি বলে' কোন জিনিস নেই, তা হ'লে আমরা বলি—এ সত্য শিশুতেও জানে যে, পদে পদে বাধা অতিক্রম করেই অগ্রসর হ'তে হয়। তাই বলে' স্থিতি-গতির সমন্বয় করে' চলার অর্থ যে শুধু হামাগুড়ি দেওয়া, এ কথা শিশুতেও মানে না। অধোগতি অপেক্ষা উন্নতির পথে যে অধিকতর বাধা অতিক্রম করতে হয়, এ ত সর্ব্বলোকবিদিত। কিন্তু এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, স্থিতির বিরুদ্ধে গতি নামক "বিরোধটি জাগিয়ে" রাখা মূর্খতা—এবং সেটিকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়াটাই জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। জড়ের সঙ্গে যোঝাযুঝি করেই জীবন স্ফূর্তিলাভ করে। সুতরাং পুরাতন যে পরিমাণে জড়, সেই পরিমাণে নবজীবনকে তার সঙ্গে লড়তে হবে। যে সমাজের যত অধিক জীবনীশক্তি আছে, সে সমাজে স্থিতিতে ও গতিতে, জড়ে ও জীবে তত বেশি বিরোধের পরিচয় পাওয়া যাবে। নূতন-পুরাতনের এই বিরোধের ফলে যা ভেঙ্গে পড়ে, তার চাইতে যা গড়ে' ওঠে, সমাজের পক্ষে তার মূল্য ঢের বেশি। কোনও নূতনের বরের ঘরের পিসি ও পুরাতনের কনের ঘরের মাসির মধ্যস্থতায় এ দুই

পক্ষের ভিতর যে চিরশান্তি স্থাপিত হবে—এ আশা দুরাশামাত্র।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, "নূতন-পুরাতনে যদি কোথায়ও বিবাদ থাকে ত সে সাহিত্যে—সমাজে নয়।" আমার বিশ্বাস যদি অন্যরূপ হ'ত, তা হ'লে আমি বিপিন বাবুর কথার প্রতিবাদ করতুম না। তার কারণ, প্রথমতঃ আমি সমাজ-সংস্কার ব্যাপারে অব্যবসায়ী। অতএব এ ব্যাপারে কোন্ ক্ষেত্রে আক্রমণ করতে হয় এবং কোন্ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে হয় এবং কোন্‌টি বিগ্রহের এবং কোন্‌টি সন্ধির যুগ, তা আমার জানা নেই। দ্বিতীয়তঃ বিপিন বাবুর উদ্ভাবিত পদ্ধতি অনুসারে নূতন-পুরাতনের জমাখরচ করুলে, সামাজিক হিসাবে পাওয়া যায় শুধু শূন্য। সুতরাং কি নূতন, কি পুরাতন, কোন পক্ষই ও উপায়ে কোন সামাজিক সমস্যার মীমাংসা করবার চেষ্টা-মাত্রও করবেন না। তৃতীয়তঃ ডাক্তার শীলের মতে—

"সহস্র বৎসরাবধি এই দেশ ঠিক সেই জায়গায়ই বসিয়া আছে, তার আর কোনও বিকাশ হয় নাই।"

যে সমাজ হাজার বৎসর এক স্থানে এক ভাবে বসে' আছে, তার আসন টলাবার শক্তি আমাদের মত সাহিত্যিকের শরীরে নেই। বিপিন বাবুর মতামত কর্ম্মকাণ্ডের নয়, জ্ঞানকাণ্ডের বস্তু বলেই এ বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি। তাঁর বর্ণিত সমন্বয়ের কোনও সার্থকতা সমাজে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যে নেই। সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে দুধের সঙ্গে জলের সমন্বয় প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু তাই বলে' সাহিত্যে জলোদুধের আমদানী আমরা বিনা আপত্তিতে গ্রাহ্য করতে পারিনে। কারণ, ও বস্তু অন্তরাত্মার পক্ষে মুখরোচকও নয়—স্বাস্থ্যকরও নয়। অথচ সরস্বতীর মন্দিরে কিঞ্চিৎ দুধ আর কিঞ্চিৎ মদের সমন্বয় যে জ্ঞানামৃত বলে' চালিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। সাহিত্যের এই Punch পান করে' আমাদের সমাজের আজ মাথা ঘুরছে। এই ঘুরুনির চোটে অনেকে চোখে এতটা ঝাপ্‌সা দেখেন যে, কোন্ বস্তু নূতন আর কোন্ বস্তু পুরাতন, কোন্‌টি স্বদেশী আর কোন্‌টি বিদেশী—তাও তাঁরা চিনতে পারেন না। এ অবস্থায় বাঙ্গালীর প্রথম দরকার—সমাজে নূতন-পুরাতনের সমন্বয় নয়—মনে নূতন-পুরাতনের বিচ্ছেদ ঘটানো। আমাদের শিক্ষা যাকে একসঙ্গে গুলে ঘুলিয়ে দিচ্ছে—আমাদের সাহিত্যের কাজ হওয়া উচিত —তাই বিশ্লেষণ করে' পরিষ্কার করা।

পৌষ, ১৩২১ সন।

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য

অনেকে বলে' থাকেন যে, আমাদের সাহিত্যের সত্যযুগ উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গেই এদেশ থেকে অন্তর্ধান হয়েছে। এখন ঘোর কলি, কেননা, এ যুগে সাহিত্যের যে একটিমাত্র পদ অবশিষ্ট আছে, সে হচ্ছে সমালোচনা এবং আমাদের যত কিছু লাফাঝাঁপি সে সব ঐ এক পায়ের উপর, তার পর ভবিষ্যতে যখন উক্ত পদের আস্ফালন বন্ধ হবে, তখন মন্বন্তর। এ সব কথা শুনে আমি হতাশ হয়ে পড়িনে, কেননা, অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালবাসা দুই-ই বেশি আছে। আমরা ইভলিউসন-পন্থী; সুতরাং আমাদের সত্য-যুগ পিছনে পড়ে' নেই—সুমুখে গড়ে' উঠছে। আমাদের কল্পিত ধরার স্বর্গ অতীতের ভুঁই ফুঁড়ে উঠবে না, বর্ত্তমানের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং আমাদের কাছে অতীতের অপেক্ষা বর্ত্তমান ঢের বেশি মূল্যবান্। অতীতের সাহায্যে আমরা বড় জোর বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা করতে পারি, তাও আবার আংশিক ভাবে, কিন্তু বর্ত্তমানের সাহায্যে আমরা ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি। আবিষ্কার করার চাইতে নির্ম্মাণ করা যে-পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, অতীতের জ্ঞানের চাইতে বর্ত্তমানের জ্ঞান লাভ করা সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ বর্ত্তমানকেই সব চাইতে কম চেনে এবং কম জানে। এ পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত, তাই সব চেয়ে অপরিচিত। যা চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের চোখের সুমুখে থাকে, তার দিকে আমরা বড় একটা দৃষ্টিপাত করিনে। ঐ কারণেই বর্ত্তমানের চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না এবং তার রূপ আমাদের মনে ধরে না। তা ছাড়া বর্ত্তমান একটি প্রবাহ, দিনের পর দিন হচ্ছে, কালের ঢেউয়ের পরে ঢেউ, সুতরাং এ বর্ত্তমানের ইয়ত্তা করতে হ'লে কালের ঢেউ গুণতে হয়; অপর পক্ষে অতীত হচ্ছে একটি জমাট নিরেট জড় পদার্থ, তার চারিদিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করা যায়, সুতরাং অতীতের গুণকীর্ত্তন করা নেহাৎ সহজ, বিশেষত চোখ বুজে। আর এক কথা, স্বদেশের অতীত হচ্ছে প্রতি জাতির পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি এবং তা' সমাজের ভোগ-দখলের বিষয়, অতএব তার প্রতি সাংসারিক মনের টানও বেশি, মানও বেশি। বর্ত্তমানের দুর্ভাগ্য এই যে, তা অস্থাবর এবং তার যা ভোগ, সে শুধু কর্ম্মভোগ। এই কারণে বর্ত্তমানকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায় না। বর্ত্তমান সাহিত্য হচ্ছে

বর্ত্তমানেরই একটি অঙ্গ, কাজেই বর্ত্তমান সাহিত্যিকরা গেঁয়ো যোগীর ন্যায় সমাজের কাছে ভক্তি পাওয়া দূরে থাক, ভিখও পান না। অথচ এই উপেক্ষিত বর্ত্তমানই যখন আমাদের অদূর-ভবিষ্যতের নির্ভরস্থল, তখন এ যুগের সাহিত্যের যথাসম্ভব পরিচয় নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। চেষ্টা করলে হয় ত এর ভিতর থেকেও একটা আশার চেহারা বার করা যেতে পারে।

আমাদের পক্ষে নব-সাহিত্যের নিন্দা করা যেমন সহজ, প্রশংসা করা তেমনি কঠিন। কেননা, খ্যাত-নামা লেখকদের বিচার করবার অধিকার যেখানে কারও নেই, সেখানে অখ্যাতনামা লেখকদের উপরে জজ হয়ে বসবার অধিকার সকলেরই আছে। জন্মাবধি উঠতে বসতে খেতে শুতে যে বস্তুর সুখ্যাতি শুনে আসছি, সে বস্তু যে মহার্ঘ্য, এ বিশ্বাস অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। গুরুজনদের তৈরী মত আমরা বিনাবাক্যে মেনে নেই, কেননা, তা মেনে নেবার ভিতর মনের কোনও খাটুনি নেই। যদি আমরাই চিন্তামার্গে ক্লেশ করুব, তা হ'লে গুরুর দরকার কি? আর যদি আমরাই পূজা করুব, তা হ'লে পুরোহিতের দরকার কি? কেননা, গুরু-পুরোহিতেরা সমাজের হাতে গড়া, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক labour saving machines. নব-সাহিত্যের দুর্ভাগ্যই এই যে, তা অতীতের ডিপ্লোমা নিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় না। এ সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করতে হ'লে নিজের অনুভূতি দিয়ে তা যাচাই করতে হয়, নিজের বুদ্ধি দিয়ে তা পরীক্ষা করতে হয়। আমরা ক'জনে সে পরিশ্রমটুকু করতে রাজি? সুতরাং নব-সাহিত্যের প্রশংসার চাইতে নিন্দাই যে বেশির ভাগ শোনা যায়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনও কারণ নেই। এই সকল নিন্দাবাদের বিচারসূত্রেই আমরা প্রকারান্তরে নব-সাহিত্যের গুণাগুণের বিচার করতে চাই।

নব-সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অপর্য্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন, চুটকি ও নকল। আমি একে একে এই সকল অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

নব-সাহিত্যের পরিমাণ যে অপর্য্যাপ্ত, তা অস্বীকার করবার যো নেই। বর্ত্তমানে এত নিত্য নূতন পুস্তক এবং পুস্তিকা, পত্র এবং পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হচ্ছে যে, এ যুগের তুলনায় "বঙ্গদর্শনের" যুগের বঙ্গসরস্বতীকে বন্ধ্যা বললেও অত্যুক্তি হয় না। উনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নামে এই অপবাদ ছিল যে, বাঙ্গালী রসনা-সর্ব্বস্ব, বিংশ শতাব্দীতে আমরা যদি কিছু হই ত রচনাসর্ব্বস্ব। এমন কি, এই নব যুগধর্ম্মের শাসনে গত যুগের অনেক পাকা বক্তারা কেঁচে আবার লেখক হয়ে উঠেছেন, নইলে যে তাঁদের গাদে পড়ে' থাকতে হয়।

এক কথায়, আজকের দিনে বাঙলার সাহিত্য-সমাজ লোকে লোকারণ্য এবং এ জনতার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আছেন। বঙ্গসাহিত্যের মন্দিরে বঙ্গ-মহিলারা যে শুধু প্রবেশ লাভ করেছেন, তা নয়, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছেন। বসেছেন বলা বোধ হয় ঠিক হ'ল না, কারণ, এ স্থলে এঁরা বসে' নেই, পুরুষদের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলেছেন। ইংরাজি রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে Peaceful penetration, সেই সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে' স্ত্রীজাতি আমাদের সাহিত্যরাজ্য ধীরে ধীরে এতটা দখল করে' নিচ্ছেন যে, আমার সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয় যে, এ রাজ্য হয় ত ক্রমে নারীরাজ্য হয়ে উঠবে। এ আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নয়, তার প্রমাণ গত মাসের "ভারতবর্ষের" প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সাহিত্য-সমাজের এই পরদা-পার্টিতে অন্তত চল্লিশ জন ভদ্রমহিলা যোগদান করেছিলেন। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা নেই, সে দেশে স্ত্রীসাহিত্যের এতটা প্রসার ও পশার বৃদ্ধির ভিতর কি একটু রহস্য নেই? এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, এই নব-সাহিত্যের মূলে এমন একটি অজ্ঞাত অবাধ্য এবং অদম্য শক্তি নিহিত রয়েছে, যার স্ফূর্ত্তি কোনরূপ বাহ্য ঘটনার অধীন নয়? বালিকা-বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়, উভয় স্থলেই নব-সাহিত্য যে সমভাবে ও সমতেজে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হচ্ছে, এর থেকে বোঝা উচিত যে, আমাদের জাতীয় মন কোনও নৈসর্গিক কারণে সহসা অসম্ভব রকম উর্ব্বর হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে আশার বীজ বপন করাই সঙ্গত, নিরাশার নয়ন-আসার নয়।

এ স্থলে নিজের কৈফিয়ৎস্বরূপে একটা কথা বলে' রাখা আবশ্যক। কেউ মনে করবেন না যে, আমি লেখিকাদের উপর কোনরূপ কটাক্ষ করে' এ সব কথা বলছি। কেননা, তাঁদের রচিত সাহিত্য এক স্বাক্ষর ব্যতীত, স্ত্রীগন্ধের অপর কোনও চিহ্ন নেই। ওসব লেখা শ্রীস্বাক্ষরিত হ'লে তার থেকে "মতী"-ভ্রংশতার পরিচয় কেউ পেতেন না। এদেশে স্ত্রীপুরুষের যে কোনও প্রভেদ আছে, তা বঙ্গসাহিত্য থেকে ধরবার যো নেই।

এত বেশি লোক যে এত বেশি লেখা লিখছে, তাতে আনন্দিত হবার অপর কারণও আছে। এই অজস্র রচনা এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বাঙালী-জাতি এ যুগে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। যদি কেউ এস্থলে এ কথা বলেন যে,বাঙালীর রচনা যে-পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে, সে-পরিমাণে কিছুই প্রকাশ করছে না। তার উত্তরে আমি বলব যে, বাঙালীর জাতীয় আত্মা আজও গড়ে' ওঠেনি এবং সে আত্মা গড়ে' তোলবার পক্ষে সাহিত্য এক-মাত্র না হ'লেও, একটি প্রধান উপায়। মানুষের দেহ যেমন দৈহিক ক্রিয়াগুলির চর্চার সাহায্যে গড়ে' ওঠে, মানুষের মনও তেমনি মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে গড়ে' ওঠে। জাতীয় আত্মা আবিষ্কার করবার বস্তু নয়, নির্ম্মাণ করবার বস্তু। আত্মাকে প্রকাশ করবার উদ্যম এবং প্রযত্ন থেকেই আত্মার আবির্ভাব হয়, কেননা, সৃষ্টি বহির্মুখী। অবশ্য আমি তাই বলে' এ দাবী করি নে যে, আজকাল যত কথা ছাপায় উঠছে, তার সকল কথাই জাতীয় মনের উপর ছাপ রেখে যাবে। "সে কহে বিস্তর মিছা, যে কহে বিস্তর"—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষে তেমনি সত্য। সুতরাং বাঙালী-জাতি যে অনেক বাক্য বৃথা ব্যয় করছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে কথা বলবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না, সে কথা বলা হয়েছে বলেই যে তা' টিঁকে যাবে, এমন ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। সাহিত্য-জগৎও যোগ্যতরের উদ্বর্ত্তনের নিয়মের অধীন। কালের নির্ম্মমকবলে পড়ে' যা ক্ষীণ-জীবী, তা অচিরে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই হবে। তবে বহু লোকে বহু কথা বললে, অনেক সত্য কথা উক্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নানা মুনির নানা মত থাকাটা দুঃখের বিষয় নয়; নানা মুনির মতের ঐক্যটাই সাহিত্য-সমাজে আসল দুঃখের বিষয়। কেননা, সে মত যদি ভুল হয়, তা হ'লে সাহিত্যের ষোল কড়াই কাণা হয়ে যায় এবং মুনিদের যে মতিভ্রম হয়, এ কথা সংস্কৃতেও লেখা আছে। এ যুগের বঙ্গসরস্বতী বহুভাষী হলেও যে বহুরূপী নন, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। তবে আমাদের সাহিত্যের সুর যে একঘেয়ে, তার কারণ, আমাদের জীবন বৈচিত্র্যহীন এবং এই বৈচিত্র্যহীনতার চর্চা আমরা একটা জাতীয় আর্ট করে' তুলেছি। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, আমাদের বদ্ধমূল ধারণা এই যে, নানা যন্ত্র এক সুরে বেঁধে তাতে এক সুর বাজালেই ঐক্যতান হয়। আর্ট-জগতে এই অদ্বৈতবাদের হাত থেকে উদ্ধার না পেলে বঙ্গসাহিত্য মুক্তিলাভ করবে না, এবং যত দিন এ দেশে আবার নূতন চৈতন্যের আবির্ভাব না হবে, তত দিন আমরা এক কথাই একশ-বার বলব, কেননা সে কথা বলার ভিতরেও মন নেই, শোনার ভিতরেও মন নেই। তাই বলে' আমাদের সকল লেখাপড়া একেবারেই অনর্থক নয়। আমরা আর কিছু করি আর না করি, ভাবী গুণীর জন্য আসর জাগিয়ে রাখছি। পাঠক-সমাজকে ঘুমিয়ে পড়তে না দেওয়াটাও একটা কম কাজ নয়।

আমরা সদলবলে সাহিত্য তৈরি করি আর না করি, সদলবলে পাঠক তৈরি কচ্ছি।

পূর্ব্বে যা বলা গেল, তা অবশ্য সকলের সমান মনঃপূত হবে না, কিন্তু এ কথা আপনারা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, যে ক্ষেত্রে লেখকের সংখ্যা অগণন, সে ক্ষেত্রে কোনও লেখক-এরণ্ড সাহিত্য-দ্রুম-স্বরূপে গ্রাহ্য হবেন না। এ বড় কম লাভের কথা নয়। হাজার অপ্রিয় হ'লেও এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের কোন কোন এরণ্ড এমন মহাবোধিবৃক্ষত্ব লাভ করেছিলেন যে, অদ্যাবধি বঙ্গ-সাহিত্যের পুরোনো পাণ্ডারা তাঁদের গায়ে সিঁদুর লেপে অপরকে পূজা করতে বলেন। অমুকে কি লিখেছেন, কেউ না জানলেও, তিনি যে একজন বড় লেখক, তা সকলেই জানেন, এমন প্রথিত-যশা প্রবীণ সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে বিরল নয়।

এ সাহিত্যের বিরুদ্ধে চুট্‌কিত্বের যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে অপবাদের সত্যাসত্য একটু পরীক্ষা করে' দেখা দরকার। ছোট গল্প, খণ্ড-কবিতা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা এবং প্রক্ষিপ্ত দর্শনই এ সাহিত্যের প্রধান সম্বল। সমালোচকদের মতে এই কৃশতাই হচ্ছে এ সাহিত্যের দুর্ব্বলতার লক্ষণ। বিংশ শতাব্দীতে যে কোনও নূতন মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার কিম্বা শকুন্তলা-তত্ত্ব লেখা হয় নি, এ কথা সত্য। এ যুগের কবিদের বাহু যে আজানুলম্বিত নয়, তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই। বধ এবং সংহার ছাড়া কাব্যের যে অপর কোনও কর্ত্তব্য নেই, এ কথা একালে মানা কঠিন। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে, মারাকাটা ব্যাপার না থাকলে কাব্য মহাকাব্য হয় না, তা হ'লে বলতে হয় যে, সাহিত্য-জগতের এমন কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই, যার দরুণ যুগে যুগে সকলকে শুধু মহাকাব্যই লিখতে হবে। Paradise Lost-এর পরে ইংরাজি ভাষায় আর দ্বিতীয় মহাকাব্য লেখা হয় নি এবং ফরাসী ভাষায় ও-শ্রেণীর কাব্য কস্মিন্‌কালেও রচিত হয় নি, তাই বলে'

ফরাসী-সাহিত্য এবং মিলটনের পরবর্ত্তী ইংরাজি সাহিত্যের যে কোনরূপ গৌরব নেই, এ কথা বলবার দুঃসাহস কোনও পাশ্চাত্য সমালোচক তাঁদের রক্তমাংসের শরীরে ধারণ করেন না।

তার পর আমরা যে শকুন্তলার চাইতে দ্বিগুণ বড় শকুন্তলাতত্ত্ব রচনা করিনে, তার জন্য আমাদের কাছে পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুর সার, অতএব সংক্ষিপ্ত। এ বিশ্বটি এত বিরাট যে, তাকে সচরাচর অনন্ত ও অসীম বলা হয়ে থাকে, অথচ তাত্ত্বিকেরা বিশ্বতত্ত্ব দু'চারটি ক্ষীণ সূত্রেই আবদ্ধ করে' থাকেন। সুতরাং আমরা কোনও সৃষ্ট পদার্থের বিষয় দুশ'-হাত তত্ত্বজাল বুনতে সাহসী হইনে, অন্ততঃ কোনও কাব্যরত্নকে সে জালে জড়াতে চাইনে। কাব্যের আগুনের পরিচয় দেবার জন্য তাকে সমালোচনার ছাই চাপা দেওয়াটা সুবিবেচনার কার্য্য নয়, কেননা, সে গুণের পরিচায়ক হচ্ছে অনুভূতি।

এ যুগের রচনার নাতিদীর্ঘতা এই সত্যেরই প্রমাণ দেয় যে, এ কালের লেখকেরা পাঠকদের মান্য করতে শিখেছেন। হিন্দুস্থানীরা বলেন যে, "আক্কেলিকো ইসারা বাস্"। যাঁদের শ্রোতার আক্কেলের উপর কোনও আস্থা নেই, তাঁরাই একটুখানি কথাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে অনেকখানি করে' তুলতে ব্যস্ত।

সমালোচকদের মতে বর্ত্তমানের আর-একটি অপরাধ এই যে, এ যুগে এমন কোনও লেখক জন্মগ্রহণ করেন নি, যাঁর প্রতিভায় দেশ উজ্জ্বল করে' রেখেছে। এ আমাদের দুর্ভাগ্য—দোষ নয়; প্রতিভার জন্মের রহস্য কোনও দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক অদ্যাবধি উদ্ঘাটন করতে পারেন নি। তবে এটুকু আমরা জানি যে, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য চাই। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে স্বীকার করতেই হবে যে, নূতন সাহিত্য গড়বার যে সুযোগ গত শতাব্দীর লেখকেরা পেয়েছিলেন, সে সুযোগ আমরা অনেকটা হারিয়েছি।

গত যুগের লেখকেরা সবাই প্রধান না হোন, সবাই স্বাধীন ছিলেন। তৎপূর্ব্ব-যুগের বঙ্গ-সাহিত্যের চাপের ভিতর থেকে তাঁদের তেড়ে-ফুঁড়ে বেরুতে হয় নি। একটি সম্পূর্ণ নূতন এবং প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালী সাহিত্যের সংস্পর্শেই উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য জন্মলাভ করে। সে সাহিত্যের উপর প্রাগ্‌ব্রিটিশযুগের বঙ্গ-সাহিত্যের কোনরূপ প্রভুত্ব ছিল না। "অন্নদামঙ্গল"-এর ভাষা ও ছন্দের কোনরূপ খাতির রাখলে মাইকেল "মেঘনাদবধ" রচনা করতেন না এবং বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনীর কোনরূপ খাতির রাখলে, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনা করতেন না। Milton এবং Scott যাঁদের গুরু—তাঁদের কাছে ভারতচন্দ্রের ঘেঁসবার অধিকার ছিল না।

কিন্তু আজকের দিনে ইংরাজি-সাহিত্য আমাদের কাছে এতটা পরিচিত এবং গা-সওয়া হয়ে এসেছে যে, তার থেকে আমরা আর বিশেষ কোনও নূতন উদ্দীপনা কিম্বা উত্তেজনা লাভ করিনে। আমাদের মনে ইংরাজি সাহিত্যের প্রথম পরিচয়ের চমক ভেঙ্গেছে, কিন্তু বিশেষ পরিচয়ের প্রভাব স্থান পায় নি। সুতরাং আমরা গত-যুগের সাহিত্যেরই জের টেনে আস্‌ছি। আমাদের পক্ষে তাই নতুন কিছু করা একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিভাশালী লেখকের সাক্ষাৎ আমরা সেই যুগে পাই, যে যুগে একটা নূতন এবং প্রবল ভাবের প্রবাহ, হয় ভিতর থেকে ওঠে, নয় বাইরে থেকে আসে। গত যুগে যে ভাবের জোয়ার বাইরে থেকে এসেছিল, এ যুগে তার তোড় এত কমে' এসেছে যে, ভাটা সুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। এ দিকে ভিতর থেকেও একটা নূতন কোনও ভাবের উৎস খুলে যায়নি। বরং সমাজের মনের টান আজ পুরাতনের দিকে—এও ত ভাবের প্রবাহের ভাটার অন্যতম লক্ষণ। এই ভাটার মুখে নতুন কিছু করতে হ'লে, কালের স্রোতের উজান বইতে হয়—তা করা সহজ নয়। এ অবস্থায় যা করা সহজ, তা হচ্ছে সনাতন জ্যাঠামি। সুতরাং নব-সাহিত্যকে বিশেষত্বহীন এবং প্রতিভাহীন বলায়, সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না। আরও বিপদের কথা এই যে, আমরা উভয় সঙ্কটে পড়েছি। কেননা, যদি আমরা গত-শতাব্দীর সাহিত্যের অনুসরণ করি, তা হ'লে সমালোচকদের মতে আমরা নকল-সাহিত্য রচনা করি, আর যদি অনুকরণ না করি, তা হ'লে পূর্ব্বোক্ত মতে আমরা কাব্যের উচ্চ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হই। অথচ আসল ঘটনা এই যে, নবযুগ কতক অংশে স্বাধীন। এই কারণে নবীন সাহিত্যিকেরা গতযুগের সাহিত্যের কোন কোন অংশের অনুকরণ করতে অক্ষম এবং কোন কোন অংশের অনুসরণ করতে বাধ্য। একালে যে মেঘনাদবধ কিম্বা দুর্গেশনন্দিনীর অনুকরণে গদ্য এবং পদ্য কাব্য রচিত হয় না, তার কারণ, বাঙালী জাতির মনের কলে Scott, Milton, Mill ও Comte-এর চাবির দম ফুরিয়ে এসেছে। অপর পক্ষে বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের

উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে অতিবিস্তৃত এবং অপ্রতিহত, তা অস্বীকার করবার যোও নেই, প্রয়োজনও নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ বলে যে, সে সাহিত্যের কোনও মূল্য কিম্বা মর্য্যাদা নেই, এ কথা বলায় শুধু স্থূলদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়। সুতরাং নবসাহিত্যকে নকল-সাহিত্য বলার কি সার্থকতা আছে, তাও একটু পরীক্ষা করে' দেখা দরকার।

সাধারণত লোকের বিশ্বাস যে, পরের লেখার অনুকরণ কিম্বা অনুসরণ করে' সাহিত্য রচনা করা যায় না। এ কথাটা ষোল-আনা সত্য নয়। ও উপায়ে অবশ্য কালিদাস হওয়া যায় না, কিন্তু শ্রীহর্ষ হওয়া যায়। "রত্নাবলী" মালবিকাগ্নিমিত্রের ছাঁচে ঢালা, অথচ সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি উপাদেয় নাটক। পৃথিবীর মহাপ্রাণ কবিদের স্পর্শে বহু লেখক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন এবং এই কারণেই তাঁদের অবলম্বন করেই সাহিত্যের নানা school গড়ে' ওঠে। ফরাসী এবং জর্ম্মাণ সাহিত্যে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গেটের আনুগত্য স্বীকার করাতে শিলারের প্রতিভার হ্রাস হয় নি। Victor Hugo-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে' Musset অ-কবির দেশে গিয়ে পড়েন নি এবং Flaubert-এর কাছে শিক্ষানবিশী করার দরুণ Guy de Maupassant-র গল্প সাহিত্য-সমাজে উপেক্ষিত হয় নি। প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যেও এরূপ ঘটনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাকে আমরা বৈষ্ণব কবিতা বলি, তা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুকরণেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে', জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, লোচনদাস, অনন্তদাসের রচনার যে কোন মূল্য নেই, এ কথা কোনও সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে, পর-সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য গঠিত হয় না, তা হ'লে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলায় সাহিত্য রচিত হয় নি। কেননা, গত শতাব্দীর মধ্যযুগের গল্প এবং উপন্যাস, কাব্য এবং মহাকাব্য, সবই যে সাহিত্যের অনুকরণে রচিত হয়েছিল, সে সাহিত্য আমাদের নিতান্তই পর। তা অপর দেশের, অপর জাতের অপর ভাষায় লিখিত। এ সত্ত্বেও আমরা গতযুগের এই আহেলা বিলাতি সাহিত্যকে বাঙলা সাহিত্য বলে' আদর করি। তার কারণ এই যে, যে সাহিত্য উপর-সাহিত্য, তা অপরই হোক্ আর আপনই হোক, মানব-মনের উপর তার প্রভাব অনিবার্য্য।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে এবং অনুসরণে যে কাব্য-সাহিত্য রচিত হয়েছে, তা নকল সাহিত্য বলে' উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

এই নব কবিদের রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ সকল রচনা, ভাষার পারিপাট্যে এবং আকারের পরিচ্ছিন্নতায়, পূর্ব্বযুগের কবিতার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যেমন কেবলমাত্র মনের আনন্দে গান গাইলে তা সঙ্গীত হয় না, তেমনি কেবলমাত্র মনের আবেগে স্বচ্ছন্দে লিখে গেলেও তা কবিতা হয় না। মনের ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতার নামই রচনাশক্তি। মনের ভাবকে গড়ে' না তুলতে পারলে তা মূর্ত্তি ধারণ করে না, আর যার মূর্ত্তি নেই, তা অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হ'তে পারে না। কবিতা শব্দকায়। ছন্দ, মিল ইত্যাদির গুণেই সে কায়ার রূপ ফুটে ওঠে। মনোভাবকে তার অনুরূপ দেহ দিতে হ'লে, শব্দজ্ঞান থাকা চাই, ছন্দমিলের কান থাকা চাই। এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য সাধনা চাই, কেননা, সাধনা ব্যতীত কোন আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না। নব-কবিরা যে সে সাধনা করে' থাকেন, তার কারণ, এ ধারণা তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে যে, লেখা জিনিসটে একটা আর্ট। নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের কবিতাবলী কিম্বা নবীনচন্দ্রের "অবকাশ-রঞ্জনী"র তুলনা করলে নবযুগের কবিতা পূর্ব্বযুগের কবিতার অপেক্ষা আর্ট-অংশে যে কত শ্রেষ্ঠ, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্য্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে, এ শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউসানের একধাপ উপরে উঠে গেছে। এ স্থলে হয় ত পূর্ব্বপক্ষ এই আপত্তি উত্থাপন করবেন যে, ভাবের অভাব থেকেই ভাষার এই সব কারিগরি জন্মলাভ করে। যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য্য নেই, তার যে আত্মার ঐশ্বর্য্য আছে, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারিনে। এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে ভাবের দিব্যমূর্ত্তি দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই। প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি ও পরিচ্ছিন্নমূর্ত্তি একরূপ নয়। ভাব যে কাব্যের আত্মা এবং ভাষা তার দেহ, এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাব্যের দেহ থেকে আত্মা পৃথক করা অসম্ভব বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় দেহের শেষ হয় এবং আত্মার সূত্রপাত হয়, সে সন্ধান কোনও দার্শনিকের জানা নেই। যাঁর রসজ্ঞান আছে, তাঁর কাছে এ সব তর্কের কোনও মূল্য নেই। কবিতা-রচনার আর্ট নবীন কবিদের

অনেকটা করায়ত্ত হয়েছে, এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তাঁদের লজ্জা পাবার কোনও কারণ নেই। ভারতচন্দ্র মালিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে, এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।" স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কবিতার যদি ঠাট্ বাদ দেওয়া যায়, তা হ'লে যে গুঁড়া অবশিষ্ট থাকে, তাতে ফোঁটা দেওয়াও চলে না, কেননা, সে গুঁড়া চন্দনের নয়। অথচ ভারতচন্দ্র যে কবি, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। নবীন কবিদের যে ভাবসম্পদ নেই, এ কথা বলায় আমার বিশ্বাস, কেবলমাত্র অন্যমনস্কতার পরিচয় দেওয়া হয়। মহাকবি ভাস বলেছেন যে, পৃথিবীতে ভাল কাজ করবার লোক সুলভ, চেনবার লোকই দুর্লভ।

মহাকাব্যের দিন যে চলে' গেছে, তার প্রমাণ বর্তমান ইউরোপেও পাওয়া যায়। সে দেশে কবিতা আজও লেখা হয়ে থাকে, কিন্তু হাতে-বহরে সে সবই ছোট। ফরাসী দেশের বিখ্যাত লেখক আঁদ্রে জীদ্ বলেন যে, গীতাঞ্জলি মুষ্টিমেয় না হ'লে বর্তমান ইউরোপ তা করযোড়ে গ্রহণ করত না। তাঁর ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষে রামায়ণ-মহাভারতের চাইতে ছোট কিছু লেখা হয়নি এবং হ'তে পারে না। এ কথা অবশ্য সত্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন একদিকে রামায়ণ-মহাভারত আছে, অপরদিকে তেমনি দু লাইন চার লাইন কবিতারও ছড়াছড়ি। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যা ছিল না, সে হচ্ছে এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনও পদার্থ। একালে আমরা যে ব্যাস-বাল্মীকির অনুকরণ না করে' অমরু ভর্তৃহরির অনুসরণ করি, সে যুগধর্ম্মের প্রভাবে। যে কারণে ইউরোপে আর মহাকাব্য লেখা হয় না, সেই একই কারণে এ দেশেও মহাকাব্য লেখা স্থগিত রয়েছে। এ যুগের কবিতা হচ্ছে হৃদয়ের স্বগতোক্তি, সুতরাং সে উক্তি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাইতে দীর্ঘ হ'তে পারে না। কিন্তু একালে গল্প আমরা গদ্যে বলি, কেননা, আমরা আবিষ্কার করেছি যে, দুনিয়ার কথা দুনিয়ার লোকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য গদ্যের পথই প্রশস্ত। সুতরাং গল্পের উত্তরোত্তর দেহ সঙ্কুচিত হওয়াটা ক্রমোন্নতির লক্ষণ নয়। ইউরোপে আজও গদ্যে এমন এমন লেখা হয়ে থাকে, যা আকারে মহাভারতের সমান না হ'লেও, রামায়ণের তুল্যমূল্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নভেলিষ্ট Tolstoy-র একখানি নভেল এক একখানি মহাকাব্য বিশেষ। ও-দেশের গদ্য-সাহিত্যে যেমন একদিকে ব্যাস-বাল্মীকি আছে, অপর দিকে তেমনি অমরু-ভর্তৃহরিরও অভাব নেই। যে ক্ষেত্রে হাজার হাজার পাতার দুচারটি গল্প জন্মলাভ করছে, সেই ক্ষেত্রেই আবার দু পাতা চার পাতার হাজার হাজার গল্প জন্মলাভ করছে—এতেই পরিচয় দেয় যে, ইউরোপের মনের ক্ষেত্র কত সরস, কত সতেজ, কত উর্ব্বর। সুতরাং আমাদের নব গদ্য-সাহিত্যে যে ছোট গল্প ছাড়া আর কিছুই গজায় না, তাতে অবশ্য এ সাহিত্যের দৈন্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু এ দীনতা ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় যতটা ধরা পড়ে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যের তুলনায় ততটা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, গত যুগের গল্প-সাহিত্যে তারক গাঙ্গুলীর "স্বর্ণলতা" ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এ যুগের গল্প-লেখকেরা যে সাধারণত ছোট গল্প রচনার পক্ষপাতী, তার কারণ এই যে, আমাদের জীবন ও মন এতই বৈচিত্র্যহীন এবং সে মনে ও সে জীবনে ঘটনা এতই অল্প ঘটে এবং যা ঘটে, তাও এতটা বিশেষত্বহীন যে, তার থেকে কোনও বিরাট কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করা যায় না। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে Anna Karenina কিম্বা Les Miserables গড়তে বসায় বাচালতার পরিচয় দেওয়া হয়—প্রতিভার নয়।

এ সমাজে যা পাওয়া যায় এবং সম্ভবত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে হচ্ছে ছোট গল্পের খোরাক। আমাদের জীবনের রঙ্গভূমি যতই হোক না কেন, তারই মধ্যে হাসি-কান্নার অভিনয় নিত্য চলছে, কেননা, আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করে'ও নিজেদের মানুষ ছাড়া অপর কোনও শ্রেণীর জীবে পরিণত করতে পারি নি। ভয়, আশা, উদ্যম, নৈরাশ্য, ভক্তি, ঘৃণা, মমতা, নিষ্ঠুরতা, ভালবাসা, দ্বেষহিংসা, বীরত্ব, কাপুরুষতা, এককথায় যা নিয়ে এই মানব-জীবন—তা miniature-য়ে এ সমাজে সবই মেলে। সুতরাং যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের গল্প-সাহিত্যের এই নূতন পথটি খুলে দিলেন, তখন আমরা দলে দলে সোৎসাহে সেই পথে এসে পড়লুম। এ অবশ্য আপশোষের কথা নয়, এবং এর জন্যও দুঃখ করবার দরকার নেই যে, এ পথে এখন এমন বহু-লোক দেখা যায়, যাদের কাজ হচ্ছে শুধু সে পথের ভিড় বাড়ানো। কি ধর্ম্মে, কি সাহিত্যে, কোনও মহাজন-কর্ত্তৃক একটি নূতন পন্থা অবলম্বিত হ'লে, সেখানে চিরদিনই এমনি জনসমাগম হয়ে থাকে, তার মধ্যে দুচারজন শুধু এগিয়ে যান। এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, সে পথ বিপথ,—কিন্তু এই প্রমাণ হয় যে, বেশির ভাগ লোক দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য।

Many are called but few are chosen—বাইবেলের এ কথা হচ্ছে এ সম্বন্ধে শেষ কথা। এ যুগে কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী উপন্যাসকার না থাকলেও এমন অনেক গল্প লেখা হয়ে থাকে, যা গত-শতাব্দীর কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের কলম হ'তে বেরত না। সুতরাং নব-সাহিত্যে যদি chosen few থাকেন, তা হ'লে আমাদের ভগ্নোদ্যম হবার কারণ নেই।

কার্ত্তিক, ১৩২২ সন।

ভারতবর্ষের ঐক্য

শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় উপরিউক্ত নামে পুস্তিকাকারে ইংরাজি ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। যাঁরা দিবারাত্র জাতীয় ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন, তাঁদের পক্ষে, অর্থাৎ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পক্ষে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের যথেষ্ট মূল্য আছে।

স্বদেশ কিম্বা স্বজাতির নাম উল্লেখ করবামাত্রই, একদলের লোক আমাদের মুখ-চোপ দিয়ে বলেন—ও সব কথা উচ্চারণ করবার তোমাদের অধিকার নেই, কেননা, ভারতবর্ষ বলে' কোন একটা বিশেষ দেশ নেই এবং ভারতবাসী বলে' কোন একটা বিশেষ জাতি নেই। ভারতবর্ষের অর্থ হচ্ছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং পরস্পর অসংযুক্ত নানা খণ্ড দেশ এবং ভারতবাসীর অর্থ হচ্ছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরস্পর-সম্পর্কহীন নানা ভিন্ন জাতি।

ভারতবর্ষ যে একটি প্রকাণ্ড মহাদেশ, এ সত্য আবিষ্কার করবার জন্য পায়ে হেঁটে তীর্থ-পর্য্যটন করবার দরকার নেই। একবার এ দেশের মানচিত্র-খানির উপর চোখ বুলিয়ে গেলেই আমাদের শ্রান্তি বোধ হয় এবং শরীর না হোক, মন অবসন্ন হয়ে পড়ে এবং ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যে অগণ্য, আর এই কোটি কোটি লোক যে জাতি, ধর্ম্ম ও ভাষায় শত শত ভাগে বিভক্ত, এ সত্য আবিষ্কার করবার জন্যও সেন্সস্ রিপোর্ট পড়বার আবশ্যক নেই; চোখ-কান খোলা থাকলেই তা আমাদের কাছে নিত্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

আমাদের জীবনের যে ঐক্য নেই, এ কথাও যেমন সত্য—আমাদের মনে যে ঐক্যের আশা আছে, সে কথাও তেমনি সত্য। এক-ভারতবর্ষ হচ্ছে এ-যুগের শিক্ষিত লোকের Utopia, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে গন্ধর্ব্বপুরী। সে পুরী আকাশে ঝোলে এবং সকলের নিকট তা প্রত্যক্ষ নয়। কিন্তু যিনি একবার সে পুরীর মর্ম্মর-প্রাচীর, মণিময় তোরণ, রজত-সৌধ ও কনকচূড়ার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন—তিনি আকাশরাজ্য হ'তে আর চোখ ফেরাতে পারেন না। এক কথায় তিনি ভারতবর্ষের একতার দিবাস্বপ্ন দেখতে বাধ্য। অনেকের মতে দিবাস্বপ্ন দেখাটা নিন্দনীয়, কেননা, ও-ব্যাপারে শুধু অলীকের সাধনা করা যায়। মানুষে কিন্তু, বাস্তব-জগতের অজ্ঞতাবশত নয়, তার প্রতি অসন্তোষবশতই চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখে; সে স্বপ্নের মূল মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত এবং ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য দেয় যে, আজকের কল্পনা-রাজ্য কখন কখন কালকের বাস্তব-জগতে পরিণত হয়, অর্থাৎ দিবাস্বপ্ন কখন কখন ফলে। সুতরাং ভারতবর্ষের ঐক্যসাধন জাতীয়জীবনের লক্ষ্য করে' তোলা - অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সকলের পক্ষেই আবশ্যক। সমগ্র সমাজের বিশেষ-একটা কোন লক্ষ্য না থাকায়, দিন দিন আমাদের সামাজিক জীবন নির্জ্জীব এবং ব্যক্তিগত জীবন সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ছে। পূর্ব্বে যে ঐক্যের কথা বলা গেল, তা অবশ্য ideal unity এবং অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের মনে এক-ভারতবর্ষ একটি বিরাট ideal-রূপেই বিরাজ করছে। আমাদের বাঞ্ছিত Utopia ভবিষ্যতের অঙ্কস্থ রয়েছে।

কিন্তু এই ideal-কে দু'টি সম্পূর্ণ বিপরীত দিক্ থেকে নিত্যই আক্রমণ সহ্য করতে হয়। এক দিকে ইংরাজি সংবাদপত্র, অপর দিকে বাঙলা সংবাদপত্র, এই ideal-টিকে নিতান্ত উপহাসের পদার্থ মনে করেন। উভয়েই শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের উপর বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করেন। ইংরাজি কাগজওয়ালাদের মতে এই মনোভাবটি বিদেশীশিক্ষালব্ধ এবং সেই জন্যই স্বদেশী-ভিত্তিহীন—কেননা, ভারতবর্ষের অতীতের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। ইংরাজি সংবাদপত্রের মতে ভারতবর্ষের সভ্যতার মূল এক নয়—বহু; এবং যা গোড়া হ'তেই পৃথক, তার আর কোনরূপ মিলন সম্ভব নয়। কুকুর আর বিড়াল নিয়ে এক-সমাজ গড়ে' তোলা যায় না; ও দুই শ্রেণীর জীব শুধু গৃহস্বামীর চাবুকের ভয়ে একসঙ্গে ঘর করতে পারে। অপর-পক্ষে বাঙলা সংবাদপত্রের মতে হিন্দুসমাজের বিশেষত্বই এই যে, তা বিভক্ত। এ সমাজ সতরঞ্চের ঘরের মত ছক-কাটা; এবং কার কোন্ ছক, তাও অতি সুনির্দ্দিষ্ট। এই সমাজের ঘরে, কে সিধে চলবে, কে কোণাকুণি চলবে, কে এক-পা চলবে, আর কে আড়াই-পা চলবে, তারও বাঁধাবাঁধি নিয়ম আছে। এর নাম হচ্ছে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। নিজের নিজের গণ্ডীর ভিতর অবস্থিতি করে' নিজের নিজের চাল রক্ষা করাই হচ্ছে ভারতবাসীর সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং যাঁরা সেই দাবার ঘরের রেখাগুলি মুছে দিয়ে সমগ্র সমাজকে

এ ঐথরে করতে চান, তাঁরা দেশের শত্রু। শিক্ষিত-সম্প্রদায় যে ঐক্য চান, তা ভারতবর্ষের ধাতে নেই—সুতরাং জাতির উন্নতির যে ব্যবস্থা তাঁরা করতে চান, তাতে শুধু সামাজিক অরাজকতার সৃষ্টি করা হবে। সমাজের সুনির্দ্দিষ্ট গণ্ডীগুলি তুলে দিলে সমাজ-তরী কোণাকুণি চলে' তীরে আটকে যাবে এবং সমাজের ঘোড়া আড়াই পার পরিবর্ত্তে বার পা তুলে ছুটবে। এ অবশ্য মহা বিপদের কথা। সুতরাং ভারতবর্ষের অতীতে এই ঐক্যের ideal-এর ভিত্তি আছে কি না, সেটা খুঁজে দেখা দরকার। এই কারণেই সম্ভবত রাধাকুমুদ বাবু দু'হাজার বৎসরের ইতিহাস খুঁড়ে, সেই ভিত বার করবার চেষ্টা করেছেন, যার উপরে সেই কাম্যবস্তুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এ যে অতি সাধু উদ্দেশ্য, সে বিষয়ে বোধ হয় দ্বিমত নেই।

২

রাধাকুমুদ বাবু জাতীয় জীবনের ঐক্যের মূল যে প্রাচীন যুগের সামাজিক জীবনে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেছেন, তার জন্য তিনি আমার নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ। অনেকে দেখতে পাই, এই ঐক্যের সন্ধান, ঐতিহাসিক সত্যে নয়, দার্শনিক তথ্যে লাভ করেন। এ শ্রেণীর লোকের মতে সমগ্র ভারতবর্ষ এক ব্রহ্মসূত্রে গ্রথিত; কেননা, অদ্বৈতবাদে সকল অনৈক্য তিরস্কৃত হয়। কিন্তু যে সমস্যা নিয়ে আমরা নিজেদের বিব্রত করে' তুলেছি, তার মীমাংসা বেদান্তদর্শনে করা হয়নি; বরং ঐ দর্শন থেকেই অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, প্রাচীন যুগে জাতীয় জীবনে কোনও ঐক্য ছিল না। মানব-জীবনের সঙ্গে মানব মনের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। কাব্যের মত দর্শনও জীবন-বৃক্ষের ফুল; তবে এ ফুল এত সূক্ষ্ম বৃন্তে ভর করে' এত উচ্চে ফুটে ওঠে যে, হঠাৎ দেখতে তা আকাশ-কুসুম বলে' ভ্রম হয়। আমার বিশ্বাস, একটি ক্ষুদ্র দেশের এক রাজার শাসনাধীন জাতির মন একেশ্বর-বাদের অনুকূল। ঐরূপ জাতির পক্ষে, বিশ্বকে একটি দেশ হিসেবে এবং ভগবান্‌কে তার অদ্বিতীয় শাসন ও পালনকর্ত্তা হিসেবে দেখা স্বাভাবিক এবং সহজ। অপর পক্ষে যে মহাদেশ নানারাজ্যে বিভক্ত, এবং বহু রাজা উপ-রাজার শাসনাধীন, সে দেশের লোকের পক্ষে আকাশ-দেশে বহু দেবতা এবং উপ-দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করাও তেমনি স্বাভাবিক। সাধারণত মানুষে মর্ত্ত্যের ভিত্তির উপরেই স্বর্গের প্রতিষ্ঠা করে। যে দেশের পূর্ব্বপক্ষ একেশ্বরবাদী, সে দেশের উত্তরপক্ষ নাস্তিক—এবং যে দেশের পূর্ব্ব-পক্ষ বহু-দেবতাবাদী, সে দেশের উত্তর-পক্ষ অদ্বৈতবাদী। অদ্বৈতবাদী বহুর ভিতর এক দেখেন না; কিন্তু বহুকে মায়া বলে' তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। সুতরাং উত্তর-মীমাংসার সার-কথা "ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা"—এই অর্দ্ধ-শ্লোকে যে বলা হয়েছে, তার আর সন্দেহ নাই। এই কারণেই বেদান্তদর্শন সাংখ্যদর্শনের প্রধান বিরোধী। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, সংখ্যা বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে শুধু শূন্য। সুতরাং মায়াবাদ যে ভাষান্তরে শূন্যবাদ এবং শঙ্কর যে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ—এই প্রাচীন অভিযোগের মূলে কত-কটা সত্য আছে। যে একাত্মজ্ঞান কর্ম্মশূন্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে জ্ঞানের চর্চ্চায় আত্মীর যতটা চর্চ্চা করা হয়, বিশ্ব-মানবের সঙ্গে আত্মীয়তার চর্চ্চা ততটা করা হয় না। আরণ্যক ধর্ম্ম যে সামাজিক, এ কথা শুধু ইংরাজি-শিক্ষিত নাগরিকেরাই বলতে পারেন। সমাজ-ত্যাগ করাই যে সন্ন্যাসের প্রথম সাধনা, এ কথা বিস্মৃত হবার ভিতর যথেষ্ট আরাম আছে।

সোহং হচ্ছে Individualism-এর চরম উক্তি। সুতরাং বেদান্তমত আমাদের মনোজগৎকে যে পরিমাণে উদার ও মুক্ত করে' দিয়েছে, আমাদের ব্যবহারিক জীবনকে সেই পরিমাণে বদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ করে' ফেলেছে। বেদান্তের দর্পণে প্রাচীন যুগের সামাজিক মন প্রতিফলিত হয় নি,—প্রতিহত হয়েছে। বেদান্ত-দর্শন সামাজিক জীবনের প্রকাশ নয়,—প্রতিবাদ। অদ্বৈতবাদ হচ্ছে সঙ্কীর্ণ কর্ম্মের বিরুদ্ধে উদার মনের প্রতিবাদ, সীমার বিরুদ্ধে অসীমের প্রতিবাদ, বিষয়-জ্ঞানের বিরুদ্ধে আত্ম-জ্ঞানের প্রতিবাদ;—এক কথায় জড়ের বিরুদ্ধে আত্মার প্রতিবাদ। সমাজের দিক থেকে দেখলে জীবের এই স্বরাট-জ্ঞান শুধু বিরাট অহঙ্কার মাত্র। সুতরাং যে সূত্রে এ কালের লোকেরা জাতিকে এক-তার বন্ধনে আবদ্ধ করতে চান, তা ব্রহ্মসূত্র নয়, কিন্তু তার অপেক্ষা ঢের স্থূল জীবন-সূত্র।

কেন যে পুরাকালে অদ্বৈতবাদীরা কৌপীন-কমণ্ডলু ধারণ করে' বনে যেতেন, তার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি না করতে পারায় এ কালের অদ্বৈতবাদীরা চোগা-চাপকান পরে' আপিসে যান। উভয়ের ভিতর মিল এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন উদাসী, আর এক-জন শুধু উদাসীন,—পরের সম্বন্ধে।

রাধাকুমুদ বাবুর প্রবন্ধের প্রধান মর্য্যাদা এই যে,

তিনি ভারতের আত্মজ্ঞানের ভিত্তি অতীতের জীবন-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। তবে কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছেন, সেইটেই বিচার্য্য। ভবিষ্যতের শূন্যদেশে যা-খুসি-তাই স্থাপনা করবার যে স্বাধীনতা মানুষের আছে, অতীত সম্বন্ধে তা নেই। ভবিষ্যতের সবই সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু অতীতে যা হয়ে গেছে, তার আর একচুলও বদল হ'তে পারে না। কল্পনার প্রকৃত লীলাভূমি ভূত নয়, ভবিষ্যৎ। আকাশে আশার গোলাপ-ফুল অথবা নৈরাশ্যের সরষের ফুল দেখবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে; কিন্তু অতীত ফুলের নয়, মূলের দেশ। যে মূল আমরা খুঁজে বার করতে চাই, তা সেখানে পাই ত ভালই, না পাই ত, না পাই।

৩

জীবের অহং-জ্ঞান যেমন একটি দেহ আশ্রয় করে' থাকে, জাতির অহং-জ্ঞানও তেমনি একটি দেশ আশ্রয় করে' থাকে। মানুষের যেমন দেহাত্ম-জ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল, জাতির পক্ষেও তেমনি দেশাত্ম-জ্ঞান তার সকল বিশিষ্টতার মূল। ভারতবাসীর মনে এই দেশাত্মজ্ঞান যে অতি প্রাচীনকালে জন্মলাভ করেছিল, রাধাকুমুদ বাবু নানারূপ প্রমাণপ্রয়োগের বলে তাই প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন।

ভারতবর্ষ মহাদেশ হ'লেও যে একদেশ এবং ভারতবাসীদের যে সেটি স্বদেশ, এ সত্যটি অন্তত: দু'হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

উত্তরে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বতের প্রাকার এবং পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বে দুর্লঙ্ঘ্য সাগরের পরিখা যে ভারতবর্ষকে অন্যান্য সকল ভূভাগ হ'তে বিশেষরূপে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র করে' রেখেছে, এ হচ্ছে প্রত্যক্ষ সত্য। তার পর, এ দেশ অসংখ্য যোজন বিস্তৃত হলেও সমতল; এত সমতল যে, সমগ্র ভারতবর্ষকে এক-ক্ষেত্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। বিন্ধ্যাচল সম্ভবত: এ মহাদেশকে দুটি চিরবিচ্ছিন্ন খণ্ডদেশে বিভক্ত করতে পারত, যদি অগস্ত্যের আদেশে সে চিরদিনের জন্য নতশির হয়ে থাকতে বাধ্য না হ'ত। রাধাকুমুদ বাবু দেখিয়েছেন যে, এই স্বদেশ জ্ঞান ভারতবাসীর পক্ষে কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞান নয়, কিন্তু তাদের আত্যন্তিক প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে জড়িত। ভারতবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষ হচ্ছে পুণ্যভূমি;—সে দেশের প্রতি ক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র, প্রতি নদী—তীর্থ, প্রতি পর্ব্বত—দেবাত্মা। কিন্তু এই ভক্তি ভাব আর্য্য মনোভাব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। বেদ হ'তে পঞ্চনদের আবাহনস্বরূপ একটিমাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করে' রাধাকুমুদ বাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঋষিদের মনে এই একদেশীয়তার ভাব সর্ব্বপ্রথমে উদয় হয়েছিল। কিন্তু সেই বৈদিক মনোভাব যে ক্রমে বৃদ্ধি এবং বিস্তারলাভ করে' শেষে লৌকিক মনোভাবে পরিণত হয়েছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। আমার বিশ্বাস, বৈদিক ধর্ম্ম নয়, লৌকিক ধর্ম্মই ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি করে' তুলেছে। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম্ম হচ্ছে লৌকিক ধর্ম্ম; বিদেশী বিজেতা আর্য্যদের ধর্ম্ম হচ্ছে বৈদিক ধর্ম্ম। ভারতবর্ষের মাটি ও ভারতবর্ষের জলই হচ্ছে লৌকিক ধর্ম্মের প্রধান উপাদান। সে ধর্ম্ম আকাশ থেকে পড়েনি, মাটি থেকে উঠেছে। ভারতবর্ষের জনগণ চিরদিন কৃষিজীবী। যে ত্রিকোণ পৃথিবী তাদের চিরদিন অন্নদান করে, সেই হচ্ছে অন্নদা এবং যে জল তাদের শস্যক্ষেত্রে রস-সঞ্চার করে, সেই হচ্ছে প্রাণদা। তাই ভারতবর্ষের অসংখ্য লৌকিক দেবতা সেই অন্নদার বিকাশ। সীতার মত এ সকল দেবতা হলমুখে ধরণী হ'তে উত্থিত হয়েছে। তাই এ দেশের প্রতিমা মাটির দেহ ধারণ করে এবং জলে তার বিসর্জ্জন হয়। "তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে" এ কথা মোটেই বৈদিক মনোভাবের পরিচায়ক নয়। কেননা, পঞ্চনদবাসী আর্য্যেরা মন্দিরও গড়াতেন না, প্রতিমাও পূজা করতেন না। এই দেশভক্তি পৌরাণিক সাহিত্যে অতি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তার কারণ, বৈদিক যুগ ও পৌরাণিক যুগের মধ্যে যে বৌদ্ধযুগ ছিল, সেই যুগেই এই স্বদেশ-জ্ঞান ও স্বদেশ-প্রীতি ভারতবর্ষময় ব্যাপ্ত হয়ে প'ড়ছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম অবৈদিক ধর্ম্ম, এবং সার্ব্বজনীন বলে' তা সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। অপর পক্ষে বৈদিক ধর্ম্ম আর্য্যদের গৃহধর্ম্ম, বড়জোর কুলধর্ম্ম। সমগ্র দেশকে একাত্ম করবার ক্ষমতা সে ধর্ম্মের ছিল না। যেমন অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে সুরেরা এক ঈশাণকোণ ব্যতীত আর সকল-দিকেই পরাস্ত হয়েছিলেন, তেমনি সম্ভবত ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি বৈদিক দেবতারা দেশজ দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে এক গৃহকোণ ব্যতীত আর সর্ব্বত্রই পরাস্ত হয়েছিলেন। অন্তত আকাশের দেবতারা যে মাটির দেবতাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তার প্রমাণ পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম। বৈদিক ও লৌকিক মনোভাবের মিশ্রণে এই নবধর্ম্মভাবের জন্ম। আর্য্যেরা যে কস্মিন্‌কালেও সমগ্র ভারতবর্ষকে একদেশ বলে' স্বীকার করতে চাননি, তার প্রমাণ স্মৃতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অধঃপতন এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের

সময় মনুসংহিতা লিখিত হয়। এই সংহিতাকারের মতে ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং আর্য্যাবর্ত্ত-বহির্ভূত সমগ্র ভারতবর্ষ হচ্ছে ঘৃণ্য ম্লেচ্ছদেশ। মনুর টীকাকার মেধাতিথি বলেন যে, দেশের ম্লেচ্ছত্বদোষ কিম্বা আর্য্যত্বগুণ নেই। যে দেশে বেদবিহিত ক্রিয়াকর্ম্মনিরত আর্য্যেরা বাস করেন, সেই হচ্ছে আর্য্যভূমি,—বাদবাকি সব ম্লেচ্ছদেশ। আর্য্যদের এই স্বজাতিজ্ঞান সমগ্র ভারতবর্ষের স্বদেশ-জ্ঞানের প্রতিকূল ছিল। পঞ্চনদের পঞ্চনদীর উল্লেখ করে' তর্পণের মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বৈদিক ঋষিরা যে গণ্ডূষ করতেন, সে কতকটা সেই ভাবে, যে ভাবে একালে বিলাতি-আর্য্যেরা মহোৎসবের ভোজনান্তে "The Land we live in" -এর নামোচ্চারণ করে' সুরায় আচমন করেন। প্রাচীন আর্য্যজাতির মনে দেশ-প্রীতির চাইতে আত্ম-প্রীতি ঢের বেশি প্রবল ছিল। প্রতি দেশের স্বাতন্ত্র্য-রক্ষাই ছিল তাঁদের স্বধর্ম্ম। রাধাকুমুদ বাবু এমন কোন বিরুদ্ধ-প্রমাণ দেখাতে পারেন নি, যাতে করে' আমার এই ধারণা পরিবর্ত্তিত হ'তে পারে।

৪

ইংরাজ যে সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষের মানচিত্র লালবর্ণে চিত্রিত করেছেন, তা নয়; আজ দু-হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বে অশোকও একবার ঐ মানচিত্র গেরুয়া-রঙে রঞ্জিত করেছিলেন। এ কথা শিক্ষিত লোকমাত্রেরই জানা না থাক, শোনা আছে। যা সুপরিচিত, তার আর নূতন করে' আবিষ্কার করা চলে না, সুতরাং রাধাকুমুদ বাবু প্রাচীন ভারতের এক-রাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক সাহিত্যে অনুসন্ধান করেছেন —তাঁর পুস্তিকার মৌলিকতা এইখানেই। সুতরাং তিনি অনুসন্ধানের ফলে যে নূতন সত্য আবিষ্কার করেছেন, তা বিনা পরীক্ষায় গ্রাহ্য করা যায় না।

শাস্ত্রকারেরা বেদকে স্মৃতির মূল বলে' উল্লেখ করেছেন,—কিন্তু বেদ যে শূদ্ররীতি কিম্বা বৌদ্ধনীতির মূল, এ কথা তাঁরা কখনও মুখে আনেন নি; বরং বৌদ্ধাচার্য্যেরা যখন বেদের কোন উৎসন্ন শাখা থেকে বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ভূত হয়েছে এই দাবী করতেন, তখন বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কানে হাত দিতেন। অথচ এ কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, ইতিহাস যে প্রাচীন সাম্রাজ্যের পরিচয় দেয়, তা বৌদ্ধযুগে ব্রাত্য-দেশে শূদ্র-ভূপতিকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মগধের নন্দবংশও শূদ্রবংশ, মৌর্য্যবংশও শূদ্রবংশ ছিল এবং অশোক, সমগ্র ভারতবর্ষে শুধু রাজচক্র নয়, ধর্ম্ম-চক্রেরও স্থাপনা করে' সসাগরা বসুন্ধরার সার্ব্বভৌম চক্রবর্ত্তীর পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সুতরাং এক-রাষ্ট্রীয়তার মূল বৈদিক-মনে পাওয়া যাবে কি না—সে বিষয়ে স্বতই সন্দেহ উপস্থিত হয়।

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে কোন একরাটের পরিচয় ইতি-হাস দেয় না। কিন্তু ইতিহাসের পশ্চাতে কিম্বদন্তী আছে,—সেই কিম্বদন্তীর সাহায্যে, দেশের বিশেষ-কোন ঘটনা না হোক্, জাতির বিশেষ মনোভাবের পরিচয় আমরা পেতে পারি। রাধাকুমুদ বাবু ব্রাহ্মণ এবং শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি নানা বৈদিক গ্রন্থ থেকে রাজনীতিসম্বন্ধে আর্য্যজাতির মনোভাব উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছেন।

রাধাকুমুদ বাবুর দাখিলি বৈদিক-দলিলগুলির কোন তারিখ নেই—সুতরাং তার সবগুলি যে মাগধ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে লিখিত হয়েছিল, তা বলা যায় না; অতএব কোন বিশেষ ব্রাহ্মণগ্রন্থ বৈদিক-সাহিত্যের অন্তর্ভূত হলেও তার প্রতি বাক্য যে বৈদিক মনোভাবের পরিচয় দেয়, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে না। ওরূপ দলিলের বলে, তর্কিত বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা অসম্ভব। বিশেষত যখন তাঁর সংগৃহীত দলিল তাঁর মতের বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দেয়। রাধাকুমুদ বাবুর প্রধান দলিল হচ্ছে "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।" ঐ গ্রন্থেই তিনি সাম্রাজ্য শব্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং সেই শব্দই হচ্ছে তাঁর মতের মূল-ভিত্তি। উক্ত ব্রাহ্মণের একখানি বাঙলা অনুবাদ আছে; তারি সাহায্যে রাধাকুমুদ বাবুর মত যাচাই করে' নেওয়া যেতে পারে। "সম্রাট্" কাকে বলে, তার পরিচয় ঐ ব্রাহ্মণে এইরূপ আছে—

"পূর্ব্বদিকে প্রাচ্যগণের যে সকল রাজা আছেন, তাঁহারা দেবগণের ঐ বিধান-অনুসারে সাম্রাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হন, অভিষেকের পর তাঁহারা "সম্রাট্" নামে অভিহিত হন"।—("ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" ৩৮শ অধ্যায়)।

রাধাকুমুদ বাবু বলেন যে, এ-স্থলে মাগধ-সাম্রাজ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। যদি তাঁর উক্ত অনুমান গ্রাহ্য হয়, তা হ'লে প্রাচীন ভারত-সাম্রাজ্যের বৈদিক ভিত্তি ঐ এক কথাতেই নষ্ট হয়ে যায়।

"ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"-এ নানারূপ রাজ্যের উল্লেখ আছে, যথা—রাজ্য, সাম্রাজ্য, ভৌজ্য, স্বারাজ্য, বৈরাজ্য, পারমেষ্ঠ্য রাজ্য, মহারাজ্য ইত্যাদি। রাধাকুমুদ বাবু প্রমাণ করতে চান যে, ঐ সকল নাম উচ্চ-নীচ-হিসাবে একরাটের অধীন ভিন্ন ভিন্ন রাজপদ নির্দ্দেশ করে। কিন্তু ঐ ব্রাহ্মণগ্রন্থেই প্রমাণ আছে

যে, ঐ সকল নাম হচ্ছে পৃথক্ পৃথক্ দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের নাম। তার সকল-দেশই পঞ্চনদের বহির্ভূত, কোন কোন দেশ ভারতবর্ষেরও বহির্ভূত, এবং বিশেষ করে' একটি দেশ পৃথিবীর বহির্ভূত। যথা—

"পূর্ব্বদিকে প্রাচ্যগণের রাজা—সম্রাট্। দক্ষিণদিকে সত্বৎগণের রাজা—ভোজী। পশ্চিমদিকে নীচ্য ও অপাচ্যদিগের রাজা স্বরাট্। উত্তরদিকে হিমবানের ওপারে যে উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র জনপদ আছে, তাহারা দেবগণের ঐ বিধানানুসারে বৈরাজ্যের জন্য অভিষিক্ত হয়, অভিষেকের পরে তাহারা বিরাট্ নামে অভিহিত হয়। মধ্যমদেশে সবশ উশীনরগণের ও কুরুপাঞ্চালগণের যে সকল রাজা আছেন, তাঁহারা রাজা নামে অভিহিত হন এবং উর্দ্ধদেশে (অন্তরীক্ষে) ইন্দ্র পারমেষ্ঠ্য লাভ করিয়াছিলেন।"

উপরিউক্ত উদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকে দেখা যায় যে, দেশ-ভেদ-অনুসারে' সে যুগের রাজাদের নামভেদ হয়েছিল,—পদমর্য্যাদা অনুসারে নয়। উক্ত ব্রাহ্মণে একরাট্ শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সে একরাট্, একসঙ্গে স্বরাট্, বিরাট্, সম্রাট্, সব রাট্ হ'তে পার্‌তেন—অর্থাৎ তিনি স্বদেশ বিদেশ এবং আকাশ-দেশের রাজা হ'তে পারতেন। বলা বাহুল্য, এরূপ একরাটের নিকট ভারতবর্ষের একরাষ্ট্রীয়তার সন্ধান নিতে যাওয়া বৃথা।

আসল কথা এই যে, রাজনীতি অর্থে আমরা যা বুঝি ও চাণক্য যা বুঝতেন—ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তার নামগন্ধও নেই। বাজপেয়, রাজসূয়, অশ্বমেধ, পুনরভিষেক, ঐন্দ্র মহাভিষেক,—এ সব হচ্ছে যজ্ঞ এবং এ সকল যজ্ঞের উদ্দেশ্য রাজ্যস্থাপনা নয়, পুরোহিতকে ভূরি দান করানো এবং ঐরূপ যজ্ঞ দ্বারা যজমানের অভ্যুদয় সাধিত হ'তে পারে, তাই প্রমাণ করা। রাধাকুমুদ বাবু তাঁর পুস্তিকাতে, পুরাকালে যাঁরা একরাট্ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তাঁদের নামের একটি লম্বা ফর্দ্দ "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ" হ'তে তুলেছিলেন। সম্ভবত তিনি উক্ত রাজগণের সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যলাভ ঐতিহাসিক ঘটনা বলে' মনে করেন, কিন্তু আমরা তা পারিনে, কারণ, উক্ত ব্রাহ্মণের মতে, ঐন্দ্র মহাভিষেকের বলেই প্রাচীন রাজারা ঐ ইন্দ্র-বাঞ্ছিত পদ লাভ করেছিলেন। মন্ত্রবলে এবং যজ্ঞফলে তাদৃশ বিশ্বাস না থাকার দরুণ আমরা উক্ত রাজযজমানদের ঐরূপ আত্যন্তিক অভ্যুদয় এবং রাজপুরোহিতদের তদনুরূপ দক্ষিণালাভের ইতিহাসে যথেষ্ট আস্থা স্থাপন করতে পারিনে। রাধাকুমুদ বাবু নামের ফর্দ্দের পাশাপাশি যদি দানের ফর্দ্দটি তুলে দিতেন, তা হ'লে পাঠকমাত্রেই "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"-এর কথা কতদূর প্রামাণ্য, তাহা সহজেই বুঝতে পারতেন। ঐন্দ্র মহাভিষেক উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপ দান করা হ'ত—

বদ্ধ শতকোটি গাভীর মধ্যে প্রতিদিন মাধ্যন্দিন সবনে দুই দুই সহস্র। আটাশী হাজার পৃষ্ঠবাহনযোগ্য শ্বেত অশ্ব। এ দেশ ও দেশ হইতে আনীত নিষ্ককণ্ঠী আঢ্য-দুহিতার মধ্যে দশ সহস্র।

এরূপ দানের দাতা দুর্ল্লভ হ'লেও, গ্রহীতা আরও বেশি দুর্ল্লভ। এত গরু, এত ঘোড়া, এত বনিতা রাখি কোথায় আর খাওয়াই কি, এ প্রশ্ন বোধ হয়, দরিদ্র ব্রাহ্মণের মনে উদিত হ'ত। ব্রাহ্মণগ্রন্থ এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, সে যুগে এমন বহু ক্ষত্রিয় ছিলেন, যাঁদের নিজেদের কোষ-বৃদ্ধি এবং অধিকার-বৃদ্ধির প্রতি লোভ ছিল এবং তাঁরা ব্রাহ্মণদের তন্তর-মন্তর-যাদুতে বিশ্বাস করতেন। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণ"-এ যে সাম্রাজ্যের উল্লেখ আছে, তা ক্ষত্রিয়ের বাহুবল, বুদ্ধিবল ও চরিত্রবল দ্বারা নয়—ব্রাহ্মণের মন্ত্রবলের দ্বারা লাভ করবার বস্তু। কারণ, শত্রুনাশের জন্য তাঁদের যুদ্ধ করা আবশ্যক হ'ত না, ব্রহ্ম-পরিমর-কর্ম্ম প্রভৃতি অভিচারের দ্বারাই সে কামনা সিদ্ধ হ'ত। এই অতীত সাহিত্যের ভিত্তির উপর যদি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, তা হ'লে আমাদের মনোজগতের গন্ধর্ব্বপুরী চিরকাল আকাশেই ঝুলবে।

আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার নূতন মদ নিত্যই সংস্কৃত সাহিত্যের পুরানো বোতলে ঢালছি। আমরা Spencer-এর বিলাতি মদ শঙ্করের বোতলে ঢালি, Comte-এর ফরাসি মদ মনুর বোতলে ঢালি এবং তাই যুগসঞ্চিত সোমরস বলে' পান করে তৃপ্তিও লাভ করি, মোহও প্রাপ্ত হই। কিন্তু এই ঢালাঢালি এবং ঢলাঢলিরও একটা সীমা আছে। Bismark-এর জর্ম্মাণ মদ ব্রাহ্মণের যজ্ঞের চমসে ঢালতে গেলে আমরা সে সীমা পেরিয়ে যাই। ও হাতায় এ জিনিস কিছুতেই ধরবে না। ইংরাজি শিক্ষার প্রসাদে আমরা ব্রাহ্মণ-সাহিত্যের আধিদৈবিক ব্যাপার সকলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা করতে পারি এবং চাই কি তাতে কৃতকার্য্যও হ'তে পারি,—কিন্তু শুধু ইংরাজি শিক্ষা নয়, তদুপরি ইংরাজি ভাষার সাহায্যেও তার "আধিরাষ্ট্রিক" ব্যাখ্যা করতে পারিনে।

৫

এতদিন, প্রাচীন ভারতের নাম উল্লেখ করবামাত্রই, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, এই

সকল কথাই আমাদের স্মরণপথে উদিত হ'ত এবং বঙ্গসাহিত্যে তারই গুণকীর্ত্তন করে' আমরা যশ ও খ্যাতি লাভ করতুম। Imperialism নামক আহেলবিলাতি পদার্থ পুরাকালে এদেশে ছিল, এরূপ কথা পূর্ব্বে কেউ বললে তার উপর আমরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠতুম, কেননা, ওরূপ কথা আমাদের দেশ-ভক্তিতে আঘাত করত। বৈরাগ্যের দেশ ঐহিক ঐশ্বর্য্যের স্পর্শে কলুষিত হয়ে উঠে। কিন্তু আজ যে নব দেশভক্তি ঐ Imperialism-এর উপর এত ঝুঁকেছে, তার একমাত্র কারণ কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রের আবিষ্কার। উক্ত গ্রন্থ থেকেই আমরা এই জ্ঞান লাভ করেছি যে, ইউরোপীয় রাজনীতির যা শেষ কথা, ভারতবর্ষের রাজনীতির তাই প্রথম কথা; এই সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে' আমাদের চোখ এতই ঝলসে গেছে যে, আমরা সকল তন্ত্রে, সকল মন্ত্রে ঐ সাম্রাজ্যেরই প্রতিরূপ দেখছি। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমাদের চোখ যখন আবার প্রকৃতিস্থ হবে, তখন আমরা এই প্রাচীন Imperialism-কেও খুঁটিয়ে দেখতে পারব এবং কৌটিল্যকেও জেরা করতে শিখব। ইতিমধ্যে এই কথাটি আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, চন্দ্রগুপ্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে যে মহাভারত রচনা করে-ছিলেন,—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র শুধু তারই ভাষ্য। যে মনোভাবের উপর সে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে মনোভাব বৈদিক নয়, সম্ভবত আর্য্যও নয়। মনু প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে' দেখলে দেখতে পাওয়া যায় যে, উক্ত অর্থ-শাস্ত্রকারের মানসিক প্রকৃতি এবং ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের প্রকৃতি এক নয়। সে পার্থক্য যে কোথায় ও কতখানি, তা আমি একটিমাত্র উদাহরণের সাহায্যে দেখিয়ে দেব।

সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম্ম শব্দের অর্থ Law, এবং শাস্ত্রকারদের মতে এই law-এর মূল হচ্ছে বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি। রাজশাসন অর্থাৎ legislation যে ধর্ম্মের মূল হ'তে পারে, এ কথা ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হয় নি। রাজা ধর্ম্মের রক্ষক, স্রষ্টা নন। অপরপক্ষে কৌটিল্যের মতে রাজশাসন সকল ধর্ম্মের উপরে। এ কথা বৈদিক ব্রাহ্মণ কখনই মেনে নেন নি,—কেননা, তাঁদের মতে ধর্ম্মের মূল হচ্ছে বেদ; অতএব ধর্ম্ম অপৌরুষেয়। তার পরে আসে স্মৃতি, অর্থাৎ আর্য্য ঋষিদের স্মৃতি,—তার পর সদাচার, অর্থাৎ আর্য্যদের কুলাচার,—তার পর আত্মতুষ্টি, অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের আত্মতুষ্টি। এক কথায় ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে—"পা· পর্য্যাদমানঃ" আর্য্য-আচারই এক-মাত্র এবং সমগ্র Law. যাঁরা এরূপ মনোভাব পোষণ করতেন, তাঁরা চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং চাণক্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতি কখনই স্বচ্ছন্দ-মনে গ্রাহ্য করতেন না। সম্ভবত এই কারণেই, চাণক্য নিজে ব্রাহ্মণ হলেও, সংস্কৃত সাহিত্যে হিংসা, প্রতিহিংসা, ক্রোধ, দ্বেষ, ক্রূরতা ও কুটিলতার অবতার-স্বরূপ বর্ণিত হয়েছেন এবং একই কারণে ব্রাহ্মণ-সমাজে তাঁর অনাদৃত গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম এবং সেই সঙ্গে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সকল কারণ আমরা অবগত নই। যখন সে ইতিহাস আবিষ্কৃত হবে, তখন সম্ভবত আমরা দেখতে পাব যে, এ ধ্বংস ব্যাপারে বৈদিক ব্রাহ্মণের যথেষ্ট হাত ছিল।

এ কথা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভারতবাসী আর্য্যদের কৃতিত্ব সাম্রাজ্য গঠনে নয়—সমাজ-গঠনে; এবং তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় শিল্পে-বাণিজ্যে নয়—চিন্তার রাজ্যে। শাস্ত্রের ভাষায় বলতে হ'লে "পৃথিবীর সর্ব্ব-মানবকে" আর্য্য-আচার শিক্ষা দেওয়া এবং সেই আচারের সাহায্যে সমগ্র ভারতবাসীকে এক-সমাজভুক্ত করাই ছিল তাঁদের জীবনের ব্রত। তার ফলে, হিন্দু সমাজের যা-কিছু গঠন আছে, তা আর্য্যদের গুণে এবং যা-কিছু জড়তা আছে, তাও তাঁদের দোষে। এই বিরাট সমাজের ভিতর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও প্রভুত্ব রক্ষা করবার জন্য তাঁরা যে দুর্গ-গঠন করেছিলেন, তাই আজ আমাদের কারাগার হয়েছে। দর্শনে, বিজ্ঞানে, কাব্যে, অলঙ্কারে, অভিধানে, ব্যাকরণে তাঁদের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি,—যে ভাষার তুলনা জগতে নেই, সেই সংস্কৃত ভাষায় অক্ষয় হয়ে রয়েছে। এ দেশের প্রাচীন আর্য্যেরা যে সাম্রাজ্যের চাইতে সমাজকে এবং সমা-জের চাইতেও মানুষের আত্মাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন, তার জন্য সমাজের লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই; কারণ, বর্ত্তমানে ইউরোপের মনেও এ ধারণা হয়েছে যে, Political problems-এর অপেক্ষা Social problems-এর মূল্য কিছু কম নয় এবং শাসনযন্ত্রের চাইতে মানুষের মূল্য ঢের বেশি।

আষাঢ়, ১৩২১ সন।

বীরবলের টিপ্‌পনী

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত

মুখপত্র

দেশে যখন লর্ড কর্জ্জনের উপদ্রব হয়, তখন সে উপদ্রবে—যাঁদের চোখ ও মুখ একসঙ্গে দুই ফোটে—তাঁদের মধ্যে আমিও ছিলুম একজন। সে সময় আমি স্বনামে বিনামে যে সকল লেখা লিখি—তার মধ্যে দুটি পুনঃ প্রকাশিত করছি। আমার বিশ্বাস, এ লেখা দুটি বাসি হ'লেও বিরস হয় নি, অতএব পাঠকদের কাছে অরুচিকর হবে না।

বাকী লেখাগুলি সবই কালকের, সুতরাং আশা করি, আজ সেগুলি একদম সেকেলে হয়ে যায় নি। আর যদি বা তাই হয়ে থাকে, তা হ'লেও সেগুলির একটা মূল্য আছে, অর্থাৎ ঐতিহাসিক মূল্য।

১৩২৮ সাল

বীরবল

বীরবলের টিপ্পনী

কংগ্রেসের দলাদলি

সম্প্রতি বাঙলার কংগ্রেসের দল যে দু'টুকরো হয়ে পড়েছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমাদের দেশে যাত্রার দল বেশি দিন গোটা থাকে না, একদিন-না-একদিন তার ভিতর থেকে একটা-না-একটা ভাঙ্গাদল বেরিয়ে পড়েই পড়ে।

আমি যখন ছোট ছেলে, তখন বাঙলাদেশে একটি জবর যাত্রার দল ছিল, তার নাম বৌ-মাষ্টারের দল। সেই দল ভেঙ্গে যখন দু'দল হ'ল, তখন উভয় দলই নিজেদের বৌ-মাষ্টারের দল বলে' পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন। দেশের লোক, কোন্ পক্ষের দাবী ঠিক, তা ঠিক করতে না পেরে, এই নামের মামলার একটা দু-পক্ষের মন-রাখা-গোছের মীমাংসা করে' দিলে। যে দলে জুড়ি বেশি আর ছোকরা কম, তার নাম দিলে বৌ-মাষ্টারের দল, আর যে দলে ছোকরা বেশি আর জুড়ি কম, সে দলের নাম রাখলে বৌ-মাষ্টারের ভাঙ্গাদল।

আজকের দিনে, কলিকাতা সহরে, যখন কংগ্রেসের উভয় দলই নিজেদের অভ্যর্থনা-সমিতি বলে' পরিচয় দিতে আরম্ভ করেছেন, তখন আমার মতে এ দু'য়ের ভিতর যে দলে জুড়ি বেশি, ছোকরা কম, সে দলকে পুরোনো বৌ-মাষ্টারের দল—আর যে দলে ছোকরা বেশি, জুড়ি কম, সে দলকে নতুন বৌ-মাষ্টারের দল বলাই সঙ্গত। এ দু'টি নাম এই দুই দলের গায়ে যে কেমন খাপে খাপে বসে' যায়, তা যাঁর চোখ আছে, তাঁকে আর দেখিয়ে দিতে হবে না।

এ দলাদলির কারণটা যে কি, তা আমাদের বুঝে দেখা আবশ্যক।

এবার কংগ্রেসের যাত্রা শুনতে ভারতসাম্রাজ্যের বড়কর্ত্তা স্বয়ং মন্‌টেগু সাহেব, সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে এদেশে আসছেন; এবং গুজব এই যে, তাঁকে খুশী করতে পারলে, তিনি আমাদের একটা মস্ত বড় পেলা দেবেন—স্বরাজ্য। সুতরাং এবারে কে মূল গায়েন হবেন, তাই নিয়ে যত মারামারি। মন্‌টেগু সাহেবের মনের খবর আমরা বড় একটা রাখিনে; কার গলা শুনে তিনি খুশী হবেন আর কার গলা শুনে তিনি চটে যাবেন,—পুরুষের মেয়েলি গলা আর স্ত্রীলোকের মর্দ্দানা আওয়াজ, এ দুয়ের ভিতর কোন্‌টি তাঁর বেশি পছন্দসই—সে কথা বলা আমাদের পক্ষে অসাধ্য, কেননা, আমরা হচ্ছি সাহিত্যিক, রাজনৈতিক নই। যেহেতু, আমাদের কাজ হচ্ছে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, আর এঁদের পরের খেয়ে দেশের গরু চরানো,—সে কারণ আমরা অবশ্য এঁদের চাইতে ঢের বেশি নির্ব্বোধ জীব। তবে সাহিত্যের দিক থেকে এ কথা আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, শ্রীমতী আনিবেসাণ্ট যে বক্তৃতা পাঠ করবেন, তা পাঠ করে' আমরা খুশী হব; কেননা, তাতে এমন একটি জিনিস থাকবে যা কংগ্রেসের ধাতে নেই—সে হচ্ছে Style. কংগ্রেসী-সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, সে সাহিত্য গড়া যেমন সহজ, পড়া তেমনি কঠিন। মামুলি কংগ্রেসী-সাহিত্যের দুধে পৌঁছনো যে কতটা অসম্ভব, তার পরিচয় পাওয়া যায় কংগ্রেসের গত অধিবেশনের সভাপতির অভিভাষণে এবং ইংরাজি ভাষাতেও যে খাঁটি বাঙলা বক্তৃতা করা যায়, তার পরিচয়ও পাওয়া যায় কংগ্রেসের গত অধি[illegible]শনের সভাপতির অভিভাষণে।

আবার এ কথাও শুনতে পাই যে, ঝগড়াটা আসলে গায়ক নিয়ে নয়,—পালা নিয়ে। এক দলের মতে নাকি পালাটা হওয়া উচিত "ভারতভিক্ষা, আর এক দলের মতে "ভারতসঙ্গীত"।

পুরোনো দল নূতন দলকে বলছেন যে, অর্ব্বাচীন তোমরা যদি গান ধরো—

> "বাজ্ রে শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে,
> সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে"—

তা হ'লে তোমরা সত্য সত্যই শিঙ্গে ফুঁকবে।

অপর পক্ষে নতুন দল পুরোনো দলকে বল্‌ছেন যে, প্রাচীন, তোমরা যদি গান ধরো—

> "কি শুনি রে আজ, পুরি আর্য্যদেশ
> এ আনন্দ-ধ্বনি কেন রে হয়"—

তা হ'লে সে আনন্দধ্বনি বস্তুত আক্রন্দধ্বনিই হবে।

কথায় যে শুধু কথা বাড়ে, তা-ই নয়, সেই সঙ্গে তার সুরও চড়ে' যায়। তাই ছ'পক্ষই আজ চড়া সুরে কড়া কথা বলতে সুরু করেছেন,—অবশ্য পরস্পরকে। সে সব কথার অলঙ্কার বাদ দিলে দাঁড়ায় এই যে—নবীন দলের মতে, কংগ্রেস এবার প্রাচীন দলের হাতে পড়লে তাঁদের কীর্ত্তনের চোটে দশের দশা ধরবে, আর দেশের দুর্দ্দশার আর সীমা থাকবে না; আর প্রবীণ দলের মতে, কংগ্রেস এবার নবীন দলের হাতে পড়লে তাঁদের নর্ত্তনের চোটে দেশের এ নব রাজসূয়যজ্ঞ নব দক্ষযজ্ঞে পরিণত হবে।

এখন এ দুই পক্ষের কোন্ পক্ষ ঠিক, বলা কঠিন। কেননা উভয় পক্ষেরই নিজের নিজের হয়ে দু'চার কথা বলবার আছে। পুরোণো দল বলেন—দেখো, আমরা আজ ত্রিশ বৎসর ধরে' চাইতে চাইতে চাওয়া বিষয়ে পাকা হয়ে উঠেছি; সুতরাং মন্‌টেগু সাহেবের কাছে কি চাইতে হবে, তা আমরা যেমন জানি, এমন আর কেউ জানে না। নূতন দল এর উত্তরে বলেন,—হ্যাঁ দেখো, তোমরা গত ত্রিশ বৎসর ধরে' চেয়ে আসছ বটে, কিন্তু মেকি ছাড়া আর কিছু পেয়ে এসো নি। এখন যখন বিলেত আমাদের বহুকালের দেনা পরিশোধ করতে উদ্যত হয়েছে, তখন আমাদের ন্যায্য পাওনা আমরা ষোল আনা বুঝে নেব, আর তার প্রতি পয়সাটি বাজিয়ে নেব।

এখন ন্যায্য পাওনাটা কি, তাই নিয়েই ত যত গোল। এ বিষয়ে কোনও পক্ষের যে একটা পরিষ্কার ধারণা আছে, তার পরিচয় ত তাঁদের কথাবার্ত্তায় বড় একটা পাওয়া যায় না। গোলের মূল ত ঐখানেই। আমাদের ভাবী "স্বরাজ"-এর একটা স্পষ্ট রূপ কারও চোখে নেই—অথচ তার নাম সকলের মুখেই রয়েছে। অতএব আসল বস্তুর চাইতে তার নামের মাহাত্ম্য ঢের বেড়ে গেছে। তাই "হোম-"রুল" এবং 'সেল্‌ফ্-গভর্ণমেণ্ট" উভয়েই যুদ্ধং দেহি বলে' কংগ্রেসের আসরে নেবেছেন। অথচ এই দু'টি বাক্যের যে একই অর্থ, তার দলিল কংগ্রেস ও মোস্‌লেম লীগের দস্তখতি দরখাস্ত। অতএব দেখা গেল, ঝগড়াটা পালা নিয়েও নয়, কেননা, উভয় পক্ষের মতেই এবার কংগ্রেসে অযোধ্যাকাণ্ডের অভিনয় হবে, অর্থাৎ—লক্ষ্ণৌ-এর পালার পুনরভিনয় হবে। সুতরাং দাঁড়াল এই যে, "বর বড় কি ক'নে বড়" এই নিয়েই আড়াআড়ি।

রাজনীতিতে রাজনীতিতে যখন বিবাদ ঘটে, তখন তার মীমাংসা করে' দিতে পারে একমাত্র সরল নীতি; আর যেখানে দু'পক্ষই বেঁকে বসে, সেখানে তাদের সিধে করে' বসাতে পারে, একমাত্র সেই লোক—যিনি কোনও পক্ষেরই তাঁবে নন, এবং দু'পক্ষেরই উপরে। সুতরাং এ অবস্থায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মধ্যস্থ হ'তে বাধ্য হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই আসরে নামাতে, দেশে হরিষে বিষাদ উপস্থিত হয়েছে। রাজনীতি যাঁদের ব্যবসা নয়, সেই সব দেশভক্ত লোকের হর্ষের কারণ, তাঁরা জানেন, মনের উদারতায় আর হৃদয়ের গভীরতায় তাঁর সমকক্ষ ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, এবং তার বাণী পৃথিবীশুদ্ধ লোক কান খাড়া করে' শুনবে, কেননা, ভাষার সৌন্দর্য্যে আর ভাবের ঐশ্বর্য্যে সে বাণীর তুলনা ভূ-ভারতে মেলা দুর্লভ। অপর পক্ষে রাজনীতি যাঁদের পেশা, তাঁরা ভয় পান যে, কংগ্রেসের আসরে দণ্ডায়মান হ'লে তিনি শুধু প্রেমের গান গাইবেন,—কেননা, তিনি কবি। তিনি যে হিংসার গান গাইবেন না, এ কথা সত্য। দেশের কথা আর দ্বেষের কথা যে এক কথা নয়, এ বানান-জ্ঞান তাঁর আছে। ভয়ের আরও কারণ আছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নন, তার উপর তিনি বাউল; সুতরাং তিনি কংগ্রেসের সাধা রাগ ও বাঁধা তাল কিছুই মানবেন না, এমন কি, সে বৈঠকের কায়দা-কানুনও নয়। যেখানে হাঁটুগেড়ে বসে' সুরভাঁজা দস্তুর, সেখানে হয় ত তিনি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে খোলা গলায় এমনি সুর ধরে' দেবেন যে, সুরের আগুন ছড়িয়ে যাবে সবখানে। কাজেই রাজনীতির পেশাদার ওস্তাদেরা হয় গালে হাত দিয়ে বসে' ঢোক গিলছেন, নয় বিড়বিড় করে' প্রলাপ বকছেন।

আমি বলি, তোমাদের কোনও ভয় নেই। যে চোরা গলিতে তোমরা ঢুকেছ, সেখান থেকে কেউ যদি তোমাদের উদ্ধার করতে পারে, তা হ'লে এক রবীন্দ্রনাথই পারবেন, অপর কেউ পারবে না। কেননা, তিনি মুক্ত আকাশের দেশের লোক,—আলোয় তাঁর অনুগামী যে হবে, তাকে দিনের সত্যের সরল ও উদার রাজপথে আসতেই হবে।

এ দিকে তোমরা ত ভ্রাতৃবিরোধে মেতে আছ, আর ওদিকে?—ওদিকে এ দেশের বে-সরকারী ইংরেজের দলও মন্‌টেগু সাহেবকে বেশ ভাল করে' গান শোনাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তাঁরা Bray-Chorus নামক একটি বিলাতি যাত্রার দল এক রাতে গড়ে' তুলেছেন। এঁদের পালার নাম

স্বরাজ-দমন এবং তার ধুয়ো হচ্ছে—"হয় এ দেশ থেকে সরব, নয় এ দেশকে সারব"। এতে আমাদের দু'দলই ভয় খেয়ে গেছেন। চীৎকার এঁদের সুরু হ'লে যে আমাদের সারা হয়, তার পরিচয় ত পূর্ব্বেও পেয়েছি। এর কারণও বেশ স্পষ্ট। কেননা, প্রথমত এঁরা গাইবেন বীররসের গান, আর আমরা করুণরসের; দ্বিতীয়ত এঁদের গলার জোর আমাদের চাইতে ঢের বেশি; তৃতীয়ত এঁরা সকলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে পারেন—যা আমরা মোটেই পারি নে। সুতরাং এ আশঙ্কা অসঙ্গত নয় যে, এঁদের বিরাট harmony-র ভিতর আমাদের স্বরাটের melody শোনাই যাবে না—বিশেষত যখন ইংরেজ-কাগজওয়ালাদের জর্ম্মাণ ফুফু্ব্যাণ্ড গাল ফুলিয়ে দিন নেই রাত নেই এঁদের সঙ্গত করুবে।

মনু বলেছেন, ভারতবর্ষে চারিটিমাত্র বর্ণ আছে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; কিন্তু নাস্তি পঞ্চমঃ। এ ত সেকালের কথা। একালে ভারতবর্ষে, চন্দ্রের দুই পক্ষের মত সবে দুটিমাত্র বর্ণ আছে,—কালো আর শাদা; এ সত্যটা আমরা ভুলে যাচ্ছিলুম বলে' এই বে-সরকারী ইংরেজের দল সেটি আবার আমাদের কান ধরে' মনে করিয়ে দিয়েছেন। এর পর কালোর ভিতর দু'টি পক্ষের সৃষ্টি শুধু দৃষ্টির অভাব থেকেই সম্ভব হয়।

এ অবস্থায় আশা করা যায় যে, কংগ্রেসের দুটি ভাঙ্গাদল আবার জোড়া লাগবে। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, কেমন করে'?—আমি বলি, তোমরা যা করে' ভেঙ্গেছিলে, আবার তাই করে' জোড় লাগাও, অর্থাৎ—না ভেবেচিন্তে। বিচ্ছেদ ঘটেছিল রাগের মাথায়—মিলন ঘটুক অনুরাগের ক্রোড়ে। অনুরাগ যে স্বভাবতই রাগের অনুসরণ করে, তার পরিচয় ত তার উপসর্গেই পাওয়া যায়।

"খণ্ডিতার" পুনর্মিলন ঘটাতে হ'লে অবশ্য কিঞ্চিৎ সাধ্যসাধনার আবশ্যক। এ সাধাসাধি একটু বেশি করেই করুতে হবে, কেননা, যাদের বাইরে মান নেই, তাদের যে ঘরে অভিমান বেশি, এ সত্য ত জগদ্বিখ্যাত; আর তা ছাড়া এ কার্য্য নবীনদের পক্ষে করাই সঙ্গত, কেননা, অতীতের প্রতি ভক্তি ত আমাদের সহজ ধর্ম্ম। তবে প্রবীণদের প্রতি আমার সানুনয় অনুরোধ এই যে, মানভঞ্জনের পালাটা যেন বেশি লম্বা না করেন। নইলে আমাদের রাজনীতির মিলনান্ত নাটক চাই কি বিয়োগান্ত প্রহসন হয়ে উঠতে পারে।

বাজারে গুজব যে, প্রবীণদল যেমন অভ্যর্থনা সমিতি হ'তে পালিয়ে এ যাত্রা নবীন দলের হাত থেকে বেঁচেছেন, তেমনি তাঁরা চেষ্টায় আছেন যে, বাঙলা থেকে পালিয়ে এ যাত্রা কংগ্রেসকে বাঁচাবেন। কংগ্রেস ঠাঁই-নাড়া হলেই যে তাজা হয়ে উঠবে, তার কোনই সম্ভাবনা নেই। স্বরাটের নাম শুনলেই আমার সুরাটের কথা মনে পড়ে। "দেশ" যে একটু বেসামাল হলেই "সুরট" হয়ে ওঠে—যাঁর কিছুমাত্র রাগের জ্ঞান আছে, তিনিই তা জানেন। এ বিষয়ে আর বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আক্কেলে ইসারা বাস্।

এই গৃহবিবাদের মূলে একটা ভুল ধারণা আছে। দু'পক্ষই মনে করছেন যে, তাঁরা কে কি বলেন, তার উপরই ভারতবর্ষের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড ভ্রান্তি! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের স্থান যে কোথায়, সে সমস্যা আজ শুধু ঘরের সমস্যা নয়—বাইরেরও সমস্যা এবং এ সমস্যার মীমাংসায় ঘরের চাইতে বাইরের হাত বেশি থাকবে। কেননা, যে-সকল পলিটিক্যাল-কূপ-মণ্ডুকদের দৃষ্টি ঘরের দেওয়ালেই আবদ্ধ, তাঁদের কাকলীও ঘরের বাইরে যায় না। ভারতবর্ষের ভাগ্য যে প্রসন্ন হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু তার ভিতর বিধাতার হাত আছে। ধর্ম্মের ঢাক আকাশে বাজে, কিন্তু সংসারের হট্টগোলে তার আওয়াজ আমরা বারোমাস শুনতে পাই নে। আজকের দিনে আকাশজুড়ে ধর্ম্মের জয়ঢাক বেজে উঠেছে এবং তার ধ্বনি বিশ্বমানবের কানে এসে পৌঁচেছে—এমন কি, কোটি কোটি ভারতবাসীরাও তা শুনতে পেয়েছে, কেননা, তারা মূক হ'লেও বধির নয়। এই হচ্ছে একমাত্র আশার কথা। জাতীয় জীবনের একটি বিরাট পর্ব্ব তখনই রচিত হয়, যখন জাতির মনে একটি নূতন সত্যের আবির্ভাব হয়। এ ক্ষেত্রে বিশ্বমানব যে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেছে, সে হচ্ছে এই যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের আসল সম্পর্কটা হচ্ছে ভাই-ভাইয়ের সম্পর্ক, দাস ও প্রভুর নয়। এই সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে নবযুগের ধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্মের সাধনায় সকলকেই চাই, অথচ কাউকেও চাই নে;—অতএব সকলে এক হও, একলা সকল হ'তে চেষ্টা করো না।

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭

"এত্তো বড়" কিম্বা "কিছু নয়"

আমার একটি আড়াই বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র আছেন, যাঁর নাম, "ছোটকালী বাবু।" তিনি যে লোককে চেনেন না, তাকে বলেন—"কেউ নয়," আর যে জিনিস জানেন না, তাকে বলেন—"কিছু নয়।" যখন শুনি, আমাদের পলিটিক্সের একদল বলেছেন, Reform-scheme "কিছু নয়," তখন আমার ছোটকালী বাবুর কথা মনে পড়ে' যায়।

আমার ভ্রাতুষ্পুত্রটির আর একটি গুণ আছে। কোন জিনিস তাঁর হাতে এলে, তিনি বুক ফুলিয়ে এবং গলা মোটা করে' বলেন, "এত্তো বড়"—তা সে বস্তু যতই ছোট হোক। যখন শুনি, আমাদের পলিটিক্সের আর এক দল বলছেন, Reform scheme, "এত্তো বড়," তখনও আমার ছোটকালী বাবুর কথা মনে পড়ে।

পলিটিক্সের জগতে, আমরা আজও সাবালক হই নি, কিন্তু তাই বলে' আমাদের পলিটিক্সের বড়-বাবুরা যে সব ছোটকালী বাবু, এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। সুতরাং এঁদের এই সব মৎফরাক্কা মত প্রকাশের নিশ্চয়ই অপর কারণ আছে।

সে কারণ হচ্ছে "যুদ্ধজ্বর।" Reform schemeও বার হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশে যুদ্ধজ্বরও এসে পড়ল। এ জ্বরে ধরলে মানুষে বেহোঁস হয়। সুতরাং এই জ্বরের প্রকোপে উক্ত Scheme সম্বন্ধে যা বলা-কওয়া হয়েছে, তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। কেননা, সে সময়ে বক্তাদের কারোও মাথার ঠিক ছিল না।

এ জ্বর যে আমাদের পলিটিসিয়ানদের গায়েই বেশি করে' ফুটে উঠেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে,—Bengal Provincial Conference-এর সেদিনকার অধিবেশনে। সে সভার temperature সেদিন দেখতে দেখতে ১০৫ ডিগ্রীর উপরে উঠে গিয়েছিল। শুধু তাই নয়, সে ক্ষেত্রে কারো কারো জ্বর যে বিকারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া গেছে তাঁদের বক্তৃতায়। শুনতে পাই, এ দেশের জনৈক অতিবক্তা নাকি বলেছিলেন যে, "স্বরাজ" তিনি প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্-এর কাছে চেয়ে নেবেন। এ রকম প্রলাপ অবশ্য বাঙলা দেশে কেউ সজ্ঞানে বকতে পারে না, কেননা, বাঙালীতে ও কাঙালীতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে।

এই যুদ্ধজ্বরের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পাচ্ছি, দু'দলেরই মাথা অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। যাঁরা আগে বলেছিলেন 'কিছু নয়', তাঁরা এখন বলছেন 'না, কিছু বটে'; আর যাঁরা আগে বলেছিলেন 'এত্তো বড়,' তাঁরা এখন বলছেন—'না ত্যাত্তো বড় নয়'। এখন যদি উভয় পক্ষে একত্র হয়ে এ বিষয়ে হিসাব মোকাবিলা করেন, ত আমার বিশ্বাস, উভয় পক্ষই দেখতে পাবেন যে, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ কোনও গরমিল নেই। সুতরাং বামমার্গ এবং দক্ষিণমার্গের পলিটিসিয়ানদের নিকট আমাদের সানুনয় অনুরোধ এই যে, তাঁরা এই ফাঁকে তাঁদের আড়াআড়ির তাড়াতাড়ি একটা আপোষ-মীমাংসা করে' নিন। এ সুযোগ কোনো পক্ষেরই হারানো উচিত নয়, কেননা, যুদ্ধজ্বরের আবার relapse হয় এবং তা হ'লে ব্যাপার হয়ে ওঠে একেবারে মারাত্মক।

কিন্তু আমাদের এ প্রার্থনায় কোন পক্ষ যে কর্ণপাত করবেন, সে বিষয়ে বড় একটা ভরসা নেই। এঁরা বলবেন, পলিটিক্স শুধু হিসেব-নিকেশের কথা নয়, ও হচ্ছে আসলে হৃদয়ের কথা। যাদের মধ্যে বুকের মিল নেই, তাদের মধ্যে মুখের মিল ক'দিন থাকবে?

হৃদয়ের দোহাই দিলে এ দেশে নির্ব্বুদ্ধিতার সাতখুন মাপ। হৃদয়টা আমাদের দেশে "এত্তো বড়" জিনিস। যার মাথা নেই, তার মাথাব্যথার কথা শুনলে আমরা অবশ্য হাসি, কিন্তু যার বুক নেই, তার বুকের ব্যথার কথা শুনলে আমরা কাঁদি। এই আমাদের স্বভাব, আর এই জন্যেই ত এ দেশে কোনও কাজের কথা বলা এত কঠিন। হৃদয় পদার্থটা অবশ্য খুব ভাল জিনিস; এবং উদরের চাইতে ঢের উঁচুদরের জিনিস এবং উদর যে অনেক ক্ষেত্রে নিজেকে মস্তক বলে' পরিচয় দিতে চায়, তাও অস্বীকার করবার যো নেই। কিন্তু মস্তকের সঙ্গে হৃদয়ের একটা মস্ত প্রভেদ আছে। মানুষের মাথায় দুটো চোখ আছে, বুকে একটাও নেই। হৃদয় অন্ধ, অতএব যে যত অন্ধ, সে যে তত হৃদয়বান্, এই হচ্ছে লোকমত। এ মতের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কেননা, সে তর্ক লোকে কানে তুলবে না। এ কথা কে না জানে যে, "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।"

তবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি ও স্বরাজ-প্রাপ্তির উপায় এক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবসর আছে। তার পর পলিটিক্সে আমরা যাকে হৃদয়াবেগ বলি, সে চাঞ্চল্যের মূল হৃদয়ে কি মস্তকে, তাও ঠিক

জানা নেই। আমরা যে আজ তিনপুরুষ ধরে' পলিটিক্সের বিলিতি মদ্য পান করে' আসছি, সে কথা ত আর অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং আমাদের এই পলিটিক্যাল ছট্‌ফটানির মূলে হৃদয়ের লালরক্তই বা কতখানি আছে আর বিলাতের লাল-পানীই বা কতখানি আছে, অর্থাৎ—বুকের ব্যথাই বা কতখানি আছে, আর বইয়ের কথাই বা কতখানি আছে, তা কে জোর করে' বলতে পারে?

তন্ত্রশাস্ত্রে বলে,—"নাভিষেকাৎ বিনা কৌলঃ কেবলং মদ্যসেবনাৎ," এ কথা যে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সত্য, সে বিষয়ে অবশ্য কোনই সন্দেহ নেই। এতকাল আমরা বিলিতি পলিটিক্সের শুধু মদ্যপান করে' এসেছি, এইবার Reform-scheme-এর প্রসাদে সে পলিটিক্সে আমরা অভিষিক্ত হব। এ শুধু যথালাভ নয়—মহালাভ। এর কারণ, এ তন্ত্রে অভিষেকের আমাদের পক্ষে প্রয়োজন আছে। পেট্রিয়টিজম্ ধর্ম্ম হ'তে পারে, কিন্তু পলিটিক্স হচ্ছে কর্ম্ম এবং অপরাপর কর্ম্মের ন্যায় এ কর্ম্মেও কৃতিত্ব লাভ করবার জন্য কিঞ্চিৎ শিক্ষা-দীক্ষার দরকার। তা ছাড়া ডিমোক্রাসি স্বদেশী মাল নয়—আহেল বিলিতি জিনিস এবং এ বস্তুর এতদিন আমরা শুধু কাগজে-কলমে চর্চ্চা করে' এসেছি, এখন হাতে-কলমে চর্চ্চা করবার দিন এসেছে।

এই অভিষেক কথাটাই ত যত গোল বাধিয়েছে। বামাচারী ও দক্ষিণাচারীদের যত মারামারি, সে সবই ত Scheme-এ ঐ বস্তুর অস্তি-নাস্তি নিয়ে। কিন্তু এ নিয়ে অতি-তুষ্ট কিম্বা অতি-রুষ্ট হবার কোনও কারণ ত আমি দেখতে পাই নে। অতি-তুষ্ট দলকে জিজ্ঞাসা করি, "তাঁরা কি মনে ভাবছেন যে, এই Scheme-এর প্রসাদে তাঁরা অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজ-কন্যা লাভ করেছেন"? আর অতি-রুষ্ট দলকে জিজ্ঞাসা করি, "তাঁরা কি মনে ভেবেছিলেন যে, ইংরাজরাজ এই সুযোগে ভারতবাসীকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করে' একছুটে "রণপ্রস্থ" অবলম্বন করবেন?

যারা রূপকথার রাজ্যে কিম্বা পৌরাণিক যুগে বাস করে না, তাদের বক্তব্য এই যে, Reform scheme, আকাশের চাঁদও নয় দিল্লীর লাড্ডুও নয়, কিন্তু এমন জিনিস, যার সাহায্যে আমরা আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে' তোলবার সুযোগ পাব! ভুলে গেলে চলবে না যে, স্বরাজ যখন আমরা উত্তরাধি-কারিস্বত্বে লাভ করি নি, তখন তা আমাদের অর্জ্জন করতে হবে এবং এ অর্জ্জন সাধনা; অতএব সময়-সাপেক্ষ।

সে যাই হোক, এই Reform scheme-এর দৌলতে আর কিছু না হোক, আমরা অন্ততঃ একটা বিদ্যে শিখ্‌ব। এই যুদ্ধের কৃপায় আমরা যেমন জিওগ্রাফি শিখেছি, এই Reform-এর কৃপায় আমরা তেমনি Constitutional Law শিখ্‌ব। তার পর যুদ্ধের ফলে আমাদের ঘরে ঘরে যেমন সব বড় বড় general তৈরি হয়ে উঠেছে, এই Reform-এর ফলে ঘরে ঘরে সব বড় বড় constitution builders তৈরি হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই উকীলের আফিসে ও Bar Library-তে দু'চার জন "এত্তো বড়" constitution builder দেখা দিয়েছেন। জাতির পক্ষে এটা কি একটা কম লাভ! অতএব "এত্তো বড়" কথাটা কিছুতেই বলা যায় না যে, Reform-scheme—"কিছু নয়"।

শ্রাবণ, ১৩২৫

গুলীখোরের আবেদন-পত্র

শ্রীল শ্রীযুক্ত লর্ড কর্জ্জন, বড়লাট মহোদয়
প্রবলপ্রতাপেষু—

দিল্লীতে অপূর্ব্ব রাজ-দরবার অনুষ্ঠানের আয়োজন হইতেছে, এই সংবাদে আপনার যাবতীয় প্রজাবর্গের মধ্যে এ অধীনরা যতদূর আনন্দ অনুভব করিয়াছে, সেরূপ আনন্দ অনুভব করা এই বিশাল ভারত-সাম্রা-জ্যের ত্রিশ কোটি অধিবাসীদিগের মধ্যে অপর কোন শ্রেণীর লোকের পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ, ভারতবাসী-মাত্রেই স্বভাবতঃ কুণো, ঘরাও,—কেবলমাত্র আমরা দরবারী। আমাদের জীবন এক কথায় Club life. মদ্যপান একা ঘরে বসিয়া করা যায়, কাঁচা আফিংও একা চলে, কিন্তু সহপায়ী ব্যতীত গুলী খাওয়া চলে না। কাজেই মহামান্য গুলীখোর-সম্প্রদায়ের মেম্বর আমরা সকলেই মিশুক লোক; এবং আনন্দ অনুভব করা সম্বন্ধেও আমাদের সমকক্ষ আর কেহই নাই, কারণ, উহাই আমাদের জীবনের একমাত্র কার্য্য। ত্বরিতানন্দের ভক্তেরা যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহা আশু ও তীব্র হইলেও ক্ষণস্থায়ী; অপরপক্ষে আমাদের আনন্দ মৃদু হইলেও চিরস্থায়ী। আমাদের চিদাকাশে বাঁধা রোশ্‌নাই। আমরাই শুধু মশ্‌গুল হইতে জানি।

কিন্তু এই মহা আনন্দের মধ্যে আমাদের একটি আক্ষেপের কারণ ঘটিয়াছে। আপনি এই দরবারে

রাজা, মহারাজা, জমিদার, দোকানদার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, উকীল, ডাক্তার, এমন কি, সংবাদপত্রের সম্পাদককে পর্য্যন্ত সবান্ধবে উপস্থিত থাকিয়া উক্ত শুভকার্য্যে যোগদান করিবার জন্য সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, যদিও ইঁহারা কেহই সমজদার নহেন। কেবলমাত্র এই হতভাগ্যেরা ফাঁকে পড়িয়াছে। ইহাই আমাদের হরিষে-বিষাদের কারণ। আমাদের আপাততঃ এই বিনীত প্রার্থনা যে, আমরাও উক্ত দরবারে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা যেন পাই। তাহাতে আমাদেরও মনের দুঃখ দূর হইবে, দরবারও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনা যে নিতান্ত অযথা ও অসঙ্গত নহে, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য আমাদের পরিচয় দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায় এই আবেদন-পত্র হুজুরের হস্তে অর্পণ করিতে আমরা সাহসী হইতেছি।

আমরা অহিফেনসেবী, শুদ্ধ সেবনের প্রকারভেদের দরুণ ভাষায় আমাদিগকে গুলীখোর বলে। অহিফেন সেবন এ দেশের একটি সনাতন প্রথা। উক্ত প্রথা অতি প্রাচীন কালেও যে প্রচলিত ছিল, হিন্দু-দর্শনই তাহার প্রধান প্রমাণ। এই অহিফেনের গুণেই পৃথিবীর সম্মুখে হিন্দু জাতির মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। এই অহিফেনের প্রসাদেই চীনজাতি আমাদের কাছে চিরঋণী। ভারতবর্ষ পুরাকালে বৌদ্ধ-দর্শন নামক মানসিক অহিফেন দান করিয়া চীন দেশকে সভ্য করিতে আরম্ভ করে, তাহা সত্ত্বেও পূর্ণ সভ্যতার পক্ষে তাহাদের যেটুকু বাকী ছিল, একালে আসল অহিফেন দিয়া তাহা পূর্ণ করিতেছে। আমাদের আসল বক্তব্য এই যে, জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিচারে হিন্দু-মুসলমান সকলেই বহুকাল হইতে অহিফেন সেবন করিয়া আসিতেছে। গুলীর আড্ডায় বর্ণভেদ নাই, ধর্ম্মভেদ নাই—সেখানে আমরা অহিফেনের যোগসূত্রে সকলে সমান আবদ্ধ। সে বন্ধন ছিন্ন করে। এমন সাঁমর্থ্য কাহারও নাই, ভারতবাসীদের একতার কেন্দ্রস্থল গুলীর আড্ডা এবং কালে গুলীর প্রচার যত বৃদ্ধিলাভ করিবে, আমাদের জাতীয় একতাও ততই ঘনীভূত হইয়া আসিবে। আমাদের দ্বারা এই যে মহৎ কার্য্যের সাহায্য হইতেছে, সেইজন্য আমরা হিন্দুস্থানবাসীমাত্রেরই—বিশেষত ভারত-গভর্ণমেন্টের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। শুনিতে পাই যে, এই দরবারের অন্যতম উদ্দেশ্য ভারতবর্ষে একতা স্থাপন করা। যেহেতু, আমরা উক্ত একতা-সাধন-ব্রতে চিরদিন ব্রতী আছি—সেইজন্য এই অনুষ্ঠানে বিশেষরূপ যোগ দিবার সম্পূর্ণ অধিকার আমাদেরই আছে।

দ্বিতীয়ত—আপনার সকল প্রজার ভিতর আমরা সর্ব্বাপেক্ষা রাজভক্ত। সর্ব্বসাধারণের ভিতর যেরূপ ও যে পরিমাণ রাজভক্তি বিদ্যমান, তাহা ত আমাদের আছেই, উপরন্তু ভারতগভর্ণমেন্টের নিকট আমরা বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ, কারণ, যাহা আমাদের প্রাণের অপেক্ষা প্রিয় ও মূল্যবান্, অর্থাৎ—অহিফেন, তাহা আমরা উক্ত গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহে লাভ করিয়া থাকি। আমাদের উপকারার্থে সরকার বাহাদুর অহিফেনের চাষ করেন এবং যাহাতে আমরা খাঁটি মাল পাই, সেইজন্য কত কষ্ট স্বীকার করিয়া রাজকর্ম্মচারীদিগের দ্বারা অহিফেন প্রস্তুত করাইয়া, উক্ত রাজকর্ম্মচারীদিগের উপরেই তাহার প্রচলনের ভার অর্পণ করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, যখন Sir Joseph Pease-প্রমুখ ইংলণ্ডের জনকতক অরসিক ব্যক্তি আমাদিগকে অহিফেন হইতে বঞ্চিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখন সরকার বাহাদুর "কমিশন" (আহা, ইচ্ছা করে, কমিশনের বালাই নিয়ে মরি!) বাহির করিয়া সেই আসন্ন ঘোর বিপদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন। সুতরাং এ দীনেরা যে কি কঠিন কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছে, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই। যাঁহার ছিল—De Quincy,—তিনি বহুদিন হইল অহিফেনলীলা সংবরণ করিয়াছেন।

তৃতীয়ত—আপনার প্রজাদিগের মধ্যে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা সুশীল ও সচ্চরিত্র। অহিফেনের প্রসাদে আমরা একরূপ জীবন্মুক্ত। শরীরের ভাগ এতই কম যে, দূর হইতে আমাদিগকে লোকের ছায়া বলিয়া ভ্রম হয়। তাহার উপর আমরা এতদূর মৃদুস্বভাব যে, ঘোড়া দেখিলে একশত হাত দূরে থাকি, হাতী দেখিলে হাজার হাত এবং মাতাল দেখিলে ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিই। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও মানসিক ভীরুতা এই দুইয়ের সংমিশ্রণেই আমাদিগকে এত সুশীল ও নিরীহ করিয়াছে। খুন, জখম, দাঙ্গা, হাঙ্গামা প্রভৃতি কোনরূপ দুঃসাহসের কার্য্যের ভিতর আমরা থাকি না। সুতরাং আমাদের নিকট হইতে সমাজের কিংবা শাসনকর্ত্তাদের কোনও বিপদের আশঙ্কা নাই। সেই কারণে, সমাজ আমাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারে, কিন্তু ভয় করে না। সুতরাং গভর্ণমেন্টের প্রিয়পাত্র হইবার আমরা সম্পূর্ণ দাবী রাখি।

চতুর্থত—আমাদের নিমন্ত্রণ করিবার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত কারণগুলিও আপনার মতে যদি যথেষ্ট না

হয়, তাহা হইলে নিম্নকথিত কারণকে আপনি উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আপনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, দিল্লীর দরবারে সকল ভারতবাসী একত্র হইয়া পরস্পরের সহিত idea-র বিনিময় করিবে। ইহাই যদি দরবারের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে বাদ দিয়া দরবার ঠিক Hamlet-কে বাদ দিয়া "Hamlet"-এর অভিনয়ের মত। কারণ, ইহা জগদ্বিখ্যাত যে, ভারতবর্ষের যত original idea, সবগুলির আড্‌ডাতে জন্মলাভ করে। আমাদের wit এবং wisdom হিন্দুস্থানের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সুপরিচিত, তাহা ভারতের চির-আনন্দের সামগ্রী। আমাদের আড্ডা idea-র রাজ্য, আমাদের মন খেচর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোন লুক্কায়িত স্থান নাই—যেখানে সে মনের গতিবিধি নাই। এ বিশ্বের ধূম্রে উৎপত্তি ও ধূম্রে বিলয়। তাই আমরা ধূম্রসেবী বলিয়া বিশ্বের সকল তত্ত্ব অবগত আছি। উক্ত কারণে এই দিল্লীর দরবারে, এই idea-র বাজারে, আমাদেরই সর্ব্বপ্রধান স্থান লাভ করা উচিত।

পূর্ব্বে দরবারে যোগদান করিবার পক্ষে কি কি উপযোগিতা আছে, তাহাই প্রকাশ করিয়াছি। পরে, আমাদের কোনরূপে যে অনুপযোগিতা নাই, তাহাই জ্ঞাপন করিতে ইচ্ছা করি।

প্রথমত আমরা অসন্তুষ্ট নহি। কারণ, শিক্ষার ধার আমরা ধারি না। বিশ্ব লইয়া যাহাদের কারবার, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ পদার্থ। সরকারের চাকরীরও আমরা প্রত্যাশা রাখি না। ছিচ্‌কে চুরিতেই আমাদের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয়।

দ্বিতীয়ত, আমরা Congress-ওয়ালা নহি; কারণ, গুলীর আড্‌ডায় আমরা পৃথিবীর যত "রাজা রুজীর" মারি। বাহিরের রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি না। আমরা বক্তা নই; আমরা শুধু সার কথা বলি, সুতরাং স্বল্পভাষী। সংবাদপত্রের সহিতও আমাদের কোন সংস্রব নাই; কারণ, গুলীর আড্‌ডাই সকল সংবাদের জন্মভূমি; আমরা প্রতিজনে একাধারে Reuter এবং Times.

জনরব যে, দরবার Economic lines-এ চালানো হইবে। সে হিসাবেও আমাদের কোন অনুপযোগিতা নাই। পূর্ব্বে আমাদের স্বভাবের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহা হইতেই অনুমান করিতে পারিবেন যে, হাতীঘোড়ায় আমাদের দরকার নাই। আমরা সকলেই মিতাহারী—আমাদের ঝোঁক শুদ্ধ দুধের দিকে। যখন এই দরবারে এত গরুর যোগাড় করা হইয়াছে, তখন আমাদের খোরাকের জন্য কোন ভাবনা নাই। দিল্লীতে শুনিতে পাই জলকষ্ট হইয়াছে। আমরা যেহেতু জল দেখিলে ডরাই, সেইজন্য জলের অনাটন আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার পক্ষে বাধা হইতে পারে না। মেরু-বায়ু আমরা নিজে যোগাড় করিয়া লইব। আর ছিটে, সে ত সরকার বাহাদুরের নিজ গুদাম হইতেই সরবরাহ হইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, অন্তত আপনার অনুষ্ঠিত Art Exhibition-এর জন্যও আমাদিগকে সংগ্রহ করিয়া দিল্লীতে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য। কেননা, আমরা হিন্দুস্থানের একটা বিশিষ্ট দ্রষ্টব্য পদার্থ। শেষ কথা এই যে, আমাদিগকে নিমন্ত্রণ না করিলেও আমরা দরবারে উপস্থিত থাকিব, কারণ, আমরা রবাহুতের দল। তবে বিনা নিমন্ত্রণে আমরা প্রকাশ্যভাবে যাইতে পারি না, ভদ্রলোকের বেশধারণ করিয়া যাইব—এই যা তফাৎ। ইতি—

সাং বাগবাজার }
কলিকাতা। }
কার্ত্তিক, ১৩০৯

সেবক
শ্রীমহামান্য গুলীখোর সম্প্রদায়
The Honourable Society
of Opium Smokers.

গর্জ্জন-সরস্বতী-সংবাদ

গর্জ্জন। হ্যা দেখ ভারতী, তোমাকে ভারতবর্ষ ছাড়তে হবে। ওঠ, আমার সঙ্গে চল।

সরস্বতী। বৎস, তুমি কে?

গর্জ্জন। আমি ভারতবর্ষের রাজা,—অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি। ও একই কথা। আমি নামে প্রতিনিধি, কাজে রাজা; আর যিনি নামে রাজা, তিনি কাজে—থাক্, সে ঢের কথা, বল্‌তে গেলে দিন ফুরিয়ে যায়। Constitutional monarchy ও benevolent despositism-এর যে কি প্রভেদ,—অর্থাৎ আমাদের রাজ্যতন্ত্র যে কি জিনিস, তা বুঝতে হ'লে অনেক ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও খৃষ্টধর্ম্ম জানা চাই। চিরজীবন ঐ নিয়ে যে না পড়ে' আছে, সে তার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে না। এক কথায়, অমনটি আর হয় না।

সর। ভারি আশ্চর্য্য ত! শুধু দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম নিয়ে রাজনীতি?

গর্জ্জন। আমাদের জাতকে অত বোকা ঠাউরো

না। তুমি যা ভেবেছ, ঠিক তার উল্টো। আমাদের রাজনীতি কেন, সকল নীতির মূলই হচ্ছে অর্থনীতি, তবে দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের নামে সব চলে।

সর। অর্থাৎ—তোমরা আসলে বেণে, ব্রাহ্মণ বলে' শুধু নিজেদের পরিচয় দাও। তোমাদের দেখছি সবই বেনামী চলে। তা ভাল, আমি তর্কের খাতিরে মেনে নিচ্ছি, তুমি এদেশের রাজা; কিন্তু তাই বলে' যে তোমার হুকুমে আমাকে দেশ ছাড়তে হবে, এ কোন্ কথা?—সরস্বতী ত রাজার অধীন নয়।

গর্জ্জন। তোমার দেখছি আজও সেকেলে সব ভুল ভাঙ্গে নি। চোখে না দেখলে, হাতে হাতে প্রমাণ না পেলে, তোমরা দেখছি কোন কথা মেনে নিতে পার না। দু'দিন পরে, যদি বেঁচে থাক ত দেখতে পাবে, আমার ইচ্ছার ইন্দ্রজালে ইন্দ্রপ্রস্থ আবার কবর থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। সেখানে অপূর্ব্ব বিরাট রাজসূয়-যজ্ঞের অভিনয় হচ্ছে, রাজা-মহারাজাদের সব পুতুলনাচ হচ্ছে। সে যে কি ব্যাপার হবে, বর্ণনা করলে প্রত্যয় করবে না; তোমাদের কাছে স্বপ্ন বলে' মনে হবে। অধিক কি, আমার কাছেই দিল্লীর অভিষেক একটা স্বপ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি ও-বিষয়ে রাত্তিরে স্বপ্ন দেখি, দিনে স্বপ্ন দেখি। রাজত্ব করা কাকে বলে, ভারতবাসী এবার তা জানতে পাবে। তোমার বিশ্বাস, তুমি রাজার অধীন নও। তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে একবার গেলে তোমার মুখ দিয়ে ও কথা আর বের হবে না।

সর। কেন, কোথায়?

গর্জ্জন। সিমলেয়।

সর। সিমলে কোথায়?

গর্জ্জন। হিমালয়ে।

সর। অলকার কাছাকাছি?—সে ত কুবেরের রাজ্য, সেখানকার লোক ত আমার ধার ধারে না। আমাকে সেখানে নিয়ে গিয়ে কার কি লাভ? এ যে অতি অদ্ভুত খেয়াল! আমার সঙ্গে রসিকতা করছ বুঝি?

গর্জ্জন। রসিকতা আমার ধাতে নেই। কেউ বলতে পারবে না যে, আজ পর্য্যন্ত কেউ আমার মুখে একটা সরস বাক্য শুনেছে। আমি কাজের লোক, আমি বর্ত্তমান কর্ম্মযোগ মূর্ত্তিমান্। আমি সব নূতন করব। কিছু যদি মাথা থেকে বার করতে না পারি, তা হ'লে যা পুরানো আছে, তাই উল্টে দেব। আমার মস্তিষ্কে খেয়াল নেই। আছে শুধু প্রতিভা।

সর। পুরাতন উল্টে দেওয়াই যদি তোমার নূতনত্ব হয়, তা হ'লে যা অতি পুরাতন, তাই আবার ফিরে আনবে।

গর্জ্জন। তা' হ'তে পারে। কিন্তু আমি স্থির করেছি, যা আছে, তা' রাখ্‌ব না। যা আছে, তাই যদি থাকে, তা হ'লে আর হ'ল কি? তা হ'লে আমি রইলুম কোথায়? আমি করব বদল, তাতে কি হবে, সে পরের ভাবনা, সে অপরের ভাবনা। আমি আমার জনকতক অধীন ও অনুগত লোককে, সরস্বতীকে নিয়ে কি করা যায়, তাই স্থির করবার ভার দিয়েছিলুম। তারা পরামর্শ দিয়েছে তোমাকে সিমলেয় কয়েদে রাখ্‌তে হবে।

সর। আমার অপরাধ?

গর্জ্জন। তুমি একেবারে অধঃপাতে যাচ্ছিলে। তোমাকে নিয়ে সকলে একটি বারোয়ারি ব্যাপার করে' তুলেছে, তোমার মন্দির দ্বিতীয় শ্রীক্ষেত্র হয়ে উঠেছে, ছত্রিশ জাতের জন্য তার অবারিত দ্বার। তোমাকে অতি উচ্চ, অতি পবিত্র স্থানে নিয়ে যাচ্ছি।

সর। তোমরা আবার জাতিভেদ মান না কি?

গর্জ্জন। তোমাদের ভাবে নয়। আমরা শুধু দুই জাত জানি, শুধু দুই জাত মানি,—ধনী আর নির্ধনী। আমাদের জাতিভেদের গোড়ায় হিসেব আছে, তোমাদেরই নেই। তোমার দুয়ারে এত দরিদ্র এসে ভিড় করেছে যে, সে উৎপাত আর সহ্য হয় না।

সর। এত লোক আমার মন্দিরে কেন ছুটে আসছে, সেটা কি একবার ভেবে দেখেছ?

গর্জ্জন। অত ভাববার দরকার নেই, অতি সোজা কথা। হতভাগারা তোমাকে অন্নপূর্ণা বলে' ভুল করে বলে।

সর। আহা, বেচারাদের পেটে ক্ষিধে ও পিঠে অপমানের বোঝা। 'ধনং দেহি মানং দেহি' বলেই যদি তারা আমার পুজো করতে আসে, তাতে তাদের প্রতি মায়া হওয়া উচিত, রাগ করা উচিত নয়।

গর্জ্জন। রাগ হবে না? যে উদ্দেশ্যেই আসুক, তোমার সঙ্গে অল্প পরিচয় হলেই তারা আর কপালে বিশ্বাস করে না, নিজের দুরবস্থার জন্যে আমাদের দোষ দিতে সুরু করে। সুতরাং তোমার মন্দিরে আর গরীব ঢুকতে দেওয়া নয়।

সর। আমি ত জানতুম, আমার রাজ্যে দারিদ্র্য পাপ বলে' গণ্য নয়। বরং লক্ষ্মীর বরপুত্রেরাই আমার ছায়া মাড়ান না।

গর্জ্জন। তাই কি? হাতে হাতে তোমার ভুল দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি লক্ষ্মীর বরপুত্র। কিন্তু তুমি আমাদের দেশের সরস্বতীকে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পাবে, তাঁর সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ।

সর। তুমি তাঁরও বরপুত্র না কি?

গর্জ্জন। না; তিনি আমার সেবাদাসী।

সর। বাছা, বাক্ তোমার রসনায় অধিষ্ঠাত্রী হয়েছেন, অস্বীকার করবার জো নেই, তবে তিনি দেবী কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। নিজের কথা ছেড়ে দিয়ে এখন বল দেখি, সিমলেই কি আমার ব্যবস্থা হ'ল?

গর্জ্জন। আমার কথা ছেড়ে দেবে কি? এখন থেকে আমাকে বাদ দিয়ে তোমার আর অস্তিত্ব থাকবে না, সিমলেতে Prospect Hill-এর উপর তোমার জন্য ছোট একটি মন্দির করে' দেব, আমি হব তার প্রধান পাণ্ডা। তোমার পশ্চিমদিকে একটি ছোট দুয়ার থাকবে, মন্দিরে যিনি তোমার উদ্দেশে সিমলে পর্য্যন্ত উঠতে পারবেন, তিনি আমাদের অনুমতি নিয়ে তোমার দর্শন পেতে পারবেন। তাঁকে বেশ ভালরকম দর্শনী দিতে হবে। পূজা চলবে আমার মতে, আমার নিয়মে। যাত্রীদের দীক্ষা হবে আমার-কাছে, আমি তাদের কানে মন্ত্র দেব, তাই তাদের ইহজীবন জপতে হবে। শুধু রাজা হয়ে আমি আমার সব বিদ্যে দেখাতে পারিনে, আমি উপরন্ত গুরু হ'তে চাই। একাধারে আমাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় দেখাতে চাই।

সর। আর বৈশ্যটা বাদ যায় কেন?—ছাই ভুলে যাই, ও ত তোমাদের আসল জাত;—মন্দিরের পূজারী হবে কারা?

গর্জ্জন। বেশির ভাগ শাদা; দুচারটি কালো। এক কথায়, যারা উপযুক্ত, অর্থাৎ—আমাদের মনোমত।

সর। তবে দেখছি, মন্ত্র পড়া হবে শুধু ইংরেজিতে। সংস্কৃত আর কানে শুনতে পাব না?

গর্জ্জন। সংস্কৃত থাকবে বই কি। কিন্তু সেও থাকবে ইংরেজের মুখে।

সর। কেন?

গর্জ্জন। সংস্কৃতের মান আমি বাড়াতে চাই। সেইজন্য সংস্কৃত অধ্যাপকদের বেশি ধন দেওয়া চাই।

সর। সুতরাং অধ্যাপকও ইংরেজ হওয়া চাই?

গর্জ্জন। এদেশের লোকদের একটা রোগ আছে যে, আমাদের কোন কাজের ঠিক অর্থ না বুঝতে পারলেই, অমনি ধরে' নেয় যে, তার ভিতর একটা কু-মতলব আছে। এটা তারা ভুলে যায় যে, কাজের ফলাফল কি হচ্ছে বা হবে, তাই বিচার করবার অধিকার তাদের আছে,—কর্ত্তাদের মনোভাব কারও বিচারাধীন নয়। উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের তফাৎটা কি, তা তারা জানে না। উদ্দেশ্য মন্দ ও অভিপ্রায় ভাল, এ যে হ'তে পারে, এ তাদের ধারণার বহির্ভূত। আমাদের আইন না জানলে motive ও intention-এর প্রভেদ কেউ বুঝতে পারে না। আমাদের অভিপ্রায় নিয়ে টানাটানিতে তোমাদের কোন লাভ নেই। ঝড়ের সঙ্গে ঝগড়া করা ঝকমারি। আসল কথা, এবার নূতন ধরণে সংস্কৃত চর্চ্চা হবে। তাই সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপকদের, ইংরাজিতে যাকে বলে critical scholarship, তাই থাকা চাই। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে উচ্চতর সমালোচনার (higher criticism-এর) যোগ থাকা চাই।

সর। সে কি ব্যাপার?—শুনে যে ভয় হচ্ছে!

গর্জ্জন। কি করে' বেদ পুরাণ আগম নিগম সব অপ্রমাণ করতে হয়, সেই সব বিদ্যে থাকা চাই। এই নূতন অধ্যাপকরা প্রমাণ করবেন যে, হিন্দুর ধর্ম্ম ছেলেমী, হিন্দুর দর্শন পাগলামো, সংস্কৃত সাহিত্য গ্রীকের অনুকরণ, এ দেশের জ্যোতিষ-শাস্ত্র ও বৈদ্য-শাস্ত্র ইউরোপ হ'তে চুরি। তাঁরা আরও প্রমাণ করতে পারবেন যে, তোমরা যে সব শাস্ত্র অনাদি মনে কর, সে সব খ্রীষ্ট জন্মাবার পরে লেখা। এরকম পাণ্ডিত্য এ দেশে নেই বলে' আমাকে বাধ্য হয়ে বিলেত থেকে বিদ্বান্ আনতে হবে।

সর। বিলেতী পণ্ডিতেরা কি সংস্কৃত ভাষায় এতদূর সুপণ্ডিত?

গর্জ্জন। আমি ত ভাষার কথা বলি নি, আমি শাস্ত্রের কথা বলছি; critical scholarship-এর সঙ্গে ভাষা জানার সঙ্গে কি সম্বন্ধ? ইউরোপীয়েরা সংস্কৃত ভাষা ভাল বুঝতে পারেন না, কিন্তু শাস্ত্রের সমালোচনায় তাঁরা অদ্বিতীয়।

সর। ওঃ, বুঝেছি, তোমার দেশের পণ্ডিতেরা যে-বিষয় যত কম জানেন, সেই বিষয়ে তত ভাল সমালোচনা করেন। বাছা, তুমি কি কখন কোন বিষয়ে ভাল সমালোচনা করে' থাক?

গর্জ্জন। তুমি দেখছি সংবাদপত্র পড় না,—

নইলে এ প্রশ্ন করতে না। কোন্ বিষয়ে আমি ভাল সমালোচনা করি নি ও করি নে, এ কথা কেউ জিজ্ঞেস করলেও একটা বোঝা যায়।

সর। তবে যে বলছিলে, ও বুদ্ধি তোমাকে অন্য কে দিয়েছে ?

গর্জ্জন। হাঁ, অন্যে দিয়েছে বটে, কিন্তু সে চাঁদ যেমন আলো দেয়। সূর্য্যের আলো চাঁদের উপর পড়ে, সে আলো চাঁদ নিজের ভিতর টেনে নিতে পারে না, গাপ্ করে' ফেলতে পারে না, কাজেই ফিরিয়ে দেয়। অজ্ঞ লোকে মনে করে, আলো চাঁদেরই।

সর। তোমার এই মন্ত্রী ক'টি কে কে ?

গর্জ্জন। প্রথম Raw-law—

সর। তিনি কে ?

গর্জ্জন। তিনি একজন scientific lawyer.

সর। এ অদ্ভুত জীবটি কি ?

গর্জ্জন। অর্থাৎ— তিনি scientist-ও নন, lawyer-ও নন, সেই জন্য আমরা তাঁকে scientific lawyer বলে' থাকি।

সর। ব্যাপারখানা কি, তা স্পষ্ট হ'ল না। তা যাক্ গে, এদের ভিতর দেশী লোক কেউ ছিল ?

গর্জ্জন। ছিল বৈ কি ; একজন মুসলমান— মিলগ্রামী, একজন হিন্দু—লঘুদাস।

সর। ভাল, মুসলমানটি কি বল্লেন ?

গর্জ্জন। তিনি বল্লেন 'শোভানল্লা'।

সর। আর ব্রাহ্মণ-সন্তানটি ?

গর্জ্জন। যেমন বাঙালীর স্বভাব, বেসুরো ধরে' বসলেন।

সর। অর্থাৎ তোমাদের গলার সঙ্গে গলা মেলান নি ?

গর্জ্জন। হাঁ, তাই।

সর। যাই হোক, সেও অনেকটা সান্ত্বনা।

গর্জ্জন। তোমার কৌতূহল ত নিবৃত্ত হয়েছে, এখন ওঠ। বসে' বসে' ভাবছ কি ?

সর। আমি ভাবছি, এ দেশে আমার এত ভক্ত আছে, তারা কি আমাকে সিমলের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না ?

গর্জ্জন। তোমার ভক্তেরা যদি মানুষ হবে, তা হ'লে তোমার এত দুর্দ্দশা কেন ?—তারা ত দেখতে পাই, নিজেদের উন্নতির একমাত্র উপায় বার করেছে নাকে-কান্না। সব দেশেই স্ত্রীলোকের চোখের জলে শক্তি ও সৌন্দর্য্য দুই-ই আছে ; কিন্তু কোন দেশেই নাকের জল যে পুরুষের ভূষণ এবং অস্ত্র, তা ত জানতুম না।

সর। কিন্তু তারা মানুষ হ'তে চায় বলেই ত আমাকে চায়।

গর্জ্জন। শুধু চাইলেই যদি পাওয়া যেত, তা হ'লে আর ভাবনা থাকত না। ভারতবাসীদের "চাই চাই" একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। তাদের চাওয়া-চিন্তে বন্ধ করবার জন্যেই ত তোমাকে দেশছাড়া করা। কিন্তু চল, সিমলেতেও তোমার দেশের ভক্ত অনেক জুটিয়ে দেব।

সর। তারা কারা বল দেখি ?

গর্জ্জন। দেশের ধনী সন্তান।

সর। লম্বশাট-পটাবৃত মূর্খের দল ? হাতের গোড়ায় থাকতেই যারা আমার দিক্ দিয়ে ঘেঁসলে না ? তারা অত দূরে অত উঁচুতে আমার আরাধনা করতে যাবে ! কি ভ্রান্তি ! প্লেগ, ম্যালেরিয়া ও ধনীর সন্তান অত উঁচুতে উঠতে পারে না।

গর্জ্জন। আমি তাদের ক্রমান্বয় বক্তৃতা দিচ্ছি যে, খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীতে মূর্খের আর ভদ্রসমাজে স্থান নেই, সুতরাং বিদ্যাচর্চ্চা করতেই হবে।

সর। তুমি যাই বক্তৃতা দাও না কেন, তারা বেশ জানে, এ যুগে সরস্বতীর চাইতে লক্ষ্মীর মান বেশি।

গর্জ্জন। আচ্ছা, সে ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে দেখা যাবে। তোমার ভক্তেরা তোমার পিছনে সিমলে পর্য্যন্ত যেতে পারুক আর না-ই পারুক, তোমাকে সেখানে যেতেই হবে।

সর। যেতে যদি হয় ত যাব। তবে কবে যেতে হবে ?

গর্জ্জন। এখনই, এই মুহূর্ত্তে।

সর। সে কি কথা ? অবস্থাটা ভাববারও দুদিন সময় দেবে না ?

গর্জ্জন। না, আমার motto হচ্ছে "ওঠ ছুঁড়ি, তোর বে।"

সর। তা হ'লে একটা কথা বলি। আমার মন্দিরটে সিমলের চাইতেও আরো একটু উঁচু জায়গায় প্রতিষ্ঠা কর না ?

গর্জ্জন। কোথায় ? মারিতে (Murree)

সর। না, আসমানে।

গর্জ্জন। ক্রমোন্নতির ফলে শেষে দাঁড়াবে তাই।

সর। যখন সকল দেবতাই একে একে ভারতবর্ষ ছেড়ে চ'লে গেছেন, লক্ষ্মীও অন্তর্দ্ধান হয়েছেন, তখন আমিই বা একা পড়ে' থাকি কেন ? চল যাই। দেবতাদের মধ্যে এদেশে বাকি থাকলেন শুধু একদিকে

প্রজাপতি, আর উল্টাদিকে শীতলা, ওলাবিবি ও সেই বংশের যাঁরা যাঁরা নূতন এসেছেন।

গর্জ্জন। আমিও তাই বলি। দেশে যে লোকের কাজ হচ্ছে জন্মানো ও মরা, সে দেশে তোমার থাকা শুধু বিড়ম্বনা।

স্যাভেজ (বেঙ্গল) ল্যাণ্ডর

ভারতী, আশ্বিন, ১৩০৯।

নবযুগ

একটা নবযুগ তার আনুসঙ্গিক নানারূপ আশা-বিভীষিকা সঙ্গে নিয়ে আমাদের দুয়োরে এসে দাঁড়িয়েছে, তাকে কি ভাবে আমরা ঘরে তুলে নিই—আদরে না অবহেলায়, আনন্দে না আশঙ্কায়, তার উপর আমাদের জাতীয় ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করবে।

অতঃপর এ দেশে যে ডিমোক্রাসির সূত্রপাত হ'ল, সে বিষয়ে আমার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। যাঁর আছে, হয় তিনি ডিমোক্রাসির অর্থ বোঝেন না, নয় তাঁর দূরদৃষ্টি নেই। এর উত্তরে পূর্ব্বপক্ষ নিশ্চয়ই বলবেন যে, আমরা চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখছি। এ উত্তরের প্রত্যুত্তরে কিছু বলা অনাবশ্যক। এক পক্ষের কাছে যা অস্তি, আর এক পক্ষের কাছে যদি তা নাস্তি হয়, তা হ'লে হাজার তর্কে সে দু'পক্ষের মতের মিল কিছুতেই হ'তে পারে না। শুধু ধর্ম্মে নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আস্তিক ও নাস্তিক, দুটি বিভিন্ন জাতের লোক। এদের পরস্পরের মূল প্রভেদ হচ্ছে প্রকৃতিগত।

স্বজাতির পলিটিক্যাল-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি আস্তিক। আমি স্বজাতির মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি এবং বিজাতির মনুষ্যত্বে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করি নে। এইজন্যে আমি তাঁদের বলি নাস্তিক, যাঁরা স্বজাতির [মনু]ষ্যত্বে বিশ্বাস করেন না এবং বিজাতির মনুষ্যত্বে [স]ম্পূর্ণ অবিশ্বাস করেন। আমাদের এই বিশ্বাস ও তাঁদের এই অবিশ্বাস কোন পক্ষই তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না, কেননা, এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষই দুটি অজানা জিনিস নিয়ে কারবার করছেন, প্রথম জাতীয় আত্মা, দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ কাল।

আমাদের কথা হচ্ছে এই যে, উক্ত বিশ্বাসই হচ্ছে আমাদের সকল বলা-কওয়ার আসল ভিত্তি। ও-বিশ্বাস ত্যাগ করলে আমাদের পক্ষে মৌনব্রত অবলম্বন করে' নির্ব্বাণমুক্তির জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

আমাকে অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, এই ডিমোক্রাসি শব্দের অর্থ কি?—

একটা জাতির ভিতর এক এক যুগে এক একটি কথা ওঠে বা হাওয়ায় উড়ে আসে, যা সকলের মুখেই শোনা যায়, আর যা সকলের মনকেই আকৃষ্ট করে, সে সব কথার স্পষ্ট অর্থ বোঝানো অসম্ভব। আমার দার্শনিক গুরু Bergson বলেন, সে অর্থ বোঝানো যেমন অসম্ভব, জনগণের পক্ষে তা বোঝাও তেমনি অনাবশ্যক। কেননা, সে সব কথার প্রকৃত অর্থ অভিধানের মধ্যে নেই, আছে জীবনের অভিব্যক্তির মধ্যে। এ জাতীয় কথা যে ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়, সে ধাতু হচ্ছে প্রাণ। লোকের যদি বিশ্বাস থাকে যে, ডিমোক্রাসির অর্থ তারা বোঝে ও সে পদার্থে তাদের আস্থা থাকে, তা হ'লেই তারা ডিমোক্রাসি গড়ে' তুলতে পারবে। এ আস্থা হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস। তার পর ডিমোক্রাসি কোনো দেশেই পড়ে' পাওয়ার জিনিস নয়, সব দেশেই গড়ে' তোলবার জিনিস এবং সেইজন্যই ডিমোক্রাসি শব্দের প্রতি ভাষায় অর্থ স্বতন্ত্র। কেননা, প্রতি জাতি ও বস্তু নিজের মন ও প্রাণ দিয়ে গড়ে' তোলে। আর যেমন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, তেমনি জাতিতে জাতিতেও মন-প্রাণের অল্প বিস্তর পার্থক্য না থেকে যায় না। যেদিন আমরা ডিমোক্রাসি গড়ে' তুলতে পারব, সেদিন ও-শব্দ বাঙলা হয়ে উঠবে, তখন তার মানে জানবার জন্যে আমাদের ইংরিজি অভিধানের আর সাহায্য নিতে হবে না। ডিমোক্রাসির অর্থ একটা বিশেষ রকমের শাসনতন্ত্র মাত্র নয়, ও-বস্তু হচ্ছে একটা জাতির আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের একটা পরিণত রূপ।

আমরা এই স্বদেশী ডিমোক্রাসির গঠন-কার্য্যে নিজ শক্তি নিয়োজিত করব, অবশ্য একমাত্র কথা কয়ে। কিন্তু কারো ভোলা উচিত নয় যে, কথাও হচ্ছে এক রকম কাজ—অবশ্য সে কথার ভিতর যদি আন্তরিকতা থাকে।

বিলেতি ডিমোক্রাসির যে-সকল নমুনা আমাদের চোখের সুমুখে রয়েছে, তা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরও নয়, সর্ব্বগুণে গুণান্বিতও নয়। স্বরাজ্য কোনো দেশেই স্বর্গরাজ্য নয়। শাসনতন্ত্রহিসেবে ডিমোক্রাসি হচ্ছে প্রথমতঃ কথার রাজ্য। সংবাদপত্র ও বক্তৃতা এ তন্ত্রের দুটি প্রধান শক্তিশালী অঙ্গ। যে দেশে এ তন্ত্র আছে, সে দেশে কথার আর অন্ত নেই। "সে কহে বিস্তর মিছা

যে কহে বিস্তর”—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি, ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষেও তেমনি সত্য। সুতরাং দু'দিন পরে হয় ত দেখা যাবে যে, দেশের আকাশ মিছে কথার কুয়াশায় ঢাকা পড়ে' গিয়েছে।

তার পর ডিমোক্রাসি সাম্প্রদায়িক দ্বেষহিংসার অত্যন্ত প্রশ্রয় দেয়। কিন্তু ডিমোক্রাসির সব চাইতে সর্ব্বনেশে দোষ এই যে, এ তন্ত্রে বৈশ্যবুদ্ধি ব্রাহ্মণবুদ্ধির স্থান অধিকার করে। কেননা, শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণ হওয়ার চাইতে বৈশ্য হওয়া ঢের বেশি সহজ। শুধু তাই নয়, এ তন্ত্রে বৈশ্যেরাই শূদ্রের বেনামিতে দেশের লোকের উপর প্রভুত্ব করে। ফলে ভাবে ও ভাষায়, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে এ তন্ত্রের সহজ ঝোঁক ইতরতার দিকে।

সুতরাং একদিকে ডিমোক্রাসি গড়ে' তোলবার সাহায্য করা যেমন আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য, আর একদিকে এই মিছে কথা, এই দ্বেষহিংসা, এই বৈশ্য-বুদ্ধি, এই ইতরতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাও আমাদের পক্ষে তেমনি কর্ত্তব্য এবং সে অস্ত্র হচ্ছে সাহিত্য। রূপলোকের সন্ধান না পেলে মানুষে কামলোকের মায়া কাটাতে পারে না। সাহিত্য অবশ্য এই রূপ-লোকের কথাই মানুষকে শোনাতে চায়। কেননা, সাহিত্যের কাজই হচ্ছে জীবনের উপর মনের প্রাধান্য রক্ষা করা।

বৈশাখ ১৩২৭।

সমাপ্ত

রায়তের কথা

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রণীত

(শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা-সম্বলিত)

মুখপত্র

আমার লেখা "রায়তের কথা" যখন সবুজ পত্রে প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিলেতে। এই কারণে সে প্রবন্ধটি সেকালে তাঁর চোখে পড়ে নি। সম্প্রতি তিনি আমার অনুরোধে সেটি পড়ে' এ বিষয়ে তাঁর মতামত-সম্বলিত একখানি পত্র আমাকে লেখেন। এ পত্র অবশ্য লেখা হয়েছে ছাপবার জন্য।

এ লেখা "টীকাসমেত" রায়তের কথার ভূমিকা-স্বরূপে প্রকাশ করবার অনুমতি রবীন্দ্রনাথ আমাকে দিয়েছেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ভূমিকা

শ্রীমান্ প্রমথনাথ চৌধুরী,

কল্যাণীয়েষু।

আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা উর্দ্ধমূল অবাক্-শাখ। উপরের দিক্ থেকে এর সুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে; অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলচে। তোমার "রায়তের কথা" পড়ে' আমার মনে হ'লো যে, আমাদের পলিটিক্সও সেই জাতের। কন্‌গ্রেসের প্রথম উৎপত্তি-কালে দেখা গেল, এই জিনিসটি শিকড় মেলেছে উপর-ওয়ালাদের উপর-মহলে,—কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই উর্দ্ধলোকে।

যাঁদের আমরা ভদ্রলোক বলে' থাকি, তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, রাজপুরুষে ও ভদ্রলোকে মিলে ভারতের গদি ভাগাভাগি করে' নেওয়াই পলিটিক্স। সেই পলিটিক্‌সে যুদ্ধবিগ্রহ সন্ধিশান্তি উভয় ব্যাপারই বক্তৃতামঞ্চে ও খবরের কাগজে, তার অস্ত্র বিশুদ্ধ ইংরাজী ভাষা;—কখনো অনুনয়ের করুণ কাকলী, কখনো বা কৃত্রিম কোপের উত্তপ্ত উদ্দীপনা। আর দেশে যখন এই প্রগল্‌ভ বাগ্‌বাত্যা বায়ুমণ্ডলের উর্দ্ধস্তরে বিচিত্র বাষ্পলীলা রচনায় নিযুক্ত, তখন দেশের যারা মাটির মানুষ, তারা সনাতন নিয়মে জন্মাচ্চে, মরচে, চাষ করচে, কাপড় বুনচে, নিজের রক্তে মাংসে সর্ব্বপ্রকার শ্বাপদ-মানুষের আহার জোগাচ্চে, যে দেবতা তাদের ছোঁয়া লাগলে অশুচি হ'ন, মন্দির-প্রাঙ্গণের বাইরে সেই দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করচে, মাতৃভাষায় কাঁদচে, হাসচে, আর মাথার উপর অপমানের মুষলধারা নিয়ে কপালে করাঘাত করে' বলচে, "অদৃষ্ট"! দেশের সেই পোলিটিশান্ আর দেশের সর্ব্বসাধারণ, উভয়ের মধ্যে অসীম দূরত্ব।

সেই পলিটিক্স্ আজ মুখ ফিরিয়েচে, অভিমানিনী যেমন করে' বল্লভের কাছে থেকে মুখ ফেরায়। বলচে "কালোমেঘ আর হেরব না গো দুতী"। তখন ছিল পূর্ব্বরাগ ও অভিসার, এখন চলচে মান এবং বিচ্ছেদ। পালা বদল হয়েছে, কিন্তু লীলা বদল হয়নি। কাল যেমন জোরে বলেছিলেম "চাই," আজ তেমনি জোরেই বলচি "চাইনে"। সেই সঙ্গে এই কথা যোগ করেছি বটে যে, পল্লীবাসী জন-সাধারণের অবস্থার উন্নতি করাতে চাই। অর্থাৎ এরাই আমার আপন, ওরা আমার পর। কিন্তু "চাইনে, চাইনে" বল্‌বার হুহুঙ্কারেই গলার জোর গায়ের জোর চুকিয়ে দিই। তার সঙ্গে যেটুকু "চাই" জুড়ি, তার আওয়াজ বড় মিহী। যে অছিলাতেই অর্থ কিছু সংগ্রহ করি, ভদ্রসমাজের পোলিটিক্যাল বারোয়ারী জমিয়ে তুল্‌তেই তা ফুরিয়ে যায়, তার পরে অর্থ গেলে শব্দ যেটুকু বাকি থাকে, সেইটুকু থাকে পল্লীর হিতের জন্যে। অর্থাৎ আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের সুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশ-প্রেমের চর্চ্চা করেচি—দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

এই নিরুপাধিক প্রেমচর্চ্চার অর্থ যাঁরা জোগান, তাঁদের কারো বা আছে জমিদারী, কারো বা আছে কারখানা; আর শব্দ যাঁরা জোগান, তাঁরা আইন-ব্যবসায়ী। এর মধ্যে পল্লীবাসী কোনো জায়গাতেই নেই, অর্থাৎ আমরা যাকে দেশ বলি, সেই প্রেতাপাদিত্যের প্রেতলোকে তারা থাকে না। তারা অত্যন্ত প্রতাপহীন—কী শব্দ-সম্বলে, কী অর্থ সম্বলে। যদি দেওয়ানী অবাধ্যতা চল্‌ত, তা হ'লে তাদের ডাকতে হ'ত বটে,—সে কেবল খাজনা বন্ধ করে' মরবার জন্যে; আর যাদের অন্ন-ভক্ষ্য ধনুর্গুণ, তাদের এখনো মাঝে মাঝে ডাক পাড়া হয় দোকান বন্ধ করে' হরতাল করবার জন্যে, উপর-ওয়ালাদের কাছে আমাদের পোলিটিক্যাল বাঁকা ভঙ্গীটাকে অত্যন্ত তেড়া করে' দেখাবার উদ্দেশ্যে।

এই কারণেই রায়তের কথাটা মুলতবীই থেকে যায়। আগে পাতা হোক্ সিংহাসন, গড়া হোক্ মুকুট, খাড়া হোক্ রাজদণ্ড, ম্যাঞ্চেষ্টার পরুক কোপ্‌নি—তার পর সময় পাওয়া যাবে রায়তের কথা পাড়বার। অর্থাৎ দেশের পলিটিক্স্ আগে, দেশের মানুষ পরে। তাই সুরুতেই পলিটিক্সের সাজ ফরমাসের ধুম পড়ে' গেছে। সুবিধা এই যে, মাপ নেবার জন্যে কোনো সজীব মানুষের দরকার নেই। অন্য দেশের মানুষ নিজের দেহের বহর ও আবহাওয়ার প্রতি দৃষ্টি রেখে বার বার কেটে ছেঁটে বদ্‌লে জুড়ে যে-সাজ বানিয়েছে, ঠিক সেই নমুনাটা দরজির দোকানে চালান্ কর্‌লেই হবে। সাজের নামও জানি,

একেবারে কেতাবের পাতা থেকে সদ্য মুখস্থ, কেননা, আমাদের কারখানা-ঘরে নাম আগে, রূপ পরে। ডিমোক্রেসি, পার্লামেণ্ট, কানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি; এর সমস্তই আমরা চোখ বুজে কল্পনা করতে পারি; কেননা, গায়ের মাপ নেবার জন্য মানুষকে সামনে রাখবার কথাই একেবারেই নেই। এই সুবিধাটুকু নিষ্কণ্টকে ভোগ করবার জন্যেই বলে' থাকি, আগে স্বরাজ, তার পরে স্বরাজ যাদের জন্যে। তারা পৃথিবীতে অন্য সব জায়গাতেই দেশের প্রকৃতি, শক্তি ও প্রয়োজনের স্বাভাবিক প্রবর্ত্তনায় আপনিই আপনার স্বরাজ গড়ে' তুলেচে, জগতে আমরাই কেবল পঞ্জিকার কোনো একটি আসন্ন পয়লা জানুয়ারীতে আগে স্বরাজ পাব, তার পরে স্বরাজের লোক ডেকে যেমন করে' হোক্ সেটাকে তাদের গায়ে চাপিয়ে দেব। ইতিমধ্যে ম্যালেরিয়া আছে, মারী আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহাজন আছে, জমিদার আছে, পুলিসের পেয়াদা আছে, গলায় ফাঁস-লাগানো মেয়ের বিয়ে, মায়ের শ্রাদ্ধ, সহস্রবাহু সমাজের ট্যাক্সো, আর আছে ওকালতীর দংষ্ট্রাকরাল সর্ব্বস্বলোলুপ আদালত।

এই সব কারণে আমাদের পলিটিক্সে তোমার "রায়তের কথা" স্থানকালপাত্রোচিত হয়েছে কি না সন্দেহ করি। তুমি ঘোড়ার সামনের দিকে গাড়ি জোৎবার আয়োজনে যোগ দিচ্ছ না—শুধু তাই নয়, ঘোড়াটাকে জোৎবার উদ্‌যোগ বন্ধ রেখে খবর নিতে চাও, সে দানা পেলে কি না, ওর দম কতটুকু বাকি। তোমার মন্ত্রণাদাতা বন্ধুদের মধ্যে এমন কি কেউ নেই যে, তোমাকে বল্‌তে পারে,—আগে গাড়ি টানাও, তা হ'লেই অমুক শুভলগ্নে গম্যস্থানে পৌঁছবই; তার পরে পৌঁছবামাত্রই যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে খবর নেবার জন্যে যে, ঘোড়াটা সচল না অচল, বেঁচে আছে না মরেছে। তোমার জানা উচিত ছিল, হাল-আমলের পলিটিক্সে টাইম্‌টেব্‌ল তৈরী, তোরঙ্গ গুছিয়ে গাড়িতে চড়ে' বসাই প্রধান কর্ত্তব্য। অবশেষে গাড়িটা কোনো জায়গাতেই পৌঁছয় না বটে, কিন্তু সেটা টাইম্‌টেব্‌লের দোষ নয়, ঘোড়াটা চললেই হিসেবে ঠিক মিলে যেত। তুমি তার্কিক, এত বড় উৎসাহে বাধা দিয়ে বলতে চাও,—ঘোড়াটা যে চলে না, বহুকাল থেকে সেইটেই গোড়াকার সমস্যা। তুমি সাবেক ফ্যাসানের সাবধানী মানুষ, আস্তাবলের খবরটা আগে চাও। এদিকে হাল-ফ্যাসানের উৎসাহী মানুষ কোচবাক্সে চড়ে' বসে' অস্থিরভাবে পা ঘসচে;—ঘরে আগুন লাগার উপমা দিয়ে সে বলচে, অতি শীঘ্র পৌঁছনো চাই, এইটেই একমাত্র জরুরী কথা। অতএব ঘোড়ার খবর নেওয়া নিছক সময় নষ্ট করা। সব আগে দরকার গাড়িতে চড়ে' বসা। তোমার "রায়তের কথা" সেই ঘোড়ার কথা—যাকে বলা যেতে পারে গোড়ার কথা।

২

কিন্তু ভাববার কথা এই যে, বর্ত্তমান কালে একদল জোয়ান মানুষ রায়তের দিকে মন দিতে সুরু করেচেন। সব আগে তাঁরা হাতের গুলি পাকাচ্চেন। বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা বিদেশে কোথাও একটা নজীর পেয়েছেন। আমাদের মন যখন অত্যন্ত আড়ম্বরে স্বাদেশিক হয়ে ওঠে, তখনো দেখা যায়, সেই আড়ম্বরের সমস্ত মালমসলার গায়ে ছাপ মারা আছে—Made in Europe। য়ুরোপে প্রকৃতিগত ও অবস্থাগত কারণের স্বাভাবিক বেগে মানুষ সোশ্যালিজম্‌, কম্যুনিজম, সিণ্ডিক্যালিজম প্রভৃতি নানাপ্রকার সামাজিক পরিবর্ত্তনের পরথ করচে। কিন্তু আমরা যখন বলি রায়তের ভালো করব, তখন য়ুরোপের বাঁধি বুলি ছাড়া আমাদের মুখে বুলি বেরোয় না। এবার পূর্ব্ববঙ্গে গিয়ে দেখে এলুম, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাঙ্কুরের মতো ক্ষণভঙ্গুর সাহিত্য গজিয়ে উঠছে। তারা সব ছোটো ছোটো এক একটি রক্তপাতের ধ্বজা। বলচে পিষে ফেলো, দ'লে ফেলো; অর্থাৎ ধরণী নির্জমিদার নির্মহাজন হোক্। যেন জবরদস্তির দ্বারা পাপ যায়, যেন অন্ধকারকে লাঠী মারলে সে মরে। এ কেমন, যেন বৌয়ের দল বলচে, শাশুড়িগুলোকে গুণ্ডা লাগিয়ে গঙ্গাযাত্রা করাও, তা হ'লেই বধূরা নিরাপদ হবে। ভুলে যায় যে, মরা শাশুড়ির ভূত ঘাড়ে চেপে তাদের শাশুড়িতর শাশুড়িতম করে' তুলতে দেরী করে না। আমাদের দেশের শাস্ত্রে বলে, বাইরের থেকে আত্মহত্যা করে' ম'লেই ভব-বন্ধন ছেদন করা যায় না—স্বভাবের ভিতর থেকে বন্ধনের মূলচ্ছেদ করতে হয়। য়ুরোপের স্বভাবটা মার-মুখো। পাপকে ভিতর থেকে মারতে সময় লাগে—তাদের সে তর্ সয় না। তারা বাইরে থেকে মানুষকে মারে।

একদিন ইংরেজের নকল করে' আমাদের ক্ষেঁড়া পলিটিক্স নিয়ে পার্লামেণ্টায় রাজনীতির পুতুলখেলা খেলতে বসেছিলেম। তার কারণ, সেদিন পলিটিক্সের

আদর্শটাই য়ুরোপের অন্য সব কিছুর চেয়ে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর ছিল।

তখন য়ুরোপীয় যে সাহিত্য আমাদের মন দখল করেচে, তার মধ্যে মাট্‌সিনি গারিবালডির সুরটাই ছিল প্রধান। এখন সেখানে নাট্যের পালা বদল হয়েছে। লঙ্কাকাণ্ডে ছিল রাজবীরের জয়, ছিল দানবের হাত থেকে সীতার মুক্তির কথা। উত্তর-কাণ্ডে আছে দুর্মুখের জয়, রাজার মাথা হেঁট, প্রজার মন জোগাবার তাগিদে রাজরাণীকে বিসর্জ্জন। যুদ্ধের দিনে ছিল রাজার মহিমা, এখন এক প্রজার মহিমা। তখন গান চলছিল বাহিরের বিরুদ্ধে ঘরের জয়—এখনকার গান, ইমারতের বিরুদ্ধে আঙিনার জয়। ইদানীং পশ্চিমে বল্‌শেভিজম্, ফাসিজম্ প্রভৃতি যে সব উদ্যোগ দেখা দিয়েছে, আমরা যে তার কার্য্য-কারণ, তার আকার-প্রকার সুস্পষ্ট বুঝি, তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল। অমনি আমাদের নকল-নিপুণ মন গুণ্ডামিটাকেই সব চেয়ে বড় করে' দেখতে বসেচে। বরাহ অবতার পঙ্ক-নিমগ্ন ধরা-তলকে দাঁতের ঠেলায় উপরে তুলেছিলেন, এরা তুলতে চায় লাঠির ঠেলায়। এ কথা ভাববার অব-কাশও নেই, সাহসও নেই যে, গোঁয়ার্ত্তমির দ্বারা উপর ও নীচের অসামঞ্জস্য ঘোচে না। অসামঞ্জস্যের কারণ মানুষের চিত্তবৃত্তির মধ্যে। সেই জন্যেই আজকের দিনের নীচের থাকটাকে উপরে তুলে দিলে, কালকের দিনের উপরের থাকটা নীচের দিকে পূর্ব্বের মতোই চাপ লাগাবে। রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বল্‌শেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশমোড়া দেওয়া। পূর্ব্বে যে ফোড়াটা বাঁ হাতে ছিল, আজ সেটাকে ডান হাতে চালান করে' দিয়ে যদি তাণ্ডব-নৃত্য করা যায়, তা হ'লে সেটাকে বলতেই হবে পাগ-লামী। যাদের রক্তের তেজ বেশি, এক এক সময়ে মাথায় বিপরীত রক্ত চড়ে' গিয়ে তাদের পাগলামী দেখা দেয়—কিন্তু সেই দেখাদেখি পাগলামী চেপে বসে অন্য লোকের, যাদের রক্তের জোর কম। তাকেই বলে হিস্‌টিরিয়া। আজ তাই যখন শুনে এলুম সাহিত্যে ইসারা চলুচে—মহাজনকে লাগাও বাড়ি, জমিদারকে ফেলো পিষে, তখনি বুঝতে পার-লুম, এই লালমুখো বুলির উৎপত্তি এদের নিজের রক্তের থেকে নয়। এ হচ্চে বাঙালীর অসাধারণ নকল-নৈপুণ্যের নাট্য, ম্যাজেন্টা রঙে ছোবানো। এর আছে উপরে হাত পা ছোড়া, ভিতরে চিত্তহীনতা।

৩

আমি নিজে জমিদার, এর জন্য হঠাৎ মনে হ'তে পারে, আমি বুঝি নিজের আসন বাঁচাতে চাই। যদি চাই, তা'হলে দোষ দেওয়া যায় না—ওটা মানব-স্বভাব। যারা সেই অধিকার কাড়তে চায়, তাদের যে বুদ্ধি, যারা সেই অধিকার রাখতে চায়, তাদেরও সেই বুদ্ধি—অর্থাৎ কোনোটাই ঠিক ধর্ম্মবুদ্ধি নয়, ওকে বিষয়-বুদ্ধি বলা যেতে পারে। আজ যারা কাড়তে চায়, যদি তাদের চেষ্টা সফল হয়, তবে কাল তারাই বনবিড়াল হয়ে উঠবে। হয় ত শিকারের বিষয়-পরি-বর্ত্তন হবে, কিন্তু দাঁত-নখের ব্যবহারটা কিছুমাত্র বৈষ্ণব ধরণের হবে না। আজ অধিকার কাড়বার বেলা তারা যে সব উচ্চ অঙ্গের কথা বলে, তাতে বোঝা যায়, তাদের "নামে রুচি" আছে; কিন্তু কাল যখন "জীবে দয়া"র দিন আসবে, তখন দেখব, আমি-ষের প্রতি জিহ্বার লেলিহান চাঞ্চল্য। কারণ, নামটা হচ্ছে মুখে, আর লোভটা হচ্ছে মনে। অতএব দেশের চিত্তবৃত্তির মাটিতে আজ যে-জমিদার দেখা দিয়েছে, সে যদি নিছক কাঁটাগাছই হয়, তা হ'লে তা'কে দ'লে ফেললেও সেই মরাগাছের সারে দ্বিতীয় দফা কাঁটা-গাছের শ্রীবৃদ্ধিই ঘটবে। কারণ, মাটি বদল হ'ল না তো।

আমার জন্মগত পেষা জমিদারী, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেষা আসমানদারী। এই কারণেই জমিদারীর জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি, জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব। আমরা পরিশ্রম না করে', উপার্জ্জন না করে', কোনো যথার্থ দায়িত্ব গ্রহণ না করে' ঐশ্বর্য্য-ভোগের দ্বারা দেহকে অপটু ও চিত্তকে অলস করে' তুলি। যারা বীর্য্যের দ্বারা বিলাসের অধিকার লাভ করে, আমরা সে জাতির মানুষ নই। প্রজারা আমাদের অন্ন জোগায় আর আমলারা আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়—এর মধ্যে পৌরুষও নেই, গৌরবও নেই। নিজেকে ছোটো হাতের মাপে রাজা বলে' কল্পনা করবার একটা অভিমান আছে বটে, "রায়তের কথা"য় পুরাতন দপ্তর ঘেঁটে তুমি সেই সুখ-স্বপ্নেও বাদ সাধতে বসেচ। তুমি প্রমাণ করতে চাও যে, আমরা ইংরেজ রাজ-সরকারের পুরুষানুক্রমিক গোমস্তা। আমরা এদিকে রাজার নিমক খাচ্চি, রায়তদের বলচি "প্রজা", তারা আমাদের বলচে "রাজা";—

মস্ত একটা ফাঁকির মধ্যে আছি। এমন জমিদারী ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু কাকে ছেড়ে দেব? অন্য এক জমিদারকে? গোলামচোর খেলার গোলাম যা'কেই গতিয়ে দিই—তার দ্বারা গোলাম-চোরকে ঠকানো হয় না। প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক বড়ো জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠ্‌বে। রক্ত-পিপাসায় বড়ো জোঁকের চেয়ে ছিনে জোঁকের প্রবৃত্তির কোনো পার্থক্য আছে, তা বল্‌তে পারিনে। তুমি বলেছ, জমি চাষ করে যে, জমি তারই হওয়া উচিত। কেমন করে' তা হবে? জমি যদি পণ্যদ্রব্য হয়, যদি তার হস্তান্তরে বাধা না থাকে? এ কথা মোটের উপর বলা চলে যে, বই তারি হওয়া উচিত, যে মানুষ বই পড়ে। যে মানুষ পড়ে না অথচ সাজিয়ে রেখে দেয়, বইয়ের সদ্ব্যবহারীকে সে বঞ্চিত করে। কিন্তু বই যদি পটোলডাঙার দোকানে বিক্রি করতে কোনো বাধা না থাকে, তা হ'লে যার বইয়ের শেল্‌ফ্‌ আছে, বুদ্ধি নেই, সে যে বই কিন্‌বে না, এমন ব্যবস্থা কি করে' করা যায়? সংসারে বইয়ের শেল্‌ফ্‌ বুদ্ধির চেয়ে অনেক সুলভ ও প্রচুর। এই কারণে অধিকাংশ বইয়ের গতি হয় শেল্‌ফের থাকে, বুদ্ধিমানের ডেস্কে নয়। সরস্বতীর বরপুত্র যে ছবি রচনা করে, লক্ষ্মীর বরপুত্র তাকে দখল করে' বসে। অধিকার আছে বলে' নয়—ব্যাঙ্কে টাকা আছে বলে'। যাদের মেজাজ কড়া, সম্বল কম, এ অবস্থায় তারা খাপ্পা হয়ে উঠে। বলে—মারো টাকাওয়ালাকে, কাড়ো ছবি। কিন্তু চিত্রকরের পেটের দায় যত দিন আছে, ছবি যত দিন বাজারে আস্‌তে বাধ্য, তত দিন লক্ষ্মীমানের ঘরের দিকে ছবির টান কেউ ঠেকাতে পারবে না।

৪

জমি যদি খোলা বাজারে বিক্রি হয়ই, তা হ'লে যে ব্যক্তি স্বয়ং চাষ করে, তার কেনবার সম্ভাবনা অল্পই; যে লোক চাষ করে না, কিন্তু যার আছে টাকা, অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য জমি তার হাতে পড়বেই। জমির বিক্রয়ের সংখ্যা কালে কালে ক্রমেই যে বেড়ে যাবে, এ কথাও সত্য। কারণ, উত্তরাধিকারসূত্রে জমি যতই খণ্ড খণ্ড হ'তে থাক্‌বে, চাষীর সাংসারিক অভাবের পক্ষে সে জমি ততই অল্প-সত্ত্ব হবেই; কাজেই অভাবের তাড়ায় খরিদ-বিক্রি বেড়ে চল্‌বে। এম্‌নি করে' ছোটো ছোটো জমিগুলি স্থানীয় মহাজনের বড় বড় বেড়াজালের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে ধরা পড়ে। তার ফলে যাঁতার দুই পাথরের মাঝখানে গোটা রায়ৎ আর বাকি থাকে না। একা জমিদারের আমলে জমিতে রায়তের যেটুকু অধিকার, জমিদার-মহাজনের দ্বন্দ্ব-সমাসে তা আর টেঁকে না। আমার অনেক রায়তকে এই চরম আকিঞ্চনতা থেকে আমি নিজে রক্ষা করেছি, জমি-হস্তান্তরের বাধার উপর জোর দিয়ে। মহাজনকে বঞ্চিত করি নি, কিন্তু তাকে রফা করাতে বাধ্য করেচি। যাদের সম্বন্ধে তা করা একেবারে অসম্ভব হয়েছে, তাদের কান্না আমার দরবার থেকে বিধাতার দরবারে গেছে। পরলোকে তারা কোনো খেসারৎ পাবে কি না, সে তত্ত্ব এই প্রবন্ধে আলোচ্য নয়।

নীল-চাষের আমলে নীলকর যখন ঋণের ফাঁসে ফেলে প্রজার জমি আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ছিল. তখন জমিদার রায়তকে বাঁচিয়েচে। নিষেধ-আইনের বাঁধ যদি সেদিন না থাকত, তা হ'লে নীলের বন্যায় রায়তী জমি ডুবে একাকার হত। মনে করো, আজ কোনো কারণে বাংলার উৎপন্ন ফসলের প্রতি যদি মাড়োয়ারি দখল-স্থাপনের উদ্দেশে ক্রমশঃ প্রজার জমি ছিনিয়ে নিতে ইচ্ছা করে, তা হ'লে অতি সহজেই সমস্ত বাংলা তারা ঘানির পাকে ঘুরিয়ে তার সমস্ত তেল নিংড়ে নিতে পারে। এমন মৎলব এদের কারো মাথায় যে কোনো দিন আসে নি, তা মনে কর্‌বার হেতু নেই। যে-সব ব্যবসায়ে এরা আজ নিযুক্ত আছে, তার মুনফায় বিঘ্ন ঘটলেই আবদ্ধ মূলধন এই সব খাতের সন্ধান খুঁজবেই। এখন কথা হচ্চে, ঘরের দিকে বেনো জল ঢোকাবার অনুকূল খাল-খনন কি রায়তের পক্ষে ভালো? মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই, শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনোমতে নিজেকে রক্ষা কর্‌তে জানে না। তাদের মধ্যে যারা জানে,তাদের মত ভয়ঙ্কর জীব আর নেই। রায়ৎখাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্ব্বনেশে, তার পরিচয় আমার জানা আছে। তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হ'তে হ'তে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে সয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরেরই জটলা দেখতে পাবে। জাল, জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছ্‌রূপ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সঙ্কোচ নেই। জেলখানায় যাওয়ার মধ্য দিয়ে তাদের শিক্ষা পাকা হয়ে উঠ্‌তে থাকে। আমেরিকায় যেমন শুনতে পাই ছোটো ছোটো ব্যবসাকে গিলে ফেলে বড় বড় ব্যবসা দানবাকার

হয়ে ওঠে, তেমনি করেই দুর্ব্বল রায়তের ছোটো ছোটো জমি ছলে বলে কৌশলে আত্মসাৎ করে' প্রবল রায়ৎ ক্রমেই জমিদার হয়ে উঠ্‌তে থাকে। এরা প্রথম অবস্থায় নিজে জমি চাষ করেছে, নিজের গোরুর গাড়ীতে মাল তুলে হাটে বেচে এসেছে, স্বাভাবিক চতুরতা ছাড়া অন্য চাষীর সঙ্গে এদের কোনো প্রভেদ ছিল না। কিন্তু যেমনি জমির পরিধি বাড়তে থাকে, অমনি হাতের লাঙল খসে গিয়ে গদার আবির্ভাব হয়। পেটের প্রত্যন্ত সীমা প্রসারিত হ'তে থাকে, পিঠের দিকে লাগে তাকিয়া, মুলুকের মিথ্যা মকদ্দমা পরিচালনার কাজে পসার জমে, আর তার দাবরাব-তর্জ্জন-গর্জ্জন-শাসন-শোষণের সীমা থাকে না। বড়ো বড়ো জালের ফাঁক বড়ো, ছোট মাছ তার ভিতর দিয়ে পালাবার পথ পায়; কিন্তু ছোটো ছোটো জালে চুনোপুঁটি সমস্তই ছাঁকা পড়ে—এই চুনোপুঁটির ঝাঁক নিয়েই রায়ৎ।

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, প্রতিকূল আইনটাকেই নিজের করে' নেওয়াই মকদ্দমার যুযুৎসু খেলা। আইনের যে আঘাত মারতে আসে, সেই আঘাতের দ্বারাই উল্টিয়ে মারা ওকালতী-কুস্তির মারাত্মক প্যাঁচ। এই কাজে বড় বড় পালোয়ান নিযুক্ত আছে। অতএব রায়ৎ যতদিন বুদ্ধি ও অর্থের তহবিলে সম্পন্ন হয়ে না ওঠে, ততদিন "উচল" আইনও তার পক্ষে "অগাধ জলে" পড়বার উপায় হবে।

এ কথা বলতে ইচ্ছা করে না, শুনতেও ভালো লাগে না যে, জমি সম্বন্ধে রায়তের স্বাধীন ব্যবহারে বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য। একদিক থেকে দেখতে গেলে ষোলো আনা স্বাধীনতার মধ্যে আত্ম-অপকারের স্বাধীনতাও আছে। কিন্তু তত বড় স্বাধীনতার অধিকার তারই, যার শিশু-বুদ্ধি নয়। যে রাস্তায় সর্ব্বদা মোটর-চলাচল হয়, সে রাস্তায় সাবালক মানুষকে চলতে বাধা দিলে সেটাকে বলা যায় জুলুম—কিন্তু অত্যন্ত নাবালককে যদি কোনো বাধা না দিই, তবে তাকে বলে অবিবেচনা। আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা, তাতে বলতে পারি, আমাদের দেশে মূঢ় রায়ৎদের জমি অবাধে হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া আত্মহত্যার অধিকার দেওয়া। এক সময়ে সেই অধিকার তাদের দিতেই হবে, কিন্তু এখন দিলে কি সেই অধিকারের কিছু বাকী থাকবে? তোমার লেখার মধ্যে এই অংশে আমার মনে যে সংশয় আছে, তা বললেম।

৫

আমি জানি জমিদার নির্ব্বোধ নয়। তাই রায়তের যেখানে কিছু বাধা আছে, জমিদারের আয়ের জালে সেখানে মাছ বেশী আটক পড়ে। আমাদের দেশে মেয়ের বিবাহের সীমা সঙ্কীর্ণ, সেই বাধাটাই বরপক্ষের আয়ের উপায়। এও তেমনি, কিন্তু দেখতে দেখতে চাষীর জমি সরে' সরে' মহাজনের হাতে পড়লে আখেরে জমিদারের লোকসান আছে বলে' আনন্দ করবার কোন হেতু নেই। চাষীর পক্ষে জমিদারের মুষ্টির চেয়ে মহাজনের মুষ্টি অনেক বেশী কড়া,—যদি তাও না মানো, এটা মানতে হবে, সেটা আরেকটা উপরি মুষ্টি।

রায়তের জমিতে জমাবৃদ্ধি হওয়া উচিত নয়, এ কথা খুব সত্য। রাজসরকারের সঙ্গে দেনা-পাওনায় জমিদারের রাজস্ব-বৃদ্ধি নেই, অথচ রায়তের স্থিতিস্থাপক জমায় কমা-সেমিকোলন চলবে, কোথাও দাঁড়ি পড়বে না, এটা ন্যায়বিরুদ্ধ। তা ছাড়া এই ব্যবস্থাটা স্বাভাবিক উৎসাহে জমির উন্নতিসাধন সম্বন্ধে একটা মস্ত বাধা; সুতরাং কেবল চাষী নয়, সমস্ত দেশের পক্ষে এটাতে অকল্যাণ। তা ছাড়া গাছকাটা, বাসস্থান পাকা করা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি অন্তরায়গুলো কোনো মতেই সমর্থন করা চলে না।

কিন্তু এসব গেল খুচরো কথা। আসল কথা, যে-মানুষ নিজেকে বাঁচাতে জানে না, কোনো আইন তাকে বাঁচাতে পারে না। নিজেকে এই যে বাঁচাবার শক্তি, তা জীবন-যাত্রার সমগ্রতার মধ্যে, কোনো একটা খাপছাড়া প্রণালীতে নয়। তা বিশেষ আইনে নয়, চরখায় নয়, খদ্দরে নয়, কন্‌গ্রেসে ভোট দেবার চার-আনা-ক্রীত অধিকারে নয়। পল্লীর মধ্যে সমগ্রভাবে প্রাণসঞ্চার হ'লে তবেই সেই প্রাণের সম্পূর্ণতা নিজেকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করবার শক্তি নিজের ভিতর থেকেই উদ্ভাবন করতে পারবে।

কেমন করে' সেটা হবে? সেই তত্ত্বটাই কাজে ও কথায় কিছুকাল থেকে ভাবছি। ভাল জবাব দিয়ে যেতে পারব কি না জানিনে—জবাব তৈরী হয়ে উঠতে সময় লাগে। তবু আমি পারি বা না পারি, এই মোটা জবাবটাই খুঁজে বের করতে হবে। সমস্ত খুচরো প্রশ্নের সমাধান এরই মধ্যে, নইলে তালি দিতে দিতে দিন বয়ে যাবে; যার জন্যে এত জোড়াতাড়া, সে তত কাল পর্য্যন্ত টিকবে কি না সন্দেহ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টীকা

রবীন্দ্রনাথ যে আমার "রায়তের কথার" দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, এ আমার পক্ষে অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা। আমি এ কথাটি তুলি এই আশায় যে, বাঙলার বিদ্বান বুদ্ধিমান ও সহৃদয় লোকেরা এ কথার বিচার করবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, মহামতি শিক্ষিতসম্প্রদায় আমার কথায় কর্ণপাত করেন নি। ফলে এ বিষয়ে তাঁরা হাঁ না কিছুই বলেন নি। সম্ভবতঃ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, আমি পূর্ব্বে যেমন সাধুভাষা বনাম বাঙ্গলা ভাষার মামলা তুলেছিলুম, এ ক্ষেত্রেও তেমনি পলিটিকাল সাধু মনোভাবের বিরুদ্ধে পলিটিকাল বাঙলা মনোভাবের মামলা তুলেছি। অতএব এ ক্ষেত্রে চুপ করে' যাওয়াই শ্রেয়ঃ, নচেৎ তর্কের চোটে আমি লোকের কান ঝালাপালা করে' দেব। আমি যে একজন নাছোড় তার্কিক, তার পরিচয় যাঁরা বাঙলা জানেন, তাঁরা পূর্ব্বে যথেষ্ট পেয়েছেন। কিন্তু এ নীরবতার যথার্থ কারণ রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছেন।

আমারও একটা পলিটিক্স আছে, যুগধর্ম্মের প্রভাব আমার মনের উপরও পূর্ণ-মাত্রায় প্রভুত্ব করে। কিন্তু আমার পলিটিক্সের প্রস্থানভূমি হচ্ছে বাঙলার জমি, বিলেতের আকাশ নয়। ফলে ও উড়ো পলিটিক্সের মত বিচিত্র ও চমকপ্রদ নয়। মহাভারতে পড়েছি যে, একটি হংস বলেছিলেন যে:—

"তোমাদের সাক্ষাতেই আমি ঊর্দ্ধগতি, অধোগতি, বেগ-গতি, সমগতি, ধীরগতি, বক্রগতি, বিচিত্রগতি, সর্ব্বদিকে গতি, পশ্চাদ্গতি, সুকুমারগতি, প্রচণ্ডগতি, দীর্ঘগতি, মণ্ডলাকারে সমগতি, সর্ব্বদিকে সমগতি, বেগে অবরোহণ, বেগে ঊর্দ্ধগমন, শোভনগমন, মণ্ডলাকারে অধঃপতন, শোভনভাবে ঊর্দ্ধগমন, শোভনভাবে অধঃপতন, অনেকের সহিত গমন, পরস্পর ঈর্ষ্যাসহকারে গমন, পরস্পর স্নেহভাবে গমন, গতাগত, প্রতিগত কাক-সমুচিত বহুতর গতিতে বিচরণ করিব।"

আমি দেশের লোকের কাছে উক্তরূপ বিচিত্র শূন্যলীলা প্রদর্শন করতে অঙ্গীকার কস্মিন্‌কালেও করিনি, কারণ, পলিটিকাল পরমহংস হবার শক্তি যে নিজদেহে ধারণ করিনে—এ জ্ঞান আমার বরাবরই ছিল, এখনও আছে। আর যে পলিটিক্সের শিকড় দেশের মাটীতে-বদ্ধ, সে পলিটিক্স যে উঁচু নজরের লোকের চোখে পড়্‌বে না, সে ত ধরা কথা।

রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছেন যে, আমার কি এমন কোন মন্ত্রণাদাতা বন্ধু ছিলেন না, যিনি আমাকে এই মেঠো পলিটিক্‌স্ থেকে বিরত করতে পারতেন? বন্ধুভাগ্যে আমি একেবারে বঞ্চিত নই। আর সকলেই জানেন, বন্ধুমাত্রেই বন্ধুর মন্ত্রী, যেমন স্ত্রীমাত্রেই স্বামীর প্রাইভেট টিউটার। তবে যে আমার বন্ধুবর্গ আমাকে পলিটিক্সের বহুজনসেবিত শূন্যমার্গ অবলম্বন করতে পরামর্শ দেন নি, তার কারণ, তাঁরা জানেন যে, আমি পলিটিসিয়ান নই, সাহিত্যিক। পলিটিক্সের ক্ষেত্রে লোকের মুখে লাগাম দেওয়া চলে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে নয়। আর সাহিত্যিককে সামাজিক কর্‌বার চেষ্টা যেমন ব্যর্থ, তেমনি অনর্থক। —দেশের সাহিত্যিকরা যদি সব পলিটিসিয়ান হয়ে ওঠে, তা হ'লে পাল্টা জবাব দেবার জন্য সব পলিটিসিয়ান রাতারাতি সাহিত্যিক হয়ে উঠবে। ফলে মনোরাজ্যে কি ভীষণ অরাজকতা ঘট্‌বে, তা ভাবতে গেলেও আতঙ্ক হয়। পণ্ডিত মোতিলাল নেহেরু যদি কাব্য লিখতে সুরু করেন আর মৌলানা মহম্মদ আলি দর্শন, আর আমরা তা পড়তে বাধ্য হই, তা হ'লে কোন্ সাহিত্যিক না বানপ্রস্থ অবলম্বন করবার জন্য ছট্‌ফট্ করবে। এই সব কারণে আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা আমার মুখে হাত দিতে চেষ্টা করেন নি। "যার কর্ম্ম তারে সাজে"—এ জ্ঞান তাঁদের ছিল। আসল কথা হচ্ছে, সাহিত্যিকের পলিটিক্স্ একেলেও নয়, সেকেলেও নয়,—তেকেলে'। সুতরাং তা একালের সঙ্গেও খাপে খাপে মিলে যাবে না, সেকালের সঙ্গেও নয়, অথচ ও দুকালের সঙ্গেই তার যোগাযোগ আছে।

২

আজকাল এমন কোনও কথা বলবার যো নেই, আর পাঁচজনে যাকে একটা ismএর ভিতর টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা না করবেন। তা যদি না করেন, তা হ'লে তাঁরা যে শিক্ষিত, তা কি করে' প্রমাণ হয়? আমি যে ism নাস্তিক, তার পরিচয় বোধ হয় আমার রায়তের কথার পত্রে পত্রে পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথও সোশ্যালিজম, কম্যুনিজম, সিনডিকালিজম প্রভৃতি কথায় ভয় পান এবং কেন ভয় পান, সে কথা তিনি তাঁর পত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন।* ও সব ধর্ম্ম ভারতবর্ষের নয়। কেন যে নয়, সংক্ষেপে তা বল্‌ছি।

কালী, তারা, মহাবিদ্যা প্রভৃতি যেমন একই আদ্যাশক্তির বিভিন্ন মূর্ত্তি—সোশ্যালিজম, কম্যুনিজম, সিণ্ডিকালিজম প্রভৃতিও Capitalism-এরই বিভিন্ন মূর্ত্তি। এ কথা এতই সত্য যে, স্বয়ং লেনিন কম্যুনিজম ওরফে বলসেভিজমের নাম দিয়েছেন State Capitalism.

এই Capitalism জিনিসটে কি? ওর জন্ম হয়েছে Industrialism থেকে। যতদিন ইউরোপে Industrialism থাকবে, ততদিন Capitalism-ও থাকবে, বদল হবে শুধু ওর নামরূপে।

এর থেকে প্রমাণ হয় যে, যে দেশে Industrialism নেই, সে দেশে সোশ্যালিজম, কম্যুনিজম, সিণ্ডিকালিজম প্রভৃতি, যার মাথা নেই, তার মাথা ব্যথার সামিল। এ জাতীয় শিরঃপীড়ায় লোক অবশ্য ভীষণ আর্ত্তনাদ করতে পারে, যেমন খালিফের অভাবে খিলাফৎ করছে, কিন্তু সে চীৎকার-ধ্বনিতে সহজ লোকের কান্না না পেয়ে হাসি পায়।

আমাদের দেশে এই রায়তের সমস্যাটা হচ্ছে non-industrial সমাজের সমস্যা। এ বিষয়ে Bertrand Russell-এর কটি কথা এখানে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি। রাসেলের তুল্য বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইউরোপের পলিটিক্সের ভাব-রাজ্যে আর দ্বিতীয় নেই, সুতরাং তাঁর কথা শোনা যাক্।

"In a non-industrial commuutiy, liberal ideals, if they could be carried out, would lead to a division of the national wealth between peasant proprietors, handicraftsmen and merchants. Such a society exists at this day in China, except in so far as it is interfered with by foreign capitalists and native military commanders. The latter revert to the right of the sword, the former introduce fragments of modern industrialism." —(Prospects of Industrial Civilization, p 55.)

বলা বাহুল্য যে, ইকনমিকালি ভারতবর্ষ ও চীন সমবস্থ। আমি "রায়তের কথায়" বাঙলায় রায়তরা যাতে peasant proprietor হয়ে উঠতে পারে, সেই প্রস্তাবই করেছি। এতে শুধু প্রজার নয়, সমাজেরও মঙ্গল হবে। আমি রায়তের পক্ষ থেকে যে সব ছোট খাটো অধিকারের দাবী করেছি, সে সব অধিকার লাভ করলে বাঙলার রায়তের দল peasant proprietorship-এর দিকে আর একটু অগ্রসর হবে। চীনের রায়তের অপেক্ষা বাঙলার রায়তের অবস্থা এক বিষয়ে ভাল। আমাদের দেশে কোনও native military commanders নেই, যারা তরবারির সাহায্যে রায়তের স্বত্ব অপহরণ করতে পারে। Foreign Capitalist অবশ্য দুই দেশেই আছে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ব্ববঙ্গে একদল রায়ত বন্ধুর সন্ধান পেয়েছেন—যারা নাকি শুধু দ'লে ফেলবার—পিষে ফেলবার পক্ষপাতী। পৃথিবীতে যে মতই প্রচার করা যাক না, লোকে তা নিজের বুদ্ধি ও চরিত্র অনুসারে অঙ্গীকার করবে এবং এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীতে বহু নির্ব্বোধ লোক আছে এবং নির্ব্বুদ্ধিতার সঙ্গে দুষ্টবুদ্ধির সদ্ভাবও অনেক ক্ষেত্রে মেলে। সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়ের উপসর্গ জুড়ে দিতে অনেকে লালায়িত। এর জন্য মানুষে দুঃখ করতে পারে, কিন্তু চুপ করে' থাকতে পারে না। ধর্ম্মের অর্থ যে অনেকের কাছে বিদ্বেষবুদ্ধি, তার প্রমাণ ত হাতে হাতেই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু তার জন্য অবশ্য ধর্ম্ম দায়ী নয়। আর যেখানে মামলা হচ্ছে ধর্ম্মের নয় অর্থের—সেখানে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য প্রভৃতি রিপুর স্ফূর্ত্তি ত হবেই। সে যাই হোক, "রায়তের কথা" যে riot-এর কথা নয় তা বোঝবার মত ভাষাজ্ঞান আশা করি, অধিকাংশ পাঠকেরই আছে।

৩

রায়তকে তার দখলীস্বত্ব-বিশিষ্ট জোত হস্তান্তর করবার অধিকার দেওয়া উচিত কি না, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ আছে। তাই তিনি হস্তান্তর করবার পক্ষে আমার কি বলবার আছে, তা শুনতে চেয়েছেন। "রায়তের কথায়" এ বিষয়ে আমি কোনও আলোচনা করি নি। এইমাত্র বলেছিলুম যে, এ ব্যাপারের পক্ষে ও বিপক্ষে যে সব কথা বলবার আছে, সে সব কথা আর যার মুখেই শোভা পাক্, বাঙলার অধিকাংশ জমিদারের মুখে শোভা পায় না। কারণ, এ ব্যাপারে তাঁরা যা দেখেন, তা প্রজার হিতাহিত নয়—দেখেন শুধু দাখিল-খারিজের নজরের তারতম্য। যে ব্যাপারে নিজের পকেট ভারি হয়, তাতে যে অপরেরও হিত হয়, এ রকম মনে করায় বিশেষ আরাম আছে। পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ঐ রকম বিশ্বাসের প্রতি মানুষের মন সহজেই অনুকূল।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার হিসাবে, মহাজনের কবল

থেকে প্রজাকে রক্ষা করবার জন্য আজীবন কি করে' এসেছেন, তা আমি সম্পূর্ণ জানি, কেননা, তাঁর জমিদারী সেরেস্তায় আমিও কিছুদিন আমলাগিরি করেছি। আর আমাদের একটা বড় কর্ত্তব্য ছিল, সাহাদের হাত থেকে সেখদের বাঁচানো।—কিন্তু সেই সঙ্গে এও আমি বেশ জানি যে, বাঙলার জমিদার-মাত্রেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নন। রবীন্দ্রনাথ কবি হিসেবেও যেমন, জমিদার হিসেবেও তেমনি Unique. আমি সেই সব জমিদারের কথা বলেছি, যাঁরা শতকরা নিরনব্বই।

আমরা হাজার স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও যেমন শিশুকে সকল বিষয়ে সমান স্বাধীনতা দিতে নারাজ তার ভালর জন্য, তেমনি বাঙলার রায়তকে তার নিজের সর্ব্বনাশ করবার স্বাধীনতা দিতেও নারাজ হ'তে পারি, রায়ত বেচারার ভালর জন্য। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার মতভেদ নাই। আমি অনেক বিষয়েই liberal অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পক্ষপাতী হলেও সকল লোককে কথায়, কাজে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেওয়ার অর্থ যে তাকে অমানুষ করা, এ জ্ঞান আমারও আছে। বিলেতে যখন অবাধ মদ্যপানকে আইনত সবাধ করবার প্রস্তাব ওঠে, তখন জনৈক liberal বলেছিলেন যে,. I would rather have England free than England sober. আমার liberalism অবশ্য অতদূর উঁচুতে ওঠে না। Drunk স্বাধীনতার উপর যদি হস্তক্ষেপ করা না যায় ত, তা sober স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করবে। প্রবৃত্তির অধীনতাকে যে অনেকে ইচ্ছার স্বাধীনতা মনে করেন, তার পরিচয় ত নিত্যই পাওয়া যায়।

তবে আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, শিশু ছাড়া আর কারও শৈশব আমার কাছে প্রীতিকর নয়। এক হাত পরিমাণে ছেলেকে কোলে করতে সকলেরই লোভ যায়, কিন্তু সেই মাপের প্রাপ্তবয়স্ক লোককে অর্থাৎ বামনকে অঙ্কস্থ করতে সহজ মানুষে সহজেই নারাজ হয়। অনেক লোক যাদের আমরা শিশু বলি, তারা মনোজগতে বামন ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনও দেশে বেশির ভাগ লোক এই জাতীয় হয়, তা হ'লে সেটা অবশ্য একটা দুঃখের বিষয় যে, কি করে' তাদের আবার মানুষ করা যায়, সেইটিই হচ্ছে আসল ভাবনার কথা। এ দেশে রায়তের দল, উক্ত হিসেবে বাস্তবিকই শিশু,—কিন্তু এই শিশুদের কি করে' মানুষ করতে হবে, সেটা একটা মস্ত সমস্যা, তবে আমি যে সমস্যা তুলেছি, তার থেকে পৃথক্ সমস্যা।

আমি অবাধ হস্তান্তরের পক্ষপাতী, এই কারণে যে হস্তান্তর করবার অধিকার হচ্ছে ইংরাজীতে যাকে বলে একটা proprietary right এবং সে right আমার মতে যে জমি চষে, তার থাকা উচিত। সে চাষী ক অথবা খ, তাতে কিছু যায় আসে না। ক জমিদারের স্বত্ব স্বামিত্ব ত নিত্য খ জমিদারের হাতে যাচ্ছে, এখন যদি কেউ প্রস্তাব করে যে, জমিদারী কেউ হস্তান্তর করতে পারবে না, তা হ'লে ক চ ট ত প পঞ্চবর্গ জমিদার পঞ্চমুখে তার প্রতিবাদ করবেন। মানবচরিত্র এই যে, কোনরূপ স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে কোন বিশেষ লোককে চিরকাল বেঁধে রাখা যাবে না। লক্ষ্মীর সঙ্গে মানুষের এমন বিবাহ হ'তে পারে না—যার আর dirvorce নেই। ইউরোপে মধ্যযুগে মানুষ-নামক জঙ্গমজীবকে সেকালের ভূম্যধিকারীরা তাঁদের জমিতে শিকড় গেড়ে গাছের মত স্থাবরজীব হ'তে বাধ্য করেছিলেন, এ অবস্থার নাম serfdom। একালে আমাদের ও নাম শুনলেই ভয় হয়। অপর পক্ষে ক'র জমি খ'র হাতে যাওয়াটা আমরা বিশেষ দুঃখের কথা মনে করি নে।

তবে কথা হচ্ছে, ক'র জোত যদি খ'র হাতে না গিয়ে গ'র হাতে যায়? ক'ও চাষী প্রজা খ'ও তাই, কিন্তু গ হচ্ছেন তিনি—যিনি প্রজা, কিন্তু চাষী নন, তিনি যিনি জমি চষেন না, কিন্তু তার উপর-টপকা ফল ভোগ করেন—অর্থাৎ জোতদার। "গ" যখন জমি চষে না, তখন সে তা অবশ্য ঘ'কে দিয়ে চষাবে। এই হবে তখন একজন কোর্ফা প্রজা অথবা আধিয়ার। ফলে এই নূতন জাতের প্রজার উপর অবশ্য সে জমির পূর্ব্ব মালিক ক'র কোন অধিকারই বর্ত্তাবে না, তার সকল অধিকারের মালিক হবে গ। ফলে এই হস্তান্তরের বলে, ঘ'র জোতে দখলী স্বত্বও থাকবে না, তার হস্তান্তরের অধিকারও থাকবে না। অর্থাৎ আমি জমিদারের অধীনস্থ রায়তকে যে সব স্বত্ব-স্বামিত্ব দিতে চাই, জোতদারের অধীনস্থ রায়তের তা কিছুই থাকবে না। ফলে হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই রায়তের সকল স্বত্ব জোতদারের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাবে। আর হস্তান্তরের ফলে বহুজোত যে জোতদার আত্মসাৎ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। খরিদ-বিক্রীর কথা অবশ্য টাকার কথা। সুতরাং যার টাকা আছে, সেই যে জোত খরিদ করবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

জমিদার ও রায়তের ভিতর মহাজনের হবে মধ্যস্বত্ব।

কিন্তু এর উপায় কি? ছেলেবেলায় স্কুলে পড়েছি যে, land, labour and capital এই তিনের যোগে ধন-সৃষ্টি হয়। কৃষীকর্ম্মের কথাই ধরা যাক। land বাদ দিয়ে শূন্যে চাষবাস হয় না, labour বাদ দিলে ফসল জন্মায় না, জন্মায় ঘাস, আর সে ঘাসও কাটবার জন্য labour চাই। আর হালবলদ মই বিদে, নিড়ুনি বীচন capital-এর অভাবে এ সব কিছুই জোটে না, আর জোটে না চাষের গরুর ও চাষীর খোরাক। আজ বীজ বুনে কাল যদি পাকা ধান পাওয়া যেত, তা হ'লে ব্যাপার হয় ত অন্যরূপ হ'ত। বাজীকররা অবশ্য আঁটি পোঁতবার অব্যবহিত পরেই ফজলী আম ফলিয়ে দেয়। এ বিদ্যে মূর্খ চাষীদের জানা নেই। আর তা ছাড়া বাজীর আমে শুধু নয়ন তৃপ্ত হয়, উদর তৃপ্ত হয় না। Land, labour এবং capital এ তিনের Co-operation যখন চাইই, তখন এই তিনের ভিতর যাতে বিরোধ নয়, সামঞ্জস্য ঘটে, তারই চেষ্টা করা আমাদের কর্ত্তব্য,—অন্তত ততদিনের জন্য—যতদিন সোস্যালিজমের কৃপায় land nationalised এবং কম্যুনিজমের কৃপায় capital inter nationalised না হয়ে যায়।

এখন এই মহাজনের হাতে জমি যাওয়ার ফলে মহাজনের অস্থাবর সম্পত্তি স্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হয়। জমি কেনা-বেচার অর্থ এই যে, যে জমি বেচে সে স্থাবর সম্পত্তিকে অস্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে, আর যে কেনে, সে অস্থাবর সম্পত্তিকে স্থাবর সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ একই জিনিস শুধু ভিন্নরূপ ধারণ করে। জমিও capital, টাকাও capital, দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে একটি স্থূল ও অচল capital, আর একটি তরল ও চঞ্চল capital, আর এ পৃথিবীর নিয়মই এই যে, স্থূল নিত্য তরলে রূপান্তরিত হচ্ছে—আর তরল নিত্য স্থূলে রূপান্তরিত হচ্ছে।

যদি কেউ বলেন যে, চাষী প্রজা যে জোত হস্তান্তর করে, সে দেনার দায়ে আর সেই সূত্রে মহাজন জোতদার হয়ে ওঠে, তা হ'লে বলি, জোত খালি মহাজনের দেনার দায়ে বিক্রী হয় না, জমিদারের বাকী খাজানার দায়েও বিক্রী হয়, আর তখন তা হয় সম্পূর্ণ নির্দ্দায়রূপে। সুতরাং জমির কেনা-বেচা যেমন চলছে, তেমনি চলবেই—মহাজন নামক Capitalist-এর হাত থেকে রায়তী জোত আইনত রক্ষা করতে চেষ্টা করলেও জমিদার নামক Capitalist-এর হাত থেকে তাকে রক্ষা করা যাবে না।

এ ক্ষেত্রে আমি মনে করি, সেই রকম আইন হওয়া উচিত—যাতে জমিদারের হাত থেকে জোতদারের হাতে গেলে রায়তের স্বত্ব-স্বামিত্ব খর্ব্ব না হয়। মধ্যস্বত্বকে খর্ব্ব করাই তার উপায়। কি ক'রে তা করা যাবে, তার সন্ধান উকীল বাবুদের কাছে পাওয়া যাবে।

৪

রায়তের কাছে জমিদার দেবতা হ'তে পারে, কিন্তু জোতদার ওরফে উপ-জমিদার যে উপ-দেবতা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই উপ-দেবতার উপদ্রব থেকে রায়তকে যে কি করে' বাঁচানো যায়, সে বিষয় আমি রায়তের কথায় আলোচনা করি নি,—দু কারণে।

প্রথমতঃ আমি আলোচনাটিকে সরল করবার জন্য রাজা-প্রজার সম্বন্ধের বিচার করি, তাই যে ব্যক্তি রাজাও নয় প্রজাও নয়, অথচ একাধারে ও দুই, তার নাম আর উল্লেখ করি নি। দ্বিতীয়তঃ এ জ্ঞান আমার ছিল যে, জাতিভেদের মত মধ্যস্বত্বের অস্তিত্ব হচ্ছে ভারতবর্ষের সমাজগঠনের বিশেষত্ব। বিলেতে যেমন middle class প্রবল, এ দেশে তেমনি middleman-ই প্রবল, শুধু কৃষীকর্ম্মে নয়, শিল্প-বাণিজ্যেও। যে ধন সৃষ্টি করে ও যে তা ভোগ করে, সে দুই ব্যক্তির ভিতর অসংখ্য middleman আছে। কথায় বলে, "যার ধন তার ধন নয়, নেপো মারে দই"। এই বিরাট নেপোর দলের নাম ভদ্র-লোক। সমাজের এ ব্যবস্থা আর যে হিসেবেই আমাদের উন্নতির কারণ হোক্, জাতীয় ধনের হিসেবে আমাদের অবনতির কারণ। আমি নিজে এই ভদ্রশ্রেণীভুক্ত, জাতি হিসেবেও, পেশা হিসেবেও, তবুও এ স্পষ্ট সত্যটা অস্বীকার করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এই ব্যবস্থার সঙ্গে আমার জীবনকে দিব্যি খাপ খাইয়েছি, কিন্তু আমার মনকে তদ্রূপ খাপ খাওয়াতে পারি নি। তাই সমাজ-দেহের রোগের কিসে প্রতীকার হয়, সে ভাবনা আমি ভাবতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে, আমি এ রোগের চিকিৎসার যে ব্যবস্থা দিয়েছি, সে হচ্ছে ডাক্তারি-ভাষায় যাকে বলে symptomatic treatment;

তার ফলে জাতীয় হীনতা দূর হবে না। এ জ্ঞানও আমার ষোল আনা আছে। তবে যে লোকের ছোটখাটো কষ্টের কি করে' প্রতীকার হ'তে পারে, সে বিষয়ে আমার মতামত প্রকাশ করেছি, তার কারণ, আয়ুর্ব্বেদে আদেশ আছে, মানুষের গায়ে কাঁটা ফুটলেই যদি পার ত তা তুলে দিয়ো, দর্শনের সব গভীর তত্ত্বের মীমাংসা না হওয়াতক্ ও কাজ করতে নিরস্ত হয়ো না।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার জাতীয় দুর্দ্দশার কারণ হচ্ছে জাতির প্রাণশক্তির অভাব। এই জীবন্মৃত জাতির অন্তরে আবার কি করে' প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা যায়, সেইটেই হচ্ছে অবশ্য একমাত্র জিজ্ঞাস্য। চারি-দিকে যে চেষ্টা হচ্ছে তাতে তা হবে না। কারণ, অনেকে যা করছেন, তা হচ্ছে বিলেত থেকে আমদানী galvanic battery-র shock প্রদান। ও shock-এ মরা জানোয়ার হাত-পা ছোড়ে, কিন্তু বাঁচে না। তবে হবে কিসে? এ বিষয়ে মুক্তি কোন্ দিকে, সে দিক্‌নির্ণয় আমি হয়ত করতে পারি—কিন্তু সে পথে কাউকে চালাবার শক্তি আমার নেই। তা ছাড়া ধান ভানতে শিবের গীত গাইতেও আমি সঙ্কুচিত। রায়তের কথা আগাগোড়া কত ধানে কত চাল হয়, তারই কথা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

রায়তের কথা

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়
সুহৃদ্বরেষু—

বাঙলার নতুন কাউন্সিলের নতুন ইলেক্‌সনের জন্য কি প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে লোকের সুমুখে আমাদের খাড়া হওয়া কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে তুমি আমার মত জানতে চেয়েছ। এ কথা শুনে লোকে হাসবে। একজন সখের সাহিত্যিকের কাছে কাজের পলিটিক্সের পরামর্শ চাওয়াটা সখের দলের পলিটিসিয়ানদের কাছে নিশ্চয়ই কামারের দোকানে দইয়ের ফরমায়েস দেওয়ার মত হাস্যাস্পদ ব্যাপার হিসেবে গণ্য হবে। তবুও তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করতে প্রস্তুত হয়েছি। কারণ কি জানো?—এ যুগের পলিটিক্সে অধিকারি-ভেদ নেই। ডিমোক্রাসীর অর্থই কি এই নয় যে, রাজনীতি সম্বন্ধে সকলের সবরকম কথা কইবার সমান অধিকার আছে? এ ক্ষেত্রে লোকমত ত বেদবাক্য। আর অসংখ্য "আমার মতকে" ঠিক দিয়েই ত "আমাদের মত" ওরফে 'লোকমত' পাওয়া যায়। এ হিসেবে আমারও মুখ খোলবার অধিকার আছে।

আর এক হিসেবে আমি বলতে পারি যে, তুমি এ ক্ষেত্রে ঠিক লোকের কাছেই এসেছ, কেননা, আমি আমার কথা বাঙলায় বলতে পারি। রিফর্‌ম্‌ বিলের ফল কি হ'ল না হ'ল আর কি হবে না হবে—এ সব বিষয়ে বিস্তর মতভেদ থাকলেও, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, এই আইনের বলে আমাদের রাজনীতির ভাষা একদম বদলে গেল। এতদিন সে-ভাষা ছিল রাজার, এবার হ'ল তা প্রজার। ষোল আনার মধ্যে পোনেরো আনা ভোট যখন প্রজার হাতে, তখন সে ভোট আদায় করতে হ'লে মাতৃভাষারই শরণাপন্ন হ'তে হবে। ভিক্ষাটা ভিক্ষাদাতার ভাষাতেই করতে আমরা বাধ্য; এই কারণেই ত সে ভাষা জানি আর না জানি—আমরা এ-যাবৎ আমাদের রাজনৈতিক আবৃত্তি দরখাস্ত সব ইংরাজিতেই করতে বাধ্য হয়েছি। এখন থেকে দরখাস্ত যখন বাঙলাতেই লিখতে হবে, তখন যার হাতে ও ভাষার কলম আছে, তাকে বাদ দিয়ে পলিটিক্স করা আগেকার মত আর চলবে না। আর আমি যে বাঙলা জানি, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই; কেননা, আমার লেখা পড়ে' লোকে বলে, আমি সংস্কৃত জানি নে। হাল পলিটিক্স সম্বন্ধে কথা কইবার বিশেষ অধিকার যে আমার আছে, এই তার প্রথম দলিল। আর যে সব দলিল আছে, তা ক্রমে পেশ করছি।

২

কেন প্রোগ্রাম চাই?

তুমি ঠিক ধরেছ যে, এ-ফেরা আমাদের যা হোক্ একটা প্রোগ্রাম চাই-ই চাই। ইতিপূর্ব্বে যে সব ইলেক্‌সান হয়ে গেছে, তাতে প্রোগ্রামের কোনই আবশ্যকতা ছিল না। ভোটারের সংখ্যা ছিল দশ বিশটি, আর সে ভোট যিনি যার খাতির রাখেন, তিনি তাঁকে দিতেন। মিউনিসিপালিটি ও ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বাররা দেখতেন, ভোটপ্রার্থী লোকটা কে—তাঁর মতটা কি, সে কথা কেউ জিজ্ঞাসা করত না। পূর্ব্বের ইলেক্‌সান ছিল একরকম সামাজিক ব্যাপার, এমন কি, সে ব্যাপারকে পারিবারিক বল্‌লেও অসঙ্গত হয় না, কেননা. আমাদের দেশের পরিবার শুধু আত্মীস্বজন নিয়ে নয়, তার ভিতর আশ্রিত অনুগত লোকও ঢের থাকে। উকীল মোক্তার যেখানে ভোটার, সেখানে জমিদারের সাহায্য ব্যতীত জমিদারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভোট আদায় করা কোনো অ-জমিদারের পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল, তা তিনি যতই বিদ্বান্ বুদ্ধিমান, যতই "স্বদেশী" ও "স্বরাজী" হোন না কেন। তোমার মনে থাকতে পারে যে, গত ইলেক্‌সানে, একটা জমিদার ভোটারের দল—ভোটপ্রার্থী কি জাত, সেই হিসেবে নিজেদের ভোট দেন। ফলে বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ ক্যাণ্ডিডেটকে হারিয়ে রাঢ়ী-কায়স্থ ক্যাণ্ডিডেট পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে লাট-সভায় ঢুকে গেলেন। বলা বাহুল্য, এ দলে বেশির ভাগ ভোটার ছিলেন রাঢ়ী কায়স্থ।

কিন্তু রিফর্‌ম্‌ বিলের প্রসাদে ভোটারের সংখ্যা

যখন দশ লাখের উপর উঠে গেছে, তখন আর ইলেক্‌সানের মামলা পারিবারিক ভোটে ফতে করা চলবে না। সুতরাং প্রোগ্রাম চাই।

প্রোগ্রাম চাই দু'কারণে। এই নতুন ভোটারের দল প্রায় সবাই নিরক্ষর। পলিটিক্সের "প" অক্ষর তাদের কাছে হয় গোমাংস, নয় হারাম। তুমি অবশ্য জানো যে, এই অশিক্ষিত জনসাধারণকে ভোটের অধিকারী করবার বিরুদ্ধে প্রধান কারণ দেখান হয়েছিল তাদের এই শিক্ষার অভাবটা। বাঙালী স্ত্রীলোকের দেহের মত, যাদের মনের পক্ষে "ঘর হতে আঙ্গিনা বিদেশ", তাদের হাতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন করবার ভার দেওয়াটা যে প্রহসন মাত্র, এ কথা দেশী বিদেশী সরকারী বেসরকারী অনেক লোক অনেক ভাবে বলেছেন,—কেউ চটে, কেউ হেসে, কেউ ধীরে, কেউ জোরে। এ আপত্তির সার্থকতা আমি অবশ্য কখনো দেখতে পাই নি। গভর্ণমেণ্ট বলতে কি বোঝায়, গভর্ণমেণ্টের ক'টি সেরেস্তা আছে, প্রতি সেরেস্তার গঠন কি, কার অধীনে থেকে কি নিয়মে প্রতি সেরেস্তার কাজ চালাতে হয় এবং নানা বিভিন্ন সেরেস্তার আভ্যন্তরিক যোগাযোগটা কি, এ সব না জানলে যদি রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণ সম্বন্ধে মত দেবার অধিকার না থাকে ত, বাঙলা দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেরও সে অধিকার নেই। অধিকার নেই কেন, তা শুনবে?—দু'বছর আগে পর্য্যন্ত কলিকাতার ল-কলেজ Constitutional Law পড়াবার ভার আমার হাতে ছিল। আমার ক্লাশে প্রতি বৎসর গোণাগাঁথা তিনশ' করে' ছাত্র জড় হ'ত এবং এরা প্রত্যেকেই হয় B. A. নয় B. Sc.—অর্থাৎ যুগপৎ বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্। এই অধ্যাপনাসূত্রে আমি কি আবিষ্কার করি জানো? —আমি নিত্য পরিচয় পেতুম যে, এই ছাত্রদের মধ্যে অনেকে Legislative Council-এর সঙ্গে Executive Council-এর প্রভেদ যে কি, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন। এ কথা তুমি সহজে বিশ্বাস করতে চাইবে না, কেননা, কোনো আইনজ্ঞ লোকের পক্ষে তা বিশ্বাস করা কঠিন। নিজের অজ্ঞতা যদি গোপন রাখতে হয়, তা হ'লে "শতং বদ মা লিখ" এই পরামর্শ মেনে চলতে হয়। কিন্তু আমাদের দেশের ভদ্রসন্তানদের সে পন্থা অবলম্বন করবার ত উপায় নেই। এগজামিন আমাদের দিতেই হবে, লিখিত প্রশ্নের লিখিত জবাব দিতে আমরা বাধ্য, আর কার কত বিদ্যে, তা কলমের এক আঁচড়েই ধরা পড়ে।

আমি আজ বছর দু'য়েক আগে একবার Constitutional Law-এর কাগজ পরীক্ষা করি। "ভারতবর্ষের আইন কে তৈরী করে"—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর শতকরা নব্বইটি ছাত্র দিতে পারে নি; তাতে কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই নি, কেননা, ছাত্রসাধারণের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে পাকা জবাব পাবার আশা আমি কোন কালেই রাখি নে। মুখস্থজ্ঞান পত্রস্থ করতে গেলে কমবেশি গলদ হবেই হবে, বিশেষত সে জ্ঞান যখন সম্পূর্ণ বিলেতি পুঁথিগত। কিন্তু কতকগুলি উত্তর পড়ে' আমিও চমকে উঠেছিলুম।

একজন লিখেছেন, "ভারতবর্ষের সব আইন মুনিঋষিরা তৈরী করে' গেছেন এবং আজও সেই সব বাহাল রয়েছে"; আর একজনের বিশ্বাস, ইংলণ্ডের রাজা হিন্দুস্থানের বড় লাটকে যে সব চিঠিপত্র লেখেন, সেই সব চিঠিতে তিনি যে হুকুমজারি করেন, সেই সব হুকুমই হচ্ছে এদেশের আইন;" আর একজনের উত্তর, "ব্রিটিশ ভারতবর্ষের আইনকানুন তৈরী করে Native Prince-রা"। কিন্তু এঁদের সকলের মন ভারতবর্ষে আবদ্ধ নয়, এ দেশের আইনকর্ত্তার তল্লাসে বাঙালার নবীন ভাবুকদের কল্পনা "ভারতের নানা দেশ করিয়া ভ্রমণ", অবশেষে "উপনীত হয়েছিল হিমালয়শিরে।" শেষে দেখলুম, একজন লিখেছেন, "ভারতবর্ষের আইন বানান নেপালের রাজা"।

এরকম সব গাঁজাখুরি জবাবের কারণ আমি জানি। এঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছেলে Constitutional Law-এর কোনো বই কখনো চক্ষেও দেখে নি, কেননা, তারা জানে যে, এ বিষয়ের কোনো জ্ঞান না থাকলে তাদের পাশ আটকাবে না এবং পরে ওকালতিরও ঠেকা হবে না। কিন্তু এই সব উত্তরই প্রমাণ যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে দেশের শাসনতন্ত্র সম্বন্ধে কোনোরূপ স্পষ্ট ধারণা নেই, এ বিষয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রায় সবাই এক পঙ্‌ক্তিতে। এ অবস্থায় শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি লাটসভায় বসবার অধিকারী হন, তা হ'লে অশিক্ষিত সম্প্রদায় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সেখানে বসাবার অধিকার কেন না পাবে? এ দেশের জনগণ নিরক্ষর বলে' যে ভোটের অধিকারী হতে পারে না, এ আপত্তি মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টে অগ্রাহ্য হয়েছে। কি কারণে অগ্রাহ্য হয়েছে, তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ উক্ত রিপোর্টের ৮৫ হতে ৯৫, এই দশ পৃষ্ঠার

ভিতর পাওয়া যাবে। ঐ পাতাক'টি বাঙলায় অনুবাদ করে' দিতে পারলে ভাল হ'ত, কিন্তু সে খাটুনি খাটবার অবসর আমার নেই। যাঁরা পলিটিক্সের ব্যবসা করেন, তাঁদের ঐ দশ পৃষ্ঠা ঈষৎ মনোযোগ দিয়ে পড়তে অনুরোধ করি। এ স্থলে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, রিফরমের স্রষ্টাদের মতে এই ভোটসূত্রেই জনগণ পলিটিক্সের শিক্ষা লাভ করবে, আর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রধান কর্ত্তব্য হবে তাদের সে শিক্ষা দেওয়া বই পড়িয়ে নয়—মুখে মুখে। অর্থাৎ—ইলেক্‌সানের ক্ষেত্রই হবে এ দেশের যথার্থ পলিটিক্যাল স্কুল, যেমন আদালতই হচ্ছে আইনের যথার্থ স্কুল।

জানই ত, এ যুগের পলিটিক্সের গোড়ার কথা হচ্ছে প্রতি লোকের নিজস্ব অধিকারের জ্ঞান। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে, অর্থাৎ একশ' আঠারো বৎসর আগে, তখনকার ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট দেশের অবস্থা জানবার জন্য জিলার কালেক্টারদের কাছে কতকগুলি প্রশ্ন করে' পাঠিয়ে দেন; তার একটি প্রশ্ন ছিল এই—দেশের প্রজাদের কি কি অধিকার আছে?

এ প্রশ্নের উত্তরে মেদিনীপুরের কালেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্ট্রেচি সাহেব লেখেন:—

"অধিকার বলতে আমরা যা বুঝি, এ দেশের জনসাধারণের কস্মিন্‌কালেও যে তা ছিল, এরূপ বিশ্বাস আমার নয়। সত্য কথা বলতে গেলে, তাদের কোনরূপ অধিকার নেই, কোনোরূপ স্বাধীনতা নেই। যদি কোথায়ও দেখা যায় যে, তারা সুখশান্তিতে বাস করছে, তার অর্থ এ নয় যে, তাদের সুখে থাকবার কিম্বা শান্তিতে থাকবার কোনোরূপ অধিকার আছে। ও-দুই বস্তু হচ্ছে তাদের শাসনকর্ত্তাদের দত্ত বরস্বরূপ। শাসনকর্ত্তারা উচিত জ্ঞান কিম্বা স্বার্থজ্ঞানের বশবর্ত্তী হয়ে তাদের উপর যদি জুলুম-জবরদস্তি না করেন, তা হ'লেই তারা নিজেদের কৃতার্থ এবং অনুগৃহীত মনে করে" —(Fifth report, Vol. II, page 596.)

এ কথা যে সত্য, তা কে অস্বীকার করবে? একটু চোখ চেয়ে দেখলে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আজকের দিনেও অধিকার সম্বন্ধে তারা যেখানে ছিল, প্রায় সেখানেই আছে। আজও লক্ষ লক্ষ প্রাণীর জীবনযাত্রা উপরওয়ালাদের অনুগ্রহের উপরই নির্ভর করে। হুজুরের মেহেরবাণী ও ধর্ম্মাবতারের অনুগ্রহের জন্য আজও এ দেশে লক্ষ লক্ষ লোক লালায়িত।

মানুষের এই অধিকারজ্ঞান আমাদের দেশে ভুঁইফুঁড়ে ওঠে নি, সাগরপার থেকে জাহাজে চড়ে' এসেছে। মনুষ্যত্বের দাবী আমরা ইংরাজি শিক্ষার গুণে করতে শিখেছি! সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র প'ড়ে দেখ—তাতে আছে শুধু কর্ত্তব্যের কথা, অধিকারের 'অ' পর্য্যন্ত তাতে নেই। মানুষমাত্রেরই অধিকারের কথা (Rights of man) ইউরোপেও সেদিন উঠেছে, এই ফরাসী-বিপ্লবের সময় থেকে। ও-জ্ঞান কোনো সমাজেই পুরাতন নয় আমরা যে ভাবি ও-জ্ঞান আমাদের সনাতন, তার কারণ, আমরা জন্মেছি ঐ জ্ঞানের আবহাওয়ার ভিতর, আর ইংরেজি স্কুলে ঢুকে অবধি ঐ বস্তু হয়েছে আমাদের মনের নিত্য-নিয়মিত খোরাক। ইংলণ্ডের ইতিহাসের মত তার কাব্যসাহিত্যও স্বাধীনতার গন্ধে ভুরভুর করছে; সুতরাং ও-বস্তুর ঘ্রাণে অর্দ্ধ-ভোজন আমাদের সবারই হয়ে গেছে।

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে জনসাধারণের মনে তাদের অধিকারের জ্ঞান ঢুকিয়ে এবং বসিয়ে দেওয়া। ওর থেকে পালাবার জো নেই, কেননা, সে পালানো হবে আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য থেকে পালানো। কেউ কেউ অবশ্য বলবেন যে—ও আমাদের মোটেই কর্ত্তব্য নয়, কেননা, আমরা পরের জন্য ডিমোক্রাসি চাই নি, নিজেরা হাতে চেয়েছিলুম স্বদেশী ব্যুরোক্রাসি। পলিটিসিয়ানদের অনেকের নজর যে দেশের দিকে নয়, সিমলার উপর পড়েছিল—সে কথা আমরা জানি। সেই কথাটা স্পষ্ট করে' বললে গোল ত চুকেই যেত।

"অচল বলিয়া উচল সেবিনু,
পড়িনু অগাধ জলে"—

অবস্থাটা যদি সত্য সত্যই তাই হয়ে থাকে ত, ভদ্রলোকের পক্ষে সে কথা চেপে যাওয়াই শ্রেয়। কেননা, কি চেয়েছিলুম আর না চেয়েছিলুম, তা নিয়ে হা-হুতাশ করা এখন নিষ্ফল। ঘটনা যা ঘটেছে, তাতে চাষার ভোট দিন দিন বাড়বে বৈ কমবে না, সুতরাং পলিটিক্যাল হিসেবে লোক-শিক্ষার ভার আমাদের হাতে নিতেই হবে। অতএব প্রোগ্রাম চাই।

৩

অধিকার—সামান্য ও বিশেষ

এ পর্য্যন্ত বোধ হয় আমরা সকলেই একমত। কিন্তু আর বেশি এগোবার আগে অধিকার কথাটার

ঠিক মানে যে কি, তা বোঝবার একটু চেষ্টা করা যাক। এ চেষ্টা ফুজুল নয়, কেননা, কথাটা হচ্ছে দ্ব্যর্থবাচক।

আমি এই খানিকক্ষণ হ'ল বলেছি যে, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে মানুষকে শুধু তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে হয় আদেশ করা হয়েছে, নয় ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সে শাস্ত্রে ধর্ম্ম বলতে বোঝায় বিধিনিষেধসম্বলিত বচন, অর্থাৎ মানুষকে কি করতে হবে আর কি না করতে হবে, তাই জানানো হচ্ছে ধর্ম্মশাস্ত্রের কাজ। এক কথায় ধর্ম্মশাস্ত্র হচ্ছে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের শাস্ত্র।

সে শাস্ত্রে এই ধর্ম্ম আবার দু'ভাগে বিভক্ত। শাস্ত্রের ভাষায় দু'রকম ধর্ম্ম আছে, এক সামান্য ধর্ম্ম আর এক বিশেষ ধর্ম্ম। চুরি করো না, খুন করো না, পরদার হরণ করো না—এসব হচ্ছে সামান্য ধর্ম্মের কথা, কেননা, এ সকল ব্রাহ্মণশূদ্র নির্ব্বিচারে সকলের পক্ষে সমান মান্য। অপরপক্ষে বেদপাঠ করা ব্রাহ্মণের, ও ব্রাহ্মণের সেবা করা শূদ্রের বিশেষ ধর্ম্ম। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে সামান্য ধর্ম্মের কথা একরকম উহ্য রয়ে গিয়েছে। মেধাতিথি বলেন, যে-ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণ, তার বিশেষ করে' উল্লেখ করবার প্রয়োজন নেই, কেননা, ধরে' নেওয়া যেতে পারে যে, সে-ধর্ম্ম সর্ব্বলোক-বিদিত। অপরপক্ষে বাইবেলে যীশুখৃষ্টের সব উপদেশই সামান্য-ধর্ম্মগত। টাকা ধার নিলে, কি হারে সুদ দিতে হবে, সে বিষয়ে যীশুখৃষ্ট সম্পূর্ণ নীরব। অর্থাৎ—আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র হচ্ছে আইন, আর বাইবেল হচ্ছে নীতি-কথা। এই কারণেই না লোকে বলে যে, ফরাসী-বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছে খ্রীষ্টধর্ম্মে।

বলা বাহুল্য, এই সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্মের ভিতর দা-কুমড়োর সম্পর্ক নেই, এ দুয়ের উপরই সভ্য সমাজের ভিত্তি। বাইবেলে বিশেষ ধর্ম্মের কথা উহ্য রয়ে গিয়েছে, কিন্তু প্রত্যাখাত হয় নি। কেননা, যীশুখৃষ্ট এক কথায় এ বিষয়ে সব কথা বলেছেন। "সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দিয়ো", এ কথার অর্থ—আইন মেনে চলো।

তার পর কর্ত্তব্য ও অধিকার হচ্ছে দুটি আপেক্ষিক শব্দ। শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণের সেবা করা যদি কর্ত্তব্য হয়, তা হ'লে শূদ্রের কাণ ধরে' সে সেবা আদায় করবার অধিকার ব্রাহ্মণের নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং এ দু-ই পরস্পর পরস্পরকে ধরে' দাঁড়িয়ে থাকে। প্রাচীন সভ্যতা ও নব সভ্যতার ভিতর আসল প্রভেদ এই যে, সেকালে লোক একমাত্র কর্ত্তব্যটাই মানুষের চোখের সুমুখে খাড়া করে' রাখত, একালে বিশেষ করে' অধিকারটাই আমরা খাড়া করতে চাই।

এত কথা বলবার উদ্দেশ্য এই, কথাটা স্পষ্ট করা যে, কর্ত্তব্যের মত অধিকারও দুভাগে বিভক্ত,—এক সামান্য অধিকার, আর এক বিশেষ অধিকার। খুন করবার অধিকার যেখানে কারো নেই, বেঁচে থাকবার অধিকার সেখানে সবারই আছে, এই হচ্ছে মানুষের সামান্য অধিকারের প্রথম দফা। কিন্তু তুমি জান, আমি জানি, আর সবাই জানে, ফাঁসি দেবার অর্থাৎ মানুষের প্রাণবধ করবার বিশেষ অধিকার State-এর আছে; অর্থাৎ সমাজ যখন প্রাণহিংসার বিশেষ অধিকার বিশেষ বিশেষ লোককে কিম্বা সম্প্রদায়কে দেয়, তখন তা হয় বৈধহিংসা। অতএব নীতির হিসেবে যা অবৈধ, সমাজ কিম্বা ষ্টেটের দোহাইতে তা বৈধ হয়ে ওঠে। তার পর বেঁচে থাকবার অধিকার যদিচ সবারই আছে, অথচ বেঁচে থাকবার জন্য যা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, অর্থাৎ—অন্ন, সেই প্রাণপদার্থে অধিকার অনেকেরই নেই। অতএব সামান্য অধিকারের কথাগুলো অনেক অংশে ফাঁকা, মস্ত হ'লেও ফাঁপা।

এখন আমার কথা এই যে, মানুষের পক্ষে তার বিশেষ অধিকারের জ্ঞানটাই হচ্ছে তার পক্ষে সবিশেষ দরকারী। মানুষের সঙ্গে মানুষমাত্রেরই একটা দূর সম্পর্ক অবশ্য আছে; কিন্তু প্রতি লোকের, কোনো কোনো বিশেষ লোকের সঙ্গে যে বিশেষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, তাই নিয়েই তার জীবন। রাজা ও প্রজা, বাপ ও ছেলে, স্বামী ও স্ত্রী, মুনিব ও চাকর, এদের পরস্পরের ভিতর কর্ত্তব্য ও অধিকারের নানারকম বন্ধন আছে এবং সেই সব অধিকারের উপর দাঁড়িয়েই সামাজিক লোকে সংসার চালায়। এ স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। মোটামুটি ধরতে গেলে এ সব ক্ষেত্রে যে প্রবল, অধিকারটা বেশি করে' তার হাতেই থাকে; আর যে দুর্ব্বল, কর্ত্তব্যটা বেশি করে' তার ঘাড়েই পড়ে। আর এই দেনাপাওনার হিসেবটা যতদূর সম্ভব দু-দিকে মিশ করে' নিয়ে আসাটা এ যুগের পলিটিক্সের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য।

অতএব জনসাধারণের মনে প্রধানত তাদের বিশেষ অধিকারের জ্ঞান জন্মিয়ে দিতে হবে এবং সামান্য অধিকারের কথা সেই স্থলেই পাড়তে হবে, যেখানে আমরা তাদের অধিকার বাড়াতে চাইব। যা আছে, সেইটুকুকে শুধু রক্ষা করার অর্থ স্থিতি,—উন্নতি নয়। কিন্তু আমরা সবাই উন্নতি চাই, এও

হচ্ছে এ যুগের মানুষের স্বাভাবিক ইচ্ছা। বিশেষ অধিকারের নিঃসম্পর্কিত সামান্য অধিকারের ঘোষণা করার অর্থ হচ্ছে জনসাধারণকে ভোগা দেওয়া। সেদিন কংগ্রেস মানুষমাত্রেরই সামান্য অধিকারের বিলেতী ফর্দ্দ ভারতবাসীর সুমুখে ধরে' দিয়েছেন। পলিটিসিয়ানরা যদি দেশের লোকের কাছে সেই ফর্দ্দ আবার পড়তে সুরু করেন, তা হ'লে বোঝা যায় যে, তারা চাষা-ভুষোকে কোনো বিশেষ অধিকার দিতে নারাজ। যাতে সকলের সমান অধিকার আছে, তাতে কারো কোনো বিশেষ অধিকার না-ও থাকতে পারে।

৪

দেশের অবস্থা

তার পর প্রশ্ন ওঠে—দেশের লোককে পলিটিক্যাল শিক্ষা দেবার সদুপায় কি?—

বই পড়ানো যে নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে কি আমাদের পথে-ঘাটে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দর্শন অথবা রাজনৈতিক বিজ্ঞানের লেকচার দিতে হবে?—তাও অবশ্য নয়। কেনন', ও-সব জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করা দরকার B. A, M. A. পাশ করবার জন্যে এবং কলেজের প্রফেসারি করবার জন্যে। ও-জ্ঞান জীবনযাত্রার পাথেয় নয়, অন্ততঃ চাষাভুষোর পক্ষে ত নয়ই। তাদের অবস্থানুযায়ী অধিকারের কথা চাপা দিয়ে তাদের কাছে rights of man-এর ব্যাখ্যান করার অর্থ, গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া। বিশেষ অধিকারের মূল থেকেই যে সামান্য অধিকারের ফুল ফুটেছে, এ কথা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কে না জানে? তা ছাড়া এ শাস্ত্রের বড় বড় কথা প্রচার করবার ভিতর বিপদও আছে। জনগণ হয় সে সব বুঝবে ন', নয় উল্টো বুঝবে; আর তখন আমরা তাদের উপর হাত চালাতে প্রস্তুত হব।

এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কিংকর্ত্তব্য?—উত্তর খুব সোজা।

মানুষের বিশেষ অধিকারসকল তার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং তার স্বার্থ যে কোথায় এবং কি উপায়ে সেই স্বার্থের রক্ষা ও বৃদ্ধি করা যেতে পারে, সেই জ্ঞান দান করতে পারলেই আমরা তাদের পলিটিক্যাল শিক্ষা দান করতে পারব। আপনার কড়াগণ্ডাটা বুঝে নেবার ক্ষমতাটাও মানুষের একটা শক্তি, আর শক্তিই হচ্ছে সকল উন্নতির মূল। কেবলমাত্র জনসাধারণের দিক্ থেকে নয়, সমগ্র জাতির দিক্ থেকে দেখলেও, যাতে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হয়, সেই চেষ্টা করাটাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য হবে। আদমসুমারিতে জনসাধারণই হচ্ছে অসংখ্য, আর অসাধারণ জন অর্থাৎ ভদ্রলোকের সংখ্যা আঙ্গুলে গোণা যায়। আর যে জাতির বেশির ভাগ লোক দুর্দ্দশাপন্ন, সে জাতির কি শরীরে কি অন্তরে কোন শক্তিও নেই, কোনো উন্নতির আশাও নেই।

সুতরাং রাজনৈতিক ভাবের বিলেতি আকাশ থেকে বাঙলার মাটিতে নেমে এসে দেখা যাক্, সে দেশের অবস্থাই বা কি, আর দেশবাসীদেরই বা অবস্থা কি? অবস্থা বুঝলে ব্যবস্থা করবার সুবিধে হবে। তোমরা সকলে লাটদরবারে ঢুকতে চাচ্ছ শুধু যে উচিত ব্যবস্থা করবার জন্য, তা সে দরবারের নামেই প্রকাশ। কে না জানে, সে সভার নাম ব্যবস্থাপক সভা।

ছেলেবেলায় কথামালায় পড়েছিলুম যে, জনৈক বৃদ্ধ কৃষক তার ছেলেদের ডেকে বলেন যে, তাঁর ক্ষেতে ধনরত্ন পোতা আছে। সেই ধনরত্নের লোভে তাঁর ছেলেরা সেই ক্ষেত আগাগোড়া খুঁড়ে ওলট-পালট করলে; কিন্তু পোঁতাধনের কোথাও সাক্ষাৎ পেলে না, তবে এই খোঁড়ার ফলে এই ক্ষেত্রে অপর্য্যাপ্ত ফসল জন্মাল।

আমাদের বাঙলা দেশ হচ্ছে ঐরকমের একটি প্রকাণ্ড কৃষকের ক্ষেত্র; ওর বুকের ভিতর কোনো গুপ্তধন পোতা নেই, ও-ক্ষেত্রে শুধু ফসল জন্মায়। বাঙলা দেশ যে সোনার খনি নয়, তা ব[illegible] কোনো দুঃখ করবার দরকার নেই, কেননা, আবাদ করতে জানলে এ জমিতে আমরা সোনা ফলাতে পারি। আর খনির সোনা দু'দিনেই ফুরিয়ে যায়, কিন্তু আবাদের সোনা অফুরন্ত ও চিরদিন ফলে।

বাঙলাদেশ যে শস্যক্ষেত্র, এই সত্যের উপর আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গড়ে' তুলতে হবে। বাঙলার উন্নতি মানে কৃষির উন্নতি। এ উন্নতি অনেকে সাধন করতে চান ছেরেপ জমিতে সার দিয়ে। তাঁরা ভুলে যান যে, কৃষকের শরীর মন যদি অসার হয়, তা হ'লে জমিতে সার দিয়ে দেশের শ্রী কেউ ফিরিয়ে দিতে পারবে না। আমাদের দেশে যা দেদার পতিত রয়েছে, সে হচ্ছে মানব-জমিন, আর আমরা যদি স্বদেশে সোনা ফলাতে চাই, তা হ'লে আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য হবে এই মানব-জমিনের আবাদ করা এবং তার জন্য দেশের জনসাধারণের

মনে রস ও দেহে রক্ত—এ দু-ই জোগাবার জন্য আমাদের যা-কিছু বিদ্যাবুদ্ধি, যা-কিছু মনুষ্যত্ব আছে, তার সাহায্য নিতে হবে। এখন আসল কথায় ফিরে আসা যাক্। আগামী ইলেক্‌শানের জন্য সেই প্রোগ্রাম তৈরী করতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে বাঙলার কৃষকের, ওরফে বাঙালী জাতির অবস্থার উন্নতি করা। একটা সমগ্র জাতির দুরবস্থা দূর করা যে কত কঠিন এবং তা করবার সকল উপায় যে আমাদের হাতে নেই, এ কথা আমি সম্পূর্ণ জানি। আমি শুধু বলি যে, যেটুকু আমাদের সাধ্যের অতীত নয়, সেইটুকু করবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে, কেননা, সে চেষ্টার ফল ভাল না হয়ে যায় না।

৫

কৃষকের অবস্থা

ইলেক্‌সানের প্রোগ্রাম অবশ্য পলিটিসিয়ানদেরই তৈরী করতে হবে, কেননা, দেশ উদ্ধারের ভার তাঁরা স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে নিজের ঘাড়ে নিয়েছেন। অতএব কৃষকের অবস্থার যাতে উন্নতি হয়, সেই মর্ম্মে প্রোগ্রাম তৈরী করা অবশ্য আমাদের পলিটিসিয়ানদের পক্ষেই কর্ত্তব্য। তাঁদের নিজের স্বার্থের দিক থেকে দেখলেও এ কর্ত্তব্য তাঁরা অবহেলা করতে পারবেন না। গাঁয়ে যাঁকে মানে না, তাঁর পক্ষে দেশের মোড়লি করা আর চলবে না। তবে এ প্রোগ্রাম তাঁরা তৈরী করতে পারবেন কি না সন্দেহ।

আমি না হই, তুমি যখন আধ-আধ কথা কইতে, সেই কালে বঙ্কিমচন্দ্র অতি স্পষ্ট করে' বলেছিলেন যে :—

"জমিদারের ঐশ্বর্য্য সকলেই জানেন, কিন্তু যাঁহারা সংবাদপত্র লিখিয়া, বক্তৃতা করিয়া বঙ্গসমাজের উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া বেড়ান, তাঁহারা সকলে কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নহেন—"

বঙ্কিমের যুগে পলিটিসিয়ানদের অজ্ঞতার যা পরিমাণ ছিল, ইতিমধ্যে তা যে অনেকটা বেড়ে গিয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কেননা, ইতিমধ্যে বাঙলার ভদ্রলোকের দল জমি থেকে ঢের বেশি আলগা হয়ে পড়েছে। এখন এ সম্প্রদায় টিঁকে আছে চাকরি, ওকালতি ও ডাক্তারির উপর। ডাক্তারি-কেরাণীগিরির সঙ্গে জমি-জমার কোনই সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে শুধু ওকালতির সঙ্গে। আমাদের উকীল সম্প্রদায়ের সম্পদ অবশ্য জমিদার ও রায়তের বিপদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু Bengal Tenancy জানা এক কথা, আর Bengal Tenantry জানা আর এক কথা। এর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞ হয়ে আর একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব। আমার বিশ্বাস, বেশির ভাগ সহুরে উকীল মহোদয়েরা কৃষকের অবস্থা সবিশেষ অবগত নন। আর যাঁরা জানেন, তাঁরাও কৃষকের ব্যথার ব্যথী হ'তে পারেন, কিন্তু বিনে পয়সায় তার কথার কথক নন। বাঙলার উকীল-রাজ হচ্ছেন জমিদারের মিত্র-রাজ। এ entente cordiale-এর ভিতর যথেষ্ট অর্থ আছে। এঁরা যে একমাত্র জমিদারের অন্নে প্রতিপালিত, তা অবশ্য নয়। জমিদার ও রায়ত উভয়েই এঁদের মক্কেল ; এঁরা গাছেরও পাড়েন, তলারও কুড়োন। তবে তিল কুড়িয়ে তাল করার চাইতে গোটা তাল হাতে পাওয়া ঢের বেশি আরামের ও আহ্লাদের কথা। ফলে এঁদের লুব্ধদৃষ্টি উপরের দিকেই সহজে আকৃষ্ট হয়, তার পর আর নামে না। অথচ এই দলের লোকই হচ্ছেন আমাদের পলিটিক্সের ল্যাজা-মুড়ো দু-ই। পলিটিসিয়ানরা প্রজার হয়ে কোনোরূপ দাবী করতে প্রস্তুত নন, আমার এ বিশ্বাস যদি অমূলক হয়, তা হ'লে তার জন্য প্রধানত পলিটিসিয়ানরাই দায়ী। মডারেট, একষ্ট্রীমিষ্ট কোন দল থেকেই অদ্যাবধি কোনো প্রোগ্রাম বার হয় নি এবং তা বার করবার তাঁদের যে কোনোরূপ অভিপ্রায় আছে, তার কোনো আভাসও তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না।

শুনতে পাই যে, মডারেট দল জমিদারদের সঙ্গে সন্ধি করবার চেষ্টায় ফিরছেন। তাঁদের নাকি বিশ্বাস যে, নায়েব-গোমস্তার সাহায্যে তাঁরা প্রজার ভোট আদায় করতে পারবেন, উপরন্তু জেলার হাকিম ও পুলিশের co-operation-এর উপরও তাঁরা ভরসা রাখেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হ'লে তাঁদের অন্য প্রোগ্রামের কোনো প্রয়োজন নেই। "জোর যার ভোট তার" এই হচ্ছে তাঁদের প্রোগ্রাম।

এ বিষয়ে Extremist দলের মত জানবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সে চেষ্টায় কোনই ফল হয় নি। এ দলের দু-চারজন কর্ত্তাব্যক্তির সঙ্গে আমার এ বিষয়ে যে কথাবার্ত্তা হয়, তা প্রকাশ করবার অধিকার আমার নেই। মোটামুটি তাঁদের বক্তব্য এই যে, লাট দরবারে তাঁরা ঢুকলে বাঙলা দেশকে সেই দেশে

পরিণত করবেন, যে দেশে আমাদের মেয়েরা খোকা বাবুর বিয়ে দিতে চায়,—অর্থাৎ যে দেশে

"লোকে গাই বলদে চষে,
দাঁতে হীরে ঘষে,
রুই মাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে—"

এ সঙ্কল্প যে অতি সাধু, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু সন্দেহ আছে তার সিদ্ধির উপায় নিয়ে। স্বদেশকে "ধন-ধান্যে পুষ্পে ভরা" করে' তোলবার উপায় সম্বন্ধে এঁরা নীরব। এ ধরণের কথা আমাদের মুখেই শোভা পায়, কেননা, ছেলে-ভুলোনো ছড়া ভাল করে বাঁধতে ও কাটতে আমরাই পারি। কবিত্ব কবিতাতেই করা কর্ত্তব্য, ও জিনিস গন্থে খাপ খায় না। আর পলিটিক্সের তুল্য ঝুনো গদ্য এক আইন ছাড়া আর কিছু নেই। সে যাই হোক, এঁদের সঙ্গে কথোপকথনের ফলে আমার মনে এই সন্দেহ জন্মেছে যে, কি উপায়ে কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা যায়, সে বিষয়ে, হয় তাঁদের কোনো মত নেই, আর না হয় ত সে মত এখন তাঁরা প্রকাশ করতে চান না। সম্ভবত তাঁরা তাঁদের প্রোগ্রাম প্রকাশ করতে ইতস্তত করছেন এই ভয়ে যে, পাছে অপরে তা চুরি করে। সাহিত্যে ও পলিটিক্সে চোরাই-মালের কারবার যে রকম বেড়ে গেছে, তাতে এ ভয় অকারণ নয়। তবে এ বিষয়ে কথা তুললে তাঁরা যে রকম আসোয়াস্তি বোধ করেন ও বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাতে মনে হয়, তাঁরা একটু উভয় সঙ্কটে পড়েছেন। প্রজার উপকার করতে প্রস্তুত কিন্তু প্রজাকে কোনো অধিকার দিতে রাজি নন, এমন লোক সকল সমাজেই আছে। এই মনোভাবকেই না ব্যুরোক্রাটিক মনোভাব বলে? তবে এ কথাও ভোলা উচিত নয় যে, আমাদের ন্যাসনালিষ্টরা আপাতত বিদেশী বড় পলিটিক্স নিয়ে এতটা ব্যস্ত আছেন যে, স্বদেশী ছোট পলিটিক্সে মন দেবার তাঁদের একদম ফুরসৎ নেই। বড় পলিটিক্সের কারবার অবশ্য রাজারাজড়া নিয়ে। মানুষে যখন রাজা উজির মারতে বসে, তখন কি কত ধানে কত চাল হয়, তার ভাবনা সে ভাবতে পারে?

রায়তের প্রোগ্রাম

দেশের পলিটিসিয়ানরা যখন এ বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখাচ্ছেন, তখন যা হোক একটা এক-মেটে প্রোগ্রাম তৈরী করবার চেষ্টা করা যাক। যদি কেউ বলেন :—

"যার কর্ম্ম তার সাজে
অন্য লোকে লাঠি বাজে"—

তার উত্তর, রায়তের ভাবনা ভাবা বাঙালী সাহিত্যিকের পক্ষে যে অনধিকারচর্চ্চা নয়, এর ভাল ভাল নজির আছে। বাঙালীর মধ্যে যে শ্রেণীর লোকদের আমরা 'গুরু বলে' মান্য করি, তাঁরা সকলেই প্রজার ব্যথার ব্যথী এবং সে ব্যথা তাঁরা কথায় প্রকাশ করেছেন। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সবাই প্রজার হয়ে ওকালতী করেছেন। তাঁদের শিষ্যত্বই হচ্ছে এ বিষয়ে কথা কইবার আমার দ্বিতীয় দলিল।

তুমি আমি যখন বালক, সেই কালে, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার প্রজার অবস্থা বিচার করে' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, রায়তকে যে অবস্থায় আমরা রেখেছি, তার ফল ত্রিবিধ—

দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব

তিনি আরও বলেন যে—

"ঐ সকল ফল একবার উৎপন্ন হইলে ভারতবর্ষের ন্যায় দেশে প্রাকৃতিক নিয়মগুলি স্থায়িত্ব লাভ করিতে উন্মুখ হয়।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা যে কত সত্য, তার প্রমাণ, আজকের দিনেও বাঙলার রায়তের দল দরিদ্র মূর্খ ও দাস।

তারা যে মূর্খ, সে বিষয়ে ত আর কোন মতভেদ নেই। তার পর তারা আইনত না হলেও বস্তুত যে দাস,—"ক্রীতদাস না হলেও যে "গর্ভদাস"—এ কথা অস্বীকার করা কঠিন। জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজও তারা নিজের অধিকারের উপর দাঁড়াতে পারে না, প্রভুর অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অবশ্য ইংরাজের আইন তাদের অনেক অধিকার দিয়েছে, কিন্তু সে শুধু নামে। Tenancy Act আজকের দিনে জমিদারের হাতে সঙীন অস্ত্র। প্রজাকে হয়রাণ করতে চাও, নাজেহাল করতে চাও, জেরবার করতে চাও ত করো উচ্ছেদের মামলা, স্বত্বের মোকদ্দমা, জমাবৃদ্ধির নালিশ, ফসলক্রোকের দরখাস্ত, মায় ড্যামেজ বাকী-খাজনার নালিশ; আর তার ভিটেমাটি উচ্ছন্নে দিতে চাও ত কর তার নামে বাকী-পড়া ও খাস-দখলের নালিশ।

তবে যে প্রজা টিঁকে আছে, তার কারণ, বেশীর ভাগ জমিদার আইনের মার রায়তদের মারেন না, তা ছাড়া মুনসেফ বাবুরা জমিদারের দাখিলী কাগজ, তা সে জমারই হোক, সুমারেরই হোক, পারৎপক্ষে

প্রামাণ্য বলে' গ্রাহ্য করেন না। আর আমলা-ফয়লার এজাহার যে বিলকুল খেলাপ, এই হচ্ছে হাকিমের দৃঢ় ধারণা। এঁরা যে জমিদারের প্রতি সব সময় সুবিচার করেন, তা নয়, তবে প্রজা যে বেঁচে বর্ত্তে থাকে, সে মুন্সেফবাবু ও Settlement office-এর গুণে। সরকারের বেতনভোগী এই রাজ-কর্ম্মচারী-রাই হচ্ছেন বাঙলার রায়তদের যথার্থ রক্ষক, জমিদারের বিত্তভোগী-রাজনীতি-ব্যবসায়ী উকীল-মোক্তারেরা নন। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, প্রজার দাসত্ব আজও ঘোচে নি।

আর তার দারিদ্র্য যে কি ভীষণ, তা শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী ব্যারিষ্টার মহোদয়ের কথাতেই প্রকাশ। তিনি সেদিন Bengal Landholders-দের তরফ থেকে গভর্ণমেণ্টকে যে পত্র লিখেছেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি—

"Bengal, if not the whole of india. Bengal probably more so than the rest of India, is an agricultural community—seventy-seven per cent. of her population being agriculturists. It is an undeniable fact that seventy per cent. of the peasantry out of the seventy-seven per cent. of the whole population is so poor, that the income *per capita* is not more that a few rupees a year, and they go to bed every day without a square meal." (Statesman, 5th March, 1920.)

অস্য বাঙলা :—"বাঙলা যদ্যপি সমগ্র ভারতবর্ষ না হয়,—বাঙলা সম্ভবতঃ বাকী ভারতবর্ষের অধিক, হচ্ছে একটি কৃষিজীবী সম্প্রদায়,কারণ,তার অধিবাসীর মধ্যে শতকরা সাতাত্তর জন কৃষক। এ কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, কৃষকদের মধ্যে শতকরা সত্তর জন, যে কৃষকেরা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা সাতাত্তর, এতাদৃশ দরিদ্র যে মাথাপিছু বাৎসরিক আয় দু-চার টাকা মাত্র এবং তারা নিত্য পেট ভরে' না খেয়েই শুতে যায়।"—

চক্রবর্ত্তী-সাহেবের বক্তব্য আমি যতদূর সম্ভব কথায় কথায় অনুবাদ করেছি, তার উপর সাহিত্যিক হাত চালাই নি এই ভয়ে যে, পাছে কেউ বলে, আমি তার গায়ে রং চড়িয়েছি! বাঙলা দেশে শতকরা সত্তর জন লোক বারো মাস আধপেটা খেয়ে থাকে, স্বজাতির অবস্থা যে এতদূর সাংঘাতিক—এ জ্ঞান আমার ছিল না। দিনের পর দিন ও-অবস্থায় যারা শুতে যায়, তারা যে আবার বিছানা থেকে ওঠে, এইটেই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে এ কথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য, কেননা, তাঁর সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, চক্রবর্ত্তী-সাহেবের কখনো ঠিকে ভুল হয় না। বিশেষতঃ তিনি যখন জমিদারের পক্ষ থেকে প্রজার এই ভীষণ দারিদ্র্য কবুল করেছেন, তখন রায়তের পক্ষ থেকে তার প্রতিবাদ করা আহাম্মখি। আর আজ আমি প্রজার হয়ে ওকালতি করতে দাঁড়িয়েছি।

প্রজার দুর্দ্দশা সম্বন্ধে আর একটি কথা উল্লেখ করতে বঙ্কিমচন্দ্র ভুলে গিয়েছিলেন—সে হচ্ছে তার স্বাস্থ্যের কথা। সম্ভবতঃ সে যুগে ম্যালেরিয়া দেশকে তেমন আচ্ছন্ন করে' ফেলেনি। আজকের দিনে জনসাধারণের শরীরগতিক কি রকম, তার পরিচয় সরকারের তরফ থেকে বর্দ্ধমানের মহারাজাই দিয়েছেন। তাঁর কথা তাঁর ভাষায় এ স্থলে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি—

"Roughly speaking we may say that in each of these two years (1918-19) very nearly four per cent. of the population has died, and unfortunately the births have not entirely replaced this loss. The more regrettable thing about this appalling mortality is the fact that a large proportion is due to causes that are entirely preventable." (Statesman, March 6, 1920.)

অস্য বাঙ্গালা :—"মোটামুটি বল্‌তে গেলে, গত দুই বৎসরের প্রতি বৎসর বাঙলা দেশের লোকের মধ্যে শতকরা চার জনের মৃত্যু হয়েছে এবং দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যত মৃত্যু হয়েছে, তত জন্ম হয় নি। বিশেষ দুঃখের কথা এই যে, যে-সব কারণে লোকক্ষয় হচ্ছে, তার অধিকাংশই নিবার্য্য।"

এই ত গেল মৃত্যুর তালিকা; কিন্তু যারা বেঁচে থাকে, তার মধ্যেও অধিকাংশ লোক জ্বরজীর্ণ-জীবন্মৃত। আর বলা বাহুল্য যে, এই রোগের অত্যাচার বিশেষ করে' সহ্য করতে হয় আমাদের প্রজা-সাধারণকে। দারিদ্র্যের সঙ্গে রোগের যোগাযোগটা যে অতি ঘনিষ্ঠ, সে কথা উল্লেখ করবার কি আর কোনো দরকার আছে? যারা বারোমাস এক সন্ধ্যে আধপেটা খেয়ে শুতে যায়, তারা যে রোগ-শয্যায় শয়ন করলে সেখান থেকে আর ওঠে না, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি?

অতএব তোমাদের সেই প্রোগ্রাম খাড়া করতে

হবে,' যার বলে বাঙলার রায়ত মূর্খতা, দারিদ্র্য, দাসত্ব ও রোগের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে।

আমাদের সৌভাগ্য এই যে, বাঙলার না হোক, বেহারের প্রজাবর্গ পলিটিসিয়ানদের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেরাই স্বপক্ষের একটি প্রোগ্রাম খাড়া করেছে। সেই প্রোগ্রাম যদি সঙ্গত হয়, তা হ'লে তা আমাদের শিরোধার্য্য করে' নিতে হবে। এখন আমি সেই প্রোগ্রামের বিচার করতে প্রবৃত্ত হলুম।

প্রোগ্রামের পরিচয়

কিছুদিন আগে "ইংলিস্‌ম্যান" কাগজে হঠাৎ চোখে পড়ল যে, বেহারের রায়তেরা মজঃফরপুরে এক প্রকাণ্ড সভা করে' সকলে একমত হয়ে নিম্নলিখিত প্রস্তাব ক'টি পাশ করেছে।

প্রথম। দেশময় Compulsory Primary Education প্রচলিত হওয়া কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়। প্রতি চার মাইল অন্তর একটি করে' Charitable Dispensary থাকা চাই।

তৃতীয়। প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রেই সর্ব্বত্র আইনত হস্তান্তরযোগ্য বলে' গণ্য হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—উক্ত শ্রেণীর জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতেই প্রজার হস্তান্তর করবার অধিকার থাকবে।

চতুর্থ। নিজের দখলী জমির গাছ কাটবার অধিকার প্রজার থাকবে, অর্থাৎ—প্রজা সে গাছের স্বত্বাধিকারিস্বরূপে স্বীকৃত হবে।

পঞ্চম। প্রজা জমিদারের বিনা অনুমতিতে নিজের দখলী জমিতে পুকুর কাটাতে পারবে, কুয়ো খুঁড়তে পারবে, কোঠাবাড়ী তৈরী করতে পারবে।

ষষ্ঠ। প্রজার দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতের জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের অতঃপর আর থাকবে না। অর্থাৎ—দখলীস্বত্ববিশিষ্ট জোতমাত্রই আইনত মৌরসী-মোকররী বলে' গণ্য হবে।

প্রজাপক্ষের প্রথম দুটি দাবী যে ন্যায্য, সে বিষয়ে কোনরূপ মতভেদ নেই। লোকশিক্ষার বিস্তারের জন্য আজ বছর দশেক ধরে' সকল দলের পলিটিসিয়ানরা ত সমান চীৎকার করছেন; এবং গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদের কথায় বিশেষ কর্ণপাত করেন না বলে' আমরাও সরকার কর্ত্তব্যের অবহেলা করেছেন বলে' তার প্রতি নিত্য দোষারোপ করি। তার পর প্রজার রোগের প্রতীকার করাও যে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য, সে কথা গভর্ণমেণ্টও মানেন। মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টে প্রকাশ যে, আর পাঁচরকম জিনিসের মধ্যে—the provision of schools and dispensaries within reasonable distance,—these are the things that make all the difference to his life.—

সুতরাং দেখা গেল যে, প্রজাপক্ষ ও সরকারপক্ষ এ বিষয়ে একমত। জমিদারপক্ষও এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী নন। শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁর পূর্ব্বোক্ত পত্রে লিখেছেন যে, বাঙলার ভবিষ্যৎ গভর্ণমেণ্টকে এই দুই কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে পালন করতে হবে:—

1. Sanitation—involving, as it must, ways and means as to how she is to combat the scourges of malaria and cholera and other similiar scourges.

অস্যার্থ—"বাংলাদেশের স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করতে হবে, অর্থাৎ—ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করতে হবে।"

2. She will be further called upon to provide for the education of her children in the light of the recent University Commission Report.

অস্যার্থ—"নিজের সন্তানদের শিক্ষা দেবার দায় বাঙলার ঘাড়ে পড়বে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী লোকশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।"

বলা বাহুল্য যে, মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টে যা দু'কথায় বলা হয়েছে, জমিদারপক্ষ তাই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছেন। এ দু-মতের ভিতর কিন্তু একটু গরমিল আছে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট চায় ডিস্‌পেনসারি, আর জমিদারপক্ষ চান দেশের আব-হাওয়ার পরিবর্ত্তন। অবশ্য এ দু-ই আমাদের চাই। তবে সর্ব্বাগ্রে চাই রোগীকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা, সমগ্র দেশকে রোগমুক্ত করবার ব্যবস্থা পরে হবে। যদি আমরা হাতে হাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা না করি, তা হ'লে sanitation এর দৌলতে দেশকে যে দিন স্বর্গ করে' তুলব, সে দিন হয় ত দেখব যে, দেশে আর মানুষ নেই, সবারই ইতিমধ্যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়েছে।

মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে

যে, স্কুল, ডিস্‌পেন্‌সারি প্রভৃতি প্রজার, জীবনকে একদম বদলে দেয়, অর্থাৎ তার উন্নতিসাধন করে। শিক্ষা জিনিসটের প্রভাব শুধু জীবনের উপর নয়, মনের উপরও আছে। আজকের দিনে দেশের প্রজাসাধারণের মনের অবস্থা কি?

রাশিয়ার বিষয় একজন জার্ম্মান লেখকের বই সে দিন আমি পড়ছিলুম। রাশিয়ার একজন অগ্রগণ্য ব্যারিষ্টার উক্ত জার্ম্মান ভদ্রলোককে যা বলে-ছিলেন, তার গুটিকয়েক কথা এখানে অনুবাদ করে' দিচ্ছি।

—আমার দেশের লোক অবিচারে অভ্যস্ত। জনসাধারণের উপর অত্যাচার করা আর না করা বড়লোকের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরে' এই ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েছি, কাজেই আমরা সকল অন্যায় অত্যহিত অদৃষ্টের নিয়তি বলে' মেনে নিই। যে শিলাবৃষ্টি তাদের শস্য নষ্ট করে এবং উপরওয়ালার যে অত্যাচারে তারা বঞ্চিত ও পীড়িত হয়, রাশিয়ার কৃষকদের কাছে এ দুয়ের ভিতর কোন তফাৎ নেই, দু-ই একজাতীয় ঘটনা (Hugo Ganz—Le Debacle Russe).

আমি জিজ্ঞেস করি যে, আমাদের কৃষকদের মনোভাবের সঙ্গে রাশিয়ান কৃষকদের মনোভাবের কোন তফাৎ আছে কি? এরা উভয়েই কি একজাত নয়? একেই বলে 'দাস' মনো-ভাব। আর আমার মতে মনের দাসত্বই হচ্ছে সবচেয়ে সর্ব্বনেশে দাসত্ব। শিক্ষার একটি প্রধান গুণ এই যে, তার প্রসাদে মানুষ মনেও মানুষ হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়। নিজের দাসত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়াই, মুক্তিলাভের প্রথম সোপান। অজ্ঞ-তার সঙ্গে মনের দাসত্বের যোগ অতি ঘনিষ্ঠ। মুক্তির পথ যে জ্ঞানমার্গ, এ সত্য বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয়েছিল, সুতরাং গ্রামে গ্রামে স্কুল বসালে আশা করা যেতে পারে যে, আমা-দের প্রজাসাধারণের মনের আব-হাওয়া বদলে যাবে। শিক্ষা জিনিসটে আসলে মনের sanitation বই আর কিছুই নয়। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টে রায়তের সম্বন্ধে বলা হয়েছে :—

"His mind has been made up for him by his landlord or his banker or his priest or his relatives or the nearest official"—

অর্থাৎ—রায়তের মন হয়, তার জমিদার নয় তার মহাজন, হয় তার পুরুত নয় তার আত্মীয়-স্বজন, আর না হয় ত হাতের গোড়ায় যে রাজপুরুষ থাকেন, তিনি গড়ে' তোলেন।

আশা করা যায়, শিক্ষা পেলে রায়তদেরও নিজের মন বলে' একটা জিনিস জন্মাবে।

দেখা গেল যে, রায়তদের শিক্ষার দাবী ও স্বাস্থ্যের দাবী সকলেই মঞ্জুর করেন, কিন্তু তাদের স্বত্বের দাবীর কথা কাণে ঢোকবামাত্র চমকে ওঠেন, এমন লোকের এ দেশে অভাব নেই। শুধু তাই নয়, এঁদের মধ্যে অনেকে আবার, প্রজার পক্ষ যাঁরা সমর্থন করতে উদ্যত হন, তাঁদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উপর নানারূপ দোষারোপ করতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা করেন না। যে প্রজার অধিকারের কথা তোলে, কারো মতে সে Bolshevik, কারো মতে সে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শত্রু, আবার কারও মতে বা সে এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর এক সম্প্র-দায়ের মারামারি কাটাকাটির পক্ষপাতী।

এঁরা যদি একটু ভেবে দেখেন, তা হ'লেই দেখতে পাবেন যে, এ-সকল অপবাদ কতদূর অমূলক। প্রথমত Bolshevik জন্তুটি যে কি, তা তাঁরাও জানেন না, আমরাও জানি নে। জুজুর ভয় ভদ্রলোকের পক্ষে অপরকে দেখানোও যেমন অনু-চিত, নিজে পাওয়াও তেমনি ছেলেমি।

দ্বিতীয়ত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলে দেবার প্রস্তাব করা আমাদের পক্ষে মূর্খতা হবে। কেননা, উক্ত বন্দোবস্তে প্রজার কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষতি হচ্ছে State-এর। সমস্ত বাঙলা কাল সরকারের খাসমহল হলে প্রজার দেয় খাজনা কমবার কোনই সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রজার তরফ থেকে সে প্রার্থনা কেউ করবে না।

তৃতীয়ত। নতুন অধিকারের দাবী যে-কেউ করে, তার বিরুদ্ধে সকল দেশে চিরকালই ঐ ঘর-ভাঙানোর মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়। এ স্থলে কথাটা একটু ব্যক্তিগত হ'লেও আমি তা বলতে বাধ্য। বাঙলার জমিদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোনরূপ কু-সংস্কার আমার নেই এবং থাকতে পারে না। আমার মন স্বতই এঁদের প্রতি অনুকূল, কেননা, আমার আত্মীয়-স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্ব সবাই জমিদার,—কেউ বড়, কেউ ছোট, কেউ মাঝারি। আমি জন্মাবধি এই জমিদারের আবহাওয়াতেই বাস করে' আসছি। সুতরাং সে সম্প্রদায় আমার যতটা অন্তরঙ্গ, অপর কোনো সম্প্রদায় ততটা নয়। জমিদারের উপর বঙ্কিমচন্দ্র যে আক্রমণ করেছিলেন, সে আক্রমণ

করতে আমি অপারগ, কেননা, আমি জানি যে, সে আক্রমণ অন্যায়। ভালমন্দ লোক সকল সম্প্রদায়েই আছে; কিন্তু এ কথা জোর করে' বলতে পারা যায় যে, সাধারণত জমিদারের দল অর্থলোভী নয়। জমিদার আর যাই হোক, মহাজন নন। আয় বাড়ানোর চাইতে—ব্যয় বাড়ানোর দিকেই এ সম্প্রদায়ের ঝোঁক বেশি। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, প্রজার স্বত্বের দাবী মঞ্জুর করতে জমিদারমাত্রেই নারাজ হবেন না। হয় ত দু-দিন পরে দেখা যাবে যে, জমিদারেরাই প্রজার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

রায়তের প্রোগ্রামের বাকী ক'টি দাবী যদি গ্রাহ্য হয় ত আমার বিশ্বাস, তার দারিদ্র্যের কিঞ্চিৎ উপশম হতে পারে। অতএব দাবীগুলির পর পর বিচার করা যাক।

দখলীসত্ববিশিষ্ট জোত হস্তান্তরযোগ্য কিম্বা নয়, এ প্রশ্নের উত্তরে আইন এখন প্রথার দোহাই দেয়। আইনের কথা হচ্ছে যে, যে জেলায় উক্ত জোত হস্তান্তর করবার প্রথা আছে, সে জেলায় সে জোত জমিদারের বিনা অনুমতিতে রায়ত হস্তান্তর করতে পারে; আর যে জেলায় সেরূপ প্রথা নেই, সে স্থলে তার দান, বিক্রয় জমিদার ইচ্ছে করলে গ্রাহ্য করতে পারেন, ইচ্ছে করলে অগ্রাহ্য করতে পারেন।

কিন্তু আসলে ঘটনা কি জানো?—ও জোত সমগ্র বাঙলায় নিত্য নিয়মিত হস্তান্তরিত হচ্ছে এবং জমিদারও তা হাসিমুখে মেনে নিচ্ছেন, কেননা, তাতে তাঁর লাভ আছে। তবে জমিদার যে প্রথার দোহাই দেন, সে শুধু দাখিল-খারিজের একটা মোটা-রকম সেলামি আদায় করবার জন্য। কোথাও বা জোতের খরিদা মূল্যের চৌথ আদায় করা হয়, কোথাও বা জমার পাঁচ থেকে দশগুণ পণ। এ বিষয়ে কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই, যাঁর যে-রকম প্রবৃত্তি ও শক্তি, তিনি এই সুযোগে প্রজাকে সেই অনুসারে দুইয়ে নেন। যে সম্প্রদায়ের সাতাত্তর জনের মধ্যে সত্তরজন বারোমাসে একদিনও পেট ভরে' খেতে পায় না, তাদের এরূপ দোহন করা যে অত্যাচার, এ কথা যার শরীরে মানুষের রক্ত আছে, সে কখনই অস্বীকার করতে পারবে না। তা ছাড়া এই দাখিল-খারিজের জন্য প্রজাকে যে কি পর্য্যন্ত হয়রান-পরিশান করা যায় ও করা হয়, তা জমিদারী সেরেস্তার সঙ্গে যাঁর কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, তিনিই জানেন। দাখিল-খারিজের প্রার্থীদের জমিদারের কাছারীতে যাতায়াত করতে করতে পায়ের নাড়ী ছিঁড়ে যায়। জোতখরিদ্দারের পক্ষে জমিদারের সেরেস্তায় নামপত্তন করার চাইতে বিয়ে করা কম কথায় হয়, যদিচ, বিয়ের জন্য লাখ কথা চাই! এ অবস্থায় বেচারার কাছ থেকে নায়েব গোমস্তা জমানবীশ সুমারনবীশ পাইক বরকন্দাজ, যে পারে সেই মোচড় দিয়ে দু পয়সা আদায় করে' নেয়। সুতরাং তার এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাবার প্রস্তাব করলে আশা করি, Bolshevism-এর পরিচয় দেওয়া হয় না।

আমার এ কথা শুনে হঠাৎ প্রজাহিতৈষীর দল কি জবাব দেবেন, তা জানি। তাঁরা বলবেন যে, প্রজার ভালর জন্যই তাকে জোত হস্তান্তর করবার অধিকারে বঞ্চিত করা কর্ত্তব্য। নচেৎ বাঙলার জমি দেনার দায়ে মহাজনের হাতে চলে' যাবে, ও বাঙলার কৃষক ভূমিশূন্য হয়ে পড়বে। এ আপত্তির বিচার বারান্তরে করব। এখন আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, জোত যখন দুবেলা কেনাবেচা হচ্ছে, তখন জমীদারের জরিমানার দায় থেকে প্রজাকে অব্যাহতি দেওয়া কর্ত্তব্য। কৃষকের জোত অ-কৃষকে কিনতে পারবে কি না, এ সমস্যার সঙ্গে জমিদারের লাভালাভের কোনই সম্পর্ক নেই, সম্পর্ক আছে রাষ্ট্রের সঙ্গে।

তার পর নিজের জোতের গাছ কাটবার অধিকার। যার নিজের বোনা শস্য কাটবার অধিকার আছে, তার নিজের পোঁতা-গাছ কাটবার অধিকার যে কেন থাকবে না, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু এ কথা বলতে গেলেই আইনের তর্ক উঠবে।—উকীল বাবুরা আমাদের Transfer of Property Act পড়ে' স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির প্রভেদটা শিখে নিতে বলবেন। কিন্তু তার উত্তরে আমি বলব যে, বাঙলার রায়তকে যদি মানুষ করতে চাও ত property সম্বন্ধে অনেক পুথিগত বিদ্যে ভুলতে হবে। কায়ক্লেশে বেঁচে থাকবার জন্যেও আমকাঁটালের তক্তার প্রয়োজন আছে—শোবার তক্তাপোষের জন্যে, দুয়োরের কপাটের জন্যে, চালের খুঁটির জন্যে; আর যদি বলো যে, তাদের বেঁচে থাকবার কোনো অধিকার নেই, তা হ'লেও তাদের কাঠের দরকার আছে—ম'লে পোড়াবার জন্যে। যেমন মুসলমান প্রজার সাড়ে তিন হাত জমিতে অধিকার আছে—তার গর্ভে অনন্ত শয্যায় শয়ন করবার জন্যে। সুতরাং গাছ কাটাটা এমন কিছু অপরাধ নয়, যার জন্যে তাকে দণ্ড দিতে হবে। তার দারিদ্র্যের

কথাটা স্মরণ করলে এ জরিমানার দায় হ'তে তাকে মুক্তি দেওয়াটা কি অধর্ম্ম ?

তার পর আসে কূয়ো খোঁড়বার, কোঠাবাড়ী তৈরী করবার অধিকার। এ সম্বন্ধে আইনের কথা হচ্চে একটা বেজায় রহস্য। আইনের বলে যাতে জোতের উন্নতি হয়, তা করবার অধিকার প্রজার আছে; এবং জোতের উন্নতি কাকে বলে, সে সম্বন্ধে অনেক আইনের তর্ক ও দেদার নজির আছে। Bench এবং Bar-এর এই সব চুলচেরা তর্ক, সূক্ষ্ম বিচারের গুণে এ বিষয়ে আইন ক্রমে সরু হ'তে হ'তে শেষটা লূতাতন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এ মামলায় প্রজার শুধু দোকর দণ্ড দিতে হয়, একবার উকীলের কাছে, আর একবার জমিদারের কাছে। নিজের পয়সায় প্রজা কোঠাবাড়ী তৈরী করলে তার বিরুদ্ধে উচ্ছেদের নালিশ চলে। বাস্তু পাকা করতে চেষ্টা করলে প্রজাকে যে ভিটে থেকে উচ্ছন্ন হ'তে হবে, এর চাইতে আর অদ্ভুত ব্যবস্থা কি হ'তে পারে ? তবে ভরসার কথা এইটুকু যে, আদালতে বোনা আইনের মাকড়সার জালে বাঁধা পড়ে কীট, মানুষ নয়। আর আমরা চাই বাঙলার প্রজা অতঃপর আর কীট হয়ে থাকবে না, সব মানুষ হয়ে উঠবে।

প্রজার শেষ দাবী এই যে, তার জোত মৌরসী ও মোকররি হবে। অর্থাৎ—অতঃপর জমাবৃদ্ধির অধিকার জমিদারের আর থাকবে না। আমার মতে Record of Rights প্রজার জমি অনুসারে যে জমা ধার্য্য করে' দেয়, সেই জমাই আইনত চিরস্থায়ী হওয়া কর্ত্তব্য। অর্থাৎ—যতদিন State-এর সঙ্গে জমিদারের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে, ততদিন জমিদারের সঙ্গেও রায়তের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাহাল থাকবে। এ দাবী অপূর্ব্বও নয়, অদ্ভুতও নয়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় বিলাতে পার্লেমেন্টরি কমিশনের সুমুখে যখন সাক্ষ্য দেন, তখন তিনি প্রজার হিতকল্পে এই দাবী উপস্থিত করেছিলেন। বাঙলা দেশের এই অদ্বিতীয় মহাপুরুষের বাক্য আমার শিরোধার্য্য, তাঁর সেই সাক্ষ্যের রিপোর্ট পড়ে' দেখলেই বুঝতে পারবে যে, পলিটিক্স সম্বন্ধেও তাঁর দিব্যদৃষ্টি ছিল। তার পর আমার মতের স্বপক্ষে শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কথা আবার উদ্ধৃত করতে বাধ্য হলুম। তিনি গভর্ণমেণ্টকে লিখেছেন যে :—

"It would be inquitous to think of taxing a population so poor as this, and my Committee venture to enter an emphatic protest against any idea of further taxation."

অস্য বাঙলা :—"এরূপ দরিদ্র সম্প্রদায়ের উপর টেক্স বসানোর চিন্তাও পাপকার্য্য হবে এবং আমার কমিটি এ স্থলে আবার নূতন কোনো টেক্স বসানোর বিরুদ্ধে তাদের ঘোর আপত্তি জোরগলায় জানিয়ে রাখতে সাহসী হচ্ছে।"—

উপরিউক্ত কথা ক'টির মধ্যে "টেক্স" কথাটি বদলে তার জায়গায় "খাজনা" বসিয়ে দিলে, আমার বক্তব্যের একটা জোরালো সংস্করণ পাবে। টেক্স অবশ্য State আদায় করে আর খাজনা জমিদার, অর্থাৎ—প্রথম ক্ষেত্রে সমগ্রজাতি আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষ। সুতরাং যে-টাকা জাতীয় কার্য্যে ব্যয় করবার জন্য জাতির পক্ষে আদায় করা পাপকার্য্য, সেই টাকা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নিজের ব্যয়ের জন্য আদায় করা যে কি-হিসেবে পুণ্যকার্য্য, তা বোঝবার মত সূক্ষ্ম ধর্ম্ম-জ্ঞান আমার নেই।

আমি জানি, এর উত্তরে পলিটিসিয়ানরা কি বলবেন। তাঁরা বলবেন যে, বর্ত্তমান State ত জাতীয় নয়, ও হচ্চে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট, অতএব এ ক্ষেত্রে State-এর স্বার্থ ও জাতীয় স্বার্থ এক নয়। তথাস্তু। কিন্তু নূতন টেক্সের বিরুদ্ধে চক্রবর্ত্তী সাহেবপ্রমুখ জমিদারবর্গের জোরগলায় ঘোর প্রতিবাদের কারণ দর্শানো হয়েছে—রায়তের দারিদ্র্য। রায়ত যদি নূতন টেক্সের চাপ আর তিলমাত্রও সইতে না পারে, তা হ'লে জমাবৃদ্ধির চাপই যে সে কি করে' সইতে পারবে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। তবে আমি বুঝতে পারি নে ব'লে যে পলিটিসিয়ানরা বুঝতে পারেন না, তা অবশ্য হ'তেই পারে না। সুতরাং জমিদার-কর্ত্তৃক হত-দরিদ্র প্রজার উপর জমাবৃদ্ধির চাপ দেবার কি সব পেট্রিয়টিক এবং ন্যাশনলিষ্ট ওরফে "স্বদেশী" ও "স্বরাজী" যুক্তি আছে, তা শোনবার জন্যে উৎসুক হয়ে রইলুম।

আপাতত দেখতে পাচ্ছি যে, যেখানে নিজেদের স্বার্থে আঘাত লাগে, সেখানে প্রজার স্বার্থের কথা শুনলে আমাদের পলিটিসিয়ানদের 'পেট্রিয়টিক' জ্বর ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়। দেশের যাঁরা ভাল চান, তাঁদের পক্ষে রায়তদের উপরিউক্ত দাবী ক'টি প্রসন্নমনে গ্রাহ্য করে' নেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথমত, এ ক'টি অধিকারে তারা অধিকারী হ'লে, তাদের দারিদ্র্যের

কিঞ্চিৎ লাঘব হবে; দ্বিতীয়ত, তারা তাদের দাসত্ব হ'তে মুক্তিলাভ করবে। একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার বলে তাদের 'দাস'বুদ্ধি দূর করা যাবে বা সেই শিক্ষার সঙ্গে চাই তাদের অবস্থারও উন্নতি ঘটানো।

পূর্ব্বে যে রাশিয়ান ব্যারিষ্টারের উক্তি উদ্ধৃত করে' দিয়েছি, তিনিই তাঁর জর্ম্মান অতিথিকে আর যে একটি কথা বলেছিলেন, সেটি এখানে তুলে দেবার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। সে কথা এই:—

"আমাদের জনসাধারণের মধ্যে সব চাইতে কিসের বিশেষ অভাব আছে জানেন?—স্বাধিকারের জ্ঞান। মনস্তত্ত্ববিদেরা জানেন যে, স্বত্বের জ্ঞান থেকেই মানুষের অধিকারের জ্ঞান জন্মায়। আপনি বোধ হয় জানেন না যে, এ দেশের কৃষকদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের জমি তার নিজস্ব সম্পত্তি।"

বাঙলার প্রজা যদি জমি হস্তান্তর করবার, গাছ কাটবার, কোঠাবাড়ী করবার, কুয়ো খোঁড়বার অধিকার পায় এবং সেই সঙ্গে তার জোত মৌরসী-মোকররি হয়, তা হ'লে সে ইংরাজিতে যাকে বলে peasant proprietor, তাই হয়ে উঠবে। প্রজা জমির মালিক হয়ে উঠলে, জাতির শক্তি ও দেশের ঐশ্বর্য্য যে কতদূর বেড়ে যায়, তার জাজ্বল্যমান উদাহরণ—বর্ত্তমান ফ্রান্স। আর প্রজাকে স্বত্বহীন ও দরিদ্র করে' রাখলে তার ফল যে কি হয়, তারও জাজ্বল্যমান উদাহরণ বর্ত্তমান রাশিয়া। যাঁরা Bolshevism-এর ভয়ে কাতর, তাঁদের অনুরোধ করি যে, তাঁরা বাঙলার রায়তকে বাঙলার peasant proprietor করবার জন্য তৎপর হোন। যে রকম দিনকাল পড়েছে, তাতে করে' মানুষকে আর দাস ও দরিদ্র করে' রাখা চলবে না। প্রজাকে এ সব অধিকার আমরা যদি আজ দিতে প্রস্তুত না হই, ত কাল তারা তা নিতে প্রস্তুত হবে। পৃথিবীর লোকের এখন মাথার ঠিক নেই, তার উপর তাদের ঐহিক সুখের পিপাসা অত্যধিক বেড়ে গিয়েছে। আবালবৃদ্ধবনিতা আপামরসাধারণ সবাই আজ রাতারাতি বড়মানুষ হ'তে চায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

প্রজার এক নম্বর ও দু'নম্বর দাবী আমরা যে মুখে অত সহজে মেনে নিই, তার কারণ, আমরা জানি, কাজে তা পূরণ করতে হবে না; কেননা, তা করা এত কঠিন যে, একরকম অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। দেশযোড়া রোগ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে যে টাকার দরকার, সরকারের তহবিলে তার সিকির সিকিও নেই এবং এই অতিরিক্ত টাকা যে কোথা থেকে আসবে, তার সন্ধান আমরা আজও পাই নি। আয়বৃদ্ধি না করে' অবশ্য ব্যয়বৃদ্ধি করা চলে না, আর সরকারী তহবিলের আমদানির মুখ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরদিনের মত বন্ধ করে' রেখেছে। সুতরাং ধরে' নেওয়া যেতে পারে যে, জনসাধারণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মামলাটা এখন মুলতুবি থাকবে। কতদিনের জন্য বলা কঠিন, কেননা, আজকের দিনে ও মামলার তারিখ ফেলতে কেউ রাজি হবেন না। ইতিমধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-বিধানের যে সব অকিঞ্চিৎকর ও লোক-দেখানো বন্দোবস্ত করা হবে, তাতে করে' দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের কোনই সুসার হবে না—মধ্যে থেকে কতকগুলো টাকা শুধু জলে ফেলা হবে।

অপর পক্ষে প্রজার অপর দাবীগুলি আমাদের পার্লামেণ্ট বসবামাত্র আমরা একদিনে পূরণ করে' দিতে পারি। Tenancy Act-এর গুটিকয়েক ধারা বদলালেই কার্য্য উদ্ধার হয়ে যায়। প্রথমত এতে কোনো খরচা নেই, দ্বিতীয়ত ব্যুরোক্রাসি এতে বাদ সাধবে না।

তবে বর্ত্তমান Tenancy Act-এর উপর হস্তক্ষেপ করবার প্রস্তাব করলেই অমনি চারিদিক থেকে চীৎকার উঠবে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। এমন কথাও শুনতে পাব যে, ও কার্য্য করাও যা, আর ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করাও তাই। জানই ত আজকাল ধর্ম্ম শব্দের মানে বদলে গেছে। আগে ধর্ম্ম বলতে লোকে বুঝত সেই বস্তু, যার সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক আছে, যার উপরে লোকের পারলৌকিক ভয়-ভরসা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজকাল ধর্ম্মের মানে হয়েছে temporal, অর্থাৎ—সাংসারিক ব্যাপার। এতে আশ্চর্য্য হবার কোনো কারণ নেই, কেননা, যে কালে পলিটিক্স হয়ে উঠেছে ধর্ম্ম, সে কালে ধর্ম্ম অবশ্য পলিটিক্স হ'তে বাধ্য। অতএব এখানে বলা দরকার যে, প্রজার দাবী অনুযায়ী Tenancy Act-এর বদল করলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না। কি করা হবে জানো?—চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কানুনে সরকার প্রজাকে যে কথা দিয়েছিলেন এবং যে কথা আজ পর্য্যন্ত খেলাপই করা হয়েছে, শুধু সেই কথা রাখা হবে,—এর বেশি কিছুই নয়।

গড়া বাধল। কেননা, ধরা পড়ে' গেল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে এই ইজারাদারেরা স্বয়ং Hastings সাহেব এবং অন্যান্য ইংরাজ কর্ম্মচারীদের বেনামদার বই আর কেউ নয়। এই সুযোগে Hastings সাহেবের পরম শত্রু Francis সাহেব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং কোম্পানীর বিলেতী ডিরেক্টারদের সে প্রস্তাবে সম্মত করেন। কিন্তু ডিরেক্টার মহোদয়দের এ বিষয়ে যা হোক্ একটা মনস্থির করতে আরো দশ বৎসর কেটে গেল। অতঃপর অনেক বলা-কওয়া, অনেক লেখালিখির পর তাঁদের আদেশ-উপদেশ মতই, ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত করা হ'ল। এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গোড়াপত্তন। অর্থাৎ—যে বৎসর ফ্রান্সের প্রজার peasant proprietorship-এর সূত্রপাত হ'ল, সেই বৎসরই বাঙলার প্রজা জমির উপর তার সকল স্বত্ব হারাতে বস্‌ল।

এ ক্ষেত্রে চারিটি সমস্যা ওঠে :—

(১) বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করা হবে—প্রজার সঙ্গে, না জমিদারের সঙ্গে?

(২) জমিদার বলতে কি বোঝায়—ভূম্যধিকারী, না সরকারের টেক্স কালেক্টার?

(৩) যদি জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা হয়, তা হ'লে সে বন্দোবস্ত মেয়াদী না মৌরসী করা হবে?

(৪) জমিদারকে যদি মৌরসী পাট্টা দেওয়া হয়, তা হ'লে তার দেওয়া মালখাজনা চিরদিনের মত নির্দ্ধারিত ও স্থায়ী করে' দেওয়া হবে কি না?

এই সমস্যার মীমাংসা করা হ'ল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এবং তার কারণ এই যে, কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিদের মতে তা করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না কেননা, কোম্পানীর গভর্ণমেণ্ট হচ্ছে বিদেশী গভর্ণমেণ্ট।

কি সব তদন্তের পর, কি যুক্তি অনুসারে জমিদারের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা স্থির হ'ল, তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ Fifth Report-এ দেখতে পাবে। এ স্থলে আমি সকল যুক্তিতর্ক বাদ দিয়ে Sir John Shore-প্রমুখ কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মচারীরা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, তারই উল্লেখ করছি।

প্রথম। জমি রায়তের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা অসম্ভব। এ দেশে জমিজমার হিসেব এত জটিল যে, ইংরাজ কর্ম্মচারীদের পক্ষে তা আয়ত্ত করা অসম্ভব, বিশেষত তাঁরা যখন বাংলা ভাষা জানেন না। এ ক্ষেত্রে হস্তবুদ তৈরী করবার, খাজনা আদায় করবার, বাকী-বকেয়ার হিসাবকিতাব রাখবার ভার দেশী আমলাদেরই হাতে থাকবে। তারা যা খুসী তাই করবে, তহবিল তছরূপ করবে, রাজা প্রজা দু দলকেই ফাঁকি দেবে। এবং ইংরাজ কালেক্টররা তার কোনো প্রতীকার করতে পারবেন না। কারণ, এই দেশী তহশিলদারদের কাছ থেকে হিসেবনিকেশ বুঝে নেবার মত শিক্ষা ও জ্ঞান ইংরাজ কালেক্টরের নেই। অতএব খাজনা যদি নিয়মমত ও নিয়মিত আদায় করতে হয়, তা হ'লে জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করাই শ্রেয়।

দ্বিতীয়। জমিদার ভূম্যধিকারী কিংবা টেক্স-কালেক্টর, তা বলা অসম্ভব; কেননা, ownership বলতে ইংরাজ যা বোঝে, এ দেশের লোকে তা বোঝে না। আমরা সবাই জানি Austin-এর ভাষায় স্বত্বের অর্থ হচ্ছে :—

"A right over a determinate thing indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition and unlimited in point of duration."

জমির উপর যে তাদের উক্তরূপ স্বত্ব আছে, এ কথা সেকালে কোনো জমিদারও দাবী করেন নি। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, রায়তকে তাঁরা উচ্ছেদ করতে পারতেন না, রায়তি জমি খাস করতে পারতেন না এবং বাঙলার নবাব ও দিল্লীর বাদশাহ——এঁদের ভিতর যাঁর খুসি, তিনিই যখন তখন জমিদারের গালে চড় মেরে তাঁর জমিদারী কেড়ে নিতে পারতেন। যেমন জাফর খাঁ ওরফে মুরশিদকুলি খাঁ কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙলার প্রাচীন ভূম্যধিকারীদের নির্ব্বংশ করে' নতুন জমিদারের দল সৃষ্টি করেছিলেন।

এ অবস্থায় কোম্পানীর কর্ত্তাব্যক্তিরা স্থির করলেন যে, জমিদারেরা যদি ভূম্যধিকারী নাও হয়, ত আইনত তাঁদের তা হ'তে হবে। তাঁদের ধারণা ছিল যে, সভ্যদেশে জমিদারের সঙ্গে প্রজার সেই সম্বন্ধ থাকা উচিত, সে যুগে English landlord-দের সঙ্গে Irish tenant-দের যে সম্বন্ধ ছিল। এ স্থলে Sir John Shore-এর মত উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি :—

"The most cursory observation shows the situation of things in this country to be singularly confused. The relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar, is neither

that of a proprietor nor of a vassal; but a compound of both. The former performs acts of authority, unconnected with proprietary right—the latter has rights without real property. Much time will, I fear, elapse before we can establish a system, perfectly consistent in all its parts, and before we can reduce the compound relation of a zemindar to government, and of a ryot to a zemindar to the simple principles of landlord and tenant." (Fifth Report, Vol, II, p. 520,)

এই উদ্ধৃত বাক্য ক'টির বাঙলায় অনুবাদ করবার সাধ্য আমার নেই। কেননা, কি বাঙলা, কি সংস্কৃত, এ দুই ভাষাতে এমন কোনো শব্দ নেই—যা ইংরাজি real property-র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আমাদের ভাষায় ও শব্দ নেই, কেননা, আমাদের দেশে ও-আপদ কস্মিন্‌কালেও ছিল না।

Shore সাহেবের কথাই প্রমাণ যে, এ দেশে জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্বন্ধ তাঁর কাছে বড়ই গোলমেলে ঠেকেছিল। কাজেই যা গোল, তাকে তিনি চৌকোণ করতে প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি অবশ্য এ পরিবর্ত্তন রয়ে-বসে করতে চেয়েছিলেন। Lord Cornwallis-এর কিন্তু আর তর সইল না। তিনি আইনের ঠুকঠাকের বদলে একঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে' বসলেন। ফলে বাঙলার প্রজা বাঙলার জমির উপর তার চিরকেলে স্বত্ব-স্বামিত্ব সব হারালে, আর রাতারাতি বাঙলার জমির নিরূঢ় ... নামক আর এক শ্রেণীর লোক

...wallis যদি অত তাড়াহুড়ো করে' ...ও না করে, বসতেন, তা হ'লে রায়তের ...proprietorship নষ্ট হ'ত না। কারণ, ...র যে সম্বন্ধ সেকালের ইংরাজদের বুদ্ধির ...ছিল, কালক্রমে তার মর্ম্ম তাঁরা উদ্ধার করতে ...হয়েছেন। আজ প্রায় দেড়শ' বৎসর ধরে' চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে অভ্যস্ত হয়ে আমাদেরও মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, রায়তের আর যাই থাক, জমির উপর কোনরূপ মালিকীস্বত্ব নেই এবং পূর্ব্বেও ছিল না। লোকের এই ভুল ভাঙানো দরকার। তাই এ স্থলে ভারতবর্ষের জমিজমার বিষয় একজন বিশেষজ্ঞ ইংরাজের কথা নিয়ে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি:—

'It is well-known that in the only place where the "Laws of Manu' allude to a right in land, the title is an individual one, is attributed to the natural source—sti... universally acknowledged throughout In... that a man was the first to remove ... stumps and prepare the land for the pl... At the same time we see, from very ... times, how the grain-produce of ... allotment is not all taken by the own... the land, but part of it is taken by the o... of the land, and part of it is by ... tom assigned to this or that recipient ... is not, observe, that the land allotment is not completely separated, but when ... crop is reaped, the owner (as we may ... him) at once recognised that, out o... grain-heap at the threshing-floor, not ... the great Chief or Raja, and his imme... headman, but a variety of other villagers ... customary rights to certain shares—if only sometimes a few double-handfuls ... other small measure. All this seem... spring from the sense of co-operation (... ever indirect) in the work of settlement ... made the holding possible. It seem... me quite clear that a sense of indivi... 'property' may arise coincidently with a s... of a certain right in others to hav... share of the produce (on the gr... of co-operation) and the two are ... felt to conflict. (Baden Powell—Vil... Community, pp. 130-31.

কষ্ট করে' এর বাঙলা করবার কোনই প্রয়ো... নেই। কেননা, বিলেতি আইন চর্চ্চা করে' য... মন ও মত Sir John Shore-এর অনুরূপ... উঠেছে, সে আইনের নজির যাঁদের নজরবন্দী ক... তাঁদের দৃষ্টির জন্যই Baden Powell সাহে... মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা গেল। আশা করি, তাঁদের চোখ ফুটবে।

যে চষে, জমি তার এবং সে জমির উ... ফসলে প্রথম রাজার, তার পর আর পাঁচ জ... যথা—গ্রামের মণ্ডল ধোপা নাপিত কুমোর ক... প্রভৃতিরও—ভাগ বসাবার অধিকার আ... এই হচ্ছে Baden Powell সাহেবের ... কথা। আর এই ছিল ভারতবর্ষের সন... প্রথা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরাজ-রাজ যখন বিদেশীরাজ, তখন দেশে এমন একটি দলের সৃষ্টি করা আবশ্যক, যাদের স্বার্থ ইংরাজরাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু, আপদে বিপদে এই দল ইংরাজরাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।

তৃতীয়। জমিদারকে যখন জমির মালিক সাব্যস্ত করা হ'ল, বলা বাহুল্য, তখন সে মালিকী স্বত্ব চিরস্থায়ী বলে' স্বীকৃত হ'ল। যে স্বত্ব unlimited in point of duration নয়, সে স্বত্ব ইংরাজের মতে আইনত মালিকীস্বত্ব হতেই পারে না।

চতুর্থ। তার পর জমিদারের দেয় রাজস্বের পরিমাণ চিরদিনের মত ধার্য্য করে' দেবার প্রস্তাব Francis সাহেব প্রথমে উত্থাপন করেন। তাঁর কথা এই যে, কোম্পানী বাহাদুর বাঙলা থেকে যে রাজস্ব আদায় করবার অধিকারী, তা "not a tribute imposed on a conquered people, but its land revenue."

মনে রেখো যে, এ সময়ে জন্ কোম্পানী রাজা হিসেবে নয়, দিল্লীর বাদশার দেওয়ান হিসেবেই ভূমি-কর আদায় করবার অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ অবস্থায় আদায়ী সেরেস্তার ব্যয়সংকুলান করবার জন্য যে পরিমাণ টাকা আদায় করা আবশ্যক, তার অতিরিক্ত টাকা আদায় করা Francis সাহেবের মতে যুগপৎ অন্যায় ও অসঙ্গত। তাঁর নিজের কথা এই:—

"The whole demand upon the country, to commence from April 1777, shoud be founlded on an estimate of the permanent services, which the government must indispensably provide for with an allowance of a reasonable reserve for contingencies……I know not for what just or useful purpose any government can demand more from its subjects; for unless expenses are collected for the express purpose of absorbing the surplus, it must be dead in the treasury, or be embezzled. Having ascertained the amount the government needed to raise by land revenue, the contribution of the districts should be settled accordingly and 'fixed for ever'."

(Fifth Report, Vol. I, p. ccc.)

সংক্ষেপে Erancis সাহেবের মতে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে যত্র ব্যয় তত্র আয় হওয়া প্রয়োজন। অতএব দেশের শাসনসংরক্ষণ করবার জন্য, সম্ভাবিত ব্যয়-আয়ের একটা বজেট তৈরী করে' আবহমানকালের জন্য সেই বজেটই কায়েম রাখা দরকার। এই মতানুসারে বাঙলার রাজস্বও চিরস্থায়ী করা হ'ল। উপরি-উক্ত সব কারণে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে দশশালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হ'ল। বঙ্কিমচন্দ্রের কথা ঠিক। এ দেশের জলবায়ুর গুণে সব জিনিসই চিরস্থায়ী হয়ে ওঠে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও প্রজাস্বত্ব

এখন দেখা যাক, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির উপর প্রজার স্বত্ব আরো পাকা হ'ল, কিম্বা একদম কেঁচে গেল।

প্রজার যে ভিটে ও মাটি দুয়ের-ই উপর কিছু কিছু স্বত্ব ছিল, সে সত্য Sir John Shore প্রভৃতি সকলেই আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেই আবিষ্কারের ফলেই না তাঁদের মনে অতটা ধোঁকা লেগেছিল! একই জমির উপর জমিদার ও রায়ত, উভয়েরই যে একযোগে স্বত্ব-স্বামিত্ব কি করে' থাকতে পারে, এ ব্যাপার তাঁদের ধারণার বহির্ভূত ছিল। কেননা, কি Roman Law, কি বিলাতের Common Law ও দুয়ের কোনটির সঙ্গেই এ ব্যাপার মেলে না। ফলে যে স্বত্ব ছিল মিশ্র, তাকে তাঁরা করতে চাইলেন শুদ্ধ। ভারতবর্ষের মাটির এমনি গুণ যে, সে মাটি যে মাড়ায়, সে-ই শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত হয়ে ওঠে। ফলে এ দেশের প্রাকৃত প্রথা তাঁরা সংস্কৃত করতে প্রবৃত্ত হলেন।

প্রজা এখনো যেমন, তখনো তেমনি, প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল,—খোদকস্ত আর পাইকস্ত। যে প্রজার বাস্ত ও ক্ষেত্র দু-ই এক গ্রামস্থ, তার নাম খোদকস্ত প্রজা; আর ভিন্ন গ্রামের লোক যে-ক্ষেত্রে ঠিকে বন্দোবস্তে সুরৎ জমি চাষ করে, তার নাম পাইকস্ত। বলা বাহুল্য যে, প্রজাস্বত্ব শুধু খোদকস্ত প্রজারই ছিল, কেননা, পাইকস্ত প্রজার উপর জমিদারের যেমন কোনরূপ স্বামিত্ব ছিল না, জমির উপর তারও তেমনি কোনরূপ স্বত্ব ছিল না।

সে কালের প্রজাস্বত্বের মোটামুটি ফর্দ্দ এই:—

(১) প্রজাকে উচ্ছেদ করবার অধিকার জমিদারের ছিল না, অর্থাৎ—তার জোত ছিল দখলীস্বত্ববিশিষ্ট।

(২) সে জোত পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল

করবার অধিকার খোদকস্ত রায়তমাত্রেরই ছিল। আর পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করবার স্বত্ব যে মালিকীস্বত্ব, এ বিষয়ে Privy Council-এর নজির আছে। অতএব ধরে' নেওয়া যেতে পারে যে, জোত হস্তান্তর করার অধিকার প্রজামাত্রেরই ছিল। তবে এ কথা নিশ্চিত যে, সেকালে জমি হস্তান্তর করার সুযোগ ও প্রয়োজন—এ দুয়েরই বিশেষ অভাব ছিল। প্রজার তুলনায় জমির পরিমাণ এত বেশি ছিল যে, জমিদারের নামমাত্র নিরিখে পাইকস্ত প্রজাকে দিয়ে জমি চাষ করতেন।

(৩) জমাবৃদ্ধি করবার অধিকার জমিদারের ছিল না। এর একটি প্রমাণ এই যে, বাঙলার কোনো নবাবই আসল জমা কখনো বাড়ান নি। আসল জমা স্থির রেখে আবওয়াব বাড়ানোই ছিল তাঁদের মামুলি দস্তুর। রাজার প্রাপ্য ছিল প্রজার উৎপন্ন ফসলের একটি অংশমাত্র, সে অংশের হ্রাসবৃদ্ধি করবার অধিকার চিরাগত প্রথা অনুসারে রাজারও ছিল না।

খালি বাঙলার প্রজা নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের প্রজা এই সকল স্বত্বে স্বত্ববান্ ছিল। প্রমাণস্বরূপ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, এম্-এ, পি-আর-এস্ মহাশয়ের "পেশোয়াদিগের রাজ্যশাসনপদ্ধতি" নামক প্রবন্ধ থেকে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি:—

"মারাঠা পল্লীর চাষীদিগকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—মিরাসদার বা মিরাসী (খোদকস্ত) ও উপরি (পাইকস্ত)। মিরাসীরা গ্রামেরই লোক, গ্রামের জমি চাষ করিত। সে জমিতে তাহাদের একটি স্থায়ী স্বত্ব থাকিত। খাজনা বাকী না ফেলিলে কাহারও অধিকার ছিল না যে, তাহাদের জমি কাড়িয়া লয়। বাকী খাজনার দায়ে জমি হস্তান্তর হইলেও কিন্তু তাহাতে মিরাসীর স্বত্ব একেবারে লুপ্ত হইত না। ৩০।৪০, এমন কি, ৬০ বৎসর পরেও বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিতে পারিলেই, মিরাসী তাহার জমি ফিরিয়া পাইত। * * * * * মিরাসীরা গ্রাম-প্রতিষ্ঠাতাদিগেরই বংশধর। মনুর বিধান অনুসারে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরাই গ্রাম্য জমির মালিকস্বত্ব লাভ করিয়াছিলেন। * * * অবশ্য সরকারের বার্ষিক কর প্রত্যেক গ্রাম্যসমিতির প্রধান ও প্রথম দেয়। এই করের হার সরকারের কর্ম্মচারিগণ 'পাটীলের' (মণ্ডল) সঙ্গে একত্র হইয়া গ্রামের জমি ও চাষের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন।—"
(ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩২৬, পৃঃ ৪১১।)

এক কথায় সেকালে জমির অধিকারী ছিল প্রজা, আর তার উপস্বত্বের আংশিক অধিকারী ছিলেন রাজা। জমিদার এ রাজস্বেরই এক অংশ পেতেন, তিনি ছিলেন ইংরাজিতে যাকে বলে tax-collector, অর্থাৎ,—জমিদার মাইনের বদলে আদায়ের উপরে কমিসন পেতেন, আজও যেমন অনেক জমিদারীতে তহশিলদারেরা পেয়ে থাকে। তফাতের মধ্যে এইটুকু যে, একালে তহশিলদারেরা শতকরা পাঁচ টাকা হারে কমিসন পায়, সেকালে জমিদারেরা দশ টাকা হারে পেতেন।

জন্ কোম্পানী কিন্তু এ দেশের জমিদার-রায়তের মিশ্র সম্বন্ধকে উল্টে ফেলে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসাদে জমিদার হলেন বাঙলার মাটির স্বত্বাধিকারী আর প্রজা হ'ল তার উপস্বত্বের আংশিক অধিকারী।

কিন্তু এ পরিবর্ত্তন কোম্পানীর বড় কর্ত্তারা স্বেচ্ছায় করলেও স্বচ্ছন্দ-চিত্তে করেন নি। এ ভয় তাঁদেরও হয়েছিল যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বলে জমিদার প্রজার ভক্ষক না হয়ে ওঠেন। অতএব সেই সঙ্গে প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থাও যে করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে তাঁরা প্রায় সকলেই একমত ছিলেন। এখানে আমি শুধু দুটি লোকের মত উদ্ধৃত করে' দিচ্ছি, প্রথম Francis সাহেবের, তার পর Lord Cornwallis-এর; কারণ, এঁদের একজন হচ্ছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জনক, আর একজন তার জননী।

"Mr. Francis proposed, that it should be made an indispensable condition with the zemindar, that in the course of a stated time, he shall grant new pottahs to his tenants, either on the same footing with his own quit rents that is as long as the zemindr's quit rent remains the same, or for a term of years, as they may agree.—"

Francis সাহেবের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে Shore সাহেবের মন্তব্য হচ্ছে এই:—

"The former is the custom of the country, this will become a new assil jumma for each ryot, and ought to be as sacred as the zemindar's quit rent.—"

(Fifth Report, Vol. II, p. 88.)

এখন Lord Cornwallis-এর কথা শোনা যাক্:—

"—unless we suppose the ryots to be absolute slaves of zemindars—